# উচ্চশিক্ষায় প্রথম প্রজন্মের আবাসিক ছাত্রীদের অবস্থান : প্রান্তিক অভিজ্ঞতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য

পি এইচ. ডি উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

২০২৪


মধুপর্ণা কর্মকার

রেজিস্ট্রেশন নং : D -7/ISLM/13/18

তত্ত্বাবধায়ক : ড. নন্দিতা ব্যানার্জী ধাওয়ান

মানবীবিদ্যা চর্চা কেন্দ্র

ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল অব ইন্টারডিসিপ্লিনারী স্টাডিজ ল’ এন্ড ম্যানেজমেন্ট

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা ৭০০০৩২

**CERTIFICATE FROM THE SUPERVISOR**

Jadavpur University

Kolkata -7000032

School of Women's Studies

This is to certify that the thesis entitled "উচ্চশিক্ষায় প্রথম প্রজন্মের আবাসিক ছাত্রীদের অবস্থান: প্রান্তিক অভিজ্ঞতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য" (Status of First Generation Women Hostelers in Higher Education : Marginalized Experiences and Institutional Discriminations) submitted by Madhuparna Karmakar, who got her name registered on 16.01.2018 for the award of Ph.D. (Women's Studies) degree of Jadavpur University, is absolutely based upon her own work under the supervision of Dr. Nandita Banerjee Dhawan and that neither this thesis nor any part of it has been submitted for any degree/diploma or any other academic award anywhere before.

Nandita Banerjee Dhawan

Signature of the Supervisor

Date - 31/01/24

Assistant Professor
School of Women's Studies
Jadavpur University
Kolkata-700032

Aishika Chakraborty

Signature of the Director

Date - 31/1/24

Director
School of Women's Studies
Jadavpur University
Kolkata-700032

## STATEMENT OF ORIGINALITY

I, Madhuparna Karmakar registered on 16.01.2018 (Registration No: D-7/ISLM/13/18) do hereby declare that this thesis entitled "উচ্চশিক্ষায় প্রথম প্রজন্মের আবাসিক ছাত্রীদের অবস্থান : প্রান্তিক অভিজ্ঞতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য" (Status of First Generation Women Hostelers in Higher Education : Marginalized Experiences and Institutional Discriminations) contains literature survey and original research work done by the undersigned candidate as part of Doctoral Studies.

All information in this thesis have been obtained and presented in accordance with existing academic rules and ethical conduct. I declare that, as required by these rules and conduct, I have fully cited and referred all materials and results that are not original to this work.

Madhuparna Karmakar

Signature of Candidate:

Date: 31/01/24

Nandita Banerjee Dhawan

Certified by Supervisor: 31/01/24

Signature with date & seal

Assistant Professor
School of Women's Studies
Jadavpur University
Kolkata-700032

উৎসর্গ

ভারতীয় আবাসিক ছাত্রীদের প্রতি উৎসর্গিত

# কৃতজ্ঞতা

সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা ভারতীয় আন্তঃবিন্যাস ভিত্তিক নারীবাদের প্রতি। জ্ঞানচর্চার এই শাখা যে দৃষ্টিকোণ এবং অবস্থানকে চিনতে শেখায়, তার ভিত্তিতে এই গবেষণা করতে সমর্থ হয়েছি। কৃতজ্ঞতা ভারতবর্ষের প্রতিটি নারীবাদী তাত্ত্বিককে যাঁরা একটি স্বতন্ত্র যুক্তি কাঠামোর ধারাবাহিকতা নির্মাণ করেছেন এবং সমাজ চিন্তার ধারাকে দিয়েছেন স্বতন্ত্র স্রোত। দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বারোজন অংশগ্রহণকারী কয়েকটি পর্যায়ে সাক্ষাৎকারের জন্য তাঁদের ব্যস্ততার মধ্যেও সময় দিয়েছেন, তাঁদের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি অকপটে প্রকাশ করেছেন। সর্বোপরি, বিষয়টি তাঁরা গুরুত্বের সঙ্গে দেখেছেন তাদের কৃতজ্ঞতা। বেশ কয়েকটি দফায় সাক্ষাৎকারের জন্য তাঁরা রাজী হয়েছেন এবং বিভিন্ন পরিসরে ঘণ্টার পর ঘন্টা কথা বলেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, হস্টেল, শ্রেণিকক্ষ, হস্টেলের অতিথিশালা ইত্যাদিতে সাক্ষাৎকারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতেও তাঁরা সহায়তা করেছেন, সময় ও মনোযোগ দিয়েছেন এবং বিষয়গুলির সঙ্গে তাঁদের একধরণের একাত্মতা তৈরি হয়েছিল যেটি অভিভূত করেছে সব থেকে বেশি। সাক্ষাৎকারের সময় তাঁরা কোনো তথ্য দিতে ভুলে গেলে পরবর্তীতে নিজে সেই তথ্য দিয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনের একান্ত বিমর্ষতার স্মৃতি ও উপলব্ধি প্রকাশ করার জন্য যে অস্বস্তি ও বেদনার মধ্য দিয়ে যেতে হয়, সাক্ষাৎকারের সময় তাঁরা তা নির্দ্বিধায় বহন করেছেন এর জন্য কোনো কৃতজ্ঞতাই যথেষ্ট নয়। অংশগ্রহণকারীদের পরিবার এবং বাসস্থান পরিদর্শন করতে তাঁরা অনুমতি এবং সম্মতি দিয়েছেন, কৃতজ্ঞতা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের। প্রায় তিনবছর যাবৎ কয়েকটি পর্যায়ে সাক্ষাৎকার হয়েছে, এই দীর্ঘ সময় তাঁরা যুক্ত থেকেছেন, তথ্য সরবরাহ করেছেন। কৃতজ্ঞতা তাঁদের প্রত্যেককে। স্কুল ওব ওম্যান স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা। বিভাগটির নির্মাণের যে উদ্দেশ্য এবং কার্যপ্রণালী, বহু গবেষককে অনুপ্রাণিত করে চলেছে বিগত বেশ কয়েকটি দশক ধরে। বিভাগটির মধ্যে যে ভিন্নস্বরের গ্রহণযোগ্যতা এবং আশ্রয় রয়েছে, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার সংস্কৃতি বজায় রয়েছে তা অতুলনীয়। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ কর্তৃক প্রদত্ত ন্যাশনাল ফেলোশিপ আমাকে গবেষণাটি করার কাজে, ক্ষেত্রসমীক্ষায়, বই, পত্রপত্রিকা সংগ্রহে এবং আনুসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে দীর্ঘ পাঁচ বছরের জন্য অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রদান করেছে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রতি কৃতজ্ঞতা। কৃতজ্ঞতা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইন্টারডিসিপ্লিনারী স্টাডিজ ল' এন্ড ম্যানেজমেন্ট' ফ্যাকাল্টির প্রত্যেক অশিক্ষক কর্মীকে যাঁরা অফিসিয়াল কাজে প্রতিনিয়ত সাহায্য করেছেন।

এই গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ড. নন্দিতা ব্যানার্জী ধাওয়ানের প্রতি কৃতজ্ঞতা অসীম। তিনি নারীবাদের যে সহমর্মী ধরণের চর্চা তাঁর অ্যাকাডেমিক কাজকর্ম এবং জীবনযাপনের মধ্যে নির্মাণ করেছেন এবং বহন করে চলেছেন তা বাস্তবের খর আঁচের মধ্যে ছাত্রছাত্রী এবং গবেষকদের দিশা দেখায়, উপশমের পথ দেখায়। তাঁর ইন্টেলেকচুয়াল উৎকর্ষ এবং প্রদত্ত শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা, সন্তান স্নেহে তিনি যেভাবে গবেষকদের

ভালোমন্দের খেয়াল রাখেন এবং সর্বতোভাবে সহায়তা করেন তা অবর্ণনীয়। অকাতরে দেবার ক্ষমতা একজন নারীবাদী অ্যাকাডেমিককে যে সম্পূর্ণতা এবং সৌন্দর্য দেয় তার মূর্ত প্রতিকৃতি একজন গবেষক হিসাবে খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। যে মানসিক এবং বৌদ্ধিক শ্রম দিয়ে তিনি অন্বিত করেছেন তা কৃতজ্ঞতার অতীত।

বিভাগীয় পরিচালক প্রফেসর ঐশিকা চক্রবর্তীকে ধন্যবাদ। 'স্কুল অব ওম্যান স্টাডিজ'এর লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক দেবমিত্রাদি তৎপরতার সঙ্গে বইপত্র সরবরাহ করতেন এবং প্রয়োজনীয় বইপত্রের খোঁজ দিতেন, তাঁকে কৃতজ্ঞতা। অভিমন্যুদাকে ধন্যবাদ। বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবন লাইব্রেরির কর্ণধার এবং আর্কাইভের কর্ণধারকে ধন্যবাদ। লাইব্রেরিয়ান সীমাদিকে অশেষ কৃতজ্ঞতা। আর্কাইভের রক্ষক দেবাশিষবাবুকে ধন্যবাদ। ছবি এবং চিঠি সংগ্রহশালা থেকে প্রয়োজনীয় ছবি এবং চিঠি তাঁদের সহযোগিতায় সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল। রবীন্দ্রভবন পাঠাগারে কার্ড করার বিষয়ে সাহায্য করেছেন আমার পূর্ববর্তী বিভাগ, বিশ্বভারতী ভাষাভবন, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মিলন কান্তি বিশ্বাস। কৃতজ্ঞতা তাঁকে। রবীন্দ্রভবন গ্রান্থাগারে পাঠ গ্রহণ কালে মূল্যবান পরামর্শ এবং সহায়ক লেখাপত্রের সঙ্গে পরিচিতি ঘটিয়েছেন বিশ্বভারতীর কিংবদন্তী অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য। তাঁর অসীম উচ্চতার সংস্পর্শে আমি ঋদ্ধ। ব্যক্তি ছাড়াও পরিসর, স্থানের গুরুত্ব রয়েছে আমাদের সব কাজে, রবীন্দ্রভবন লাইব্রেরির পাঠকক্ষের প্রতি যে মুগ্ধতা আকৈশোর ছিল, গবেষণার কাজে তা কৃতজ্ঞতায় রূপান্তরিত হয়েছে। যাবতীয় বাইরের কাজ শেষ করে আমাকে সন্দর্ভ লেখার জন্য অনিবার্য ভাবে ফিরতে হয়েছিল শান্তিনিকেতনে। যেখানে কৈশোর, তারুণ্য কেটেছে সেই শান্তিনিকেতনের স্নেহস্পর্শ ছাড়া আমার পক্ষে মানসিক স্থিতি বজায় রেখে লেখার কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হত না। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং চিন্তাবিদ প্রহ্লাদ রায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা, সাক্ষাৎকারের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা তিনি যেমন আন্তরিকতার সঙ্গে করেছেন তেমনি তাঁর ব্যস্ততার মধ্যেও দীর্ঘ সময় ব্যয় করে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, তাঁর মূল্যবান বক্তব্য সমৃদ্ধ করেছে। পাঠভবনের শিক্ষক পার্থদা মূল্যবান বক্তব্য এবং পর্যবেক্ষণ দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন। পাঠভবনের শিক্ষক তড়িৎ রায় চৌধুরী সাক্ষাৎকার দিয়েছেন এবং তাতে গবেষণার লক্ষ্যে দ্রুত পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শিয়ান বিভাগের অধ্যাপক মহম্মদ ফায়েক মূল্যবান বক্তব্য ও পরামর্শ দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা তাঁকেও। দলিত নারীবাদী এবং লেখক কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়াল, লেখিকা মঞ্জু বালা সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করেছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শম্পাদি পরামর্শ দিয়েছেন, যাতে বহু সংশয় দূর হয়েছে এবং আলোচনার পথ সুগম হয়েছে। সহ গবেষক সায়ানাদি, সূর্যদা, প্রসেনজিৎ, চিরঞ্জিৎকে ধন্যবাদ। যাদবপুর বাংলা বিভাগের গবেষক প্রদীপদাকে ধন্যবাদ, যাবতীয় বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে গেছেন অনলস ভাবে। ধন্যবাদ সহপাঠী অভিমন্যুকে, ভ্রাতৃপ্রতিম সুমন কল্যাণকে, সুকৃতিকে, সুপ্রকাশকে যাদের সমর্থন এবং সহযোগিতা পরিমাপযোগ্য নয়। কৃতজ্ঞতা আমার মাকে, তাঁর মানসিক সমর্থন চালিকাশক্তি হিসাবে আজীবন ক্রিয়াশীল। বন্ধু এবং ভাইয়েরা যারা প্রতিনিয়ত

চেতনাকে জাগিয়ে রাখে তাদের প্রতি শুধু কৃতজ্ঞতা নয়, অপার শ্রদ্ধা। তাদের সদর্থক উপস্থিতি আজীবন মূল্যবান হয়ে থাকবে। গবেষণাকর্মটিতে অসাবধানতাবশত বানানগত ত্রুটি মার্জনীয়।


উদয়নপল্লী
শান্তিনিকেতন

মধুপর্ণা কর্মকার
গবেষক (পি এইচ ডি)
মানবীবিদ্যা চর্চা কেন্দ্র
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

# সূচিপত্র


| | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| **ভূমিকা** | ১-৪৭ |
| **প্রথম অধ্যায়**<br>স্বদেশি শিক্ষার পুনর্গঠনকালে সামাজিক ন্যায় বিচার ও লিঙ্গসাম্য :<br>বিশ্বভারতী এবং যাদবপুর বিশ্ববদ্যালয়ের সূচনাপর্ব | ৪৮-১০৫ |
| **দ্বিতীয় অধ্যায়**<br>গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের সার্বিক তথ্যের রেখাচিত্র | ১০৬-১২৭ |
| **তৃতীয় অধ্যায়**<br>উচ্চশিক্ষায় প্রথম প্রজন্মের আবাসিক ছাত্রীদের অভিজ্ঞতার বিশেষত্ব<br>এবং নবনির্মিত আত্মবোধের বিন্যাস | ১২৮-১৮৬ |
| **চতুর্থ অধ্যায়**<br>বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে প্রথম প্রজন্মের ছাত্রীদের ক্ষমতায়নের লড়াই,<br>অভিজ্ঞতা ও প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য | ১৮৭-২৪২ |
| **পঞ্চম অধ্যায়**<br>হস্টেলজীবন কেন্দ্রিক বাংলা কথা-সাহিত্যে আবাসিক ছাত্রীর উপস্থাপন:<br>একটি আন্তঃস্তরবিন্যাস ভিত্তিক পাঠ | ২৪৩-২৯২ |
| **উপসংহার** | ২৯৩-২৯৯ |
| **পরিশিষ্ট** | ৩০০-৩০১ |
| **গ্রন্থপঞ্জি** | ৩০২–৩১৪ |

## সারণী সূচি


পৃষ্ঠা

তালিকা – ১ গবেষণার ক্ষেত্র ও নমুনা সম্বন্ধে সাধারণ তথ্য ৩৮

তালিকা – ২ অংশগ্রহণকারীদের প্রাথমিক তথ্য, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ৩৮

তালিকা - ৩ অংশগ্রহণকারীদের প্রাথমিক তথ্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ৩৯

তালিকা – ৪ ক্ষেত্রসমীক্ষা এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণ বিষয়ক তথ্য ৪২

তালিকা – ৫ সাধারণ তথ্য (ক) ১০৯

সাধারণ তথ্য (খ) ১১০

তালিকা – ৬ অর্থনৈতিক অবস্থান। অংশগ্রহণকারী ছাত্রীদের অর্থনৈতিক অবস্থান (ক) ১১২

অংশগ্রহণকারী ছাত্রীদের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থান (খ) ১১৩

তালিকা – ৭ পারিবার সংক্রান্ত তথ্য। পারিবারিক তথ্য (ক) ১১৫

পারিবারিক তথ্য (খ) ১১৬

তালিকা - ৮ পারিবারিক শিক্ষাগত পরিস্থিতি ১১৯

তালিকা – ৯ স্থানান্তর সংক্রান্ত তথ্য ১২১

তালিকা - ১০ বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত তথ্য ১২৩

তালিকা - ১১ হস্টেল সংক্রান্ত তথ্য ১২৪

তালিকা - ১২ অংশগ্রহণকারী ছাত্রীদের শিক্ষাবর্ষে বিরতি এবং তার কারণ ১২৬

## চিত্রসূচি


পৃষ্ঠা

চিত্র - ১ সূচনাকালে শান্তিনিকেতন (গৌরপ্রাঙ্গণ) ৬৯

চিত্র – ২ শ্রীসদনের সামনে আশ্রমমাঠে মেয়েদের খেলার ছবি ৭৫

চিত্র – ৩ শিল্পকর্মে নিমগ্ন ছাত্রী ৭৬

চিত্র - ৪ শান্তিনিকেতনে মেয়েদের শিক্ষার সূচনাপর্বে মেয়েদের সহশিক্ষার ছবি ৭৬

চিত্র – ৫ চৈত্যর সামনে শ্রীসদনের ছাত্রীরা ৭৭

চিত্র - ৬ হেমবালা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি ৮১

চিত্র - ৭ নারীভবনের ঠিকানায় হেমবালা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি ৮২

চিত্র – ৮ বিশ্বভারতীর প্রথম মেয়েদের হস্টেল শ্রীসদন ৮৪

চিত্র – ৯ শ্রীসদন ছাত্রীনিবাসের অতিথিশালায় দেওয়ালচিত্র ৮৬

চিত্র - ১০ শ্রীসদন ছাত্রীনিবাসের অতিথিশালায় দেওয়ালচিত্র ৮৭

চিত্র – ১১ শ্রীসদন ছাত্রীনিবাসের অতিথিশালায় দেওয়ালচিত্র ৮৭

চিত্র - ১২ শ্রীসদন ছাত্রীনিবাসের অতিথিশালায় দেওয়ালচিত্র ৮৮

চিত্র – ১৩ শ্রীসদন ছাত্রীনিবাসের অতিথিশালায় দেওয়ালচিত্র ৯১

চিত্র – ১৪ গারদহীন শ্রীসদনের জানালা ৯২

চিত্র – ১৫ শ্রীসদন ছাত্রীনিবাস ৯৩

চিত্র - ১৬ মনোরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি ৯৫

চিত্র - ১৭ হেমবালা দেবীকে আমেরিকা থেকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি ৯৫

চিত্র –১৮ রমা করকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি ৯৬

চিত্র – ১৯ শ্রীসদনে মেয়েদের দৈনন্দিনের ছবি ১০২

চিত্র – ২০ শ্রীসদনে মেয়েদের দৈনন্দিনের ছবি ১০২

চিত্র – ২১ শ্রীসদনে মেয়েদের দৈনন্দিনের ছবি ১০৩

চিত্র – ২২ ক্ষেত্রসমীক্ষাকালীন অংশগ্রহণকারীদের বাসস্থানের ছবি ১৩৩

চিত্র – ২৩ ক্ষেত্রসমীক্ষাকালীন অংশগ্রহণকারীদের বাসস্থানের ছবি ১৩৫

চিত্র – ২৪ ক্ষেত্রসমীক্ষাকালীন অংশগ্রহণকারীদের বাসস্থানের ছবি ১৩৬

চিত্র – ২৫ অংশগ্রহণকারীদের ঘর, ক্ষেত্রসমীক্ষাকালীন ছবি ১৪৩

চিত্র – ২৬ ক্ষেত্রসমীক্ষাকালীন অংশগ্রহণকারীদের বাসস্থানের ছবি ১৪৬

চিত্র – ২৭ ক্ষেত্রসমীক্ষাকালীন অংশগ্রহণকারীদের বাসস্থানের ছবি ১৪৬

চিত্র – ২৮ ক্ষেত্রসমীক্ষাকালীন অংশগ্রহণকারীদের বাসস্থানের ছবি ১৪৮

চিত্র – ২৯ ক্ষেত্রসমীক্ষাকালীন অংশগ্রহণকারীদের বাসস্থানের ছবি ১৫০

চিত্র – ৩০ ক্ষেত্রসমীক্ষাকালীন অংশগ্রহণকারীদের বাসস্থানের ছবি ১৫১

চিত্র – ৩১ ক্ষেত্রসমীক্ষাকালীন অংশগ্রহণকারীদের বাসস্থানের ছবি ১৫১

চিত্র – ৩২ প্রতিমা ছাত্রীনিবাস, ক্ষেত্রসমীক্ষাকালীন ছবি ১৮০

চিত্র – ৩৩ আম্রপালী ছাত্রীনিবাস, ক্ষেত্রসমীক্ষাকালীন ছবি ১৮১

চিত্র – ৩৪ ক্ষেত্রসমীক্ষাকালীন ছবি ১৮৩

চিত্র – ৩৫ ক্ষেত্রসমীক্ষাকালীন অংশগ্রহণকারীদের বাসস্থানের ছবি ১৮৬

চিত্র – ৩৬ ক্ষেত্রসমীক্ষাকালীন অংশগ্রহণকারীদের বাসস্থানের ছবি ১৮৬

চিত্র – ৩৭ পিঞ্জড়া তোড় অন্দোলনের গ্রাফিতি ২৪০

চিত্র – ৩৮ ছাত্রীনিবাস, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ২৪০

চিত্র – ৩৯ গ্রাফিতি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ২৪১

চিত্র – ৪০ গ্রাফিতি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ২৪১

চিত্র – ৪১ গ্রাফিতি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ২৪২

চিত্র – ৪২ স্মৃতিকথায় বর্ণিত শ্রীসদনের অতিথিশালার দেওয়ালচিত্র ২৫৮

চিত্র – ৪৩ স্মৃতিকথার আধার 'শ্রীসদন' ২৬২

চিত্র – ৪৪ 'সব হতে আপন' বইটির প্রচ্ছদ ২৬৫

চিত্র – ৪৫ বিশ্বভারতীর প্রথম মেয়েদের হস্টেল শ্রীসদন ২৬৬

চিত্র – ৪৬ 'মেয়েদের হস্টেল- জীবন অন্দরের কথামালা' বইটির প্রচ্ছদ ২৭৫

চিত্র – ৪৭ স্মৃতিকথার পটভূমি, শ্রীসদন ২৭৬

চিত্র – ৪৮ 'শ্রীসদনের শ্রীমতীরা' বইটির প্রচ্ছদ ২৮০

চিত্র – ৪৯ 'চাঁদের গায়ে চাঁদ' বইটির প্রচ্ছদ ২৯১

## মানচিত্র সূচি


| | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| মানচিত্র - ১ বিশ্বভারতীতে পড়তে আসা ছাত্রীদের এলাকা | ৩৯ |
| মানচিত্র – ২ যাদবপুরে পড়তে আসা ছাত্রীদের এলাকা | ৩৯ |
| মানচিত্র – ৩ ভারতের ম্যাপে দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান | ৪০ |
| মানচিত্র - ৪ বিশ্বভারতীতে পড়তে আসা ছাত্রীদের এলাকা | ১৫৪ |
| মানচিত্র - ৫ যাদবপুরে পড়তে আসা ছাত্রীদের এলাকা | ১৫৪ |
| মানচিত্র - ৬ সুধা মালের এলাকা থেকে উচ্চশিক্ষাসূত্রে স্থানান্তর | ১৫৭ |
| মানচিত্র – ৭ ইউমী দর্জির এলাকা থেকে উচ্চশিক্ষাসূত্রে স্থানান্তর | ১৫৭ |
| মানচিত্র - ৮ টিনা দাসের এলাকা থেকে উচ্চশিক্ষাসূত্রে স্থানান্তর | ১৫৮ |
| মানচিত্র - ৯ রিনি মুর্মুর এলাকা থেকে উচ্চশিক্ষাসূত্রে স্থানান্তর | ১৫৮ |

# ভূমিকা

# ভূমিকা

“জাত গেল জাত গেল বলে
এ কি আজব কারখানা
সত্য কাজে কেউ নয় রাজী
সবই দেখি তা না না না” ...। লালন ফকির[১]

জাতিভিত্তিক বৈষম্য উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে একটি জটিল সমস্যা যার দৃশ্যমানতা প্রকট না হলেও প্রভাব অনুভূত হয়। আজকের উচ্চশিক্ষা কোনো আকস্মিক প্রতিষ্ঠান নয়, একটি স্পষ্ট ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ফসল। একটি প্রতিষ্ঠান ও তৎসংলগ্ন পরিসরের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের একটি নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থাকে যার ভিত্তিতে নির্মিত ও সঞ্চারিত হয় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির কার্যপ্রণালী। উচ্চশিক্ষা পরিসরে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের অংশগ্রহণ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়াজাত। শিক্ষানীতি সংস্কার, সাংবিধানিক অধিকার ও সংরক্ষণ, চলমান সামাজিক আন্দোলনের একটি সম্মিলিত প্রভাব পড়ে উচ্চশিক্ষার পরিসরে অথবা এই কার্যকারণ সম্পর্কে নির্মিত হয়ে চলে একটি উচ্চশিক্ষা পরিসরের চরিত্র। সামাজিক প্রতিটি স্তরগুলি যেমন প্রতিনিয়ত নিজেদের অবস্থান বদল করছে, প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে পারস্পরিক বিদ্যমান ক্ষমতা সম্পর্ক। ক্ষমতা সম্পর্কের আপাত শক্তিশালী প্রভাবকগুলি ক্রমে অন্য বিষয় এবং পরিসরকে প্রভাবিত করে চলে। বিপরীতে ভিন্ন কার্যকারণ ক্ষমতা সংগ্রহ করলে পুনরায় বদলে যায় অবস্থান। প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্র ও পরিকাঠামো এই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় ক্রমে বদলে যায়। একদিকে সামাজিক বৈষম্য, আর্থ-সামাজিক স্তরবিভাজন, বিদ্যমান ক্ষমতা সম্পর্ক অন্যদিকে সংরক্ষণ, বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন, সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদির চলমান দ্বান্দ্বিক সম্বন্ধ বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরকে একটি ক্রমাগত রূপান্তরের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে পরিকাঠামোগত অন্তর্ভুক্তি অন্যদিকে বাস্তব দৈনন্দিনে তার ব্যত্যয় পরিস্থিতিকে স্ববিরোধী করে তোলে। বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে উচ্চশিক্ষায় প্রান্তিক ছাত্রীদের অভিজ্ঞতা ও অবস্থান এই গবেষণা সন্দর্ভের অন্বিষ্ট।

**‘প্রান্তিকতা’র ঐতিহাসিক বহুমাত্রা**

শিক্ষাক্ষেত্রে নিম্নবর্গ নারীর প্রান্তিকতার ভারতীয় পটভূমি আলোচনার ক্ষেত্রে বর্ণাশ্রম এবং অস্পৃশ্যতার ধারাবাহিকতার রেখাচিত্র গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সামাজিক প্রান্তিকতায় আর্থ-সামাজিক পশ্চাৎপদতার সঙ্গে অস্পৃশ্যতারও একটি রূপান্তর রয়েছে। আজকের ‘প্রান্তিক’ সম্প্রদায় যে প্রান্তিকতার মধ্যে অবস্থান করছেন তার মধ্যে পিছিয়ে থাকা (রাখা)-র একটি বিবর্তিত রূপের ছাপ রয়েছে। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় ‘ক্ষমতাক্রম’

---

[১] প্রচলিত বাউলগান, পদকর্তা, লালন ফকির (১৭৭২-১৮৯০) জাতি-ধর্ম ভিত্তিক সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সাধক বাউল লালন সাঁই বিশেষ সচেতনতা গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর রচিত গান জাতি বৈষম্যের বিরুদ্ধে একটি বলিষ্ঠ স্বর হয়ে ওঠে।

একটি সামাজিক সংস্কার যার ফলে ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণীয় হিন্দু, হিন্দু সমাজেরই অন্যান্য সম্প্রদায়ের এবং হিন্দু সমাজ বহির্ভূত মানুষজনকে অপবিত্র ভেবে স্পর্শের অযোগ্য মনে করেছে এবং সামাজিক সকল প্রকার দূরত্ব বজায় রেখেছে। প্রাচীন হিন্দু সমাজ চারটি শ্রেণি বা বর্ণে বিভক্ত ছিল – ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। যে প্রথার মাধ্যমে এই বর্ণগুলির মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণীত হত তা বর্ণাশ্রম প্রথা হিসাবে পরিচিতি লাভ করে (Smith, 1961)। এই প্রথা অনুযায়ী প্রতিটি ব্যক্তি বংশানুক্রমিকভাবে সুনির্দিষ্ট পেশার সঙ্গে জড়িত থাকত এবং সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে উচ্চনীচের অনুক্রম মেনে চলত। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকে রচিত ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের একটি শ্লোকে সর্ব প্রথম বর্ণ বিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায় (Thapar, 1966)। সেখানে বলা হয়েছে; ব্রাহ্মণের জন্ম পরম পুরুষের মুখ থেকে, ক্ষত্রিয়ের জন্ম বাহু থেকে, বৈশ্যের জন্ম উরু থেকে এবং শূদ্রের জন্ম পা থেকে।[২] উচ্চ নীচের এই ধারণা ক্রমে একটি বর্ণকে শ্রেষ্ঠ এবং বাকিদের নিকৃষ্ট ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে। উচ্চ ও নীচের এই ধারণা এক সম্প্রদায়ের প্রতি অন্য সম্প্রদায়ের ঘৃণা ও হিংসার সম্পর্কের জন্ম দেয়। সমাজে অস্পৃশ্য হিসাবে পরিচিত অংশ আর্থ-সামাজিক ভাবেও পিছিয়ে, যাবতীয় সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। বর্ণহিন্দুগণ সেখানে শোষক এবং নিম্নবর্গীয়গণ সেখানে শোষিতের ভূমিকায়। শ্রেণিগত এবং বর্ণগত দ্বিমুখী বৈষম্যের তাঁরা সম্মুখীন হন। এই যাবতীয় বিভাজন ইত্যাদি পুরুষের সমাজের, সমাজের সমস্ত নারী শূদ্র হিসাবে বিবেচিত। ব্রাহ্মণ্যবাদী অনুশাসনগ্রন্থগুলির মধ্যে মনুসংহিতায় অস্পৃশ্যতা আইনি ভিত্তি লাভ করে। এখানে স্পৃশ্য এবং অস্পৃশ্যতার বিচারে তিনটি বিভাগের কথা বলা হয়েছে। স্পৃশ্য, প্রায় অস্পৃশ্য, পূর্ণ অস্পৃশ্য (Shastri, 1945)। এখানে ব্রাহ্মণ এই বিধানের নির্ধারক এবং বিধির নিয়ন্ত্রক। এই বিধান অনুসারে ব্রাহ্মণরা অগ্নি ও জলের ন্যায় পবিত্র, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য সম্প্রদায়ের মানুষ ব্রাহ্মণদের নিকট স্পৃশ্য রূপে গণ্য হবেন এবং শূদ্ররা প্রায় অস্পৃশ্যের পর্যায়ে। যারা পুরোপুরি অস্পৃশ্য তারা হল অন্ত্যজ। মনুসংহিতা অনুসারে বর্ণগুলির পারস্পরিক গ্রহণযোগ্যতা জটিল শর্ত সাপেক্ষ এবং প্রায়শ্চিত্ত বিধানের ওপর দাঁড়িয়ে (Dutt, 1968)।

পরবর্তীতে বুদ্ধদেব খ্রীষ্টপুর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্যবাদ, বর্ণাশ্রম ধর্ম, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদির ভিত্তিহীনতা বিষয়ে প্রচার করেন ফলত বৌদ্ধ শাস্ত্রসমূহে এ বিষয়ের উল্লেখ কিছুটা ভিন্ন ধর্মী (ঘোষ, ১৯৮৩)। বৌদ্ধ শাসনামলে বর্ণবাদ অপেক্ষাকৃত ভাবে স্তিমিত হলেও দশম শতকের কাছাকাছি হিন্দুত্ববাদের পুনরুত্থানের কালে পুরাণ রচনার হাত ধরে পুনরায় বর্ণবাদ প্রচলিত হয় (রায়, ১৯৪৭)। সচেতনভাবে সমকালীন সমাজব্যবস্থাকে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য স্মৃতির আদর্শ, কাঠামো ও যুক্তিপদ্ধতি অনুসারে পুনর্গঠনের প্রয়াস শুরু হয় (রায়, ১৯৪৭, পৃ- ৭)। বৃহদ্ধর্ম পুরাণে হিন্দু সমাজের ৫০ টি সম্প্রদায় বা 'জাত'-কে মোটামুটি ভাবে ৫ টি বৃহত্তর ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ, উত্তম সংকর, মধ্যম সংকর, অধম সংকর, ম্লেচ্ছ। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে

[২] গুণ এবং কর্ম অনুযায়ী বর্ণবিভাগের উল্লেখ রয়েছে রাময়ণে এবং মহাভারতে। শ্লোক গুলি উল্লেখ করা হল - "চাতুর্ব্বর্ণ্য লোকস্মিন স্বে স্বে ধর্মে নিয়কস্যতি" রামায়ণ, ১;১;৭৯, "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ" শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা, ৪;১৩

শূদ্রকে ভাগ করা হয়েছে দুইটি বর্ণে। এই পুরাণে ৪৭ টি জাতকে ৪ টি মোট বৃহৎ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ, সৎ শূদ্র, অসৎ শূদ্র এবং অন্ত্যজ। ভবদেব ভট্টের 'প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ' গ্রন্থে সরাসরি ১৪ টি জাতিকে অস্পৃশ্য হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের সামাজিক অবস্থান এই দীর্ঘ সময় ধরে একই না থাকলেও আর্থ-সামাজিক ভাবে তারা ব্রাত্যই থেকেছে। ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনে হিন্দু সমাজের এই বিভাজন একটি ভিন্ন আদল পায়। স্পৃশ্য জাতিগুলি 'সাধারণ' এবং অস্পৃশ্য জাতিগুলি 'তফসিলি' অভিধায় বিভক্ত করা হয় (সুর, ১৯৭৭)। 'অস্পৃশ্য' জাতিগুলি একটি শিরোনামের আওতায় আসে। জাতিভেদ বিরোধী আন্দোলনগুলি তীব্রতর হওয়ার পরবর্তীকালে 'তফসিলি' শিরোনামে তালিকাভুক্ত জাতিগুলির অভিধা আনুষ্ঠানিকতা লাভ করে এবং হিন্দু সমাজে স্পৃশ্য এবং অস্পৃশ্য বিভাজন নতুন মাত্রা পায় (সুর, ১৯৭৭)।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে অস্পৃশ্যতার সরাসরি প্রতিক্রিয়া হিসাবে 'মতুয়া' ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। প্রবর্তক হরিচাঁদ ঠাকুর (১৮১২-১৮৭৮) নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের উন্নতি সাধনে ব্রতী হন, তাঁর ধর্মদর্শনে বৌদ্ধধর্ম, বৈষ্ণব সহজিয়া, বাউল, কর্তাভজা প্রভৃতি ধর্মাদর্শের প্রভাব দেখা যায়। বুদ্ধ ও চৈতন্যের কর্ম পুরণের জন্য তাঁর জন্ম হয়েছে বলে তিনি দাবী করেন, তিনি ধর্মাচরণের মধ্যে শিক্ষাকে দিয়েছিলেন সর্বাধিক গুরুত্ব। (সরকার, ১৯৭১) বিশ শতকের হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্যতা নির্ভর ক্রমবিন্যাস খুঁজতে গিয়ে দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য দেখেন, উচ্চতর জাতি অস্পৃশ্য জাতিতে ঘৃণা করে, অস্পৃশ্য জাতি আবার অস্পৃশ্যতর জাতিকে ঘৃণা করে। এইভাবে হিন্দু সমাজে নিম্নতম স্থানে ঘৃণা চিরস্থায়িত্ব পেয়েছে (বিদ্যাভূষণ, ১৯২৮)। শূদ্র শ্রেণির বালকেরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত তিনি সেটিও লক্ষ করেন। এই ভাবে শূদ্র পুরুষদের শিক্ষার আঙ্গিনায় প্রবেশ বিষয় দ্বিধান্বিত থেকেছে উনিশ শতকের শেষার্ধেও। বৃটিশ সরকারের হস্তক্ষেপে এবং জাতিভেদ প্রথা বিরোধী আন্দোলনের সামাজিক প্রভাবে শিক্ষার আঙ্গিনায় অস্পৃশ্য, দলিত পুরুষের প্রবেশাধিকার নিয়ে বিতর্ক, সমালোচনা এবং গ্রহণযোগ্যতার টানাপোড়েনে বিধ্বস্ত ছিল এই শতক। পাশপাশি মেয়েদের শিক্ষার অধিকার, শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ বিষয়ে ততদিনে মুখর হয়ে উঠেছে বাংলার শিক্ষাঙ্গন। এখানে আলোচনার মধ্যে যাঁরা আসছেন না তাঁরা দলিত নারী। 'অস্পৃশ্য বালক' এবং 'উচ্চবর্ণীয় নারী'-র শিক্ষায় অংশগ্রহণ এবং স্থান করে নেবার সামাজিক সচেতনতার মধ্যে দলিত নারীর সঙ্গে শিক্ষায় অংশগ্রহণের সম্বন্ধ কি দাঁড়ায়। যাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে শিক্ষার অধিকারের জন্য সাংবিধানিক সংরক্ষণ পর্যন্ত এবং সামাজিক সাবলীল গ্রহণযোগ্যতার পথ কি আজও মসৃণ হয়েছে?

এই বিষয়টির অনুসন্ধান এই গবেষণার মূল চালিকা শক্তি। প্রান্তিক ছাত্রীরা যারা ঐতিহাসিক ভাবে যে সামাজিক স্তর বিভাজন, বংশানুক্রমে তার প্রান্ত থেকে এসেছেন, এই প্রান্তিকতার কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাদের প্রান্তিকতা একমাত্রিক নয়। সমাজের নিম্ন স্তর থেকে উচ্চশিক্ষায় আসা প্রথম প্রজন্মের ছাত্রীদের প্রান্তিকতা একটি বহুমুখী বিষয়। এই প্রান্তিকতার প্রথম এবং প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, যে সামাজিক স্তরের সদস্য হিসাবে সাংবিধানিক ভাবে পরিগণিত হয় সেখানেও তারা প্রান্তিক অবস্থানে থাকে। মূলস্রোতের সাপেক্ষে

তাদের প্রান্তিকতা কয়েকগুণ বেড়ে যায়, শ্রেণিগত, জাতিগত, লিঙ্গগত এবং ভৌগোলিক মানদণ্ডে। আর্থ-সামাজিক পরিসরের কাঠামোগত ভাবে যে মূল প্রামাণ্য মানদণ্ড তা উচ্চবর্ণ পুরুষ। তার ভিত্তিতে এই ছাত্রীদের অবস্থান নির্ণয় করার চেষ্টা করলে দেখা যাবে 'প্রান্তিকতা' কয়েকটি সাপেক্ষতায় প্রতিফলিত হয়। প্রথমত নিজেদের সম্প্রদায়ের, স্তরের মধ্যে লিঙ্গ বৈষম্য গত দিক থেকে এক ধরণের প্রান্তিকতার অবস্থান রয়েছে। আবার একটি জেলা, রাজ্যের নারীদের মধ্যে তারা শ্রেণিগত, জাতিগত কারণে আরেক প্রস্থ প্রান্তিক অবস্থানের সম্মুখীন তারা হন। তাদের প্রান্তিকতার মূলত দুটি বৈশিষ্ট্য– বহুমাত্রিকতা, বহুসাপেক্ষতা। বহুমাত্রিকতার দিক থেকে তাদের প্রান্তিকতার কয়েকটি মাত্রা রয়েছে। শ্রেণিগত, জাতিগত, লিঙ্গগত এবং ভৌগোলিক। বহুসাপেক্ষতার ক্ষেত্রে তাদের প্রান্তিকতা সাপেক্ষতা অনুসারে ভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয়।

'প্রান্তিকতা' ভারতীয় সমাজে একটি বহুমাত্রিক বিষয় এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে একজন নারীর প্রান্তিকতা বহুবিধ আর্থ-সামাজিক মানদণ্ডের ওপর নির্ভর করে। এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারী প্রথম প্রজন্মের ছাত্রীরা প্রথমত, লৈঙ্গিক দিক থেকে সামাজিক বৈষম্য অনুযায়ী প্রান্তিক। 'মুখ্য' এবং 'প্রধান' লিঙ্গের পাশে 'দ্বিতীয় লিঙ্গ', 'অপর' হিসাবে বিবেচিত নারী প্রান্তিকতার স্বীকার তা বলা বাহুল্য (বোভোয়ার, ২০১২)। দ্বিতীয়ত, জাতিগত বৈষম্য তাদের আরেক প্রস্থ প্রান্তিকতার সম্মুখীন করে, জাতিগত বৈষম্যের বর্তমানে অস্তিত্ব নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তোলেন কিন্তু এই অদৃশ্য অথচ প্রকট বৈষম্য সমাজে অস্তিত্বশীল (Rege, 1998)। যারা এই বৈষম্যের শিকার হন তাদের কাছে এটির অস্তিত্ব প্রকট বাস্তব। প্রান্তিক ছাত্রীরা জাতিগত দিক থেকে সামাজিক মানদণ্ডে প্রান্তিকতার সম্মুখীন হন। তৃতীয়ত, শ্রেণিগত একটি প্রান্তিকতা তাদের রয়েছে। পরিবারের স্বচ্ছলতা বা অস্বচ্ছলতার অপর অনেক ক্ষেত্রেই নির্ভর করে না প্রান্তিক মেয়েটির অর্থনৈতিক সমস্যা, 'মেয়েদের দারিদ্র' দারিদ্রের ভিন্ন একটি মাত্রা। অন্যদিকে প্রথম প্রজন্মের ছাত্রীরা সাংস্কৃতিক মুলধনের দিক থেকে প্রান্তিক। 'পিছিয়ে পড়া' (রাখা) সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হবার দরুণ এবং বিগত দিনে পরিবারের কেউ বিশ্ববদ্যালয়ে যাবার সুযোগ না থাকায় সাংস্কৃতিক মূলধনের প্রশ্নে তাদের একটি প্রান্তিকতা থাকে। চতুর্থত, ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে একটি প্রান্তিকতা তাদের রয়েছে। জেলার প্রান্তিক গ্রামগুলিতে, বা প্রান্তিক জেলাগুলিতে তারা থেকেছে বা বড় হয়েছে সেদিক থেকে বড় শহরে খাপ খাইয়ে নিতে বা শহরের ক্যাম্পাসে খাপ খাইয়ে নিতে তাদের অসুবিধা হয়। অথবা 'প্রান্তিক অঞ্চলে' পড়াশুনার সুযোগ ও অন্যান্য পরিষেবা উপলব্ধ নয়। এই আর্থ-সামাজিক অবস্থানে একদিকের প্রান্তিকতাকে অন্যগুলির সঙ্গে যুক্ত করে ভিন্ন একটি মাত্রা করে তোলে। দুটি আলাদা প্রান্তিকতা ভিন্ন ভাবে যে বৈশিষ্ট্য বহন করে, সেই বৈশিষ্ট্যগুলি একত্রিত হলে তার প্রভাব বদলে যায়, আরো সূক্ষ্ম ও তীব্র হয়ে পড়ে। একদিকে নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে পুরুষের দ্বারা নিপীড়িত আবার তারা নারীদের মধ্যেও প্রান্তিক। পিছিয়ে পড়া শ্রেণির প্রথম প্রজন্মের ছাত্রীদের প্রান্তিকতার এই বিশেষত্ব রয়েছে। দ্বিমাত্রিক বৈষম্যের সম্মুখীন হন তারা। প্রান্তিক ছাত্রীরা লিঙ্গ ও জাতি এই দুই বৈষম্য দ্বারা নিপীড়িত। আর্থ-সামাজিক কারণে তারা বিদ্যমান ক্ষমতা

সম্পর্কের মধ্যে লিঙ্গ ও জাতিভিত্তিক বৈষম্যের সম্মুখীন হন। উচ্চশিক্ষায় আর্থিক সামর্থ্যের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক মূলধনের প্রশ্নটি ক্রিয়াশীল থাকে প্রথম প্রজন্মের ছাত্রীদের ক্ষেত্রে। তথ্যের অভাব, শিশুকাল থেকে পরিমণ্ডলের অভাব তাদের শিক্ষার অভিজ্ঞতাকে বিশেষ একটি আকার দিতে পারে না। পরবর্তীকালে নিজের চেষ্টায় এবং কারো সহায়তায় উচ্চশিক্ষায় এসে পৌছতে সক্ষম হয়। এই ছাত্রীদের শিক্ষাজীবনে সাংস্কৃতিক মূলধনের প্রশ্নটি একটি বড় ভুমিকা পালন করে।

স্বগোষ্ঠীর মধ্যে এই ছাত্রীদের প্রান্তিকতা এবং গোষ্ঠীর বাইরে তাদের প্রান্তিকতার চেহারা আলাদা। আবার ব্যক্তির কিছু নিজস্ব প্রান্তিকতার বোধ রয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, প্রথম প্রজন্মের একজন ছাত্রীর উপরিউক্ত প্রান্তিকতাগুলির সঙ্গে রয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধকতা যা তাকে একধরনের বাস্তবতা এবং প্রান্তিকতার বোধের মধ্যে নিমজ্জিত রাখে। প্রান্তিকতা এমন একটি পরিচিতি যা কেন্দ্রের কাছাকাছি না এলে উপলব্ধ হয় না। দিকভ্রান্ত প্রান্তিকতার চর্চা বৈষম্য বাড়িয়ে পরিস্থিতি আরো শ্বাসরোধী করে তোলে যেমন, অভিজাত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রান্তিক অবস্থান থেকে এসে 'প্রান্তিক' এই তকমার মধ্যে ডুবে যাওয়া। এই পরিসরে এসে তারা জানতে পারে তারা ক্রমে নিকটবর্তী হয়েছে কোনো ক্ষমতার কেন্দ্রের। যার প্রেক্ষিতে সে প্রান্তিক। দিকভ্রান্ত প্রান্তিকতার চর্চা প্রান্তিকতার বৈষম্যমূলক চরিত্রকেই মান্যতা দেয়, গঠনমূলক কোনো সমাধান সূত্রে উপনীত করে না।

**উচ্চশিক্ষায় 'প্রথম প্রজন্ম' এর ধারণা**

প্রথম প্রজন্মের কলেজ ছাত্ররা 'শিক্ষামূলক অগ্রদূত' তারা তাদের পরিবারের প্রথম, বা প্রথমদের মধ্যে একজন যারা মাধ্যমিক পরবর্তী শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করেছে (Billson and Terry, 1982; Mitchell, 1997) কিছু চিন্তাবিদ তাদের এমন ছাত্র হিসাবে বর্ণনা করেছেন যাদের বাবা-মা কলেজে যাননি। Billson & Terry এবং অন্যান্য গবেষকরা তাদের কাজের সংজ্ঞাটিকে এমন ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন যাদের বাবা-মা কলেজে পড়াশোনা করেছেন, কিন্তু কোনও ডিগ্রি অর্জন করেননি। তাদের গবেষণায় সংজ্ঞাটিকে সংকুচিত করেছেন এবং প্রথম প্রজন্মের ছাত্র বলতে কেবলমাত্র সেই ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন যারা তাদের পরিবার থেকে প্রথম কলেজে গেছে। (London, 1989) কিছু গবেষক এই ধরনের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অভিজ্ঞতাগত পার্থক্য নিয়ে গবেষণা করেছেন, যাদের বাবা-মায়ের শুধুমাত্র উচ্চ বিদ্যালয় বা তার কম ডিগ্রি রয়েছে, বনাম এমন কিছু ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে, যাদের বাবা-মা কোনও কলেজে পড়েছিলেন কিন্তু ডিগ্রি পাননি এবং যে ছাত্রছাত্রীদের বাবা-মা স্নাতক বা তার বেশি ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং এই আলাদা গোষ্ঠীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য খুঁজে পেয়েছেন (Pascarella et al. 2004; Sherlin, 2002)। এই গবেষণায় প্রথম প্রজন্মের কলেজ ছাত্রছাত্রীদের সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যাদের বাবা-মা বা অভিভাবক উভয়েরই উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষা বা তার কম রয়েছে এবং মাধ্যমিক পরবর্তী ডিগ্রি শুরু করেননি। এই সংজ্ঞাটি সমসাময়িক গবেষণার সাথে সবচেয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয়। যদিও প্রথম প্রজন্মের কলেজ ছাত্রছাত্রীর

সংজ্ঞা পরিবর্তিত হতে পারে। কয়েকটি প্রতিষ্ঠান তাদের প্রথম প্রজন্মের কলেজ ছাত্রছাত্রীদের খতিয়ান নেয়, তাতে দেখা যাচ্ছে, তাদের সংখ্যা ইউনাইটেড স্টেটসের কলেজ ক্যাম্পাসে বাড়ছে (Mitchell, 1997; Padron, 1992; Terenzini et al., 1996)। পূর্ববর্তী গবেষণাগুলিতে ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের জন্য কলেজে স্থানান্তরকে বিশেষভাবে কঠিন বলে চিত্রিত করা হয়েছে (London, 1989; Terenzini et al., 1996)। Terenzini (1994) এবং অন্যান্য গবেষকরা যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা কলেজের সাথে খাপ খাইয়ে নেয় তাকে 'বিচ্ছিন্নতা' বা পারিবারিক ঐতিহ্যের লঙ্ঘন হিসাবে বর্ণনা করেছেন। যেহেতু কলেজের অভিজ্ঞতা তাদের পরিবারের পটভূমিতে ছিল না, তাই প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের অবশ্যই একটি নতুন সংস্কৃতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হয়, মূলত কলেজ জীবনের একাডেমিক এবং সামাজিক সংস্কৃতির সঙ্গে।

দক্ষিণ আফ্রিকার শিক্ষা ব্যবস্থার কর্তৃত্ব ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষায় অ/বৈধতার প্রেক্ষাপটে, Alcock & Belluigi (2019) উচ্চশিক্ষায় নতুন প্রবেশকারী ছাত্রছাত্রীদের ক্যাম্পাস জীবনে তাদের রূপান্তর এবং অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করার সময় তাদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পরিচয় এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থানের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। তারা দক্ষিণ আফ্রিকার একটি কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম প্রজন্মের সাতজন শিক্ষার্থীর রূপান্তর বিষয়ে একটি মনোসামাজিক অধ্যয়ন পরিচালনা করেছিলেন যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়টি একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসাবে অবস্থান করছিল, যেখানে উন্নতির সুযোগ এবং আত্মিক বিচ্ছিন্নতা উভয়ই ছিল। অংশগ্রহণকারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পেশাদার সম্প্রদায়ের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে পরিচিত। তবে, শহুরে ক্যাম্পাসের প্রেক্ষাপটে, বেশিরভাগ অংশগ্রহণকারীদের স্থানীয় সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যগুলি কমতি হিসাবে চিহ্নিত হয়ে যায়। এই দুই গবেষক যুক্তি দেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করার প্রয়োজন, যা শিক্ষার্থীদের রূপান্তরমূলক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আত্ম-প্রতিফলনে সক্ষম করে তুলবে এবং তাদের মধ্যে সম্মিলিত এবং সমালোচনামূলক চেতনা বিকশিত করবে।

প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা সামাজিকভাবে যে অবস্থান থেকে আসেন, সেই উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পরিচয়কে তারা অসুবিধাজনক মনে করে বা সংশোধনযোগ্য মনে করে। মার্কিন "সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীরা" তাদের সাদা সমকক্ষদের তুলনায় পিছিয়ে, এই শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৪৮ শতাংশ ল্যাটিনো/এ, ৪২ শতাংশ আফ্রিকান আমেরিকান এবং ২০ শতাংশ ইংরেজি ছাড়াও ভিন্ন ভাষাভাষীর ছাত্র (PNPI, 2016)। এখানে বৈষম্য মূলত অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা থেকে উদ্ভুত। একইভাবে, দক্ষিণ বিশ্বের প্রেক্ষাপটে, এই ধরনের সমস্যাগুলি এবং ঐতিহাসিক ভাবে পিছিয়ে রাখা সমাজপ্রসূত সমস্যাগুলি উচ্চশিক্ষা পরিসরের মধ্যে পুনরুৎপাদিত হয় এবং আরও তীব্রতর হয় (Jia & Ericson, 2017; Shaguri, 2013)। দক্ষিণ আফ্রিকার উচ্চশিক্ষার পরিসরে, এই গবেষণার জাতীয় প্রেক্ষাপটে, শিক্ষার্থীদের একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী হিসাবে দেখা হয়, যারা দেশের অসম এবং বৈষম্যমূলক জাতিগত সামাজিক-রাজনৈতিক অতীতকে মূর্ত করে তোলে

(Heymann & Carolissen, 2011)। অন্য প্রেক্ষাপটে যেখানে প্রথম প্রজন্ম সংখ্যালঘু জনসংখ্যা থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন, তারা বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত। প্রান্তিক ছাত্রীরা যে সম্প্রদায়ের মধ্যে অবস্থিত তাদের জ্ঞানের সাথে উচ্চশিক্ষার সম্পর্ক বোঝার জন্য এবং কীভাবে বিভিন্ন পরিচয়ের বিভিন্ন অভিব্যক্তির সম্পর্ক, বিশেষত বর্ণের সাথে সম্পর্কিত পরিচয় যা একাডেমিক অনুশীলনের উপর প্রভাব ফেলে এই বিষয়গুলির আন্তঃসম্পর্ক বোঝার জন্য জরুরি হয়ে ওঠে (Jawitz, 2012)। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে মূলত পশ্চিমবঙ্গের পটভূমিতে প্রথম প্রজন্মের ছাত্রীদের অভিজ্ঞতা জাতিগত, শ্রেণিগত, লিঙ্গগত এবং ভৌগোলিক প্রান্তিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

ভারতীয় প্রেক্ষাপটে 'প্রথম প্রজন্ম' হিসাবে ব্যক্তিকে চিহ্নিত করার আগে কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখতে হয়, শিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয়করণের বাইরে যে বিস্তৃত জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র ভারতবর্ষ ধারণ করে তার একটি স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম প্রজন্ম হলেও ছাত্ররা তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে তারা বিভিন্ন জ্ঞান এবং শিক্ষার ধারা বহন করে চলে। আর্থ–সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণি থেকে আসা ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই পরিবার সূত্রে কৃষি, সুত্রধরের কাজ, বয়নশিল্প, রন্ধনশিল্প ইত্যদি সম্বন্ধে বিশেষ দক্ষতা ও জ্ঞানের অধিকারী। সেক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় তারা প্রথম প্রজন্ম হলেও আমাদের কাছে এইটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা এই বিষয়ে কি ভাবে। অন্যদিকে যে মানদণ্ডের ভিত্তিতে 'প্রথম প্রজন্ম' হিসাবে অংশগ্রহণকারীদের ধরা হয়, আর একটি লৈঙ্গ বৈষম্যের অভিমমুখ আছে। পরিবারের অর্থনীতির ওপর যেমন পরিবারস্থ নারীদের আর্থিক স্বচ্ছলতা নির্ভর করে না, পরিবার ধনী হলেও পরিবারস্থ গৃহবধূ ও কন্যা দরিদ্র হতে পারেন। সুতরাং, পরিবারটির অর্থনৈতিক সঙ্গতি নারীদের আর্থিক সামর্থ্যের পরিমাপ হয় না (Boserup, 1970)। ঠিক তেমনি জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক মূলধন হস্তান্তরের ক্ষেত্রেও বিষয়টি প্রযোজ্য। একটি পরিবারের পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো অর্জিত সাংস্কৃতিক মুলধন কাকে হস্তান্তর করবে অথবা করবে না, সেখানেও ক্রিয়াশীল লিঙ্গ বৈষম্য। মেয়েদের সাধারণত লৈঙ্গিক ভূমিকায় দেখা হয়, স্বল্প পড়াশুনা যতটুকু বিবাহের জন্য 'উপযুক্ত পাত্রী' হয়ে উঠতে কাজে লাগবে। তারপর তাকে লৈঙ্গিক ভুমিকায় কন্যা-মা-স্ত্রী হিসাবে পরিবারে পরিষেবা দানকারী একজন হিসাবে দেখা হয় (Dhawan, 2011)। সেক্ষেত্রে পরিবারের সাংস্কৃতিক মুলধন মেয়েদের হাতে হস্তান্তরিত করা হয় না। মেয়েদের 'পরের ঘরের ধন' হিসাবে দেখার দৃষ্টি যেহেতু সমাজের সর্বস্তরেই রয়েছে সেহেতু মেয়েটিকে পরিবারের সম্পত্তি অর্থাৎ অর্থনৈতিক মূলধনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক মুলধন থেকেও বঞ্চিত করা হয়। এখানে যে মানদণ্ডের ভিত্তিতে 'প্রথম প্রজন্ম' শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ ছাত্রীটির পরিবারের সদস্যদের শিক্ষাগত অবস্থানকে এখানে মানদণ্ড হিসাবে ধরা হচ্ছে, কিন্তু 'শিক্ষিত' ও কয়েক প্রজন্মের সাংস্কৃতিক মূলধনসমৃদ্ধ পরিবারের মেয়েটি ছাত্রী হিসাবে তার পরিবারের শিক্ষাগত সমৃদ্ধির বাহক নাও হতে পারে। তার পরিবার তাকে সাংস্কৃতিক মূলধন হস্তান্তর নাও করতে পারে। সেক্ষেত্রে পরিবারস্থ মেয়েটি শিক্ষাক্ষেত্রে হতে পারে সম্পূর্ণ নতুন। এদিক থেকে 'প্রথম প্রজন্মের ছাত্রী' শব্দটি এই লিঙ্গ বৈষম্যের বাইরে

বলে মনে হয় না। যেহেতু রিসোর্স, তথ্যের পর্যাপ্ত ব্যবহারযোগ্যতা একজন ছাত্র বা ছাত্রীর শিক্ষাজীবনকে গড়ে তোলে সেক্ষেত্রে এই বিষয়গুলির অনুপস্থিতি একটি ছাত্রীর ও একটি 'শিক্ষিত' পরিবারের মধ্যেও থাকতে পারে। যদিও এই আলোচনায় বাবা-মা প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত না হওয়া অবস্থানটিকেই ছাত্রীদের 'প্রথম প্রজন্ম'-এর মানদণ্ড হিসাবে ধরে অংশগ্রহণকারী নির্বাচন করা হয়েছে। আরেকটি প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে 'প্রথম প্রজন্মের ছাত্র' এবং 'প্রথম প্রজন্মের ছাত্রী'-দের সমস্যা কি আলাদা? অন্যদিকে পরিবারের পুরুষ সদস্যদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মূলধন কি পরিবারের মেয়েদের মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়? সেখানে দেখা যাচ্ছে পুরুষদের সাংস্কৃতিক মূলধন পরিবারের পুরুষ ছাত্রদের মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়। সুতরাং একটি মেয়েকে 'প্রথম প্রজন্মের ছাত্রী' বলার সময় আমরা তার পরিবারের কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ঐতিহ্যের কথা স্মরণে রেখে কথা বলব? লিঙ্গ বৈষম্য পূর্ণ সমাজে লৈঙ্গিক ভূমিকার ভিতরে, রিসোর্সের লৈঙ্গিক বন্টনের মধ্যে পরিবারের 'শিক্ষিত' পুরুষ অভিভাবকের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মূলধন পরিবারের মেয়েটির মাধ্যমে সঞ্চারিত হবার অবকাশ থাকে কি? ইউনিভার্সিটির অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত পিতা তার আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক মুলধন তার কন্যাকে হস্তান্তর করবেন তার নিশ্চয়তা লিঙ্গ বৈষম্যপূর্ণ সমাজ দিতে পারে না। সমাজ, পরিবার এবং বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, প্রফেসর, সহপাঠীরা কিভাবে তাদের দেখে— এই বহুমাত্রিক বিন্যাসের ভিতরে প্রথম প্রজন্মের ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা পরিসরে সামাজিক, সাংস্কৃতিক নির্মাণ তৈরি হয়।

যিনি স্কুল শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত হন নি বা সুযোগ পান নি, তার সন্তান যখন উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন তাকে উচ্চশিক্ষা জগতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে 'প্রথম প্রজন্ম' হিসাবে ধরা হয়। উচ্চশিক্ষায় 'প্রথম প্রজন্ম' এমন একটি শব্দ যা দ্বারা আন্তর্জাতিক ভাবে বোঝানো হয় সেইসব ছাত্রদের যাদের অভিভাবকদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ ছিলনা। উচ্চশিক্ষার পরিকাঠামোর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে তাদের বেশ কিছু কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যে বিষয়টি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এই শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় আনার অন্যতম লক্ষ্য হল তাদের প্রথম প্রজন্মের শিক্ষাবিদ হিসাবে যোগদানে সক্ষম করা। যারা প্রথম প্রজন্মের ছাত্র ছিল এবং পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে একাডেমিক পদে প্রবেশাধিকার অর্জন করবে। একাডেমিক অনুশীলনে অংশগ্রহণকারী বা অবদানকারী হিসাবে, তারা জ্ঞান সম্প্রদায়গুলিকে বৈচিত্র্যময় করার সম্ভাবনা রাখে এবং তাদের পক্ষে যদি সমালোচনামূলক ভিত্তি অর্জন করা সম্ভব হয়, তবে এই ছাত্রছাত্রীরা সামাজ গঠন শিক্ষার মাধ্যমে) এবং জ্ঞান গঠন গবেষণার মাধ্যমে এবং পরিসরের গণতান্ত্রিককরণে অবদান রাখতে সক্ষম হয়ে উঠবে।

**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নারী শিক্ষা ও লিঙ্গসাম্যের দর্শন**

রবীন্দ্রনাথ শ্রেণি এবং লিঙ্গ সাম্য শান্তিনিকেতনের সামাজিক তন্তুবিন্যাসের মধ্যে প্রথিত করেছিলেন সূচনাকাল থেকেই। তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজের রক্তচক্ষু এড়িয়ে তিনি বিশ্বভারতীতে নারীদের শিক্ষা এবং সার্বিক অংশগ্রহণের বিষয়ে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। অসংখ্য প্রবন্ধ এবং চিঠি তার সাক্ষ্য বহন করে। স্ত্রীশিক্ষা, শ্রীভবন

সম্বন্ধে আমার আদর্শ, শিক্ষা, শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম ইত্যাদি প্রবন্ধে এবং অজিত কুমার চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমবালা প্রমুখকে লেখা চিঠিতে বিস্তারিত ভাবে তাঁর লিঙ্গসাম্যের দর্শন এবং উদ্যোগ প্রতিভাত হয়। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুস্পুত্রী ইন্দিরা দেবী, কবির বড় দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্রবধূ হেমলতা দেবী, রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধু প্রতিমা দেবী, বাল্য বিধবা লাবণ্য দেবী যিনি বরিশালের গুহ ঠাকুরতা পরিবারের একজন সদস্য তিনি শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। সুশীলাবালা দত্ত যিনি কণা মাসীমা হিসাবে পরিচিত ছিলেন একজন নিঃসন্তান বিধবা যিনি ছাত্রাবাসের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন, বাল্য বিধবা ননীবালা রায় যিনি কালীমোহন ঘোষের তত্ত্বাবধানে সুরুল গ্রামে রুরাল এবং সামাজিক কাজকর্মে নিযুক্ত ছিলেন, সাগরিকা রায়, বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে অন্যতম অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নাতনি উমা রায়, পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন এবং কিরণবালা সেনের কন্যা অমিতা সেন, বিহারের উকিল দেবতা চরণ মুখোপাধ্যায়ের যিনি প্রবাসী বাঙালি, তাঁর কন্যা রমা চক্রবর্তী, মহাশ্বেতা দেবী প্রমুখ শান্তিনিকেতনে নিজেদের অবদান রেখেছেন উল্লেখযোগ্য ভাবে। লিঙ্গসাম্যের প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ সেকালে যে মাত্রায় প্রথা ভাঙতে পেরেছিলেন তা অবিশ্বাস্য (Mukhopadhyay, 2016)। যখন উচ্চবিত্ত পরিবারেও বিধবা নারীর পারিবারিক অবস্থান এবং সামাজিক মর্যাদার প্রশ্নে সমাজ মীমাংসিত নয়। বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়ন হয়ে গেলেও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতায় প্রশ্ন প্রতিনিয়ত বিদ্ধ করছে যাঁদের রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করলেন যাবতীয় ঝুঁকি এবং সম্ভাব্য সামাজিক আক্রমণের বিরুদ্ধে। লাবণ্য দেবী, সুশীলাবালা দেবী এমন কি রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী উচ্চবিত্ত পরিবার থেকে বাল্যবিধবারা শান্তিনিকেতনে এসে কবির সাহচর্য্য পেয়েছেন, পাঠ লাভ করেছেন এবং শান্তিনিকেতনের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন অবলীলায়। সামাজিক বিদ্যমান ক্ষমতা সম্পর্ক এবং তার উঁচুনীচু বিন্যাসের মধ্যে যে বৈষম্যের প্রকট চেহারা তৎকালে বহাল ছিল তার প্রতিটি সমীকরণের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ সোচ্চার ছিলেন, শান্তিনিকেতনে অন্তর্ভুক্তির বিস্তৃতি দেখলে তা স্পষ্ট হয়। শুধুমাত্র উচ্চবিত্ত পরিবারের মেয়েরা রক্ষণশীল ঘেরাটোপ থেকে বাইরে বেড়িয়ে এসে পড়াশুনা করছেন, সহশিক্ষায় অংশ নিচ্ছেন এবং মুক্ত জীবনের স্বাদ পাচ্ছেন, শান্তিনিকেতনের কাজকর্মে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন, শুধুমাত্র তাই নয়, বাল্যবিধবা যাঁরা সামাজিক ভাবে বিবিধ বৈষম্যের সম্মুখীন হতেন এবং প্রায় 'না-মানুষ' এর জীবনযাপন করতে বাধ্য থাকতেন তাঁরাও রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যে পেলেন ভিন্ন এক মুক্তির জীবন। সমকালের যাবতীয় দৃশ্যমান এবং যেগুলি নিয়ে উল্লেখযোগ্য ভাবে বিতর্ক নির্মিত হয়েছিল সেগুলির প্রত্যেকটিতে রবীন্দ্রনাথ নিপীড়িতের পক্ষ নিয়েছেন এবং অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের পথ প্রশস্ত করেছেন। কিন্তু জাতিভিত্তিক বৈষম্য যার শিকড় গভীরে প্রোথিত ছিল সামাজিক তন্তুবিন্যাসের মধ্যে সে বিষয়ে কিছু ক্ষেত্রে তাঁকে ভিন্ন অবস্থান নিতে হয়েছে।

রবীন্দ্র সমকালে মেয়েদের শিক্ষা এবং সার্বিক অংশগ্রহণের যে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল তা রবীন্দ্রনাথের লিঙ্গসাম্যের চিন্তা চেতনাকে পরিস্ফুট করে। রবীন্দ্রসমকালে যে নারীরা শান্তিনিকেতনে শিক্ষায়

এবং কার্যপরিচালনায় অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা মূলত অভিজাত, উচ্চবিত্ত এবং উচ্চবর্ণীয় নারী। বিশ্বভারতী নির্মাণকালীন সদস্যদের পরিবারের মেয়েদের শান্তিনিকেতনে পাঠলাভের কথা বহুবিধ স্মৃতিকথায় উল্লিখিত রয়েছে। অমৃত সেন এবং তপতী মুখোপাধ্যায় যাঁদের কথা সংকলন করেছেন— অমিতা সেন, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, কিরণবালা সেন, লীলা রায়, গৌরী ভঞ্জ, কমলা সেন, যমুনা সেন, রমা চক্রবর্তী, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ এবং বিদেশী কয়েকজন বিদুষী নারীর অবদান যাঁরা বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রসমকালে বিশ্বভারতীতে পাঠলাভ এবং বিশেষ কিছু দায়িত্ব পালন করেছিলেন (Mukhopadhyay, 2016)। তাঁরা ছিলেন প্রত্যেকেই অত্যন্ত অভিজাত এবং উচ্চবর্গীয় নারী। নিম্নবর্গের নারীরা বিশ্বভারতীতে প্রবেশাধিকার পেতে অপেক্ষা করতে হয়েছে সাংবিধানিক সংরক্ষণ এবং বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ওঠা অবধি। সাংবিধানিক সংরক্ষণের পরবর্তীতে নিম্নবর্গীয় ছাত্র-ছাত্রীরা কি ধরনের সমস্যা এবং অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছেন বা যাচ্ছেন তা অনুসন্ধান সাপেক্ষ এবং যা এই গবেষণার উদ্দেশ্যের অন্তর্গত। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘শান্তিনিকেতনে সেকাল’ গ্রন্থটির সমালোচনা লিখতে গিয়ে অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য রবীন্দ্র সমকালের একটি ঘটনার উল্লেখ করছেন, ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘স্মৃতির লিপিমালা’ শীর্ষক লেখাটিতে অধ্যাপক ভট্টাচার্য জানাচ্ছেন বইটির সূচনায় ‘প্রথম কার্যপ্রণালী’ নামে রবীন্দ্রনাথের একটি রচনা সংকলিত হয়েছে। তিনি লিখছেন, “এসব রচনা রবীন্দ্র রচনাবলীতে আছে, আমাদেরও বহুপঠিত। তথাপি, ‘প্রথম কার্যপ্রণালী’ আরও একবার না পড়ে থাকতে পারলাম না। সেই সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্ররা কী কী করবে এবং করবে না, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ রয়েছে এই লেখাটিতে। এটি একটি দীর্ঘ পত্র, বর্তমান বইয়ে ৩৭ থেকে ৪৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত।...তারিখ ’২৭ শে কার্তিক ১৩০৯’ অর্থাৎ ১৩ নভেম্বার ১৯০২’ সদ্য প্রতিষ্ঠিত তাঁর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রদের শৈশবে ছাত্রাবস্থায় কী কর্তব্য কি অকর্তব্য তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অধ্যাপক ভট্টাচার্য এই লেখাটিকে রবীন্দ্রনাথের রচিত একটি নীতিশিক্ষাপুস্তক রূপেও বিবেচনা করেছেন (ভট্টাচার্য, ২০২০)। ১৯০২ সালে রচিত প্রায় সাড়ে তিন হাজার শব্দের এই অসামান্য বিদ্যালয় নির্দেশিকাকে একটি ‘চিরকালের আদর্শ প্রাইমার’ হিসাবে বিবেচনা করছেন তিনি। অনেকে এই রচনাটিকে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রথম সংবিধান বলে উল্লেখ করেছেন। পত্রটি তিনি কার উদ্দেশ্যে লিখেছেন তা উল্লিখিত হয় নি। পত্র প্রাপকের নাম কুঞ্জলাল ঘোষ। ইনি ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রীর জামাতা। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের যে অধ্যক্ষ সমিতি গঠন করেন, তার সভাপতি ছিলেন মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও কার্যসম্পাদক ছিলেন কুঞ্জলাল ঘোষ। মনোরঞ্জন বাবুকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, ‘আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত তিনি এই কার্যে ব্রতী’ হয়েছেন, “অধ্যাপনাকার্যেও তিনি আপনাদের সহায় হইতে পারেন”। আর কুঞ্জলালকে বিদ্যালয়ের ‘নিয়মাবলী’ সূত্রে যে চিঠি লেখেন, তাতে একটি স্তবকে ছিল, ‘অধ্যাপকদের প্রতি ছাত্রদের নির্বিচারে ভক্তি থাকা চাই। তাহারা অন্যায় করিলেও তাহা বিনা বিদ্রোহে নম্রভাবে সহ্য করিতে হইবে। কোনমতে তাঁহাদের সমালোচনা বা নিন্দায় যোগ দিতে পারিবে না। ...ছাত্রগণ অধ্যাপকদিগকে প্রত্যহ

প্রণাম করিবে'। কুঞ্জলাল কাজে যোগ দেওয়ার পর এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই বিদ্যালয়ে অধ্যক্ষসমিতির সভাপতি কবিকে চিঠি লিখে জানতে চাইলেন ব্রাহ্মণ ছাত্রদের পক্ষে অধ্যাপক কুঞ্জলাল ঘোষকে প্রণাম করা সংগত কি না। এর উত্তরে ১৯ অগ্রহায়ণ ১৩০৯ (৫ ডিসেম্বার ১৯০২) তারিখের পত্রে কবি চিঠি লিখলেন। অধ্যাপক ভট্টাচার্য লিখছেন "এর উত্তরে... কবি কী লিখলেন? কবি কি এই কথার অননুমোদন করলেন? মনোরঞ্জনবাবুর কথায় বিস্মিত হলেন, বিরক্ত হলেন? নাকি কবি তাঁর নিজের পূর্বসিদ্ধান্ত[৩] থেকে তিনটি সপ্তাহ যেতে না যেতেই পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে একশো আশি ডিগ্রি সরে আসতে বাধ্য হলেন?" (ভট্টাচার্য, ২০২০) যে রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন সত্যকে মিথ্যার কাছে পরাস্ত হতে দেন নি, সেই রবীন্দ্রনাথই লিখলেন, "প্রণাম সম্বন্ধে আপনার মনে যে দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে তাহা উড়াইয়া দিবার নহে। যাহা হিন্দু সমাজ বিরোধী তাহাকে এ বিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া চলিবে না। সংহিতায় যেরূপ উপদেশ আছে ছাত্ররা তদনুসারে ব্রাহ্মণ অধ্যাপকদিগকে পাদস্পর্শপূর্বক প্রণাম ও অন্যান্য অধ্যাপকদিগকে নমস্কার করিবে এই নিয়ম প্রচলিত করাই বিধেয়। সর্বাপেক্ষা ভাল হয় যদি কুঞ্জবাবুকে নিয়মিত অধ্যাপনার কার্য হইতে নিস্কৃতি দেওয়া যায়। তিনি যদি আহারাদি তত্ত্বাবধানেই বিশেষরূপে নিযুক্ত থাকেন তবে ছাত্রদের সহিত তাঁহার গুরুশিষ্য সম্বন্ধ থাকে না (মুখোপাধায়, ১৯৩৬, পৃ -৪৭)। রবীন্দ্রনাথের মতো চিন্তাবিদকেও সময়ের সঙ্গে পরিস্থিতির সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হয়, নিজের সত্য ও সংকল্প থেকে সরে আসতে হয়। ভট্টাচার্য (২০২০) আরোও লিখছেন, "... কিন্তু যেহেতু সত্য কখনও মিথ্যা হয় না, তাই শান্তিনিকেতন থেকে ক্রমেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যা সংস্কার দূরীভুত হয়েছিল চিরতরে। অব্রাহ্মণ হও, ব্রাহ্মণ হও, মুসলমান হও, হিন্দু হও, দরিদ্র হও, ধনী হও, এই শান্তিনিকেতন-আশ্রমই একদিন সমস্বরে গেয়ে উঠতে পেরেছিল 'আমরা সবাই রাজা' বলে। শুধু স্বদেশ নয়, ক্ষুদ্র ধর্মনীতি নয়, ক্ষুদ্র রাজনীতি নয়, সমগ্র বিশ্বই এখানে ঘর বাঁধতে পেরেছিল রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীকে কেন্দ্র করে।" 'চিরতরে' এই মিথ্যা সংস্কার দূরীভুত হয় নি শান্তিনিকেতন থেকে। ২০০৭ সালে 'কাল রবিবার' পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে একটি সংবাদ সেখানে দেখা যাচ্ছে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ডঃ প্রহ্লাদ রায় তফশিলি উপজাতিভুক্ত হওয়ার কারণে জাতিবৈষম্যের স্বীকার হয়েছেন বিভাগের অধ্যক্ষের দ্বারা। অধ্যাপক রায় দীর্ঘ সময় ধরে হেনস্থার সম্মুখীন হয়েছেন এই মর্মে অভিযোগ জানিয়েছেন মানব সম্পদ বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য প্রধানমন্ত্রীকেও। প্রতিবেদনে বর্ণিত হয়েছে, একটি রাখী উৎসবে অধ্যাপক রায়কে ছাত্রছাত্রীরা রাখী পরাতে গেলে অধ্যক্ষ তা নিষেধ করেন এবং কড়া ভাষায় কটাক্ষ করেন। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন 'নীচুজাতের লোক', 'জন্মের ঠিক নেই' ইত্যাদি শব্দবন্ধ। অধ্যাপক রায় চেয়ারে বসলে তিনি তা গঙ্গাজল দিয়ে 'শুদ্ধ' করতেন বলে লেখে হচ্ছে 'কাল রবিবার' এর প্রতিবেদনে। অমিত ভট্টাচার্য এবং বৈশাখী ঘোষের এই লেখায় দেখা যাচ্ছে কিভাবে অধ্যাপক রায় শুধুমাত্র তাঁর জাতিগত পরিচয়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গণতান্ত্রিক' পরিসরে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘ এবং বহুমাত্রিক সাম্যচর্চার

[৩] 'ছাত্রগণ অধ্যাপকদিগকে প্রত্যহ প্রণাম করিবে'।

ইতিহাস রয়েছে সেখানে হেনস্থার সম্মুখীন হয়েছেন (ঘোষ, ২০০৭) এবং অভিযোগ জানিয়ে কোনো সুরাহা হয়নি দীর্ঘ সময়। ব্রাহ্মণ্যবাদের করাল থাবার ছায়ায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানটিও প্রতিনিয়ত উৎপাদন এবং পুনরুৎপাদন করে চলে বিদ্যমান ক্ষমতা সম্পর্ক এবং তার নতুন বয়ান। রবীন্দ্রনাথের আদর্শের প্রতিফলন হলেও সামাজিক পরিসর হিসাবে বৃহৎ কাঠামোর মজ্জাগত রীতি নীতি নিজের জায়গা করে নেয় অচিরেই। আপাতভাবে দৃশ্যমান না হলেও, যার উপস্থিতি জানান দেয় মাঝেমধ্যেই। যার ধারাবাহিকতায় বর্তমানের পরিসরও সেই ক্ষমতার সমীকরণের বাইরে যেতে পারে না, কেবল ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয় মাত্র।

**প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা প্রয়োগ প্রণালী এবং আবাসিকদের পরিবর্তিত আত্মবোধ**

সামাজিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম সম্পর্কে মিশেল ফুকোর তাত্ত্বিক কাজ সর্বজনবিদিত। ফুকো দেখিয়েছেন যে কীভাবে 'শৃঙ্খলা' কোনও প্রতিষ্ঠানের সাথে বা কোনও যন্ত্রের সাথে চিহ্নিত করা যায় না; এটি এক ধরণের শক্তি, এর অনুশীলনের জন্য একটি পদ্ধতি, যা যন্ত্র, কৌশল, পদ্ধতি, প্রয়োগের স্তর, লক্ষ্যগুলির একটি সম্পূর্ণ তন্ত্র নিয়ে গঠিত; এটি শক্তির একটি কাঠামো, একটি প্রযুক্তি এবং এটি 'বিশেষায়িত' প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা বা যে প্রতিষ্ঠানগুলি এটিকে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের (স্কুল, হাসপাতাল) জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করে বা পূর্ব-বিদ্যমান কর্তৃপক্ষগুলি তাদের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াগুলিকে শক্তিশালী বা পুনর্গঠন করার একটি উপায় হিসাবে খুঁজে পায় তাদের দ্বারা এটি গ্রহণ করা যেতে পারে ক্ষমতার প্রক্রিয়া বা এমন যন্ত্রপাতি দ্বারা যা শৃঙ্খলাকে তাদের অভ্যন্তরীণ কার্যকারিতার নীতি বা অবশেষে রাষ্ট্রীয় যন্ত্রপাতি দ্বারা যার প্রধান, যদি একচেটিয়া না হয় তবে এটি নিশ্চিত করে যে পুরো সমাজ জুড়ে শাসন করার জন্য শৃঙ্খলা রয়েছে। পিতামাতা-শিশু এই এককে গঠিত আন্তঃ-পারিবারিক সম্পর্কগুলি কীভাবে 'শৃঙ্খলাবদ্ধ' হয়ে উঠেছে, শাস্ত্রীয় যুগ থেকে শোষিত, প্রথমে শিক্ষাগত এবং সামরিক, তারপরে চিকিৎসা, মনোরোগ, মনস্তাত্ত্বিক, যা পরিবারকে স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক শৃঙ্খলাজনিত প্রশ্নের উত্থানের বিশেষ স্থান করে তুলেছে।

এরভিং গফম্যান বলছেন **'টোটাল ইন্সটিটিউশন'** এর ধারণা। প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত এই ধারণায় দেখা যাচ্ছে আবাসিকদের ওপর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠান একপাক্ষিক ভাবে প্রয়োগ করে। যা আবাসিকদের আত্ম সম্পর্কে ধারণাকে প্রভাবিত করে। টোটাল ইন্সটিটিউশন হিসাবে তিনি দেখছেন কারাগার, মানসিক হাসপাতাল, বোর্ডিং স্কুল ইত্যাদি। এই প্রতিষ্ঠান গুলিতে মূলত সামাজিক ভাবে 'ভঙ্গুর', 'ভয়ংকর' ব্যক্তিদের সংশোধনের একটি উদ্দেশ্যমূলকতা রয়েছে। এর ক্ষমতা প্রয়োগ প্রণালী একপাক্ষিক। এখানে আবাসিকদের অংশগ্রহণ নেই। গফম্যান আরো বলছেন, এই নিচ্ছিদ্র একপাক্ষিক ক্ষমতার চলনের জন্য আবাসিকদের মধ্যে প্রতিরোধ স্পৃহা তৈরি হয় এবং একটি 'প্রতিরোধী আত্ম' গড়ে ওঠে। যার সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা লাগু করার প্রক্রিয়ার একটি দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। খুব ক্ষুদ্র মাত্রায় প্রতিরোধ থেকে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ তৈরি হয় আবাসিকদের মধ্যে। প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সদস্যদের, আবাসিক, কর্মী, কর্তৃপক্ষের প্রতিনিয়ত পারস্পরিক যোগাযোগ, আদানপ্রদানের ভিত্তিতে আবাসিকদের 'আত্ম'-এর ধারণাটি তৈরি হয় এবং পরিবর্তিত হতে থাকে। আবাসিকদের এই 'আত্ম'

এর ধারণা স্থির ধারণা নয়, প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্বন্ধের মাত্রা অনুসারে তা বদলায়। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানগুলির চরিত্র বদলে যাচ্ছে, যা পুনর্নির্মিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। যেখানে কর্তৃপক্ষ এবং আবাসিকরা প্রতিনিয়ত পরস্পরকে প্রভাবিত করছে, এখানে ক্ষমতা, নির্দেশ একমুখী নয়, এখানে পরস্পরকে প্রভাবিত করার একটি অবকাশ তৈরি হয়। বিশ্ববিদ্যলয়ের হস্টেল কিভাবে এই রিইনভেন্টেড প্রতিষ্ঠানের আকার নিয়েছে, সেখানে কর্তৃপক্ষ এবং আবাসিকদের মধ্যে একটি পারস্পরিকতার জন্ম হয়, যেখানে নির্মিত 'আত্ম' এর সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিয়ত আন্তঃসম্পর্কের ভিত্তিতে কিভাবে নির্মিত হয়ে চলে প্রতিষ্ঠানটির চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্য- এই গবেষণায় বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে পুনরোন্বেষণের সুযোগ রয়েছে। এই প্রতিরোধী আত্মের সঙ্গে সংঘর্ষে তৈরি হয় ক্ষুদ্র মাত্রার প্রতিরোধ থেকে বৃহৎ আন্দোলন।

এই পুনর্নির্মিত প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তি বিভিন্ন কারণে যুক্ত হয়। এই প্রতিরোধ যত ক্ষুদ্র বা বৃহৎ আকারেই হোক না কেন, টোটাল ইন্সটিটিউশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। নিয়ম নীতির বিরুদ্ধে, অবদমনের বিরুদ্ধে, পরিষেবা পাবার জন্য, একে অন্যের জন্য পাশে দাঁড়ানো, কড়া কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এবং নজরদারীর বিরুদ্ধে। এই প্রতিরোধ স্পৃহা তৈরি হয় আবাসজীবনে। এই প্রতিরোধ স্পৃহা মূলত আবাসজীবনে অন্যান্য আবাসিক অর্থাৎ সহ-আবাসিকদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মী, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে নির্মিত হয়। অথবা এই প্রতিরোধ স্পৃহা তৈরি হয় প্রতিষ্ঠানে আসার আগে তাদের নিজস্ব, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। ডব্লিউ জে ফিলিপ্স তাঁর 'দি গ্রেনেডা বয়েজ সেকেন্ডারী স্কুল হস্টেল' (২০০৯) -এ বর্ণনা করছেন কিভাবে হস্টেলে রাগী, বদমেজাজী, সহবতহীন ছাত্রদের কিভাবে সংশোধন করা হত। এখানে পড়াশোনা ছাড়াও ছাত্রদের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ তৈরির অবকাশ ছিল। বাকী ছাত্রদের থেকে হস্টেলের ছাত্ররা অপেক্ষকৃত বেশি বন্দি থাকলেও তাদের এই বন্দিত্ব বোঝার মত ছিল না, হস্টেলে তারা নিজেদের এবং সামাজিক ভাবে নিজেদের সত্তাকে উন্নত করার অবকাশ পেত। হস্টেল তাদের কাছে এনে দিত বহুবিধ সমৃদ্ধির সুযোগ।

আত্মপরিচিতির বোধ কোনো স্থির ধারণা নয়, এই হিসাবে যুক্তি দিচ্ছেন সুজি স্কট। প্রতিষ্ঠান এবং ছাত্রদের প্রতিনিয়ত আদানপ্রদানের মাধ্যমে আত্ম সম্বন্ধে ধারণা বদলে যেতে থাকে, এই ক্রম বিবর্তিত আত্মের ধারণার সঙ্গে বদলে যেতে থাকে ব্যক্তির আত্মপরিচিতির বোধ (Scott, 2011)। নবনির্মিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই আত্মের রূপান্তরের অবকাশ অনেক বেশি। এক্ষেত্রে বদল হতে থাকে পারস্পরিক ভাবে। ব্যক্তিকে একদিকে যেমন বদলে দিতে থাকে প্রতিষ্ঠান তেমনি ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির সাহচর্যে ক্রমাগত বদলে যেতে থাকে প্রতিষ্ঠানের চরিত্র। কারাগার বা মেন্টাল হাসপাতালের থেকে চরিত্রগত দিক থেকে ভিন্ন হয়ে পড়ে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেল। সেখানে কিভাবে পারস্পরিক প্রভাবে গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডলে বদলের সম্ভবনা

রয়েছে তা খতিয়ে দেখার অবকাশ রয়েছে এই গবেষণায়। উদাহরণ হিসাবে এখানে পিঞ্জড়া তোড়[৪] আন্দোলনের কথা বলা যায়, নবনির্মিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেই সম্ভবনা বা অবকাশ রয়েছে যেখানে আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামোগত বদল করা সম্ভব। এখন প্রশ্ন, এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে একজন আবাসিকের আত্মপরিচিতির বোধ কেন বদলে যায় এবং কিভাবে বদলে যায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির পরিকাঠামো এবং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আবাসিকদের আন্তঃসম্পর্ক। বিশেষ আর্থ-সামাজিক অবস্থান থেকে হীন আত্ম পরিচয় বা আত্ম পরিচয়হীনতা থেকে আবাসিক এবং ছাত্রী এই নতুন পরিচিতির মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। ক্রমাগত নতুন আদান প্রদান থেকে নতুন আত্ম-পরিচয় লাভের সম্ভবনা তৈরি হয়। আবার, বিশেষ পরিচিতির বোধের সঙ্গে ব্যক্তি একাত্মতা বোধ করে, বাকী অনেক পরিচিতি তাদের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও সেগুলির সঙ্গে তারা ততখানি একাত্মতা বোধ করে না (Shreeya, 2018)। আবাসিকদের পরিবর্তিত আত্মবোধ যা দীর্ঘ আবাসজীবনে নির্মিত হয় তার সঙ্গে বিরোধ বাঁধে প্রান্তিক ছাত্রীটির পিছনে রেখে আসা বাস্তবতার, সে বেখাপ হয়ে পড়ে। একদিকে যেমন নবনির্মিত আত্ম একজন ছাত্রীকে করে তোলে নিজের সম্বন্ধে শক্তিশালী তেমনি নিজের সম্প্রদায়ের বিদ্যমান ক্ষমতা সম্পর্কের সঙ্গে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়। বিষয়টি অন্বেষণের অবকাশ রয়েছে।

**উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সাসটেনেবল উন্নয়নের লক্ষ্য**

জাতিসংঘের স্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) নিম্ন এবং মধ্যম আয়ের দেশগুলিকে প্রভাবিত করে এমন বেশ কয়েকটি বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে যার মধ্যে রয়েছে মানসম্মত শিক্ষা অর্জন করা (SDG 4), লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা (SDG 5), এবং শান্তি ও ন্যায়বিচারের জন্য শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান তৈরি করা (SDG 16)। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সাসটেনেবল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মূল চালিকাশক্তি হিসাবে বিবেচিত, যেখানে এই প্রতিষ্ঠানগুলি বিশ্বব্যাপী শিক্ষার্থীদের সমালোচনামূলক ভাবে ও নৈতিকভাবে চিন্তা করার জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা ভাবা হয়। Levi and Rothstein (2018) সমালোচনামূলক-নৈতিক বিশ্লেষণ এবং সুচারু চিন্তাভাবনা প্রবর্তনের জন্য পরিবর্তনের মূল এজেন্ট হিসাবে এবং সার্বিক ভালোর জন্য সমাজের আদর্শিক রূপ গঠনে সহায়ক ভূমিকা কাঁধে নেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সম্ভাবনা এবং দায়িত্বকে স্বীকৃতি দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে কীভাবে সাসটেনেবল বা দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নে নেতৃত্ব দিতে হবে এবং কীভাবে দীর্ঘমেয়াদে তাদের প্রতিশ্রুতিতে কাজ করতে হবে, এই লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে প্রথমে নিজেদের দিকে তাকিয়ে কাজ শুরু করা উচিত এবং সমালোচনামূলক-নৈতিক এজেন্ডার জন্য অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়, নাগরিক সমাজ সংগঠন এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সাথে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা উচিত, এই বিষয়ে তারা কথা

[৪] ২০১৫ সাল নাগাদ দিল্লীর কয়েকটি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসিক ছাত্রীরা হস্টেলে এবং মেসে লিঙ্গ বৈষম্যপূর্ণ নিয়মের বিরুদ্ধে 'পিঞ্জড়া তোড়' আন্দোলন গড়ে তোলে। যা পরবর্তী বছর গুলিতে ছড়িয়ে পড়ে সারা ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যায়ের ক্যাম্পাসে।

বলেন। সরকারি পণ্য সরবরাহের প্রতিনিধি হিসাবে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে উপযুক্ত অবস্থান অর্জনের জন্য উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনীয় নতুন নকশার বিষয়ে সুপারিশ করা উচিত– একথা উল্লিখিত হয়। এটি আমাদের গবেষণার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক লক্ষ্য।

নায়ার (2017) ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে ঔপনিবেশিক যুগ থেকেই একটি রাজনৈতিক স্থান হিসাবে বর্ণনা করেছেন, যখন ১৯২০-এর দশকে এটি ‘জাতিগত পার্থক্যের শাসন’ কে চ্যালেঞ্জ করে জাতীয়তাবাদী ও বিপ্লবী আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হয়ে ওঠে। তিনি উল্লেখ করেছেন কীভাবে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঔপনিবেশিক শাসনের প্রয়োজন থেকে শুরু করে একটি আধুনিক আমলাতান্ত্রিক অভিজাতদের তৈরি করার কথা ছিল, তখন থেকে একটি বুদ্ধিজীবী, অভিজাতদের তৈরি করা অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু সমসাময়িক সময়ে বাজারে বিদেশী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রবেশের আগে পর্যন্ত এটি বিচ্ছিন্ন এবং অভিজাত শ্রেণি গঠনের স্থান ছিল, ধনীদের জন্য স্কুল থাকলেও ধনীদের জন্য কোনও বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। তখনও পর্যন্ত ভারতীয় রাষ্ট্রের অর্থায়নে পরিচালিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলি রাষ্ট্রীয় ভর্তুকি এবং কম ফি-র কারণে স্বল্প আয়ের মানুষের কাছে নাগালযোগ্য ছিল এবং এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গাগুলি সামাজিক বাস্তবতার সাথে যোগাযোগের সুযোগ করে দিয়েছিল যা অন্য কোথাও উপলব্ধ ছিল না (Chaudhuri, 2011)। বিগত কয়েক দশকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও গঠন পরিবর্তিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে, চিন্তাবিদগণ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি ‘সত্যিকারের গণতান্ত্রিক স্থান’ হয়ে ওঠার পথে দেখেছেন, যা পিছিয়ে রাখা শ্রেণি যাদের শিক্ষার এবং বস্তুগত সম্পদ, মূলধনের অভাব রয়েছে তাদের ‘সামাজিক গতিশীলতা’ নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক স্থান হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করবে। ছাত্র ফেলোশিপের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার জন্য সংরক্ষণ নীতি এবং সহযোগিতা অন্তত ছাত্রদের জন্য ব্যাপককরণ এবং গণতন্ত্রীকরণের পথ প্রশস্ত করেছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত প্রধান সামাজিক গোষ্ঠীগুলির জন্য সাম্যবাদী পরিস্থিতিতে একত্রিত হওয়ার একমাত্র স্থান হয়ে উঠেছিল। যদিও বিশ্ববিদ্যালয় এক ধরনের রাষ্ট্র-বাধ্যতামূলক সমতার স্থান এবং ভারতের আইনসভা, সংসদ, বিচার বিভাগ বা আমলাতন্ত্রের মতো সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অন্তর্ভুক্ত, এটি একই সাথে নতুন বৈষম্যকে তুলে ধরে, তৈরি করে এবং অগ্রভাগে রাখে (Deshpande, 2016; Nair, 2017)।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে সুপ্রিয়া চৌধুরী (2011), অরুণিমা (2017), জানকী নায়ার (2017) বিশদে বলেছেন। সুপ্রিয়া চৌধুরী (2011) জ্ঞানের অর্থনীতি বিষয়টিতে আলোকপাত করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভূমিকা এবং প্রত্যাশিত ভূমিকা সম্পর্কে বলেছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় এখনো পর্যন্ত ‘পাবলিক গুড’ সাধারণের সম্পত্তি এবং গণতন্ত্র রক্ষার পরিসর হিসাবে পরিগণিত হয়। (Choudhury, 2011) বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানের অর্থনীতি মূলত দিকনির্দেশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রিত এবং প্রত্যাশিত ভূমিকার। তিনি আরো বলছেন, ধনীদের জন্য স্কুল নির্মিত হলেও এখনও অবধি আলাদা ভাবে

বিশ্ববিদ্যালয় নির্মিত হয় নি। সামাজিক সাম্য এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার পরিসর হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় ক্রমে সংকুচিত হয়ে আসার আশঙ্কা তিনি করেছেন। জানকী নায়ার (2017) দেখেছেন জ্ঞানের অর্থনীতির আমুল বদলের সাথে সাথে ক্রমে জ্ঞান হয়ে উঠেছে পণ্য এবং নিয়ন্ত্রিত পণ্য। শিক্ষণ এবং গবেষণার পদ্ধতি বদলাতে শুরু করেছে তার হাত ধরে। বিগত কয়েক দশক ধরে এই প্রাতিষ্ঠানিক পরিসর সামাজিক রূপান্তরের একটি ক্ষেত্র হিসাবে ক্রিয়াশীল থেকেছে। তিনি পিছিয়ে রাখা শ্রেণির উচ্চশিক্ষায় হস্টেলের উপযোগিতার পাশাপাশি বলছেন কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভুর ভাষা শিক্ষা অনিবার্য হয়ে ওঠে। সংরক্ষণের মধ্যেও কিভাবে বৈষম্য টিকে আছে, কিভাবে 'সংরক্ষিত' এবং 'অসংরক্ষিত' আসনের ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে ব্যবধান টিকে আছে, এবং কিভাবে শিক্ষার মাধ্যমে এবং শিক্ষার পরিসরের মধ্যে সামাজিক সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা সুদূর পরাহত (Dhawan, 2022) সমাজ নির্মাণ, জ্ঞান নির্মাণ বিষয়ে ২০২০ সালে ডঃ ডিনা জোয় বেলুইজি কলকাতায় একটি বক্তৃতায় উচ্চশিক্ষার দ্বিবিধ রূপান্তর ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেন। প্রথমত, সামাজকে অবয়ব দান এবং জ্ঞান নির্মাণ (Belluigi, 2020)। শিক্ষা বিষয়ে অসাম্যের পটভূমিতে প্রান্তিক ছাত্রীরা শুধুমাত্র উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণ করে দৃশ্যমান হয়ে উঠছেন অথবা এই দ্বিমাত্রিক ভূমিকায় অংশ হয়ে উঠতে পারছেন কিনা এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্যে কি ধরণের সমস্যার সম্মুখীন তারা হচ্ছেন এটি আলোচনা করা বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভের লক্ষ্য।

গবেষকরা দেখিয়েছেন যে কীভাবে স্বাধীন ভারতে উচ্চ শিক্ষার সম্প্রসারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গঠনে বড় পরিবর্তন এনেছিল, বিশেষত ছাত্র জনসংখ্যার প্রধানত পুরুষ, উচ্চ বর্ণ, মধ্যবিত্ত প্রকৃতির আলোচনার ক্ষেত্রে। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জনসংখ্যার জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান পরিবর্তন ঘটেছিল সরকার-নির্ধারিত সংরক্ষণের (কোটা) কারণে যারা পূর্বে প্রান্তিক ছিল-বিশেষ করে 'তফসিলি জাতি' (এস সি) 'তফসিলি উপজাতি' (এস টি) এবং 'অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি'-র জন্য (ও বি সি)। ছাত্রদের মধ্যে এই ধরনের 'বৈচিত্র্য' বৃদ্ধি সুযোগ-সুবিধা, পরিকাঠামো এবং ব্যাপককরণের প্রতি মনোভাবের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে, যা অনুশীলন, নীতি বা গবেষণায় যুক্তিযুক্তভাবে পর্যাপ্তভাবে সমাধান করা হয়নি।

ভারতে ১০৪৩ টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে যার মধ্যে ৩৮৬টি রাজ্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, ৪৮টি কেন্দ্রীয় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় গুরুত্বের ১৩৫ টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে (AISHE, 2010)। ২০০১ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে শিক্ষার্থীদের গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও (জি ই আর) ৮ থেকে বেড়ে ২৭.১% হয়েছে। AISHE রিপোর্ট (2019-2020) ছেদমূলক সূক্ষ্মতা প্রতিফলিত করে না, এটি বর্ণ, ধর্ম এবং গ্রামীণ/শহুরে অবস্থান সম্পর্কিত বৈষম্য এবং নিপীড়নের অন্যান্য কাঠামোর সাথে লিঙ্গ কীভাবে কাজ করে তা প্রতিফলিত করে না। সাম্প্রতিক নতুন শিক্ষানীতির (২০২০) প্রভাবগুলি বিশ্লেষণ করার সময় এই জাতীয় আন্তঃসম্পর্কিত বিবেচনার গুরুত্ব রয়েছে যা ২০৩৫ কে কমপক্ষে ৫০% এর জিইআর-এর সময়সীমা হিসাবে উপস্থাপন

করে। এই সংযোগকারি প্রভাবগুলি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রবেশ স্তরে একই সামাজিক গোষ্ঠী জুড়ে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের জন্য আরও বেশি বৈষম্য তৈরি করতে দেখা গেছে (John, 2012; Shaguri, 2013)। ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে পুরুষ ছাত্র ৫১% এবং মহিলা ছাত্র ৪৯%। লিঙ্গ সমতা এসসি-র জন্য ১.০৫, এসটি-র জন্য ০.৯৭ এবং সমস্ত বিভাগের জন্য ১.০১ হিসাবে গণনা করা হয়। ওবিসিগুলি ভারতীয় উচ্চশিক্ষায় মোট ছাত্র জনসংখ্যার ৩৭% গঠন করে, এসসি এবং এসটি যথাক্রমে ১৪.৭% এবং ৫.৬% গঠন করে (AISHE, 2020)। যাইহোক, জিইআর এই বিভাগগুলিতে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয় এসসি এবং এসটি যথাক্রমে ২৩.৪% এবং ১৮% এর জিইআর সহ, যাদের ২৭.১% এর জিইআর ছিল তাদের তুলনায়। লিঙ্গ বণ্টনের ক্ষেত্রে, এসসি-র পুরুষ এবং মহিলা ছাত্র জনসংখ্যার যথাক্রমে ২২.৮% এবং ২৪.১% এবং এসটি-র যথাক্রমে ১৮.২% এবং ১৭.৭% জিইআর রয়েছে।

উচ্চশিক্ষায় প্রান্তিক এবং প্রথম প্রজন্ম ছাত্রীরা কীভাবে প্রবেশাধিকার পেলেন এবং নিজেদের জায়গা করে নিতে সক্ষম হলেন, এ বিষয়ে যারা পূর্ববর্তী পর্যায়ে কাজ করেছেন এবং যুক্তিপরম্পরার নির্মাণ করে চলেছেন সংক্ষেপে আলোচনা করা হল। উনিশ শতকের সূচনা থেকেই 'নারী শিক্ষা' একটি কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিল। বিশেষত স্বাধীনতার পরবর্তী দশক থেকে, শিক্ষায় এবং উচ্চশিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ ধীরে ধীরে লিঙ্গ ভিত্তিক ব্যবধান কমিয়ে এনেছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হিসাবে স্বদেশি শিক্ষার পুনর্গঠনের প্রয়াসের মধ্যে শ্রেণি সাম্য এবং লিঙ্গসাম্য বিষয় দুটি নিহিত ছিল। রবীন্দ্রনাথ বিদেশি শিক্ষা বর্জন করে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করলেন ১৯০১ সালে। 'শিক্ষা' প্রবন্ধে তিনি স্বদেশি শিক্ষার বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন, শ্রেণি, বর্ণ, নির্বিশেষে ছাত্ররা ভর্তি হচ্ছেন, তিনি 'স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আমার মতাদর্শ' প্রবন্ধে মেয়েদের পড়াশোনার বিষয়ে ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং মেয়েদের শিক্ষার উপযুক্ত পরিকাঠামো নির্মাণের কথা উল্লেখ করছেন। বিশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই একদিকে সামাজিক আন্দোলন এবং অ্যাকাডেমিয়ার মধ্যে এই বিষয়টির ভিত্তি তৈরি হয়ে যায়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে একদিকে জাতিবৈষম্য বিরোধী অধিকার আন্দোলন চালু হয় আর অন্যদিকে অ্যাকাডেমিক কাজ যেগুলি পরস্পরের পরিপূরক একটা ধারা নির্মাণ হয়ে চলেছে।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ১৯৫০ সালে ভারতীয় সংবিধান সরকারী খাতের কর্মসংস্থান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী পদে তফসিলি জাতির (এস সি) জন্য ১৫% এবং তফসিলি উপজাতির (এস টি) জন্য ৭.৫% আসন সংরক্ষণ করেছিল। মণ্ডল কমিশনের[৫] ১৯৮০ সালের প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয় যে, তফশিলি জাতি ও তফশিলি উপজাতির জন্য সংরক্ষিত বিভিন্ন পদের ২৩ শতাংশ ছাড়াও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির

[৫] মন্ডল কমিশন ১৯৭৮ সালে নিয়োগ করা হয়েছিল যার নামকরণ সভাপতি বি. পি. মন্ডলের নামে করা হয়েছিল। এই কমিশন নিয়োগ করার পেছনে কারণ ছিল যে কোন গোষ্ঠীগুলি সামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে প্রান্তিক ছিল তা নির্ধারণের মানদণ্ড নির্ধারণ করা এবং তাদের অগ্রগতির জন্য গৃহীত পদক্ষেপের সুপারিশ করা।

(ও বি সি) জন্য আরও ২৭ শতাংশ সংরক্ষণ করা হবে।[৬] যদিও সম্ভবত আন্তঃবর্ণ প্রতিক্রিয়া এড়ানোর জন্য পরবর্তী সরকারগুলি এই সুপারিশগুলি স্থগিত করেছিল। অবশেষে ১৯৯১ সালের ৭ই আগস্ট ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ভি. পি. সিং ঘোষণা করেন যে সুপারিশগুলি বাস্তবায়িত করা হবে। ওবিসি-র জন্য ২৭% সংরক্ষণ ২০০৬ সালে কার্যকর করা হয়েছিল। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সংরক্ষণকে (জনস্বার্থ হিসাবে) সমর্থনকারী চিন্তাবিদরা দীর্ঘস্থায়ী বৈষম্য নিরসনের নিখুঁত হাতিয়ার হিসাবে দেখেননি, বরং প্রান্তিক আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠী থেকে নারী ও পুরুষদের অন্তর্ভুক্তিকে উৎসাহিত করে সামাজিক সাম্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হিসাবে দেখেছিলেন (John, 2012; Nair, 2017; Chaudhuri 2011)। এই ক্রমবর্ধমান দৃশ্যমানতা নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক কিন্তু এই দৃশ্যমানতা কি তাদের যথাযথ জায়গায় যথার্থ অবস্থান নির্মাণে সক্ষম হয়েছে?

Satish Deshpande (2013) দেখেছেন কীভাবে উচ্চবর্ণের পরিচয় এমন যে 'আধুনিক পেশাদার পরিচয়' যা পছন্দ অনুযায়ী গৃহীত বা বর্জিত হয় বা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পুনর্লিখনযোগ্য, যেখানে নিম্নবর্ণের পরিচয় এত অবিশ্বাস্যভাবে খোদাই করা হয়েছে যে এটি অন্যান্য সমস্ত পরিচয়কে ওভাররাইট করে এবং তাদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এমন পরিচিতির সঙ্গে একাত্মতা বিনষ্ট করে। সুতরাং, আজকের বর্ণের কেন্দ্রীয় সমস্যা হল যে এটি তথাকথিত নিম্নবর্ণের জন্য অতি-দৃশ্যমান এবং তথাকথিত উচ্চবর্ণের জন্য অদৃশ্য। নিম্নবর্ণের জন্য, যা জনসংখ্যার বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ গঠন করে, বর্ণই তাদের জন্য একমাত্র উপলব্ধ সম্পদ বলে মনে হয় যার সাহায্যে তারা এমন একটি খেলায় তাদের জীবন-সম্ভাবনা, আর্থ সামাজিক অবস্থান উন্নত করার চেষ্টা করে যেখানে খেলার মাঠ সমান নয়। এখানে বর্ণ-ভিত্তিক রাজনীতি তৈরি হয়ে যায়। অন্য অংশটি হল উচ্চবর্ণ এবং যা অনেক কম সংখ্যক এবং তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি সমজাতীয়, তাদের বর্ণের অবস্থান ইতিমধ্যে এমন একটি সিঁড়ি তৈরি করেছে যা এখন নিরাপদে উৎখাত করা যেতে পারে। ঐতিহ্যবাহী বর্ণকে পুঁজি করে এবং এটিকে সম্পত্তির মতো আধুনিক মূলধন, উচ্চশিক্ষাগত যোগ্যতা এবং লাভজনক পেশাগুলির শক্ত ঘাঁটিগুলিতে রূপান্তরিত করে, এই অংশটি আজ নিজেকে 'বর্ণহীন' বলে মনে করে।

যাইহোক, মণ্ডল-পরবর্তী পর্যায় প্রমাণ করে যে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির বর্ণ-চেতনা থেকে স্ব-অনুভূত উত্তরণ ছিল বিভ্রান্তিকর। 'দ্বিতীয় গণতান্ত্রিক উত্থান' এই উচ্চবর্ণ শ্রেণিকে তাদের সুযোগ-সুবিধা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। যদিও তাদের কাছে নিম্নবর্ণের বিভিন্ন অংশের প্রবেশের জন্য স্থান তৈরি করা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না, হিন্দু উচ্চবর্ণ মধ্যবিত্ত শ্রেণির বড় অংশ নিম্নবর্ণের

[৬] এস সি এবং এসটি একসাথে ভারতের জনসংখ্যার ২৩.৫% এবং মন্ডল কমিশন হিসাব করেছে মুসলিম এবং খ্রীষ্টান ধর্মান্তরিত সহ জনসংখ্যার অতিতিক্ত ৫২% বিশেষ ছাড়ের প্রয়োজন সব মিলিয়ে ভারতের মোট জনসংখ্যার তিন চতুর্থাংশ। তবে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে রিজার্ভেশন ৫০% এর বেশি হতে পারে না, তাই কমিশন ওবিসির জন্য কেবল ২৭% চাকরি সংরক্ষণের সুপারিশ করেছিল।

উত্থানের প্রতিক্রিয়ায় অভিজাত বিদ্রোহে জড়িত ছিল এবং বর্ণ-ভিত্তিক সংরক্ষণের বিরোধিতা করেছিল (Krishnan, 2017; Upadhya, 2016; Fernandes and Heller, 2006; Corbridge and Harriss, 2000)। Sheth (1999) এই প্রক্রিয়াটিকে 'বর্ণের শ্রেণীবিভাগ' হিসাবে উল্লেখ করেছেন যেখানে বর্ণ নতুন অর্থনৈতিক আগ্রহ এবং একটি রাজনৈতিক পরিচয় অর্জন করেছে। এর সদস্যরা এখন বৃহত্তর এবং একাধিক সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিচয়ের মালিক। ফলস্বরূপ, নতুন আর্থ-সামাজিক গঠনগুলি যেমন 'উচ্চ বর্ণ', অনগ্রসর বর্ণ (ও বি সি), দলিত বা এসসি এবং উপজাতি বা এসটি সমাজের সম্পদ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিযোগিতা করেছিল, ঊর্ধ্বমুখী সামাজিক গতিশীলতার ধারণা সহ সমস্ত বর্ণের মানুষকে সম্মিলিতভাবে এবং স্বতন্ত্রভাবে অনুপ্রাণিত করার মধ্যমে। উচ্চবর্ণগুলি তাদের ঐতিহ্যবাহী উচ্চতর মর্যাদার সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণের দ্বারা উপকৃত হয়েছিল, নিম্নবর্ণগুলি ইতিবাচক পদক্ষেপের রাষ্ট্রীয় নীতির মাধ্যমে তাদের সুবিধা অর্জন করেছিল, যার ফলে পুরানো মর্যাদা ব্যবস্থা এবং নতুন ক্ষমতা ব্যবস্থার মধ্যে এক ধরনের সংমিশ্রণ ঘটেছিল।

১৯৯১ এর দশকে যে পদক্ষেপ 'রাজনীতির মণ্ডলীকরণ' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে, তা ভারতের রাজনীতির সামাজিক ভিত্তিকে আমুল পরিবর্তন করে দেয়। নতুন আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠী হিসাবে তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান উপলব্ধি করার জন্য নিয়ন্ত্রিত পদক্ষেপ হিসাবে সংরক্ষণ নীতি বাস্তবায়নের জন্য সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির উপর প্রশাসনিক দায়িত্ব সহ এসসি এবং এসটি-র সমন্বয়ে বিদ্যমান সংরক্ষিত বিভাগগুলিতে ওবিসি-র বিভাগ যুক্ত করা হয়েছিল। মণ্ডল কমিশন প্রতিষ্ঠার পরবর্তীতে অসংরক্ষিত 'সাধারণ' বিভাগের (General category) কল্পকাহিনী 'সর্বজনীন বিভাগ' হিসাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। পরিবর্তে, সাধারণ বিভাগটি ভারতীয় জনসংখ্যার সংখ্যালঘু অংশ গঠনকারী সুবিধাপ্রাপ্ত উচ্চ বর্ণের জন্য একটি অভিব্যক্তি হয়ে ওঠে (Deshpande, 2013)। সরকারি চাকরি ও কেন্দ্রীয় পরিষেবায় নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি কোটা ব্যবস্থা রূপায়ণের উদ্দেশ্য ছিল তথাকথিত অনগ্রসর বর্ণের নিয়োগ বৃদ্ধি করা এবং 'অগ্রগামী' উচ্চবর্ণের লোকদের অনুপাত অনিবার্যভাবে হ্রাস করা। এইভাবে, মণ্ডল কমিশনের সুপারিশগুলির প্রতিক্রিয়াগুলির মধ্যে 'অচিহ্নিত বর্ণহীন' ছাত্রীদের তীব্র প্রতিবাদ অন্তর্ভুক্ত ছিল, যারা কিছু ক্ষেত্রে প্ল্যাকার্ড ধরেছিল যার উপর লেখা ছিল 'আমরা বেকার স্বামী চাই না' (Chakravarti, 2002, p. 1)। এর অর্থ ছিল যে, উচ্চবর্ণের মেয়েদের ভবিষ্যতের জন্য উদ্বেগকে প্রতিফলিত করে প্ল্যাকার্ডগুলিতে বার্তা সহ বর্ণ ব্যবস্থার পুনরুৎপাদন হিসাবে এন্ডোগামি একটি প্রভাবশালী নিয়ম হিসাবে অব্যাহত ছিল। যা সম্ভবত উচ্চবর্ণের ভারতীয় প্রশাসনিক পরিষেবায় যুক্ত (আইএএস) স্বামীদের থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে উচ্চবর্ণের নারীদের মধ্যে বিরূপভাবে প্রভাবিত হবে। এটা অকল্পনীয় ছিল যে, পিছিয়ে পড়া বর্ণের যারা সংরক্ষণের কারণে এই সুবিধাপ্রাপ্ত চাকরিগুলি দখল করবে, তারা এই যুবতী মহিলাদের সম্ভাব্য স্বামী হওয়ার জন্য বর্ণের অলঙ্ঘনীয় বাধা অতিক্রম করবে (Chakravarti, 2002; Dhareshwar, 1993)।

কেন্দ্র ও রাজ্য শিক্ষাপর্ষদ থেকে সাংবিধানিক সংরক্ষণ লাগু করা হয় ও কয়েকটি বৃত্তি প্রদান করা হয়। যেগুলো প্রান্তিক ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশের ছাড়পত্র হিসাবে কাজ করে। কেন্দ্র সরকার ও রাজ্য সরকারের সংরক্ষণ – এস সি, এস টি, ও বিসি (এ), ও বি সি (বি) ক্যাটাগরির জন্য লাগু হয়েছে। অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জন্য ২৭% সংরক্ষণ রয়েছে, তফশিলী জাতি ও উপজাতির জন্য রয়েছে ১৫% সংরক্ষণ। এস সি এবং এস টি ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে বিনামূল্যে থাকতে পারেন। ফর্মের দামের ক্ষেত্রে লাঘব করা হয়। তফশিলি জাতি উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জন্য পরীক্ষায় কাট অব মার্ক্স আর বয়সের ক্ষেত্রে ছাড় রয়েছে। নেট বা সেটে কাট অব মার্ক্স কম থাকে আর বয়সের শিথিলতা থাকে। চাকরীর ক্ষেত্রে সংরক্ষণ রয়েছে। প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক ছাত্রীরা জাতি ভিত্তিক এবং লিঙ্গ ভিত্তিক–এই দুই ধরনের সংরক্ষণ উচ্চশিক্ষায় ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন। এস সি এবং এস টি তালিকাভুক্ত ছাত্রদের জন্য ক। প্রিমেট্রিক খ। পোস্টমেট্রিক গ। রাজীব গান্ধী ন্যাশনাল ফেলোশিপ রয়েছে। জাতিগত সংরক্ষণ এবং মেয়েদের জন্য সংরক্ষণ এই দুইয়ের সুবিধা যারা ব্যবহার করতে পারছেন সেই ছাত্রীরা শেষ পর্যন্ত আসছেন উচ্চশিক্ষায়। এবং উল্লেখযোগ্য ভাবে সংরক্ষণ ছাড়া মেধা তালিকার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের দৃশ্যমানতা বেড়েছে উল্লেখযোগ্য ভাবে।

**ভারতের নারী আন্দোলন এবং নারীবিদ্যা চর্চা কেন্দ্র নির্মাণ**

ভারতের অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় এবং সৃজনশীল নারী আন্দোলনের একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস এবং অভিজ্ঞতা রয়েছে। বামপন্থী দল, মধ্যপন্থী কংগ্রেস দল এবং ডানপন্থী দলগুলির সঙ্গে যুক্ত গোষ্ঠী থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজনৈতিক বর্ণালীর অন্তর্গত বিভিন্ন মহিলা গোষ্ঠী এবং সংগঠন এই বৈচিত্র্যের একটি অংশ। ১৯৭৪ সালে ‘কমিটি অন দ্য স্ট্যাটাস অফ উইমেন ইন ইন্ডিয়া’ কর্তৃক প্রকাশিত সমতার প্রতিবেদন[৭] প্রকাশের সাথে সাথে স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রাথমিক বছরগুলিতে মহিলাদের মধ্যে আত্মতুষ্টির পর্যায়টি নড়ে যায় (GOI 1974)। ১৯৭০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়টি ছিল ভারতীয় রাজনীতিতে এক অশান্ত দশক, যেখানে একদিকে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর নির্মম দমন-পীড়ন এবং অন্যদিকে সমাবেশ, ঘেরাও, ধর্মঘট, বিক্ষোভ ও মিছিলের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রাণবন্ত প্রতিরোধ ছিল— শাহাদা আন্দোলন, শ্রমিক সংগঠনের ঘরোয়া সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রচারণা, সেবা, ইউনাইটেড উইমেনস অ্যান্টি-প্রাইস ফ্রন্ট, নব নির্মাণ ইত্যাদি। এটি ছিল নতুন সামাজিক আন্দোলনের সূচনা, যার মধ্যে জনপ্রিয় মহিলাদের কণ্ঠস্বর তাদের প্রথম মঞ্চ খুঁজে পেয়েছিল, যদিও তারা সকলেই লিঙ্গের রাজনীতিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল না (Kumar, 1995; Sen, 2002; Datta, 2007; Banerjee, et al. 2011)।

৭০ এবং ৮০ এর দশকে লিঙ্গ বৈষম্য ও জাতি বৈষম্য বিরোধী সামাজিক আন্দোলনগুলি রূপান্তরের পথ প্রশস্ত করেছে। এই নতুন সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে নারীদের কণ্ঠস্বর পিতৃতন্ত্রের সমালোচনার জন্য

---

[৭] Report Towards Equality, 1974.

প্লাটফর্ম খুঁজে পায় এবং এই প্লাটফর্ম ক্রমে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। স্থানীয় সম্প্রদায় যারা দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সামনে রেখে। ভিল ভূমিহীন শ্রমিকরা মহারাষ্ট্রের ধুলিয়া জেলায় শাহাদা আন্দোলন শুরু করে। ১৯৭২ সালে এই শ্রমিক সংগঠনের শ্রমিক আন্দোলন গার্হস্থ্য হিংসার বিরুদ্ধে জোরালো প্রচার শুরু করে। ১৯৭২ সালে গান্ধীবাদী সমাজতান্ত্রিকরা বস্ত্র শ্রমিক সংগঠন (আহমেদাবাদ) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইলা ভট্টের নেতৃত্বে স্ব-কর্মসংস্থান মহিলা সমিতি গঠন করে। ১৯৭৩ সালে সমাজতান্ত্রিক দলের মৃণাল গৌড় সিপিআই (এম) থেকে নারীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ইউনাইটেড উইমেন্স 'অ্যান্টি প্রাইস রাইজ ফ্রন্ট' গঠন করেন। ১৯৭৪ সালে গুজরাটে মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলনে মধ্যবিত্ত মহিলারা নেতৃত্ব দেয়। ১৯৭৩-৭৪ সালে হায়দ্রাবাদে মহিলাদের প্রগতিশীল সংগঠন তৈরি হয়। মাওবাদী নারীরা সংগঠন তৈরি করে। বিপ্লবী বাম রাজনীতির নারীবাদী সমালোচনা তৈরি হয় ইতিমধ্যে। লিঙ্গবৈষম্যের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শুরু হয়। নারীবাদের সঙ্গে সাম্যের ধারণা, শ্রমের লিঙ্গ ভিত্তিক বিভাজন ইত্যাদি যুক্ত হয়। নারীকে শোষণের মূল ভিত্তি হিসাবে চিহ্নিত হয় শ্রমের লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন। ১৯৭৫ সালে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের উদযাপন হয় উল্লেখযোগ্য ভাবে। ১৯৭৫ সালে মহারাষ্ট্রে দলিত নারীদের সংগঠন 'মহিলা সমতা সৈনিক দল' তৈরি হয়। যৌন হিংসা নিরসন মূল উদ্দেশ্য হলেও এখানে ধর্ম এবং জাতি ভিত্তিক বৈষম্যের বিরুদ্ধেও কথা বার্তা শুরু হয়। এছাড়াও মহারাষ্ট্রে 'পূর্ণগামী স্ত্রী সংগঠন', 'স্ত্রী মুক্তি সংগঠন' উল্লেখেযোগ্য। পাশপাশি পরিবেশকেন্দ্রিক আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৭৩ সালে উত্তরাখণ্ডে পাহাড়ী অঞ্চলে চন্ডী প্রসাদ ভট্র এবং সুন্দরলাল বহুগুনা গাছ কাটার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন, গৌরা দেবী, সুদেশা দেবী, বাচনী দেবী গাছেদের জড়িয়ে ধরে প্রতিবাদ করেন। এদিকে নারীর জমির অধিকারের জন্য ১৯৭৮ সাল নাগাদ শুরু হয় বোধগয়া আন্দোলন। জে পি নারায়ন এখানে নেতৃত্ব দেন যিনি প্রথম অহিংস বিপ্লবী যিনি বহুজন কৃষি শ্রমিকদের জমির অধিকারের জন্য লড়েছিলেন উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে। এখানে নারীমুক্তির কথা উঠে আসে উল্লেখযোগ্যভাবে।

১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে পিতৃতন্ত্রের প্রথম তীব্র সমালোচনা আসে, এই সময়ে নতুন মহিলা গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হয়। নতুন গোষ্ঠীগুলি স্থানীয় এবং কেন্দ্রীভূত এজেন্ডার সাথে শক্তভাবে বোনা ছিল যা ১৯৭৫ সালে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসাবে ৮ মার্চ প্রথম বড় উদযাপনে শেষ হয়েছিল (Kumar, 1995; Datta, 2007)। ১৯৭৩-৭৪ সালে, মাওবাদী মহিলারা মহিলাদের প্রগতিশীল সংগঠন গঠন করেছিলেন; ১৯৭৫ সালে, মহারাষ্ট্রে মহিলা সমতা সৈনিক দল নামে একটি দলিত মহিলা গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যারা যৌন নিপীড়নের দিকে মনোনিবেশ করেছিল তবে বর্ণের পরিবর্তে বর্ণ ও ধর্মের ব্যাখ্যা চেয়েছিল। ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থা ঘোষণার ফলে নতুন মহিলা আন্দোলনের গতি ব্যাহত হয়, যা অনেক উগ্র বামপন্থী মহিলাকে আত্মগোপনে নিয়ে যায়, তাদের নেটওয়ার্কগুলিকে খণ্ডিত করে দেয়। জরুরি অবস্থার পরে অবশ্য নতুন শক্তির আবির্ভাব ঘটে এবং ১৯৭৮ সাল থেকে স্বায়ত্তশাসিত শহর-ভিত্তিক মহিলা গোষ্ঠীগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়, যার মধ্যে কয়েকটি বামপন্থী রাজনীতিতে দৃঢ় শিকড় ছিল। এগুলি ছিল

মহিলা সংগঠন যা রাজনৈতিক দলগুলির মহিলা শাখার সাথে তাদের মতপার্থক্যের ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য স্বায়ত্তশাসিত বলে দাবি করেছিল। এই মহিলা কর্মীরা অনুভব করেছিলেন যে রাজনৈতিক দলগুলি, এমনকি সবচেয়ে উগ্রপন্থী এবং বামপন্থী দলগুলিও তাদের সংগঠনে পিতৃতান্ত্রিক এবং রাজনীতি সম্পর্কে তাদের বোঝার ক্ষেত্রে লিঙ্গ-অন্ধ। তাদের স্বায়ত্তশাসন রাজনৈতিক দলগুলির কাছ থেকে স্বাধীন অস্তিত্বকে বোঝায়, তবে নারীর প্রশ্নকে রাজনীতিকরণ না করে। এই স্বায়ত্তশাসিত গোষ্ঠীগুলিকে প্রাথমিকভাবে নারীবাদী গোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল (Akerkar, 1995)। এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না যে, তাঁরা ছিলেন মধ্যবিত্ত শহুরে মহিলারা, যাঁরা ধর্ষণ, যৌন হয়রানি ও যৌতুকজনিত মৃত্যুর মতো হিংসার বিরুদ্ধে অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

শাহ বানো[৮] মামলা এবং রূপ কানওয়ার[৯] সতী সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের বিভাজনকে তুলে ধরেছিল। ইউ সি সি (Uniform Civil Code) র উপর সুপ্রিম কোর্টের জোর দেওয়া পুরনো আশঙ্কা জাগিয়ে তোলে যে এটি হিন্দু আধিপত্য চাপিয়ে দেওয়ার একটি হাতিয়ার হবে। ১৯৯১ সাল থেকে শুরু করে, ভারত দারিদ্র্য ও সামাজিক সুরক্ষার প্রশ্নের আরও বাজার-চালিত সমাধানের দিকে অর্থনৈতিক নীতিতে একটি বড় বিচ্যুতি প্রত্যক্ষ করেছে। উদারীকরণের এই পর্যায়, বিশ্বায়নের পরে, রাষ্ট্র-নেতৃত্বাধীন উন্নয়নের শাসনব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক পরিত্যাগের সাক্ষী হয়েছে। পরিবর্তনের এই বৃহত্তর প্রক্রিয়াগুলিতে কিছু নাটকীয় রাজনৈতিক ঘটনা যোগ করা হয়েছিল। মণ্ডল ও মসজিদের সংমিশ্রণ ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে বদলে দেয়। পিছিয়ে পড়া বর্ণের জন্য আরও সংরক্ষণের জন্য মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ অনুসরণ করে যে আন্দোলন হয়েছিল তা কেবল উচ্চবর্ণের কুসংস্কারের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করেনি, বরং নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় বর্ণের ভূমিকাকে আরও জোরদার করেছিল। ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংস এবং তার পরের দাঙ্গা সাম্প্রদায়িক বক্তব্যের ব্যাপক বৃদ্ধির প্রতিনিধিত্ব করেছিল। মূলধারার রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ নিয়ে বিতর্কে বর্ণ ও সম্প্রদায়ের উপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক পার্থক্যের গুরুত্ব তীব্রভাবে প্রাধান্য পেয়েছিল। ১৯৮০-র দশকে মুসলিম উইমেন (প্রোটেকশন অফ রাইটস অন ডিভোর্স) অ্যাক্ট ১৯৮৬ এবং ১৯৯০-এর দশকে উইমেনস রিজার্ভেশন বিল নিয়ে বিতর্ক জাতি ও সম্প্রদায়ের গুরুত্ব এবং এই পরিচয়ের সাথে প্রভাবিত না হওয়া লিঙ্গের রাজনীতি প্রকাশ করার অসম্ভবতা নিশ্চিত করে। এই সমস্ত কিছুর ফলে নারী আন্দোলন আরও জটিল স্বীকৃতিতে পৌঁছেছিল, যে সংহতির বিভিন্ন রাজনৈতিক

---

[৮] ১৯৭৮ সালে ৬২ বছর বয়সী একজন মুসলিম মহিলা শাহ বানো বিবাহবিচ্ছেদের পর স্বামী মহম্মদ আহমেদ খানের কাছ থেকে খোরপোশ দাবী করে। ১৯৮৫ সালে সুপ্রীম কোর্ট শাহ বানোর পক্ষে রায় দেয়। মুসলিম পার্সোনাল আইনের বিরুদ্ধে মুসলিম মেয়েদের লড়াই এ এই কেসটি ছিল একটি মাইলস্টোন।

[৯] ১৯৮৭ সালে রাজস্থানের সিকার জেলায় দেওরালা গ্রামে ১৮ বছরের রূপ কানোয়ারকে স্বামী মাল সিং সাখাওয়াতের সঙ্গে সতী হিসাবে পুড়িয়ে মারা হয়। ঘটনাটি মেয়েদের অধিকার ও সাংস্কৃতিক রক্ষনশীলতার ভয়াবহ চাপের বিষয়ে সারা ভারতব্যাপী আলোড়ন তৈরি করে।

প্রক্রিয়ার অধীনে নারীরা 'দলিত', 'মুসলমান', 'শ্রমিক শ্রেণি'-র 'নারী' হিসাবে একত্রিত হয়। এই চ্যালেঞ্জগুলি ঐক্যের বিস্তৃত ধারণাকে বিভক্ত করেছিল এবং এর মধ্যে নিম্নবর্ণ এবং দরিদ্রদের সাথে ভগ্নীত্ব এবং রাজনৈতিক জোটের অন্তর্নিহিত ধারণাগুলি বিদ্যমান ছিল। তারা দেখিয়েছেন যে লিঙ্গ রাজনীতির উপর ভিত্তিতে সমষ্টিগত আলোচনা কতটা ভঙ্গুর ছিল এবং সম্প্রদায়, শ্রেণি ও বর্ণের স্বার্থের চ্যালেঞ্জের জন্য এটি কতটা ঝুঁকিপূর্ণ ছিল (Tharu & Niranjana, 1994)।

১৯৫০ সালে যখন ভারতের সংবিধান লিঙ্গ সমতাকে একটি মৌলিক অধিকার করে তোলে, তখন লিঙ্গ ন্যায়বিচারের লড়াই প্রায় জয়ী বলে মনে হয়। স্বাধীন ভারতে উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশ এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগের সুবিধাভোগী হওয়ার মাধ্যমে মধ্যবিত্ত মহিলাদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৭৫ সালে কমিটি অফ দ্য স্ট্যাটাস অফ উইমেন ইন ইন্ডিয়া (সি এস ডাব্লু আই) কর্তৃক পরিচালিত অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ গবেষণার মাধ্যমে প্রকাশিত ভারতে বহু সংখ্যক মহিলার প্রান্তিককরণের প্রক্রিয়াটি সামনে চলে আসে। এটি ছিল 'Towards Equalit' মুহূর্ত যা ক্রমবর্ধমান দাম, ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক নারীবাদী আন্দোলন এবং ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা আরোপের কারণে গ্রামীণ ও শহুরে ভারতে ক্রমবর্ধমান সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার অভ্যন্তরে এবং বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির উত্থানের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি তৈরি করেছিল। ১৯৭৪ সালে সি. এস. ডব্লিউ. আই-এর গবেষণা চলাকালীন বোম্বেতে এস. এন. ডি. টি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবার 'উইমেনস স্টাডিজ' নারীবিদ্যা চর্চার সুস্পষ্ট ধারণাটি বাস্তবায়িত হয়। ভারতীয় উচ্চশিক্ষায় নারীবিদ্যা চর্চা কেন্দ্রের প্রাতিষ্ঠানিককরণ প্রথম কাঠামোগতভাবে গৃহীত হয় এবং ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই নীতিগত হস্তক্ষেপ অনুসরণ করে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রথম ৫ বছরে ২২ টি, প্রথম দশকে ৫৪ টি এবং ২০১৭ সালের মধ্যে ১৬৩ টি নারীবিদ্যা চর্চা কেন্দ্র চালু হয়েছে (Dhawan & Belluigi, In press; Kanagsabai, 2018; Datta, 2011) এর সূচনা থেকেই, নারী বিদ্যা চর্চা কেন্দ্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি 'হস্তক্ষেপবাদী' এবং 'সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি' হিসাবে দেখা হত কারণ এটি সমস্ত বিদ্যমান শাখায় মহিলাদের প্রশ্নের সংহতকরণের সুপারিশ করেছিল। এই কেন্দ্রগুলিকে বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞান শাখার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে একটি বহু-বিভাগীয় অনুশীলন হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল। ব্যাপক আশঙ্কা ছিল যে, যে কোনও সামাজিক বিশ্লেষণ যা মহিলাদের এর পরিধি থেকে বাদ দেয় তা মহিলাদের জীবনের অভিজ্ঞতাগুলি সামগ্রিকভাবে অধ্যয়নের জন্য অপর্যাপ্ত হবে। গবেষকগণ এটিও বিশ্বাস করতেন যে এই কেন্দ্রগুলি বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থা এবং প্রভাবশালী জ্ঞান ব্যবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে সক্ষম করার জন্য কল্পনা করা হয়েছিল (John, 2004) এবং প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, শিক্ষাব্যবস্থাকে অবিচার, প্রান্তিককরণ এবং মহিলাদের উপর নিপীড়নের বিরুদ্ধে সামাজিক উদ্বেগকে প্রসারিত করতে দায়বদ্ধ করা হবে (Anandhi & Swaminathan, 2006)। তাই এই কেন্দ্রগুলি সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রদায়কে মহিলাদের উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলির সমাধানে অনুপ্রাণিত করতে একটি

'অনুঘটক ভূমিকা' পালন করবে বলে আশা করা হয়েছিল। 'একাডেমিক ফেমিনিজম' হিসাবে উল্লেখ করা, নারী বিদ্যা চর্চা কেন্দ্র নারীবাদী পদ্ধতির আহ্বান জানিয়ে দেখায় যে কীভাবে প্রভাবশালী জ্ঞান অনুশীলনগুলি মহিলাদের অসুবিধায় ফেলে এবং কীভাবে নারীবাদী জ্ঞানতত্ত্ববিদরা জ্ঞান, জ্ঞানী, বস্তুনিষ্ঠতা এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির এই ত্রুটিপূর্ণ ধারণাগুলি সনাক্ত করেন।

**'ব্রাহ্মণবাদী পিতৃতন্ত্র' এবং দলিত নারীবাদ**

ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে কোনও উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ব্যর্থ হওয়ার জন্যও নারীবাদীদের সমালোচনা করা হয়েছিল। যদিও, বাম দল ভিত্তিক সংগঠনগুলির জন্য, বর্ণ শ্রেণিতে সীমাবদ্ধ বলে মনে হয়েছিল, সার্বজনীন ভগ্নীত্বের ধারণাটি স্বায়ত্তশাসিত মহিলা সংগঠনগুলির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই প্রক্রিয়াগুলিতে, ব্রাহ্মণ্য পিতৃতন্ত্রের জন্য একটি নির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জের প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা করা হয়েছিল। এইভাবে, দলিত মহিলা সংগঠনগুলি নারী আন্দোলনের জন্য বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল, যা নারী আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য অংশগুলিকে বর্ণ ও লিঙ্গের সংযোগগুলি অনুসন্ধান করতে পরিচালিত করেছিল। Rege (1998, 2000) যুক্তি দিয়েছিলেন যে 'পার্থক্যের' কাঠামোর মধ্যে বর্ণের বিষয়গুলি দলিত মহিলা সংগঠনগুলির একমাত্র দায়িত্ব হয়ে উঠেছে।

সমাজতাত্ত্বিক লেখাগুলি প্রায়শই বুদ্ধিবৃত্তিক এবং এর ফলে বর্ণ ব্যবস্থার কাঠামো ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে ছদ্মবেশ ধারণ করে। লুই ডুমনির মতো পণ্ডিতরা বস্তুগত অবস্থা এবং ক্ষমতার প্রশ্নগুলি বাদ দিয়ে ধর্মীয় দিকগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বর্ণ ব্যবস্থার মতাদর্শের উপর জোর দিয়েছেন। বর্ণ ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টিভঙ্গির দিকে মনোনিবেশ করার জন্য এবং দলিত লেখকদের বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি এবং বর্ণ-ভিত্তিক নিপীড়নের বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতা এড়িয়ে চলার জন্য নারীবাদীরা তাদের সমালোচনা করেছেন। লুই ডুমন্ট এবং অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানীরা বর্ণ ব্যবস্থাকে প্রভাবশালী এবং প্রভাবশালী উভয়ের দ্বারা গৃহীত সম্মতিসূচক মূল্যবোধের ব্যবস্থা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এটি উচ্চবর্ণের জন্য সুবিধাজনক করে তোলে কারণ এটি শ্রেণিবদ্ধ কাঠামোর মধ্যে তাদের নিজস্ব অবস্থানকে মুছে দেয়। এটি আম্বেদকর যিনি বর্ণকে শ্রেণিবদ্ধ বৈষম্যের একটি ব্যবস্থা হিসাবে বর্ণনা করেছেন যা নীচে থেকে অনুভূত হয়। তাঁর কাছে বর্ণ ব্যবস্থা শ্রমের বিভাজন নয়, বরং শ্রমিকদের বিভাজন ছিল। বর্ণগুলি শ্রদ্ধার একটি আরোহী স্কেল এবং অবজ্ঞার একটি অবরোহী স্কেল অনুযায়ী সাজানো হয়। আমরা যখন বর্ণ ব্যবস্থার উপরে উঠি, তখন একটি বর্ণ গোষ্ঠীর ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং আমরা যখন নিচে যাই, তখন বর্ণের প্রতি অবজ্ঞার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। যখন আমরা নিম্নবর্ণের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি অধ্যয়ন করি তখনই আমরা বুঝতে পারি যে তাদের বস্তুগত সম্পদ, জমি, শিক্ষার কোনও অ্যাক্সেস নেই এবং তারা মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছে। উচ্চ বর্ণের লোকেরা উৎপাদনের উপায়ে আধিপত্য বিস্তার করে এবং প্রতীকী উৎপাদনের

উপায়েও আধিপত্য বিস্তার করে। যদিও উভয়ই 'বিশুদ্ধতা' এবং 'দূষণ'-এর ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক কাঠামো ব্যবহার করে। আম্বেদকর, ডুমন্টের বিপরীত প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন।

'ব্রাহ্মণবাদী পিতৃতন্ত্র' শব্দটি পিতৃতন্ত্রের এই অনন্য কাঠামোকে বিচ্ছিন্ন করার একটি কার্যকর উপায়, যা এখন ভারতের অনেক অংশে প্রভাবশালী। এটি এমন নিয়ম ও প্রতিষ্ঠানের একটি সেট যেখানে বর্ণ ও লিঙ্গ সংযুক্ত, প্রতিটি একে অপরকে রূপ দেয় এবং যেখানে বর্ণের মধ্যে সীমানা বজায় রাখতে মহিলারা গুরুত্বপূর্ণ। এই কাঠামোর মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক কোডগুলি নিশ্চিত করে যে বর্ণ ব্যবস্থাটি বদ্ধ অন্তঃসত্ত্বা বৃত্তের শ্রেণিবদ্ধ ক্রম লঙ্ঘন না করে পুনরুৎপাদন করা যেতে পারে, প্রতিটি অন্যদের থেকে আলাদা এবং উচ্চতর এবং নিম্ন। উপরন্তু, মহিলাদের জন্য ব্রাহ্মণ্য কোডগুলি বর্ণের শ্রেণিবিন্যাসে বর্ণ গোষ্ঠীর অবস্থা অনুসারে পৃথক হয় এবং যৌনতার উপর সবচেয়ে কঠোর নিয়ন্ত্রণ সর্বোচ্চ বর্ণের জন্য বিশেষাধিকার হিসাবে সংরক্ষিত থাকে। পরিশেষে, এটি 'পবিত্র' স্ত্রী এবং পতিব্রতা মহিলাদের একটি মতাদর্শ এবং নিয়ম ও প্রতিষ্ঠানের একটি কাঠামো উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে যার দ্বারা বর্ণের শ্রেণিবিন্যাস এবং লিঙ্গ বৈষম্য সম্মতি এবং জবরদস্তির প্রয়োগ উভয়ের মাধ্যমেই বজায় রাখা হয়। অন্তর্বিবাহ[১০] (Endogamy) প্রথা বর্ণের জন্ম দেয়। বিবাহ একটি সর্বজনীন এবং রাজনৈতিক কাজ যা আধিপত্যবাদী সামাজিক শৃঙ্খলা এবং তাই বর্ণের শৃঙ্খলা তৈরি করে এবং পুনরুৎপাদন করে। উমা চক্রবর্তী পতিব্রতের মতাদর্শ-উচ্চবর্ণের মহিলাদের মতাদর্শ-কে হিন্দু আদর্শিক শৃঙ্খলার প্রতিভার মাস্টারস্ট্রোক হিসাবে উল্লেখ করেছেন, যেখানে মহিলারা নিজেরাই তাদের নিজস্ব যৌনতা নিয়ন্ত্রণ করেন এবং বিশ্বাস করেন যে তারা যে কোডগুলি গ্রহণ করেছেন তার মাধ্যমে তারা শক্তি ও সম্মান অর্জন করেছেন। উচ্চবর্ণের মহিলাদের বর্ণ ব্যবস্থায় প্রবেশের প্রবেশদ্বার এবং কেন্দ্র হিসাবে বিবেচনা করা হয়। নিম্নবর্ণের পুরুষদের যৌনতা রক্তের উচ্চবর্ণের বিশুদ্ধতার জন্য হুমকি হিসাবে দেখা হয় এবং তাই উচ্চবর্ণের মহিলাদের যৌন প্রবেশাধিকার থেকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রতিরোধ করতে হবে। ব্রাহ্মণ্য পিতৃতন্ত্র তাই বর্ণের মিশ্রণ রোধ করতে নজরদারি ও নির্জনতার একটি কার্যকর ব্যবস্থা কার্যকর করে কারণ এটি সামাজিক শৃঙ্খলার বিস্তৃত কাঠামো ভেঙে ফেলবে। উচ্চবর্ণের মহিলাদের এবং নিম্নবর্ণের মহিলাদের মতাদর্শের মধ্যেও একটি স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। দুই বর্ণের মধ্যে সম্মান, লজ্জার নিয়মে পার্থক্য রয়েছে। যদিও শ্রম-যৌন ও ঘরোয়া উভয় ক্ষেত্রেই-উভয় বর্ণের জন্য অবমূল্যায়িত, দলিত মহিলাদের অস্তিত্বের কেন্দ্রবিন্দু হল শ্রম।

এমন পরিস্থিতিতে, যেখানে পার্থক্যকে ঘিরে রাজনীতির সংগঠন নারীবাদী রাজনীতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে, সেখানে পার্থক্যের ধারণাকে ঘিরে দলিত মহিলাদের সংগঠন একটি যৌক্তিক ফলাফল হতে বাধ্য। ১১ ই আগস্ট দিল্লিতে ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ দলিত উইমেন (এন. এফ. ডি. ডব্লিউ) গঠনে দলিত মহিলাদের পরিচয়ের একটি স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত দাবি প্রথম প্রকাশ পায়। দলিত মহিলাদের

[১০] স্বগোত্রে বা স্বকুলে বিবাহ।

ভিন্নভাবে কথা বলার প্রয়োজনীয়তা বোঝার জন্য এই ঘটনার উপর প্রভাব বিস্তারকারী অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উভয় কারণই বর্ণনা করা প্রয়োজন। দলিত মহিলারা বাহ্যিক কারণগুলির ভিত্তিতে ভিন্নভাবে কথা বলার জন্য মামলাটিকে ন্যায়সঙ্গত করেন, যেখানে উচ্চবর্ণের নারীবাদী সহ অ-দলিত শক্তিগুলি দলিত মহিলাদের সমস্যাকে একত্রীকরণ করে; এবং অভ্যন্তরীণ কারণগুলি যেখানে দলিত মহিলারা দলিতদের মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্যের মুখোমুখি হন। এইভাবে গোপাল গুরু দলিত মহিলাদের তিনটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ভিন্নভাবে কথা বলার দাবিকে সমর্থন করেন। ক। এটি কেবল বর্ণ ও শ্রেণি পরিচয় নয়, একজনের লিঙ্গ অবস্থানও একটি ঘটনার বৈধতা নির্ধারণ করে। খ। দলিত পুরুষরা তাদের মহিলাদের বিরুদ্ধে একই প্রক্রিয়া পুনরুৎপাদন করছে যা তাদের উচ্চ বর্ণের বিরোধীরা তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে ব্যবহার করেছিল। গ। দলিত মহিলাদের অভিজ্ঞতা দেখায় যে দলিতদের মধ্যে স্থানীয় প্রতিরোধ গুরুত্বপূর্ণ। তাই তিনি বলেছেন যে দলিত মহিলাদের স্বাধীন দাবিকে দলিত পুরুষদের বিভাজনকারী হিসাবে দেখা উচিত নয়; পরিবর্তে, এটিকে ইতিবাচক মুক্তির সম্ভাবনা বহনকারী হিসাবে দেখা উচিত। কারণ এটি তাদের সৃজনশীল শক্তির একটি অর্থবহ সম্পৃক্ততার দিকে পরিচালিত করতে পারে। তিনি আরও যুক্তি দেন যে, দলিত মহিলাদের স্বায়ত্তশাসিত সংহতি একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেও বোঝা যেতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখে যে একটি সমাজের কম শক্তিশালী সদস্যদের সামাজিক বাস্তবতা সম্পর্কে অন্যদের তুলনায় বেশি বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে কারণ তাদের সুবিধাবঞ্চিত অবস্থান তাদের অন্যদের উপর একটি নির্দিষ্ট জ্ঞানতাত্ত্বিক বিশেষাধিকার প্রদান করে।

গোপাল গুরুর মতে, দলিত মহিলাদের 'ভিন্নভাবে কথা বলার' দাবি ধরে নেয় যে বক্তার সামাজিক অবস্থান কমবেশি স্থিতিশীল হবে; অতএব, 'ভিন্নভাবে কথা বলা' কে প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এর ফলে দলিত মহিলাদের পক্ষে কথা বলার দলিত মহিলার দাবি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বৈধ হয়ে যায়। এটি করার ক্ষেত্রে, 'ভিন্নভাবে কথা বলা' র ঘটনাটি দলিত মহিলাদের পরিচয়ের অগ্রভাগে রয়েছে। যদিও এই পর্যায়ে দলিত নারী আন্দোলন সম্পর্কে কোনও সুনির্দিষ্ট মন্তব্য করা কঠিন, তবে উপরোক্ত অনুমানের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। দলিত মহিলাদের অবস্থানের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটছে। মহারাষ্ট্রের দলিত মহিলারা কর্ণাটকের মহিলাদের তুলনায় বেশি শিক্ষিত এবং নিযুক্ত। এবং প্রথমজনই বেইজিংয়ে দলিত মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব করবেন। সুতরাং, এখানেও, দলিত মহিলাদের একটি নির্দিষ্ট অংশকে বেনামী করে দেওয়া হবে। এই কারণেই এন. এফ. ডি. ডব্লিউ-এর আলোচনাসূচির দ্বিতীয় বিন্দুতে তৃণমূল স্তরের দলিত মহিলাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উপরন্তু, রাজনীতিতে পুরুষ আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য, দলিত মহিলারা তাদের জন্য একটি স্থান তৈরি করতে রাজ্যের উপর নির্ভরশীল। এটি তাদের সহ-বিকল্পের বিপদের মুখোমুখি করে যেমনটি তাদের পুরুষ

সমকক্ষদের ক্ষেত্রে হয়েছিল। তা সত্ত্বেও, দলিত মহিলাদের ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া দেশ-রাজ্যের ভূখণ্ডকে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তুলেছে।

১৯৯০-এর দশকে স্বায়ত্তশাসিত দলিত মহিলা সংগঠনগুলির দাবি নারীবাদী আন্দোলনের ব্রাহ্মণবাদ এবং দলিত রাজনীতির পিতৃতান্ত্রিক অনুশীলনের উপর জোর দেওয়ার পাশাপাশি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের জন্ম দেয়। যদিও বিভিন্ন মহিলা সংগঠন 'ভিন্ন' কণ্ঠে কথা বলতে পারে, তবে এটি একাধিক/বহুবচন নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির একটি আদর্শিক অবস্থানের প্রস্তাব দেয় বলে মনে হয়। এই ধরনের 'পার্থক্যের' কাঠামোর মধ্যে বর্ণের বিষয়গুলি দলিত মহিলা সংগঠনগুলির একমাত্র দায়িত্ব হয়ে ওঠে। শর্মিলা রেগে উল্লেখ করেছেন যে বিভিন্ন অবস্থানের অন্বেষণের অনুপস্থিতি দ্বান্দ্বিকতা বাধাগ্রস্ত করে, উভয়ই সমসাময়িক নারীবাদী রাজনীতির সংশোধন এবং স্বায়ত্তশাসিত দলিত মহিলা সংগঠনগুলির দ্বারা উপস্থাপিত অবস্থানগুলির তীক্ষ্ণতা। রেগে অবশ্য বিশ্লেষণাত্মক এবং রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে পার্থক্যের ধারণার সীমাবদ্ধতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি যুক্তি দেন যে 'নামকরণের পার্থক্য' বা 'ভিন্ন কণ্ঠস্বর' থেকে সামাজিক সম্পর্কের দিকে মনোনিবেশ করা যা পার্থক্যকে নিপীড়নে রূপান্তরিত করে নারীবাদী রাজনীতির জন্য অপরিহার্য। অন্য কথায় এর অর্থ হল 'পার্থক্য' কে একটি দৃষ্টিভঙ্গিতে রূপান্তরিত করা। অন্যথায়, 'পার্থক্য'-এর কাঠামোর মধ্যে, বর্ণের বিষয়গুলি দলিত মহিলা সংগঠনগুলির একমাত্র দায়িত্ব হয়ে উঠবে। পরিবর্তে মহিলাদের আন্দোলনের জন্য বিভিন্ন অবস্থানের জন্য লড়াই করা এবং একে অপরের অবস্থান অন্বেষণ করা প্রয়োজন। রেগে যুক্তি দেন যে আমাদের 'স্বতন্ত্র আখ্যান' থেকে 'শ্রেণিবিন্যাসের সমষ্টিগত প্রতিযোগিতায়' যেতে হবে কারণ সত্যতার দাবির উপর সরাসরি অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিশেষাধিকারের জ্ঞানের দাবিগুলি একটি সংকীর্ণ পরিচয়ের রাজনীতির দিকে নিয়ে যেতে পারে। এবং এই সংকীর্ণ পরিচয়ের রাজনীতি দলিত মহিলা সংগঠনগুলির মুক্তির সম্ভাবনাকে সীমাবদ্ধ করে দেয়। অ-দলিত নারীবাদীরা দলিত মহিলাদের জন্য 'কথা বলতে' বা স্বর হয়ে উঠতে পারে না, তবে তারা নিজেদেরকে দলিত নারীবাদী হিসাবে পুনরায় উদ্ভাবন করতে পারে। এই ধরনের অবস্থান 'সত্যতা' এবং সংকীর্ণ 'পরিচয়ের রাজনীতি'-র উপর ভিত্তি করে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সংকীর্ণ পথকে এড়িয়ে চলে।

ব্যক্তির সঙ্গে প্রতিষ্ঠান এবং সমষ্ঠির সম্বন্ধ বিষয়ে নীরা যূভাল ডেভিস "পলিটিক্স ওব বীলংগিং" বইতে বিশদে আন্তঃস্তর ভিত্তিক আলোচনার বৈশিষ্ট্যের পাশপাশি ব্যক্তির সংযুক্তি এবং বিচ্ছিন্নতার বোধ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কখন একজন নিজের পরিচিত এলাকা, গোষ্ঠীর বাইরে অন্যত্র বিচ্ছিন্ন বোধ করেন। নিজের পরিচিত পরিসরের বাইরে কীভাবে একজন আত্ম–পরিচিতি এবং অস্তিত্ত্ববোধের সংকট বোধ করেন। এই বিষয়টি প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে যখন একজন দলিত ছাত্রী নিজের পরিচিত গোষ্ঠী, এলাকার বাইরে মেট্রোপলিটন সিটিতে আসেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন তা দেশের বাইরে না হলেও, স্থানিক, ভৌগোলিক সবদিক থেকে এতটাই আলাদা যে তাঁরা এক ধরণের বিচ্ছিন্নতা বোধ করেন, কোনো কিছুই তাদের কাছে

পরিচিত হিসাবে প্রতিভাত হয় না। অস্তিত্বের সংকটের বোধ তৈরি হয়। নীরা যূভাল ডেভিস আরো বলছেন, ব্যক্তির সংযুক্তির বোধ বিভিন্ন ভাবে হতে পারে এবং বিশেষ কোনো বস্তুর সঙ্গে একাত্মতা বোধের ভিত্তিতে হতে পারে। এই সংযুক্তির বোধ ক্রমাগত পরিবর্তিত হতে পারে, তা স্থির কোনো ধারণা নয়। ব্যক্তির সংযুক্তির বোধ একটি স্তরীভূত ধারণা। স্থানগত, মাত্রাগত। তাঁর মতে সামাজিক, রাজনৈতিক এই সংযুক্তির বোধ বিশ্লেষণ করতে গেলে তিনটি পৃথক বিষয়কে চিহ্নিত করতে হবে যা দ্বারা সংযুক্তির বোধ নির্মিত হয়। প্রথমত, সামাজিক অবস্থান, দ্বিতীয়ত, মানুষজনের সঙ্গে পরিচিতি, সমষ্ঠি ও দলের সঙ্গে নৈকট্যের বোধ তৃতীয়ত, নৈতিক এবং রাজনৈতিক মূল্যবোধ যার দ্বারা একজন নিজেদের ও অন্যদের বিচার করে (Davis, 2011) এই বিষয় গুলি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত।

**বিদ্যমান সাহিত্য পর্যালোচনার ফাঁক/গবেষণায় ব্যবধান**

এই সচেতনতা, চর্চার পরেও দেখা যাচ্ছে কীভাবে প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য টিকে আছে, চুনি কোটাল, রোহিত ভেমুলাদের ঘটনা ঘটে যাচ্ছে ক্রমাগত অথবা নৈঃশব্দে হারিয়ে যাচ্ছে আরো বহু ঘটনা। বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষাকালে প্রান্তিক ছাত্রীরা কি ধরণের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছন, এখনও কি ধরণের সমস্যা তাদের তাড়িত করে, যেগুলি হারিয়ে যাচ্ছে নৈঃশব্দের ঘন অন্ধকারে? তাদের অভিজ্ঞতার স্বাতন্ত্র্য এবং বিশেষত্ব কি, তাদের কি একটি ভিন্ন চেতনা জগত আছে, কীভাবে তাদের উচ্চশিক্ষার অভিজ্ঞতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনালোকিত দিককে চিহ্নিত করে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক শিক্ষার বাইরে স্বদেশী শিক্ষার পুনর্গঠন কি সমাজের সব স্তরের ছাত্রছাত্রীদের স্বর বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে অন্তর্ভুক্ত করতে সমর্থ হয়েছিল? দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে সংরক্ষণ, শিক্ষানীতি সংস্কার, পলিশি নির্মাণ কি বিশ্ববিদ্যালয়ে কাঙ্ক্ষিত গণতান্ত্রিক পরিসর গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে? ছাত্রীদের পরিবার, সমাজ, যাত্রাপথ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের সময় যাপন ইত্যাদির ভিত্তিতে প্রান্তিক ছাত্রীদের বর্তমান অবস্থান— এই গবেষণার অন্বিষ্ট।

Govinda et al. (2020) খতিয়ে দেখেছেন যে সমসাময়িক ভারতের একাডেমিতে নারীবাদী হওয়ার এবং নারীবাদ 'চর্চা করার' অর্থ কী। তারা উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিতে নারীবাদী হিসাবে শিক্ষাদান, শেখা, গবেষণা এবং কাজ করার রূপান্তরকারী সম্ভাবনা, দ্বিধা এবং চ্যালেঞ্জগুলি প্রতিফলিত করে। এই গবেষণা এই রূপান্তরের সম্ভাবনাকে খতিয়ে দেখতে চায়। প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক শিক্ষার্থীরা যখন উচ্চশিক্ষার সুযোগ পায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেমোগ্রাফি পরিবর্তন করে, তখন এই গবেষণা নারীবাদী লেন্স ব্যবহার করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপান্তরকারী সম্ভাবনাগুলি পরিমাপের অবকাশ তৈরি হয়। তাদের উপস্থিতি কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাদান, গবেষণা এবং সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়াকে পরিবর্তন করে? শিক্ষার অংশীদার হিসাবে, প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক শিক্ষার্থীরা কি জ্ঞান সম্প্রদায়কে বৈচিত্র্যময় করার সম্ভাবনা

অর্জন করে? এবং সামাজ গঠন,[১১] এবং জ্ঞান গঠন এবং বৈধতা গণতান্ত্রিককরণে অবদান রাখে? যদি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে শান্তি ও ন্যায়বিচার, লিঙ্গ সমতা এবং মানসম্মত শিক্ষার প্রতিষ্ঠানের মতো সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্টের লক্ষ্যগুলি (SDG) অর্জন করার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে হয়, তবে প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক মহিলা শিক্ষার্থীদের স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কীভাবে কাজ করছে সেদিকে গবেষণার দৃষ্টি নিবদ্ধ করা দরকার। আমাদের দেখতে হবে যে ‘গুণমান’ এবং ‘সমতা’-র মতো শব্দগুলি সামাজিক ন্যায়বিচার প্রদানের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে কিনা, না কি এই শব্দগুলি সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সরঞ্জাম হয়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কি তাদের কাঠামো ও কার্যাবলীকে এমনভাবে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করতে প্রস্তুত, যাতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীদের জনসংখ্যার পরিবর্তনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, শুধু পরিমাণগতভাবে নয়। এই গবেষণাটি নারীবাদী লেন্স ব্যবহার করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অধ্যয়নের জন্য মূল্যায়ন করবে যে তারা লিঙ্গ এবং বর্ণের আত্ম-পরিচিতির রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে নিশ্চিত করতে পারছে কি না যে জ্ঞান গঠনকে সামাজিক গঠনের সাথেও দৃঢ়ভাবে যুক্ত করা যেতে পারে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, গবেষণাটি নতুন প্রবেশকারীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হস্টেল এবং বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগগুলি বোঝার চেষ্টা করবে। এই বিষয়ে ভারতের উচ্চ শিক্ষা প্রাঙ্গণের বিদ্যমান সাহিত্যে এই ফাঁকগুলি এই গবেষণাটি পূরণ করার চেষ্টা করবে।

**গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য**

উচ্চশিক্ষা তথা সমাজের সর্বত্র আর্থ-সামাজিক অবস্থান অগ্রাধিকার পেয়ে এসেছে। সমাজের পিছিয়ে পড়াদের (পিছিয়ে রাখা) জন্য সংরক্ষণ এবং ‘সুযোগ’, ‘সুবিধা’ জায়গা পায় তাদের অধিকারের জায়গায়। বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে প্রান্তিক ছাত্রীরা কি পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, সমাজ আর প্রতিষ্ঠানের একাধারে যারা প্রান্তিক, তারপর নারী, তারপর বিবিধ লড়াইয়ে মানসিক ভাবে জর্জরিত তারা কিভাবে এই পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়ায় তার একটা ভিন্ন বাস্তবতা আছে। বিচিত্র প্রতিকূলতা নিয়ে এই ছাত্রীরা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে পৌঁছয় অথবা পৌঁছয় না কোথাও। পরিবার, সমাজ, শিক্ষাজীবন, বিশ্ববিদ্যালয়, হস্টেল এই যে পরিসর যেখানে প্রান্তিক ছাত্রীদের দৈনন্দিন বেঁচে থাকা, বছরের পর বছর চালিয়ে বয়ে নিয়ে যাওয়া সীমাবদ্ধতা তাদের ওপর কি প্রভাব ফেলে। উচ্চশিক্ষা পরিসরের সঙ্গে কি একাত্ম হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়? অথবা একটি ব্রাত্য থেকে যাবার বোধ তাদের তাড়িত করে সমগ্র শিক্ষাজীবনে। পরিবার যেখানে একটি পিতৃতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সেখানে তাদের অবদমিত পরিস্থিতি অন্যদিকে সমগ্র শিক্ষাজীবন, স্কুল কলেজ নানা প্রতিষ্ঠান পেরিয়ে যখন তারা পৌঁছয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। তখন সেখানে কি তারা কি ভাবে গৃহীত হয়। তাদের অনু/প্রবেশ প্রতিষ্ঠানের কাছে কি ধরণের হয়ে ওঠে? সমাজের রন্ধ্রে

---

[১১] সামাজ গঠন শিক্ষার মাধ্যমে, জ্ঞান গঠন গবেষণার মাধ্যমে এবং বৈধতা নির্মাণ যা অনুশীলনের এই দুটি ক্ষেত্রের সম্পর্কের মাধ্যমে সম্প্রদায়ের সাথে জড়িত।

রন্ধ্রে থাকা অসাম্য, নারীবিদ্বেষ, জাতিবিদ্বেষ, শ্রেণি অসাম্য সব সে একত্রে সম্মুখীন হতে হতে যায়। একটি প্রান্তিক ছাত্রী তার শৈশব থেকে সহ্য করে চলে নানা ধরনের নির্যাতন এবং অবদমন। এই নির্যাতনের চলমানতা থামে না, বিদ্বেষের চলমানতা থামে না, প্রজন্ম বদলে বদলে যায়। এই গবেষণা সন্দর্ভে মূলত অন্বেষণ করা হয়েছে প্রান্তিক ছাত্রীদের জীবনবৃত্তান্ত, তাদের বাস্তবতার বিভিন্ন স্তর বিন্যাস। প্রথমত, শিশুকন্যা হিসাবে পরিবার তাকে একটি অবদমন মূলক শর্তে বেঁধে রাখে। দ্বিতীয়ত, গ্রাম, মফস্বল থেকে শহরে আসে শিক্ষাসূত্রে। তৃতীয়ত, এই ছাত্রীদের পরিবারে আর্থিক স্বচ্ছলতা নেই। চতুর্থত, পরিবারে পারিবারিক হিংসার শিকার হতে থাকে তারা, দীর্ঘবছর নির্যাতনের ফলে মানসিক সুস্বাস্থ্য তাদের থাকে না অনেক ক্ষেত্রেই। পঞ্চমত, সাংস্কৃতিক মূলধন নেই। সামনে এগিয়ে যাবার প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাব থাকে। ষষ্ঠত, ভাষাগত সমস্যা তাদের রয়েছে। কারণ তারা পশ্চিমবঙ্গের পটভূমিতে বাংলা মিডিয়াম থেকে পাশ করা ছাত্রী। প্রাইভেট এডুকেশন ইংরেজী শিক্ষা তারা পায় নি। সে ইংরেজী জানে না। সপ্তমত, ধারনা গত ভাবে সে নানাভাবে পিছিয়ে। তার বুঝতে জানতে সময় লাগে। সুতরাং সে ধীর গতি সম্পন্ন। এখন বহুমাত্রিক প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে একটি মেয়ে যখন পড়াশুনা চালিয়ে যায় তখন তার চালিকা শক্তি কি? একমাত্র তার নিজের ইচ্ছা, জেদ আর পারিপার্শ্বের চাপ? চারিদিকে সীমাবদ্ধতা যখন অগুনতি তখন কি সে নিজেকেই নিজে এগিয়ে নিয়ে যায়? যদিও সে জানে না তার গন্তব্য কোথায়। সময়ের সঙ্গে বাড়তে থাকে তার প্রতিকুলতা, বাড়তে থাকে প্রতিকুলতার রকমফের, মাত্রা। এই ক্রমবর্ধমান প্রতিকুলতায় সঙ্গে তারা কিভাবে যুঝে নেয়, কিভাবে তার পড়াশুনা অথাব গবেষণা এগিয়ে নিয়ে যায় তার অন্বেষণ ও বিশ্লেষণ এই গবেষণা সন্দর্ভের উপজীব্য।

এই গবেষণায় মূলত যে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে সেটি হল উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন প্রান্তিকতা কিভাবে কার্যকারণ সম্বন্ধের ভিতরে ছাত্রীদের বাস্তবতা নির্মাণ করে তার সামাজিক প্রক্রিয়াটি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা। প্রথমত, প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক ছাত্রীরা কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয় তথা উচ্চশিক্ষা পরিসরের সঙ্গে খাপ খাওয়ায়, কি ধরনের সমস্যা ও প্রতিকূলতার সম্মুখীন তারা হয় এবং শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মী, সহপাঠী তথা ক্যাম্পাসের সঙ্গে তাদের কি ধরনের আন্তঃসম্পর্ক তৈরি হয়। পরিবার, বিশ্ববিদ্যালয়, হস্টেল এই প্রতিষ্ঠান গুলোর সঙ্গে তার সম্পর্ক কিভাবে নির্ণীত হয়, কিভাবে পরিসর একাত্মতা তৈরি হয় অথবা হয় না। প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য কিভাবে শিক্ষাব্যবস্থার ভিতরে সূক্ষ্মভাবে ক্রিয়াশীল থাকে। উচ্চশিক্ষার সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠান গুলির বৈশিষ্ট্য, প্রাথমিক ভাবে নারীদের জন্য এবং প্রান্তিক নারীদের জন্য পরিসর হিসাবে তাদের নির্মাণ| প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক ছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের অভিজ্ঞতা আমার গবেষণার প্রতিপাদ্য বিষয়| উচ্চশিক্ষাকালীন আবাসজীবন কিভাবে তাদের প্রভাবিত করে ও নিজস্ব পরিসর হিসাবে গড়ে ওঠে।

**গবেষণার মূল প্রশ্ন**

১। প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক আবাসিক ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার অভিজ্ঞতা এবং অভিজ্ঞতার বয়ান নির্মাণে আর্থ-সামাজিক অবস্থান কিভাবে ক্রিয়াশীল থাকে?

২। পরিবারের বাইরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হস্টেল কিভাবে স্বতন্ত্র পরিসর হিসাবে প্রান্তিক ছাত্রীদের বাস্তবতাকে আকার দেয়?

৩। সাংবিধানিক অধিকার সুত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রান্তিক ছাত্রীদের অংশগ্রহণ এবং দৃশ্যমানতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিকাঠামো এবং উচ্চশিক্ষার পরিসরে কি ধরনের পারস্পরিক প্রভাব তৈরি করে?

৪। স্ত্রীশিক্ষার সূচনা কালে উচ্চবর্গীয় নারীর আবাসজীবনের স্মৃতিকথা এবং সমসাময়িক হস্টেল জীবনকেন্দ্রিক সাহিত্যে প্রতিফলিত নারীর আত্মবোধের আন্তঃস্তরবিন্যাস ভিত্তিক পাঠ কিভাবে ভিন্ন?

Chellman & Levitan (2016) যুক্তি দিচ্ছেন, কীভাবে ছাত্রছাত্রীদের পরিচিতি তাদের উচ্চশিক্ষার স্থায়িত্বে এবং সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। একজন ছাত্রী বিচিত্র আত্ম পরিচিতি বহন করে চলে তাদের লৈঙ্গিক, সামাজিক অবস্থান, জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে (Levitan, 2016) একটি পিতৃতান্ত্রিক, জাতি বৈষম্যভিত্তিক সমাজে এই বহুমাত্রিক আত্ম পরিচিতি প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক ছাত্রছাত্রীরা উচ্চশিক্ষালাভের ক্ষেত্রে বহুবিধ সমস্যা ও প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয় (Crenshaw, 2020)। Crenshaw এর মতে, এই বহুবিধ পরিচিতিগুলির ভিন্ন চরিত্র এবং ভিন্ন প্রভাব আলাদা ভাবে দেখলে তাদের সমস্যার একটি সামগ্রিক চিত্র তৈরি হয় না। অবদমনের বিভিন্ন স্তর যেগুলি প্রান্তিক ছাত্রছাত্রীদের আত্ম-পরিচিতির সঙ্গে শুধুমাত্র যুক্তই নয়, অঙ্গাঙ্গী ভাবে সম্পৃক্ত, আন্তঃস্তর বিন্যাস ভিত্তিক যুক্তি পরম্পরার ভিত্তিতে সেগুলি চিহ্নিত করা প্রয়োজন। এই বিষয়গুলি চিহ্নিত করার জন্য গুনগত গবেষণার একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, ন্যারেটিভ এনকোয়েরি ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বর্ণনা ভিত্তিক আলোচনায় প্রান্তিক ছাত্রছাত্রীদের প্রতিটি আত্ম-পরিচিতির সার্বিক প্রকাশের সুযোগ রয়েছে Denzin (1997) বর্ণনামূলক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আলোচনার পদ্ধতির মধ্যে বহুমাত্রিক আত্ম–পরিচিতি চিহ্নিতকরণের সম্ভবনাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এখানে অংশগ্রহণকারীদের ভিন্ন আত্ম–পরিচয় সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা এক সঙ্গে উঠে আসার পরিসর তৈরি হয়। বেশির ভাগ গবেষণা দলিত ছাত্রীদের বিভিন্ন আত্ম–পরিচয়ের মধ্যে যথাযথ মেলবন্ধনর ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। Paik (2014) যুক্তি দিয়েছেন, 'উঁচু-জাত' বস্তুতপক্ষে গবেষণার মধ্যে এড়িয়ে গেছে অব্রাহ্মণ এবং দলিত শিক্ষা বিষয়ক প্রতিনিধিস্থানীয় তাত্ত্বিকদের শিক্ষা সম্বন্ধীয় দর্শন এবং অনুশীলন সম্বন্ধীয় বক্তব্য (Paik, 2014)। যার ফলে দলিত নারীর সচেতনতা এবং অভিজ্ঞতার নির্মাণ অস্বীকৃত থেকেছে, দৃষ্টিগোচরতায় আসে নি। তাই দলিত, প্রান্তিক ছাত্রীদের অভিজ্ঞতাগুলি আবার গভীর ভাবে পর্যালোচনা এবং আলোচনা করা প্রয়োজন যাতে দৃষ্টি অগোচর বিষয়গুলি সামনে আসে এবং শিক্ষাবিষয়ক নীতিগুলিকে আরো বেশি সমৃদ্ধ এবং অন্তর্ভুক্তিমুলক হয়ে উঠতে পারে। জাতি, লিঙ্গ এবং প্রথম প্রজন্ম বিষয়ক তর্ক-বিতর্ক অসম্পূর্ণ থেকে

যাবে যদি দলিত ছাত্রীদের অভিজ্ঞতাগুলি অনালোচিত এবং দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায়। এই গবেষণয় মূলত প্রান্তিক ছাত্রীদের ভারতীয় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা আন্তঃস্তর বিন্যাসের ভিত্তিতে আলোচিত হয়েছে।

**গবেষণার পদ্ধতি ও প্রকরণ**

নারীবাদী তাত্ত্বিক অবস্থান এবং দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণের পদ্ধতিগত অবস্থান থেকে গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে। কোন দৃষ্টিকো্ণ থেকে দেখা হচ্ছে কোনো বিষয় তার উপর নির্ভর করে পর্যবেক্ষণের ফলাফল। প্রচলিত পর্যবেক্ষণের রীতি পিতৃতান্ত্রিক, পরিস্থিতির যা ব্যাখ্যা দেয় তাতে অসংবেদনশীলতা এবং একপেশে পক্ষপাত উল্লেখযোগ্য ভাবে বর্তমান। নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে তার অভিজ্ঞতার কথা তার বয়ানে শুনলে উপলব্ধ হয় প্রচলিত বয়ানের সঙ্গে তার পার্থক্য। নারীবাদী অবস্থান বিষয়ের একটি অশ্রুত স্বরকে প্রতিষ্ঠা দেয়। অবদমনের ভিন্ন মাত্রা অনুভূত হয় ভুক্তভোগীর কাছ থেকে তার অভিজ্ঞতার কথা শুনলে। এদিক থেকে নারীবাদী গবেষণা পদ্ধতি নারীর অভিজ্ঞতাকে দিয়েছে একটি বিশেষ জায়গা যেখানে প্রচলিত আরোপিত ক্ষমতাশালী স্বরের প্রতাপ থেকে স্বতন্ত্র ভাবে নারীর স্বর উঠে আসে তার নিজস্বতা ও বিশেষত্ব সমেত। প্রথমত, এই গবেষণায় নারীর অভিজ্ঞতা নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় সমাজে নারী একমাত্রিক কোনো গোত্র নয়। শ্রেণি, ধর্ম, বর্ণ, জাতি, বয়স, ইত্যাদি অনুসারে বদলে যায় তাদের বাস্তবতা ও বিদ্যমান ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক। ফলত বদলে যায়, তাদের অভিজ্ঞতার বয়ান। তাই, উল্লেখযোগ্যভাবে এই গবেষণার দৃষ্টিও অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ। নারীবাদ যদি সামাজিক ও শৃঙ্খলামূলক নিয়ম ও সীমানাকে চ্যালেঞ্জ করে থাকে, একাডেমিতে থাকার এবং জানার নতুন উপায় নিয়ে আসে, তবে এটি তার নিজস্ব আধিপত্যবাদী সংস্করণ তৈরি ও স্থায়ী করেছে, গেটকিপিং, 'অপর' বানিয়ে তোলা, নীরবতা, উপেক্ষা এবং/অথবা আমাদের বহু অভিজ্ঞতাকে মুছে ফেলেছে। Govinda et al. (2020) দেখিয়েছেন যে, প্রতিটি ভিন্ন অবস্থানের নারী ভিন্ন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন এবং তার অভিজ্ঞতার ন্যারেটিভটিও বদলে যায় তার অবস্থানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। তাই সামাজিক গবেষণায় এই আন্তঃস্তর ভিত্তিক আলোচনা জরুরি অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার বৈচিত্র্য উঠে আসার জন্য। প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক ছাত্রী যারা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছেন তাদের বাস্তবতা এবং অভিজ্ঞতা অনুধাবন করার জন্য নারীবাদী আন্তঃস্তর বিন্যাস ভিত্তিক আলোচনা যথোপযুক্ত হবে বলে মনে হয়েছে। এই আলোচনা পদ্ধতি বা দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সম্ভবনা রয়েছে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে কোনো বিষয়ের একটি জটিলায়িত বিশ্লেষণ গড়ে তোলার।

উচ্চশিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণের পাশাপাশি বাংলা কথা সাহিত্যে তা প্রতিফলিত হয়ে চলেছে ধারাবাহিক ভাবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা পরিসরে সামাজিক বিভিন্ন স্তরের নারীদের অংশগ্রহণ কিভাবে সাহিত্যে উপস্থাপিত হয়েছে— এই গবেষণায় বিষয়টি দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি পূর্ণ ছবি অনুধাবনের জন্য সাক্ষাৎকার ভিত্তিক গবেষণার পাশাপাশি সাহিত্যে উপস্থাপনটি দেখা জরুরি। যে আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় বিশেষ স্বর গুরুত্ব পায় এবং ভিন্ন স্বর নৈঃশব্দে ডুবে যায় তার ছাপ সমাজে এবং সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়ে

চলে সমান্তরালে। তাই সাক্ষাৎকার ভিত্তিক বিশ্লেষণের পাশাপাশি সাহিত্যে একই বিষয়ের উপস্থাপন এখানে অন্বেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। শেষ অধ্যায়ে আবাসজীবন কেন্দ্রিক সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রেও নারীবাদী সাহিত্য সমালোচনা পদ্ধতি এবং আন্তঃস্তর বিন্যাস ভিত্তিক দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হয়েছে। এই আলোচনা পদ্ধতি একদিকে যেমন লিঙ্গবৈষম্যের দিকটি চিহ্নিত করে তেমনি সামাজিক আন্তঃস্তর বিভাজনের দিকটিও তুলে আনে। নারীবাদী সাহিত্য সমালোচনা সাহিত্য আলোচনার একটি ধারা হিসাবে গড়ে উঠেছে যেখানে নারীর স্বর ভিন্নতা এবং স্বাতন্ত্র্যসহ প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং বিশেষত নারীর স্মৃতিকথা, আত্মজীবনীর বিশেষত্ব চর্চা এই ধারায় উল্লেখযোগ্য জায়গা করে নিয়েছে। নারীবাদী সাহিত্য সমালোচনা পদ্ধতি সাহিত্যে আলোচনার মধ্যে ক্ষমতা কাঠামোর উপস্থাপনকে প্রশ্ন করে এবং ভিন্ন স্বরের প্রতিষ্ঠাকে গুরুত্ব দেয়। শেষ অধ্যায়ে  দুটি উপন্যাসের পাশাপাশি চারটি স্মৃতিকথা আলোচিত হয়েছে।

নারীবাদী গবেষণা যেহেতু গবেষকের অবস্থানকে গুরুত্ব দেয় এবং অবস্থানগত দৃষ্টিকোণের গুরুত্বকে স্বীকার করে সেক্ষেত্রে গবেষকের ব্যক্তিগত আত্মবোধ এবং যাত্রাপথটিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আমি সাংবিধানিক তালিকা অনুসারে অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ভুক্ত এবং পরিবার থেকে প্রথম উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় যোগ দিয়ে উচ্চশিক্ষার যাত্রা সচল রেখেছি। শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ এক দশকের বেশি সময় হস্টেলে থেকে পড়াশুনা করার পর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণায় নিয়োজিত হয়েছি। জাতিগত, শ্রেণিগত এবং সাংস্কৃতিক মূলধন ভিত্তিক অবস্থান একজন ছাত্রীকে কিভাবে প্রভাবিত করে তার সঙ্গে একটি ঘনিষ্ট বাস্তবিক এবং মনস্তাত্ত্বিক যোগ রয়েছে। প্রাথমিক ভাবে এই বিষয়ে গবেষণা করার অনুসন্ধিৎসা তৈরি হয় নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে। রাজ্যের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রান্তিক ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার ব্যক্তিগত যাত্রা অনুধাবনের ইচ্ছা তৈরি হয়। নারীবাদী গবেষণা গবেষণার অন্তিম ফলাফলের মতই সমান গুরুত্ব দেয় গবেষণার প্রক্রিয়াটিকে যেখানে মূলত গবেষণাটি 'হয়ে ওঠে' এবং এই গবেষণাগুলি যেহেতু গবেষকের মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সমান গুরুত্ব দেয় সামষ্টিক ভাবে গবেষণাটির নির্মাণ পদ্ধতিকে যেখানে গবেষক অংশগ্রহণকারীদের সহযোগিতায় এবং সক্রিয় অংশগ্রহণে কাজটি সম্পন্ন করেন। মানবীবিদ্যা গবেষণার ভিতরে এই সামষ্টিক নির্মাণ এবং জ্ঞাননির্মাণের যৌথতাকে গুরুত্ব দেয়। এক্ষেত্রেও অংশগ্রহণকারীদের দীর্ঘসময়ের সংযুক্তি এবং একাত্মতা গবেষণাটিকে চালিত করেছে। এই গবেষণাটি একটি যৌথ জ্ঞাননির্মাণের প্রচেষ্টা হিসাবে উল্লেখ করছি। মোট ছয়টি পর্যায়ে আমি নিজে এবং অংশগ্রহণকারীরা একটি মানসিক যৌথ প্রক্রিয়ার মধ্যে যাপন করেছি যার ফলাফল স্বরূপ এই গবেষণা সন্দর্ভ একটি আকার পেয়েছে। অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের জীবন, আত্মোপলব্ধি, আত্মজিজ্ঞাসার একটি স্রোতের মধ্যে থেকেছেন এবং তাদের কথা তাদের ভাষায় বলেছেন। নারীবাদী গবেষণা যে নৈতিক অবস্থান এবং নিজস্ব জটিলায়িত রাজনীতি নিজের মধ্যে ধারণ করে তার বিশেষত্ব হল, অংশগ্রহণকারীদের স্বরের প্রকৃতরূপের (উপ)স্থাপন।

গবেষণার পদ্ধতি হিসাবে গৃহীত হয়েছে গুণগত পদ্ধতি। গুণগত পদ্ধতির মধ্যে লাইফ হিস্ট্রী প্রকরণ ব্যবহৃত হয়েছে নমুনা সংগ্রহের জন্য। লাইফ হিস্ট্রী রিসার্চ প্রকরণ হিসাবে গ্রহণের প্রাথমিক কারণ, এই প্রকরণে একজন ব্যক্তির জীবন ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সংগ্রহ করা সম্ভব। একজন ব্যক্তির কাছে কয়েকবার বিভিন্ন সময়ে বা কিছু সময় অন্তর ফিরে গিয়ে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়, এই পদ্ধতিতে। সেক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী তাঁর বক্তব্য, অনুভূতি সুবিন্যস্ত ভাবে প্রকাশ করার অবকাশ পান। অংশগ্রহণকারীর দৈনন্দিন জীবন, কর্মব্যস্ততা পর্যবেক্ষণ করে তাঁর সঠিক অবস্থান সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা সম্ভব হয়। লাইফ হিস্ট্রী রিসার্চ একজন ব্যক্তির সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য এবং পর্যবেক্ষণের অবকাশ দেয় যা গবেষণার মূল উদ্দেশ্যের দিকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করে। প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক ছাত্রীদের সামগ্রিক শিক্ষাজীবনের চিত্র তুলে আনার জন্য লাইফ হিস্ট্রী রিসার্চ উপযুক্ত হবে বলে মনে হয়েছে। প্রতিষ্ঠান অন্তস্থ ব্যক্তি বা ব্যক্তির আত্মের ধারণা পাঠের জন্য মূলত প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ, কেস স্টাডি ইত্যাদি মেথড ব্যবহৃত হয়, তুলনামূলক ভাবে কম ব্যবহৃত আরো একটি মেথড হল এই লাইফ হিস্ট্রী রিসার্চ বা ব্যক্তির জীবন–ইতিহাস প্রকরণ যেখানে ব্যক্তির জীবন গভীর পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে পাঠ করা সম্ভব হয়। এখানে ব্যক্তির ব্যক্তিগত, নিজস্ব এবং জীবনীভিত্তিক বিষয়গুলিতে বিশেষ মনোযোগ দেবার অবকাশ তৈরি হয়। জীবনীর সঙ্গে ইতিহাস এবং সামাজিক বাস্তবতার একটি সাযুজ্য তৈরি হয় (Harrison, 2009)। বিষয়ের সামাজিক পরিস্থিতির সমাজবিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যাখ্যার পাশাপাশি তাদের ঐতিহাসিক ভাবে অবস্থান এখানে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় (Shreeya, 2018)। ব্যক্তির আত্ম এবং প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক একদিকে যেমন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার থেকে উঠে আসে তেমনি উঠে আসে জীবনী, আত্মজীবনী এবং স্মৃতিকথায়। এইগুলি থেকে বোঝা যায় 'আত্মপরিচিতি আদতে একটি প্রবহমান ধারণা', 'হয়ে ওঠার ক্রমাগত এবং ধারাবাহিক প্রক্রিয়া' (Scott, 2011) কীভাবে ব্যক্তির আচরণের নির্মাণ এবং ব্যাখ্যা তৈরি হবে বা পাঠ নেওয়া হবে, জীবন-ইতিহাস পদ্ধতি এখানে ব্যক্তির প্রেক্ষাপট বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাশ দেয় যা দেখায় কীভাবে প্রতিষ্ঠানের ভিতর ব্যক্তির অবস্থান একটি বৃহৎ পটভূমি তৈরি করে যা ব্যক্তির আত্ম-পরিচিতি নির্মাণ আত্মবোধের বিবর্তনকে সূচিত করে।

এই গবেষণায় মূলত অন্বিষ্ট একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানে (বিশ্ববিদ্যালয়, হস্টেল) ব্যক্তির "আত্ম" এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটের জটিল দ্বিপাক্ষিক সম্বন্ধ। টোটাল ইন্সটিটিউশন সম্পর্কে বহুল সমাজতাত্ত্বিক কাজ হয়েছে, গফম্যান 'অ্যাসাইলাম' (Goffman, 1961)-এ টোটাল ইন্সটিটিউশনকে তত্ত্বায়িত করেছিলেন, এথনোগ্রাফিক বর্ণনার দ্বারা ওয়াশিংটনে একটি মেন্টাল হাসপাতালে পাঠ নিয়ে। গফম্যান এই ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যে, টোটাল ইন্সটিটিউশন এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে সদস্যরা দীর্ঘসময়ের জন্য বন্দী থাকে এবং এই প্রতিষ্ঠানের মৌলিক উদ্দেশ্যই হল সদস্যদের আত্ম-পরিচিতি বদলে ফেলা (Scott, 2011)। এই প্রতিষ্ঠানগুলির প্রবণতাই হল, প্রাতিষ্ঠানিক একাগ্রতা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে দেখে এবং আবাসিকদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করে (Smith, 2006)। এখানে আবাসিকরা নিয়ম মেনে নেয়

অথবা প্রতিরোধের রাস্তা খোঁজে। পরবর্তীতে পুনর্নির্মিত প্রতিষ্ঠান বা রিইনভেন্টেড প্রতিষ্ঠানের ধারণা তৈরি হয়। যেখানে এই একপাক্ষিক নির্দেশ পালনের কাঠামো আর ক্রিয়াশীল থাকছে না, এখানে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে প্রতিনিয়ত পারস্পরিক আদানপ্রদান যার ফলে দুটি পক্ষই বিবর্তিত হচ্ছে (Scott, 2011)। বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেল এই নবনির্মিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আলোচিত হতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানে আবাসিকদের নবনির্মিত আত্মের সঙ্গে ক্রমপরিবর্তিত প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক এবং পারস্পরিকতা প্রভাব লাইফ হিস্ট্রী রিসার্চে উঠে আসার সম্ভবনা রয়েছে। এই গবেষণায় লাইফ হিস্ট্রী রিসার্চে যারা অংশগ্রহণ করেছেন, তাদের প্রত্যেকের বয়ান আলাদা। সমাজের সমস্ত নারীকে যেমন এক পঙক্তিতে আলোচনা করা যায় না। আন্তঃস্তর বিন্যাস ভিত্তিক অক্ষিকাঁচ বা  ইন্টারসেকশনাল লেন্স দিয়ে দেখলে যেমন সামাজিক ছবিগুলো উঠে আসে বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাবে তেমনি সেখানেও কোন সাধারণীকরণ সম্ভব নয়। প্রতি জনের আলাদা অভিজ্ঞতা, আলাদা বয়ান। মাইক্রো ইন্টারশেকশনাল লেন্স ব্যবহার করলে আরো অনেক বৈচিত্র্য উঠে আসে। লাইফ হিস্ট্রী স্টাডি সেখানে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেকে নিজেদের মূল্যবোধ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তাদের এই অভিজ্ঞতার বয়ান কার্যকারণ ও প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা হয়েছে এই গবেষণায়। লাইফ হিস্ট্রি রিসার্চে স্মৃতিকথার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। স্মৃতিকথার বয়ান একদিকে যেমন ব্যক্তির আন্তঃস্তর বিন্যাস ভিত্তিক অবস্থানকে চিহ্নিত করে তেমনি ক্রম রূপান্তরিত আত্মের বিবর্তন এখানে সূচিত করা সম্ভব হয়। লাইফ হিস্টি রিসার্চে স্মৃতিকথা একটি বিশেষ অবকাশের সম্ভবনা তৈরি করে। একদিকে সাক্ষাৎকার ভিত্তিক ছাত্রীদের বয়ান এবং স্মৃতিকথার ভিত্তিতে ন্যারেটিভ থেকে গবেষণার মূল লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

**নমুনা সংগ্রহ**

তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে দুটি প্রকরণ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমত, ব্যক্তিগত ও সাধারণ তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নাবলী পূরণ করানো হয়েছে। এবং অংশগ্রহণকারীদের বাস্তবতা অনুধাবন করার জন্য নিবিড় সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। ছটি পর্যায়ে তাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে লাইফ হিস্ট্রী রিসার্চ মেথডটি প্রয়োগ করা হয়েছে। নমুনা সংগ্রহের জন্য উদ্দেশ্যমূলক নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি বা পারপাসিভ স্যাম্পেলিং পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে অন্বিষ্ট বিষয়ের লক্ষ্যে উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই নমুনা সংগ্রহ করা হয়। উচ্চশিক্ষায় প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক এবং আবাসিক ছাত্রীদের অবস্থান নির্ণয় যেহেতু এই গবেষণার প্রতিপাদ্য বিষয় তাই নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে কয়েকটি শর্ত এবং সাপেক্ষতা বজায় রাখতে হয়েছে। যাতে প্রথম প্রজন্মের ছাত্রী যিনি প্রান্তিক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত এবং উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছেন, একই সঙ্গে যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে থেকে পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছেন— এই বিষয়গুলির সাপেক্ষতা পূর্ণ হয়। উচ্চশিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষ দিকের বাস্তবতা এবং পরিস্থিতি অন্বেষণ

করার ক্ষেত্রে পারপাসিভ স্যাম্পেলিং উপযুক্ত হবে বলে মনে হয়েছে। নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক সংরক্ষন (Reserved Category) এবং আর্থ-সামাজিক এই দুই দিক থেকে প্রান্তিকতাকে দেখা হয়েছে।

হস্টেলজীবন বিষয়ে বাংলা কথা সাহিত্যের যে ধারা নির্মিত হয়ে চলেছে তার মধ্যে সামাজিক বিভিন্ন স্তরের 'শিক্ষিত' এবং 'আবাসিক' নারীর স্বরের উপস্থাপন এবং প্রান্তিক স্বরের শূন্যতা কয়েকটি টেক্সটের ভিত্তিতে আলোচনা করা হয়েছে। শান্তিনিকেতনের সূচনাকালে যা উচ্চবিত্ত নারীরা হস্টেলে থেকে উচ্চশিক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন তার মধ্যে দুটো স্মৃতিকথা, রমা চক্রবর্তীর 'ভরা থাক স্মৃতিসুধায়', রাণী চন্দের 'সব হতে আপন' এবং সমসাময়িক স্মৃতিকথা অহনা বিশ্বাসের 'মেয়েদের হস্টেলজীবন; অন্দরের কথামালা', ঋতা বসুর 'শ্রীসদনের শ্রীমতীরা'— এই দুটি স্মৃতিকথার আন্তঃস্তর বিন্যাস ভিত্তিক নারীবাদী সমালোচনা করা হয়েছে। এই দুই সময়কালের স্মৃতিকথার মধ্যে 'শিক্ষিত', 'আবাসিক' নারীর স্বরের ভিন্ন উপস্থাপন আলোচনার সঙ্গে কথা-সাহিত্যের আরো একটি ধারা উপন্যাসের দুটি টেক্সট অহনা বিশ্বাসের 'আরশি নগর', তিলোত্তমা মজুমদারের 'চাঁদের গায়ে চাঁদ'-এর নারীবাদী আন্তঃস্তরবিন্যাস ভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে। উচ্চশিক্ষায় অংশ নিয়ে সমাজের বিচিত্র স্তরের নারীরা এবং বিশেষত প্রান্তিক ছাত্রীরা আবাসজীবনের শরিক হচ্ছেন, তার ছাপ ধারাবাহিকভাবে কিভাবে বাংলা কথা সাহিত্যের মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে চলেছে এই ছয়টি রচনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আলোচনা করা হয়েছে। নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যমূলক নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে।

**গবেষণার ক্ষেত্র, ক্ষেত্রসমীক্ষা এবং পরিবার পরিদর্শন**

মূলত পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তিক নারীর উচ্চশিক্ষা এই গবেষণার প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রথম প্রজন্মের ছাত্রী যারা বিভিন্ন মানদন্ডে প্রান্তিক যেমন – শ্রেণিগত, জাতিগত, লিঙ্গগত, ভৌগোলিকভাবে প্রান্তিক। বিভিন্ন অবস্থানে তাদের প্রান্তিকতা বদলে যায়। পশ্চিমবঙ্গের 'নিম্নবিত্ত' এবং 'নিম্নবর্গ' নারীশিক্ষায় এই বহুমাত্রিক প্রান্তিকতা যা প্রথম প্রজন্মের ছাত্রীদের শিক্ষাজীবনকে আকার দেয়, তার একটি খতিয়ান এই গবেষণায় করার চেষ্টা হয়েছে। এই বিষয়টি অনুধাবনের জন্য রাজ্যের দুটি প্রতিনিধিস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণার ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় - এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত প্রান্ত থেকে ছাত্রছাত্রীরা উচ্চশিক্ষার জন্য আসেন।

গবেষণায় গৃহীত দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণের ইতিহাস ও সময় আলাদা। বিশ্বভারতী নির্মিত হয়েছে স্বাধীনতার পূর্বে (১৯০৭) এবং যাদবপুর নির্মিত হয়েছে স্বাধীনতার পরে (১৯৫৫ সাল ২৪ শে ডিসেম্বর)। বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর রাজ্য সরকারের অধীনস্থ বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্বভারতী মফস্বল এলাকায় অবস্থিত এবং যাদবপুর রাজ্যের রাজধানীতে অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গের দুটি বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে সমগ্র রাজ্য থেকে ছাত্রছাত্রীরা পড়তে আসেন এবং যাদের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন দুটি অবস্থানের – এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রজন্মের ছাত্রীদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তিক ছাত্রীদের বাস্তবতা ও

পরিস্থিতি তুলে ধরা সম্ভব হবে বলে মনে হয়। যাবতীয় সমস্যা প্রতিকূলতা পেরিয়ে সংরক্ষণ ও  স্কলারশিপ ইত্যাদি পেয়ে কিছু ছাত্রী উচ্চশিক্ষায় আসতে পারে। এবং যারা পরিবারকে বোঝাতে পেরেছে যে উচ্চশিক্ষায় সে যেতে চায়। নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে যখন তারা উচ্চশিক্ষায় আসে ও হস্টেলে থাকে তাদের এই বিশ্ববিদ্যালয় জীবন তাদের কিভাবে প্রভাবিত করে ও তাদের জীবনকে নির্মাণ করে তোলে।  পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকে এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার ফলে সেইসব জায়গার পরিস্থিতি, উচ্চশিক্ষায় অংশ নেবার ক্ষেত্রে অসুবিধা ইত্যাদি চিহ্নিত করার অবকাশ তৈরি হয়েছে। সারা পশ্চিমবঙ্গ আসা প্রান্তিক ছাত্রীদের লাইফ হিস্ট্রী স্টাডির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তিক ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরা সম্ভব হিসাবে ধরা যায়।  এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের ইতিহাস, ভৌগোলিক অবস্থান, ছাত্রছাত্রীদের বৈচিত্র্য এবং জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসাবে এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিনিধিস্থানীয়।

**তালিকা ১ - গবেষণার ক্ষেত্র ও নমুনা সম্বন্ধে সাধারণ তথ্য**

| **বিশ্ববিদ্যালয়** | **নাম** | **অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা** | **ভৌগোলিক অবস্থান** |
|---|---|---|---|
| বিশ্ববিদ্যালয় এক | বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় | ৬ | বীরভূম |
| বিশ্ববিদ্যালয় দুই | যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় | ৬ | কলকাতা |

মোট বারোটি লাইফ হিস্ট্রী স্টাডি দুটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে করা হয়েছে। এছাড়াও দুটি প্রতিষ্ঠানের মোট পাঁচজন অধ্যাপক এবং দুই জন করে মোট চারজন হস্টেলের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশগ্রহণকারীদের প্রাথমিক তথ্য উল্লেখ করা হল। অংশগ্রহণকারীদের পরিবার পরিদর্শনের সময় পরিবারের এক- দুই জন সদস্যদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে এবং সাধারণ ভাবে কথা বলা হয়েছে।

**তালিকা ২ – অংশগ্রহণকারীদের প্রাথমিক তথ্য - বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।**

| **অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা** | **সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়** | **উচ্চশিক্ষার স্তর** | **জেলা** |
|---|---|---|---|
| অংশগ্রহণকারী ১ | বিশ্বভারতী | এম এ | পুরুলিয়া |
| অংশগ্রহণকারী ২ | বিশ্বভারতী | পি এইচ ডি | হুগলি |
| অংশগ্রহণকারী ৩ | বিশ্বভারতী | এম এ | পুরুলিয়া |
| অংশগ্রহণকারী ৪ | বিশ্বভারতী | পি এইচ ডি | বীরভূম |
| অংশগ্রহণকারী ৫ | বিশ্বভারতী | এম ফিল | পূর্ব বর্ধমান |
| অংশগ্রহণকারী ৬ | বিশ্বভারতী | এম এ | বাঁকুড়া |

**তালিকা ৩ -অংশগ্রহণকারীদের প্রাথমিক তথ্য - যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়**

| অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা | সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় | উচ্চশিক্ষার স্তর | জেলা |
|---|---|---|---|
| অংশগ্রহণকারী ৭ | যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় | এম ফিল | কোচবিহার |
| অংশগ্রহণকারী ৮ | যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় | এম এ | দার্জিলিং |
| অংশগ্রহণকারী ৯ | যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় | এম ফিল | মুর্শিদাবাদ |
| অংশগ্রহণকারী ১০ | যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় | এম ফিল | পশ্চিম মেদিনীপুর |
| অংশগ্রহণকারী ১১ | যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় | পি এইচ ডি | বীরভূম |
| অংশগ্রহণকারী ১২ | যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় | এম এ | দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা |

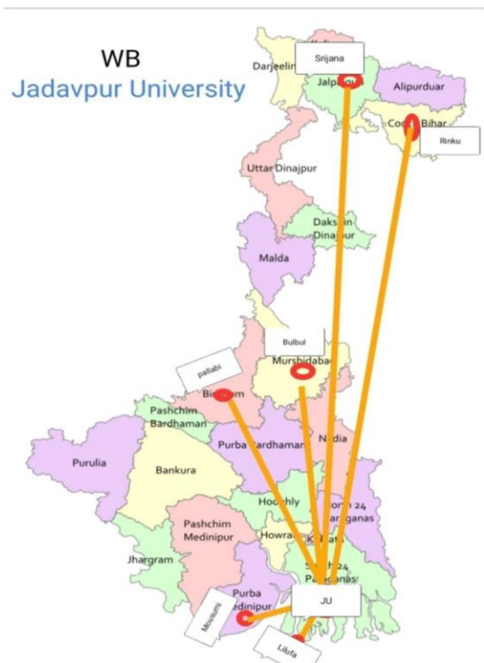

মানচিত্র -১ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশগ্রহণকারীদের বাসস্থান থেকে উচ্চশিক্ষার সূত্রে স্থানান্তর চিহ্নিত করা হল।

মানচিত্র -২ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশগ্রহণকারীদের বাসস্থান থেকে উচ্চশিক্ষাসূত্রে স্থানান্তর চিহ্নিত করা হল।

মানচিত্র – ৩ ভারতের প্রেক্ষিতে দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান চিহ্নিত হল।

গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের ব্যক্তিগত পরিচয় গোপন রাখার জন্য এখানে তাদের 'অংশগ্রহণকারী' হিসাবে উল্লেখ করা হল এবং পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আলোচনার ক্ষেত্রে কাল্পনিক নাম ব্যবহার করা হবে। ক্ষেত্রসমীক্ষার মোট সময় নির্ধারিত ছিল তিনবছর, তিনবছরের মধ্যে ছটি পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার সম্পন্ন হয়েছে। প্রথম পর্যায় – সাধারণ তথ্যাবলী সংগ্রহ। এই পর্যায়ে উদ্দেশ্যমূলক নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি হয়। এরপর তাদের সঙ্গে প্রাথমিক আলাপচারিতা করি, গবেষণার বিষয়বস্তু জানাই এবং তাদের সম্মতিক্রমে একটি প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তাদের বিষয়ে সাধারণ তথ্য সংগ্রহ করি। এই পর্যায়টি সম্পন্ন হয় প্রথম চার মাসের মধ্যে। উদ্দেশ্যমূলক নমুনা সংগ্রহের কারণে অংশগ্রহণকারীদের সন্ধান পেতে এবং যোগাযোগ করতে বেশ কিছুটা সময় লেগেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে এই গবেষণা বিষয়ে তাদের প্রশ্ন, আগ্রহ এবং কৌতুহলের বিশদে উত্তর দিই এবং অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে নিবিড় ভাবে পরিচিত হই। এবং এই পর্যায়ের মূল লক্ষ্য ছিল অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে সখ্য গড়ে তোলা, যাতে তাঁরা তাদের কথা বলতে সংকোচ বোধ না করেন। সঙ্গে অসংগঠিত ভাবে তথ্যসংগ্রহ প্রক্রিয়া চালু ছিল। প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা ভাবে কথোপকথন সম্পাদিত হয়েছে। অংশগ্রহণকারীরা ছাত্র এবং গবেষক, তাঁদের সময় এবং অবসর অনুযায়ী কথোপকথনের সময়, দিন নির্বাচন করে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়েছে। পরবর্তী ছয়মাসে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজটি সম্পন্ন হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে সাবলীলভাবে সাক্ষাৎকার সম্পন্ন হয়। অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা দ্বিধা, সংকোচ ছাড়া বলেছেন এই পর্যায় থেকে। চতুর্থ পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের হস্টেলে তাদের সাক্ষাৎকার হয়, সঙ্গে তাদের হস্টেলের পরিবেশ, পরিকাঠামো ইত্যাদিও পর্যবেক্ষণের আওতায় আসে। পঞ্চম পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের বাড়ীতে যাই, সেখানে তাদের সঙ্গে এবং

তাদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলি। তাদের পারিবারিক, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং পরিবারে অংশগ্রহণকারীর অবস্থান পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়। ষষ্ঠ পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। এই ছটি পর্যায় ধারাবাহিক ভাবে তিন বছর ধরে চলে। মাঝখানে কোভিড মহামারী শুরু হওয়ায় কিছু কথোপকথন ফোনে হয়েছে, তবে মূলত কোভিডের আগে দেড় বছর এবং কোভিড পরবর্তীতে দেড় বছর, মোট তিন বছর ক্ষেত্রসমীক্ষা করা হয়েছে।

শান্তিনিকেতন একটি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাম। একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র কড়ে গড়ে উঠেছে একটি বিস্তৃত জনপদ। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন ভিন্ন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ বিষয়ে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী হিসাবে বিশ্বভারতীর যাবতীয় প্রাথমিক তথ্য আমার অবগত ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়জন ছাত্রী যাঁরা উচ্চশিক্ষায় নিয়োজিত রয়েছেন তাঁদের সঙ্গে ছয়টি পর্যায়ে সাক্ষাৎকার হয়েছে। তাঁরা স্নাতকোত্তর, এম ফিল এবং পি এইচ ডি তে নিয়োজিত রয়েছেন। অংশগ্রহণকারীরা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ছড়িয়ে থাকা ছাত্রীনিবাসগুলির আবাসিকা। তিনজন ছাত্রী বিশ্বভারতীর প্রথম মেয়েদের হস্টেল শ্রীসদনের আবাসিকা। শ্রীসদন হস্টেল সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। একজন অংশগ্রহণকারী প্রতিমা ছাত্রীনিবাসের[১২] আবাসিকা, দুইজন আম্রপালী[১৩] ছাত্রীনিবাসের আবাসিকা তাঁদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে, আশ্রম মাঠে, হস্টেলের বারান্দায়, ক্যান্টিনে সাক্ষাৎকার হয়েছে। তাঁরা তাদের ব্যস্ত দৈনন্দিনের ভিতরে সময় বের করে কথা বলেছেন। দীর্ঘসময় ধরে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁদের কোনো উৎসব অনুষ্ঠান আয়োজিত হলে সেখানে আমাকে নিয়ে গেছেন। দু হাজার উনিশ সালের মার্চ মাস। তখন খেজুরডাঙায় শালের নতুন পাতা গজানো উপলক্ষে বাহাপরব আয়োজিত হয়েছিল। আম্রপালী হস্টেলের দুই ছাত্রী এই উৎসবে যোগ দেয় এবং আমন্ত্রণ জানায়। তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ছাড়াও অন্যান্য কাজের মধ্যে তাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার এবং পর্যবেক্ষণের অবকাশ হয়েছে। নারীবাদী গবেষণা সেই উন্মুক্ত পরিসর দেয় যেখানে একটি সাধারণ পটভূমিতে আদানপ্রদানের অবকাশ তৈরি হয়। নারীবাদী গবেষণা পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি উপশমের পরিসর তৈরি করে। অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে গবেষকের 'অ্যাকাডেমিক দূরত্ব' একটি অত্যন্ত জটিল বিষয়। নারীবাদী আন্তঃবিন্যাস ভিত্তিক গবেষণায় একটি সম্ভবনা রয়েছে পারস্পরিকতা নির্মাণের। এই পরিসরে অংশগ্রহণকারী এবং গবেষকের অবস্থানগত দূরত্ব কিছুটা হলেও অতিক্রম করা সম্ভব হয়। তথ্যসংগ্রহ এখানে শুধুমাত্র নৈবর্ক্তিক থাকে না, পরস্পর ব্যক্তি হিসাবে প্রতিভাত হয়। বিশ্বভারতী ক্যাম্পাসে ছাত্রীরা ক্লাস, কাজের দিনের মধ্যে এবং ছুটির দিন সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাম্পাসে, ক্যান্টিনে এবং শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়েছে। বেশ কয়েকটি পর্যায়ে

---

[১২] প্রতিমা ছাত্রীনিবাস - প্রতিষ্ঠা- ২০০৫।

[১৩] আম্রপালী ছাত্রীনিবাস - প্রতিষ্ঠা-২০১৫।

সাক্ষাৎকারগুলি সম্পন্ন হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার পরিসরে তাঁদের অভিজ্ঞতা তাঁরা বলেছেন। তাঁদের পরিবারের কথা, শৈশব থেকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে তাঁদের বেড়ে ওঠা এবং উচ্চশিক্ষায় পদার্পণ, যাতায়াতের অভিজ্ঞতা তাঁরা বলেছেন। সাধারণ তথ্যের জন্য প্রশ্নাবলি এবং অর্ধ -সংগঠিত সাক্ষাৎকারের জন্য প্রশ্নাবলী ব্যবহৃত হয়েছে।

অংশগ্রহণকারীদের বাড়ি এবং এলাকা পরিদর্শন করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারী এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা গবেষণার জন্য যাবতীয় সহায়তা করেছেন। বাড়ি পরিদর্শনের ছবি আলোচনার সঙ্গে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে সংযোজিত হয়েছে। পারিবারের সদস্যদের সাক্ষাৎকার এবং পরিবার পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা আলোচনায় সংযোজিত হয়েছে। বিশ্বভারতীর অংশগ্রহণকারীদের ক্ষেত্রে বড়পুকুরডাঙা, শ্যামপুর, সিউড়ী, তাঁতিপাড়া, সিয়ান এলাকায় তাঁদের পরিবার পরিদর্শন করে, পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে অংশগ্রহণকারীদের বাস্তবতা এবং অবস্থান সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ সম্ভব হয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বারুইপুর, মুর্শিদাবাদ, খড়গপুর এলাকায় পরিবার পরিদর্শন করা হয়েছে।

**তালিকা ৪ - ক্ষেত্রসমীক্ষা এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণ বিষয়ক তথ্য**

| **বিশ্ববিদ্যালয়** | **অংশগ্রহণকারী** | **সাক্ষাৎকারের সংখ্যা** | **সাক্ষাৎকারের সময় (ঘন্টা)** | **সাক্ষাৎকারের মোট সময় (ঘন্টা)** | **সাক্ষাৎকারের স্থান** | **প্রতিটি পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতি** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **বিশ্বভারতী** | ১ | ৬ | ২ | ১২ | ক্যাম্পাস, শ্রীসদন ছাত্রীনিবাস, বাড়ি। | উপস্থিত |
| | ২ | ৬ | ২ | ১২ | শ্রীসদন ছাত্রীনিবাস, বাড়ি, ক্যান্টিন। | উপস্থিত |
| | ৩ | ৬ | ২ | ১২ | আশ্রমমাঠ, শ্রীসদন ছাত্রীনিবাস, বাড়ি। | উপস্থিত |
| | ৪ | ৬ | ২ | ১২ | প্রতিমা হস্টেল, বাড়ি, চৈত্য, চায়ের দোকান, গাছতলা। | উপস্থিত |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ৫ | ৬ | ২ | ১২ | আম্রপালী হস্টেল, বাড়ি, অতিথিশালা, আশ্রমমাঠ, বেদী। | উপস্থিত |
| | ৬ | ৬ | ২ | ১২ | আম্রপালী হস্টেল, বাড়ি, চায়ের দোকান, গাছতলা। | উপস্থিত |
| **যাদবপুর** | ৭ | ৬ | ২ | ১২ | ক্যাম্পাস, হস্টেল, বাড়ী, কফিশপ। | উপস্থিত |
| | ৮ | ৬ | ২ | ১২ | ক্যাম্পাস, ক্যান্টিন, হস্টেল। | উপস্থিত |
| | ৯ | ৬ | ২ | ১২ | হস্টেল, ক্যাম্পাস, চায়ের দোকান। | উপস্থিত |
| | ১০ | ৬ | ২ | ১২ | ক্যাম্পাস, হস্টেল, বাড়ি। | উপস্থিত |
| | ১১ | ৬ | ২ | ১২ | ক্যাম্পাস, হস্টেল, কফিশপ। | উপস্থিত |
| | ১২ | ৬ | ২ | ১২ | ক্যাম্পাস, হস্টেল, বাড়ি। | উপস্থিত |

দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচজন অধ্যাপক, শিক্ষক এবং চারজন হস্টেলের দায়িত্বপ্রাপ্তের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন অধ্যাপক যাঁরা প্রথম প্রজন্মের ছাত্র ছিলেন এবং অধ্যাপক পদে উন্নীত হয়েছেন, তাঁদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। প্রথম প্রজন্মের ছাত্র হিসাবে তাঁদের অভিজ্ঞতা এবং

পরবর্তীতে অধ্যাপক হিসাবে প্রথম প্রজন্মের ছাত্রদের পড়ানোর অভিজ্ঞতা তাঁরা বিশদে বলেছেন। এছাড়াও বিশ্বভারতীর স্কুল পাঠভবনের দুজন শিক্ষকের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে যেখানে তাঁরা মূলত প্রথম প্রজন্মের ছাত্রদের পড়ানোর অভিজ্ঞতা বলেছেন। এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন করে মোট চারজন হস্টেলের চারপ্রাপ্তের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে, তাঁরা তাদের দীর্ঘ কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন, আবাসিকা ছাত্রীদের কথা, ছাত্রীদের তত্ত্বাবধানের অভিজ্ঞতা। কর্তৃপক্ষ এবং আবাসিকাদের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা জানিয়েছেন।

**অধ্যায় বিভাজন**

বিষয়টি আলোচনার জন্য গবেষণা সন্দর্ভটি কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত হয়েছে।

**ভূমিকা** - গবেষণার বিষয় এবং পটভূমি এই অধ্যায়ের উপজীব্য। ভূমিকা অংশটি পাঁচটি উপবিভাগে পরিকল্পিত হয়েছে। উচ্চশিক্ষায় প্রান্তিকতার বহুমাত্রা এবং 'প্রথম প্রজন্ম' বিষয়টি আলোচনার পর সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিদ্যমান ও পূর্ববর্তী সূত্র (লিটেরেচার রিভিউ), অতঃপর, এই গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রতিপাদ্য বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। এই অংশে মূলত গবেষণার বিষয়টির প্রেক্ষাপট এবং বিষয়টি সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসার কারণ আলোচিত হয়েছে। পরবর্তীতে গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতি ও প্রকরণ আলোচিত হয়েছে। গবেষণার জন্য গৃহীত লাইফ হিস্ট্রি মেথডের উপযোগিতা আলোচিত হয়েছে। পরিশেষে, এই গবেষণা উপস্থাপনের জন্য সন্দর্ভটি কি কি অধ্যায়ে বিভক্ত হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

**প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম "স্বদেশি শিক্ষার পুনর্গঠনকালে সামাজিক ও লিঙ্গসাম্য : বিশ্বভারতী এবং যাদবপুর বিশ্ববদ্যালয়ের সূচনাপর্ব"।** এই অধ্যায়ে মূলত এই গবেষণার প্রেক্ষাপট আলোচিত হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসনের পরবর্তীকালে স্বদেশি শিক্ষার পুনর্গঠনকালে সংশ্লিষ্ট দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ এবং সঞ্চারের ইতিবৃত্ত এই অধ্যায়ের মূখ্য বিষয়। রবীন্দ্রশিক্ষাচিন্তা প্রসূত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসাবে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বদেশী শিক্ষার পুনর্নির্মাণে সহায়ক হয়ে ওঠা এবং রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে বিশ্বভারতীতে নারী শিক্ষার নান্দীপাঠ - এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এই অধ্যায় কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথমত, আলোচিত হয়েছে ঔপনিবেশিক শাসনের পরবর্তীকালে জাতিগঠনের উদ্দেশ্যে স্বদেশি শিক্ষার পুনর্গঠন। দ্বিতীয়ত, বর্ণিত হয়েছে কিভাবে ব্যক্তির সার্বিক বিকাশের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন ও ভাবনাচিন্তা, বিশ্বভারতী নির্মাণ, যা সমান্তরালে স্বদেশী শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তিস্থাপন করেছিল। তৃতীয়ত, বিশ্লেষিত হয়েছে কিভাবে বিশ্বভারতীতে নারীর উচ্চশিক্ষা ও মেয়েদের প্রথম হস্টেল 'শ্রীসদন' নির্মাণ স্বদেশী নারী শিক্ষাকে একটি বিশেষ রূপ দিয়েছিল। পরবর্তী অংশে আলোচিত হয়েছে কিভাবে পরাধীন ভারত থেকে স্বদেশী শিক্ষাচিন্তার সূত্র জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হবার পর ভারতীয় শিক্ষাচিন্তাবিদদের অক্লান্ত বৌদ্ধিক শ্রমে শেষ অবধি অবয়ব পেয়েছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের মাধ্যমে। এই অধ্যায়ে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে জাতির সমৃদ্ধির জন্য স্বদেশী শিক্ষার পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্র

হিসাবে আলোচ্য দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গড়ে ওঠার পটভূমি এবং এই পরিসরে নিম্নবর্গের নারীর প্রবেশের প্রেক্ষাপট বিধৃত হয়েছে।

**দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম "গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের সার্বিক তথ্যের রেখাচিত্র"।** এই অধ্যায় মূলত সংগৃহীত নমুনার পরিমাণগত তথ্য বিশ্লেষণ। যে তথ্যগুলি একজন অংশগ্রহণকারীর আর্থ–সামাজিক অবস্থান ও গড়ে ওঠা চিহ্নিত করে এবং একজন ব্যক্তি হিসাবে বুঝতে সহায়তা করে, আটটি তালিকায় তিনটি পর্যায়ে তথ্যগুলি পরিবেশিত হয়েছে - সাধারন তথ্য, পারিবারিক ও সামাজিক পরিস্থিতি কেন্দ্রিক তথ্য, বিশ্ববিদ্যালয় ও হস্টেল সংক্রান্ত তথ্য।

**তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম "উচ্চশিক্ষায় প্রথম প্রজন্মের আবাসিক ছাত্রীদের অভিজ্ঞতার বিশেষত্ব এবং নবনির্মিত আত্মবোধের বিন্যাস"।** অধ্যায়ে পরিবার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হওয়া পর্যন্ত প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক ছাত্রীরা কি ধরনের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হন, আলোচিত হয়েছে। এই অধ্যায়টি ছয়টি ভাগে পরিকল্পিত হয়েছে। নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক স্তরে পরিবারের মধ্যে একজন ব্যক্তি হিসাবে এই ছাত্রীরা কিভাবে বেড়ে ওঠেন, কি ধরনের সমস্যা এবং সংকটের সম্মুখীন হন, সংশ্লিষ্ট সমাজে, পাড়ায়, পরিবারে তাদের লিঙ্গবৈষম্যের অভিজ্ঞতা এবং নিজের এলাকা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা সূত্রে তাদের স্থানান্তরের বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে। পরবর্তী অংশে পরিবার এবং হস্টেল পরিসর হিসাবে এই ছাত্রীদের জীবনে, মানসে কি ধরনের প্রভাব ফেলে, তাদের লক্ষ্য ও সম্ভবনা পূরণে এই পরিসর কিভাবে সহযোগী ভূমিকা নেয় এবং আবাসিক পরিসর কিভাবে তাদের নিজস্ব পরিসর হয়ে উঠেছে বিশ্লেষিত হয়েছে। উচ্চশিক্ষার পরিসরে তাদের নবনির্মিত আত্মবোধের তৈরি হয়ে ওঠা এবং তৎসম্পর্কিত সংকট আলোচিত হয়েছে। সাংবিধানিক সংরক্ষণের হাত ধরে 'প্রদত্ত বাস্তবতা' থেকে কিভাবে উচ্চশিক্ষার হাত ধরে এই ছাত্রীরা 'অর্জিত বাস্তবতা'র স্বপ্ন দেখে মূলত এই বিষয়টি তৃতীয় অধ্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে কয়েকটি বিষয়ের আলোকে আলোচিত হয়েছে।

**চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম "বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে প্রথম প্রজন্মের ছাত্রীদের ক্ষমতায়নের লড়াই : প্রান্তিক অবস্থান এবং প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য"।** প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক স্তর বিভাজন প্রসূত ক্ষমতা সম্পর্কের সঙ্গে অংশগ্রহণকারী প্রান্তিক ছাত্রীদের আন্তঃসম্পর্ক এই অধ্যায়ের মূল বিষয়বস্তু। অধ্যায়টি কয়েকটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। উচ্চশিক্ষা পরিসর প্রান্তিক ছাত্রীদের ক্ষমতায়নে কিভাবে সদর্থক ভুমিকা নেয় বিশ্লেষিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় তাদের এগিয়ে যাবার দিশা দেখিয়েছে, নিজের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, আত্ম-সম্মান, আত্ম-মর্যাদা নির্মাণে সহায়ক ভুমিকা পালন করেছে। পরবর্তী অংশে আলোচিত হয়েছে, প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে সমস্যা। উচ্চশিক্ষা পরিসরে আত্ম -পরিচিতির সংকট, শিক্ষাক্ষেত্রে বিরতি নেবার কারণ, ভাষাগত সমস্যা, বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে জাতি, জাতিহীনতা এবং বিচ্ছিন্নতার সমস্যা, বর্জনের নৈশঃব্দ এবং নীরবতা এবং আনুগত্যের রাজনীতি, মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যা, 'উঁচু' এবং 'নীচু' সংস্কৃতি এবং

সাংস্কৃতিক আধিপত্যের সমস্যা, সাংস্কৃতিক মুলধনের অভাবজনিত সমস্যা আলোচিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হস্টেল এবং আবাসিকাদের সম্বন্ধে সামাজিক সাংস্কৃতিক নির্মাণ বিধৃত হয়েছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে মূলত হস্টেল কিভাবে প্রান্তিক ছাত্রীদের নিজস্ব পরিসর হয়ে ওঠে এবং নবনির্মিত আত্মবোধের আধার হয়ে ওঠে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে, এই অধ্যায়ে হস্টেলের মধ্যে কিভাবে বৈষম্যপূর্ণ নিয়মাবলী অনুশীলন করা হয় এবং মেয়েদের হস্টেল সম্পর্কে সামাজিক সাংস্কৃতিক নির্মাণ আলোচিত হয়েছে। এই অধ্যায়ের মূল প্রতিপাদ্য হল উচ্চশিক্ষা সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিষ্ঠান ও পরিসর হিসাবে বৈশিষ্ট্য, সামাজিক সাংস্কৃতিক নির্মাণ এবং প্রতিষ্ঠান গুলিতে চর্চিত লিঙ্গ, জাতি ও আর্থসামাজিক বৈষম্যের মধ্যে প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক ছাত্রীদের অবস্থান। উচ্চশিক্ষা, হস্টেলে বসবাসের ব্যবস্থা এবং বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে প্রাপ্ত রিসোর্স তাদের জীবন গঠনে কিভাবে সদর্থক ভুমিকা নেয় পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় ও হস্টেল পরিসরে কিভাবে প্রাতিষ্ঠানিক এবং কাঠামোগত ভাবে লিঙ্গ এবং জাতি বৈষম্যপূর্ণ নিয়মাবলী চর্চা করে থাকে আলোচিত হয়েছে। প্রথম প্রজন্মের ছাত্রীরা কিভাবে এই বৈষম্যের শিকার হয়, কারণ আর্থিক অবস্থা এবং দূরত্বের ভিত্তিতে দেওয়া হয় হস্টেল তারফলে বেশির ভাগ আবাসিক... পিছিয়ে পড়া শ্রেণির, প্রত্যেকে প্রথম প্রজন্মের না হলেও এলাকাগত দিক থেকে প্রান্তিক। মেস পিজিগুলো বৈষম্যমূলক নিয়ম দ্বারা চালিত হয়। এই নানাবিধ বৈষম্যের বিরুদ্ধে সারা ভারত জুড়ে 'পিঞ্জড়া তোড়' আন্দোলন শুরু হয়েছে বিগত পাঁচ-ছয় বছর ধরে। বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক ছাত্রীরা কি ধরনের মনস্তাত্ত্বিক, মানসিক এবং ব্যবহারিক অসুবিধা ভোগ করেন অংশগ্রহণকারীদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে আলোচিত হয়েছে। পরবর্তী অংশে বিশ্লেষিত হয়েছে প্রান্তিক ছাত্রীদের স্ব- প্রণোদিত ব্যক্তিগত সংগ্রাম ও 'ভিতরের ক্ষমতা' কে জাগিয়ে তো তোলার মাধ্যমে ক্ষমতায়ন আকার নেওয়ার প্রক্রিয়া। অংশগ্রহণকারীদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এই অধ্যায়ে উচ্চশিক্ষা পরিসরে প্রান্তিক ছাত্রীদের প্রতিকুলতা এবং এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায়নের অভিমুখে যাত্রায় আলোকপাত করা হয়েছে।

**পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম "হস্টেলজীবন কেন্দ্রিক বাংলা কথা-সাহিত্যে আবাসিক ছাত্রীর উপস্থাপন : একটি আন্তঃ স্তরবিন্যাস ভিত্তিক পাঠ"** এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে বাংলা সাহিত্যে আবাসজীবনের ধারাবাহিক উপস্থাপনা ও হস্টেলজীবন কেন্দ্রিক সাহিত্য। আলোচনার সুবিধার্থে এই অধ্যায় কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথমত, বাংলা কথা সাহিত্যে নতুন একটি প্রবণতা ধীরে ধীরে পরিলক্ষিত হচ্ছে, একটি নতুন সংরূপ – হস্টেল জীবন কেন্দ্রিক সাহিত্যে নির্মিত হয়ে চলেছে – প্রেক্ষাপট সহ একটি স্বতন্ত্র গোত্র প্রস্তাবিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিকে দেখা দিচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবাসজীবন। হস্টেল জীবন সম্বন্ধে রচিত হয়েছে এবং হয়ে চলেছে উপন্যাস, আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা। আবাসিক নারী আন্তঃস্তরবিন্যাসের ভিত্তিতে কিভাবে উপস্থাপিত হয়েছে – এই অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য। দ্বিতীয় অংশে বিশ্লেষিত হয়েছে বিশ্বভারতীর প্রথম মেয়েদের হস্টেল শ্রীসদনের 'উচ্চবিত্ত' আবাসিকারর দুটি স্মৃতিকথা। শান্তিনিকেতনের সূচনাকালে রবীন্দ্র

সান্নিধ্যে আবাসজীবন যাপন করেছিলেন রাণী চন্দ, রমা চক্রবর্তী প্রমুখ। তাঁদের শ্রীসদনে আবাসজীবনের স্মৃতিকথা বিধৃত হয়েছে। তৃতীয় অংশে আলোচিত হয়েছে বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হস্টেল জীবন, নারী ও পুরুষ আবাসিকের উপস্থাপনের তারতম্য, সমাজের বিভিন্ন অবস্থানের নারীর আবাসজীবনের অভিজ্ঞতা ও সাহিত্যে তার প্রতিফলন, কিভাবে সামাজিক অবস্থান অনুসারে বদলে যায় স্মৃতিকথার বয়ান। কথা সাহিত্যের মূলত দুটি শাখা উপন্যাস এবং স্মৃতিকথায় উপস্থাপিত মেয়েদের আবাসজীবন সমসাময়িক দুটি উপন্যাস এবং দুটি স্মৃতিকথা অবলম্বনে আলোচিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে প্রান্তিক নারীর অংশগ্রহণের সমান্তরালে আবাসজীবন কেন্দ্রিক কথা সাহিত্যে প্রান্তিক নারীর স্বরের নৈঃশব্দ এবং সমাজের ভিন্ন অবস্থানের নারীদের দ্বারা প্রান্তিক নারীর উপস্থাপন এই অধ্যায়ের মূখ্য বিষয়।

**উপসংহারে** এই গবেষণা সম্পর্কে সামগ্রিক যুক্তিপরম্পরা, ক্ষেত্রসমীক্ষাকালীন সংকট, পলিশি নির্মাণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের পরামর্শ, গবেষণার ত্রুটি বিচ্যুতি এবং পরবর্তী সম্ভবনা উল্লেখ করা হয়েছে। পরিশেষে সংযোজিত হয়েছে সহায়ক **গ্রন্থপঞ্জি।**

## প্রথম অধ্যায়

## স্বদেশি শিক্ষার পুনর্গঠনকালে সামাজিক ন্যায় ও লিঙ্গ সাম্য : বিশ্বভারতী এবং যাদবপুর বিশ্ববদ্যালয়ের সূচনাপর্ব

# স্বদেশি শিক্ষার পুনর্গঠনকালে সামাজিক ন্যায় ও লিঙ্গসাম্য : বিশ্বভারতী এবং যাদবপুর বিশ্ববদ্যালয়ের সূচনাপর্ব

"ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত
দেবালয়ে মন্দিরের দ্বারে
পূজা ব্যবসায়ী ওদের ঠেকিয়ে রাখে" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।[১]

এদেশে নারীশিক্ষার বন্ধুর পথ ও নানা সংকট পেরিয়ে আমাদের আজকের নারীশিক্ষার ক্রম সাবলীল উত্তরণ। ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা প্রসূত শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা থেকে বিকল্প এবং স্বদেশী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রক্রিয়া স্বাধীনতার পূর্বেই শুরু হয়েছিল স্বাধীনতা পরবর্তী কালে এই উদ্যোগ জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন, বিভিন্ন কমিশন ও পলিশি নির্মাণের ধারাবাহিকতায় পল্লবিত হতে শুরু করে। স্বদেশি শিক্ষা গঠনের মধ্যে নিহিত ছিল দেশীয় শিক্ষার প্রসার, নারী শিক্ষা এবং সমাজের সব স্তরের মানুষের শিক্ষায় অংশগ্রহণ। দেশ জুড়ে স্বদেশি শিক্ষা পুনর্গঠনের উদ্যোগ নানা ভাবে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে যার ঢেউ এসে লেগেছিল বাংলাতেও। একদিকে উনিশ শতকের রক্ষণশীলতার নিগড় পেরিয়ে বিশ শতকের গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ নারীশিক্ষার যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং বাস্তবায়নের সমুহ প্রচেষ্টা করেছিলেন তা সেকালে নারী স্বাধীনতা ও নারী প্রগতিশীলতাকে এগিয়ে দিয়েছিল বেশ কয়েকধাপ। মেয়েদের শিক্ষার সূচনা পর্বের রবীন্দ্রনাথের ভুমিকা ছিল তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দুইদিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে তিনি যেমন ভেবেছেন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার বিপরীতে বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থার কথা তেমনি নারীশিক্ষার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা সেইসময় মেয়েদের শিক্ষার জন্য তখনো তেমন উদ্যোগ গড়ে তোলে নি। এদিকে বিশ্বভারতীতেও আশ্রমবিদ্যালয়ের সূচনাকালেই মেয়েদের শিক্ষার পরিসর গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। তারপর বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে আশ্রম বিদ্যালয়ে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে মেয়েদের জন্য শিক্ষার নিজস্ব বয়ান, প্রথম মেয়েদের হস্টেল শ্রীসদন। এখন প্রশ্ন, স্বদেশি শিক্ষার পুনর্গঠন কি আর্থ-সামাজিক সব স্তরের স্বর উপস্থাপনের জন্য পর্যাপ্ত ছিল? 'স্বদেশ' শব্দটি কিভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে যখন স্বদেশি শিক্ষার পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, এই 'স্বদেশ' এর কেন্দ্র ছিল মূলত উচ্চবর্ণের পুরুষ। সেখানে নারীরা যাদের এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করার কথা আসছে পরবর্তীকালে, এই স্বদেশি যুগে পুনর্গঠিত শিক্ষায় নারীদের খাপ খাওয়াতে লড়াই করতে হয়েছে, এই কাঠামো যেহেতু উচ্চবর্ণের পুরুষদের জন্য মূলত নির্মিত ছিল, সেখানে নিম্নবর্ণের পুরুষ এবং নিম্নবর্ণের নারীদের খাপ খাওয়াতে হয়েছে। স্বদেশি শিক্ষার পর সংরক্ষণ এবং মণ্ডল কমিশন এই দীর্ঘ সময় ধরে

[১] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৯৩৬) 'ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত', পত্রপূট কাব্য, পত্রপূট কাব্যের ১৫ নাম্বার কবিতা, রবীন্দ্র – রচনাবলী দশম খন্ড, পৃ – ১২৬, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা।

অন্তর্ভুক্তি হয়েছে। স্বদেশি শিক্ষার পুনর্গঠন আদপে আংশিক। যার ধারাবাহিকতা এখনও চলছে রূপান্তরের মাধ্যমে। এই পুনর্গঠেনের অংশ হিসাবে ধারবাহিকতায় গড়ে ওঠে গবেষণায় গৃহীত দুটি বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতী এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় যারা সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের। দুটিই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় তবে বৈশিষ্ট্যগত ভাবে ভিন্ন। ছাত্র আন্দোলনের শক্তি যাদবপুরে অনেক বেশি। একটা বহুমুখী ক্যাম্পাস। হোক কলরবের মত আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা যায়। পিঙ্গরা তোড় আন্দোলনের ঢেউ যাদবপুরে এসে পৌঁছলেও বিশ্বভারতীতে এসে পৌঁছয়নি। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে এখানে সচেতনতা এবং আলাপ আলোচনা বিশদে রয়েছে। যেভাবে ছাত্র আন্দোলনের ঢেউ যাদবপুরের ক্যাম্পাসকে আন্দোলিত করে, সেভাবে বিশ্বভারতীতে এসে পৌঁছয় না।

এই অধ্যায়ের মূল প্রশ্ন হল, স্বদেশি শিক্ষার পুনর্গঠন, স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের সূচনাপর্বে রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শ ও তাঁর উদ্যোগের সমান্তরালে কোন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আলোচ্য দুটি বিশ্ববিদ্যালয় নির্মিত হল? এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিম্নবর্গের শিক্ষাগ্রহণে অন্তর্ভুক্তির প্রেক্ষাপট কি? এবং এই অধ্যায়ের মূল যুক্তি পরম্পরা হল— প্রথমত, স্বদেশী শিক্ষার পুনর্গঠনে নারী শিক্ষা ও নিম্নবর্গের অন্তর্ভুক্তির জন্য সংরক্ষণ অবধি অপেক্ষা করতে হয়েছে এবং মসৃণ হবার প্রক্রিয়া এখনও চলছে। এই 'স্বদেশী শিক্ষা'র পরিকাঠামোয় 'উচ্চবিত্ত পুরুষ'-এর পর একে একে পর্যায়ক্রমে নারী এবং নিম্নবর্গ এবং সর্বশেষে নিম্নবর্গের নারীর অন্তভুক্তি— এই স্তরীভূত ধাবাবাহিকতা বর্ণাশ্রমপ্রসূত ক্ষমতা সম্পর্কের একটি ক্ষয়িষ্ণু রূপ। স্বদেশি শিক্ষার পুনর্গঠনের মধ্যে প্রান্তিক নারীর স্বর তুলে আনার আয়োজন থাকলেও ফলপ্রসূ প্রভাব দেখা যায় নি, পরবর্তীতে আরেকদফা সংরক্ষণ এবং সংস্কারের পরে এই প্রতিনিধিত্ব ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে, কিন্তু এই পরিসর গণতান্ত্রিক হয়ে উঠতে এবং প্রান্তিক স্বরের 'নিজস্ব' পরিসর হয়ে ওঠা সম্ভব হয় নি। তার জন্য পুনর্গঠন, সংস্কার পেরিয়ে রূপান্তরের দাবী করে। এখানে মূলত স্বদেশি শিক্ষার পুনর্গঠনকালীন পরিস্থিতি এবং দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই উদ্যোগে ভূমিকা এবং প্রতিফলন আলোচনা করা হয়েছে। নারীশিক্ষায়, আবাসজীবনের নির্মাণে এবং বহুস্বরের গ্রহণযোগ্যতায় এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধিস্থানীয় ভূমিকা নিলেও প্রান্তিক স্বর কি এখানে যথোপযুক্ত অবস্থান পেয়েছে?

এই গবেষণা সন্দর্ভে মূলত আলোচিত হয়েছে কিভাবে স্বদেশি শিক্ষার পুনর্গঠন প্রকল্পের মধ্যে বিশ্বভারতী এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। নারীশিক্ষার প্রথম যুগে মেয়েদের শিক্ষার পরিসর গড়ে ওঠা, মেয়েদের স্কুল নির্মাণের পাশাপাশি নানা প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে মেয়েদের প্রথম হস্টেল নির্মাণ ও তৎকালীন সমাজে তার প্রভাব আলোচিত হয়েছে। আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রথমযুগে যে নারী শিক্ষার্থীরা শিক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন এবং যাঁরা মেয়েদের হস্টেলের দায়িত্বে ছিলেন তাঁদের অভিজ্ঞতা ও স্মৃতিচারণ আমাদের বুঝতে সাহায্য করে সেযুগের নারীশিক্ষা সুত্রপাতের প্রকৃত স্পন্দন। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠা করলেন বিশ্বভারতী এবং পরবর্তীতে স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই শুরু হওয়া উদ্যোগগুলিতে কীভাবে

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠল, কোন ধারাবাহিকতায় আজকের নতুন এডুকেশন পলিশির নির্মাণ এবং দীর্ঘপথ বেয়ে ভারতীয় শিক্ষা বিবর্তিত হওয়ার পর লিঙ্গসাম্য এবং সামাজিক সাম্যের প্রশ্নে বিশ্ববিদ্যালয় দুটির বর্তমান অবস্থান এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। ঔপনিবেশিক শিক্ষার সমালোচনা ও স্বদেশি শিক্ষার সূত্রপাত হিসাবে দুটি বিশ্ববিদ্যালয়, স্বদেশী শিক্ষার পুনর্নির্মাণে গঠিত কমিশন, পলিশি ও সাংবিধানিক সংরক্ষণ, রবীন্দ্র শিক্ষাচিন্তা এবং স্বদেশি শিক্ষার মাধ্যমে জাতিগঠনের প্রয়াস, অস্পৃশ্যতাবিরোধী চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ এবং শান্তিনিকেতনে বর্ণাশ্রম, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ এবং শান্তিনিকেতনে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের সমান্তরালে মেয়েদের হস্টেল নির্মাণের সূত্রপাত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের সূচনাপর্ব— এই কয়েকটি বিভাগে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

**ঔপনিবেশিক শিক্ষার সমালোচনা ও স্বদেশি শিক্ষার সূত্রপাত হিসাবে দুটি বিশ্ববিদ্যালয়**

ঔপনিবেশিক শাসকের প্রযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে নিহিত ছিল শাসকের স্বার্থ যার ফলে তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে মুখ্য হয়ে উঠেছিল কেবলমাত্র শাসকের উদ্দেশ্য পূরণের আকাঙ্ক্ষা। যেখানে কেবলমাত্র কিছু দক্ষতা অর্জন এবং কেরানী হয়ে ওঠাই লক্ষ্য ছিল। এই শিক্ষাব্যবস্থা মূলত শাসকের ক্ষমতাকে অনেকাংশে যেমন পোক্ত করেছিল তেমনি বহাল রাখতে সাহায্য করেছিল। এই কেরানী তৈরির শিক্ষার প্রতি বীতশ্রদ্ধা এবং ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল তখনই। দেশজ শিক্ষার প্রসার এবং বিদেশি শিক্ষার ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য চিন্তাভাবনা এবং বিকল্প নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল পরাধীন ভারতেই। তৎকালের জাতীয় চিন্তাবিদ এবং তাত্ত্বিকগণ পথ খুঁজছিলেন যেখানে শিক্ষা হয়ে উঠবে জাতি গঠনের হাতিয়ার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমকালীন শিক্ষার বদ্ধতা থেকে বেরিয়ে নতুন দিশা দেখালেন বিশ্বভারতী নির্মাণের মধ্য দিয়ে। তাঁর শিক্ষাচিন্তা সে সময়ের স্বদেশি শিক্ষার দিশাহীনতাকে পথ দেখিয়েছিল। গান্ধীজী তাঁর শিক্ষাদর্শের অনুরাগী ছিলেন এবং স্বাধীন দেশ গঠনের জন্য তা ফলপ্রসূ হবে বলে ধারণা করেছিলেন। স্বাধীনতার (১৯৪৭) কয়েক দশক আগেই বিশ্বভারতী নির্মিত হয়েছে (১৯০১) অন্যদিকে, স্বাধীনতা লাভের পর স্বদেশি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার যে তৎপরতা শুরু হয়, এবং জাতীয় শিক্ষা কমিশন নির্মিত হয়, তার মূর্ত প্রতিফলন হিসাবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। দুটি বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের পশ্চাতে দেশ এবং জাতি গঠন এবং স্বদেশি শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্নির্মাণের উদ্দেশ্য যেমন ছিল, তেমনি বিদেশি শাসকের আরোপিত শিক্ষাব্যবস্থাকে নস্যাৎ করে এদেশের শিক্ষার আদর্শকে তুলে আনার প্রচেষ্টা ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী সচেতনতা এবং বিদ্রোহ ক্রমে বাড়তে শুরু করেছিল। পাশাপাশি 'স্বদেশি' চিন্তা চেতনার জাগরণ, উন্মেষ ও বিস্তার ঘটতে থাকে। সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী পটভূমিতে ঔপনিবেশিক সরকারের আর্থিক নীতির সমালোচনার অন্যতম একটি দিক ছিল এই যে, ভারত থেকে সংগৃহীত করের বড় অংশ দেশের বাইরে নির্গমণ। এই সম্পদ নিষ্কাশন রুখতে জাতিগঠনের মাধ্যমে জাতিগত স্বনির্ভরতা অর্জনের দিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন তৎকালীন চিন্তাবিদরা। জাতি

ও জাতির অর্থনীতির বিকাশ ঘটাতে গেলে পশ্চাদপদ চিন্তাভাবনা এবং ধারণাগুলির অবসান ঘটানোর কথা তাঁরা চিন্তা করেছিলেন। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন এবং তার সঙ্গে সম্পৃক্ত দেশি দ্রব্য কেনা ও বৃটিশ দ্রব্য বয়কট আন্দোলন স্বদেশি অর্থনৈতিক চিন্তার বিকাশ এবং শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রেরণা জোগানোর সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশি শিক্ষা, সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে জাতীয় চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল। এই সময় থেকে ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল দেশ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার সাংস্কৃতিক রূপান্তর ঘটানো।

এই পর্বে স্বদেশি যুগের বুদ্ধিজীবীদের উদ্ভব হয়েছিল পশ্চিমী শিক্ষার হাত ধরে। আবার স্বদেশি আন্দোলনের অন্যতম দিক ছিল পশ্চিমী শিক্ষার প্রতি একধরনের বিতৃষ্ণা। এই সময় স্বদেশি আন্দোলনকারীরা একদিকে সরকারি স্কুল কলেজের বয়কটের ডাক দিয়েছেন আবার তার পাশাপাশি সমান্তরাল ভাবে 'জাতীয় শিক্ষা'র একটি স্বাধীন কাঠামো গড়ে তোলায় সচেষ্ট হয়েছেন। অমিত ভট্টাচার্য (২০২৩) লিখছেন, জাতীয় নিয়ন্ত্রণাধীন জাতীয় শিক্ষার গুরুত্ব সতীশচন্দ্র মুখার্জীকে প্রভাবিত করে এবং তিনি জাতীয় শিক্ষা কাউন্সিল গঠন করার বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন ততদিনে ১৯০১ সালে বোলপুরের নিকটবর্তী শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম গড়ে তুলেছেন, যা জাতীয় শিক্ষার ধারণার বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল (ভট্টাচার্য, ২০২৩)। ১৯০৪ সালে জে সি ঘোষের উদ্যোগে 'Association for the Advancement of Industrial and Scientific Education' গড়ে ওঠে। এই জাতীয় সংস্থাটির লক্ষ্য ছিল কারিগরি শিক্ষার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা এবং তার সাহায্যে তরুণ ছাত্রদের বিদেশে পাঠানো, যাতে তাঁরা ফিরে এসে দেশের কাজে ব্রতী হতে পারেন। বঙ্গ বিভাজনের এই পরিস্থিতিতে দেশব্যাপী আন্দোলনে সীমিত পরিসরে মেয়েরা অংশগ্রহণ করে। 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় সেই সময় প্রতিবাদ মিটিংগুলিতে মেয়েদের অংশগ্রহণের সংবাদ প্রকাশিত হয়। ১৯০৫ এর জুলাই মাস থেকে 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার বিষয়টি উত্থাপন করেন। বিপিনচন্দ্র পালের 'নিউ ইন্ডিয়া' পত্রিকায় (৫ই আগস্ট, ১৯০৫) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'গোলদিঘির গোলমালখানা' বলে ব্যঙ্গ করা হয়। এখানে পরীক্ষা বয়কট করার ডাক দেওয়া হয়। এই সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে 'কার্লাইল সার্কুলার' জারি হয়। এর বিরুদ্ধে অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি তৈরি হয়। এই সোসাইটির পরিচালক সদস্য ছিলেন শচীশচন্দ্র বসু, সুকুমার মিত্র, কৃষ্ণকুমার মিত্র। এই সোসাইটিতে বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সতীশচন্দ্র মুখার্জী। এখানে তিনি জাতীয় শিক্ষা ও জাতীয় চেতনার আন্তঃসম্পর্ক ব্যাখ্যা করেন। পরবর্তী গণসম্মেলনের ফলশ্রুতি হিসাবে রংপুরে জাতীয় বিদ্যালয় নির্মিত হয়। এই জাতীয় বিদ্যালয় নির্মিত হয় কলকাতায় স্থাপিত জাতীয় শিক্ষা পরিষদের (মার্চ, ১৯০৬) পূর্বে।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠন ১৯০৫ সালে একটি ঘটনার[২] অভিখাতে ৯ই নভেম্বার পাঁতির মাঠে বিক্ষোভ প্রদর্শন হয়। এই জমায়েতে সুবোধচন্দ্র মল্লিক এই জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাবদ ১ লক্ষ টাকার প্রতিশ্রুতি দেন। অমিত ভট্টাচার্য উল্লেখ করছেন, ময়মনসিংহের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরি ৫ লক্ষ টাকা এবং মহারাজা সূর্যাকান্ত আচার্য চৌধুরি ও মনমোহন ভট্টাচার্য উভয়ে মোট আড়াই লক্ষ টাকা দান করেন। আরও অনেকে এই প্রয়াসে আর্থিক সহযোগিতা করেন তাঁদের প্রত্যেকের নাম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অরবিন্দ ভবনের দোতলায় ওঠার সিঁড়ির দুপাশের দেওয়ালে খোদাই করা আছে। এই সব পথ পেরিয়ে ১৯০৬ সালে ১১ মার্চ জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়। এইভাবে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ বা ভবিষ্যতের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আদিরূপের সূচনা হয়। জাতীয় কংগ্রেসও এই শিক্ষা আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট হয়ে সাহিত্যগত, বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিশিক্ষা গড়ে তোলার পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করে। অ্যাকাডেমি প্রধান ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ এবং প্রশাসনিক প্রধান ছিলেন সতীশচন্দ্র মুখার্জি, তিনিই ছিলেন মূলত জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের মূল হোতা। বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ হওয়ার পর জাতীয় শিক্ষা পরিষদ পুনর্গঠন কমিটি গড়ে তোলে (ভট্টাচার্য, ২০২৩, পৃ -২২০)।

১৯৪৭ সালে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের পর নবগঠিত ভারত সরকার সি ই টি কে সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে ক্যাম্পাসে গৃহ নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি কেনার জন্য বেশ কয়েক লক্ষ টাকা অনুদান আসে। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কর্মকর্তারা সেই সময় থেকে এই প্রতিষ্ঠানকে একটি স্বতন্ত্র ও স্বকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার কথা ভাবতে শুরু করেছেন। অধ্যাপক ত্রিগুণা সেন, যিনি ১৯৪৪ সালে এর প্রিন্সিপাল ও কর্ণধার ছিলেন। দ্বিতীয় উপাদান একই বছরে ডঃ বিধানচন্দ্র রায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সভাপতি হন। যাদবপুরের সি ই টি কে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার সুপারিশ আসে ১৯৪৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের কাছ থেকে। ১৯৫৫ সালে সেপ্টেম্বার মাসে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় বিধানসভায় 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বিল' পেশ করেন। সদস্যদের আলাপ আলোচনার পর ১৯৫৫ সালে ২৪ সেপ্টেম্বার বিলটি গৃহীত হয়। রাজ্যপালের সম্মতি আসে ১৪ নভেম্বর এবং সরকারিভাবে তা ২৪ ডিসেম্বর থেকে কার্যকরী হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা ঘটল ১৮ ই মার্চ ১৯৫৬ তে উপরাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের দ্বারা আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মাধ্যমে। এই তারিখটি ছিল জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তীর সময়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও নিয়মবিধি অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষা পরিষদের নিয়মবিধিতে পরিবর্তন আনা হল। প্রথম রেক্টর হলেন ত্রিগুণা সেন। এই ভাবে ১৯৫৬ সালে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ যে যাত্রা শুরু করেছিল তা বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মাধ্যমে ১৯৫৬ সালের ১৮ ই মার্চ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক সূচনার মাধ্যমে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের নিরলস কর্ম প্রচেষ্টা স্বীকৃতি

[২] ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে এক ছাত্রকে বেত্রাঘাতের নির্দেশের প্রতিবাদে।

পেল। ক্রমে নতুন বিভাগ শুরু হল। ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের গোড়া পত্তন হয়েছিল ১৯০৬ সালে, পরে এই বিভাগ থেকে ভারতের প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট হন জ্যোতি দেশাই। ১৯২১ সালে প্রাক্তন ছাত্রদের সমিতি তৈরি হয়। বর্তমান ফ্যাকাল্টিগুলির নাম ছিল কলেজ। কলেজ অব আর্টস, কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি, কলেজ অব সায়েন্স। এখানে সূচনাকাল থেকেই সহশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এই ক্যাম্পাসের চরিত্র স্বদেশি যুগ থেকেই প্রতিবাদী। সেই প্রতিবাদী, স্বকীয় চরিত্র প্রজন্মের পর প্রজন্ম ছাত্রছাত্রীরা লালন করে চলেছে।

**যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের সূচনাপর্ব**

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের সূত্র গ্রথিত রয়েছে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অংশের মধ্যে, বিশেষত স্বদেশি আন্দোলনের মধ্যে। ১৯০৫-১৯০৬ এর উত্তপ্ত সময়। বৃটিশ আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শিক্ষাকে নতুন ভূমিকা নিতে হয়েছিল। প্রতিরোধের নতুন হাতিয়ার হিসাবে এবং উদীয়মান জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রচারের মাধ্যমে শিক্ষা পুনর্গঠন করার কথা ভাবা হয়। ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন গঠিত হয় যার উদ্দেশ্যই ছিল জাতীয় নিয়ন্ত্রণে সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিগত শিক্ষা প্রদান এবং সূদুরপ্রসারী উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার মাধ্যমে আত্মনির্ভরতা অর্জন করা। রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক, গৌরীপুরের ব্রজেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী, স্যার রাসবিহারী ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রী অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখের বৌদ্ধিক এবং আর্থিক অবদানে জাতীয় শিক্ষা কমিশনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী সচেতনতা এবং বিদ্রোহ ক্রমে বাড়তে শুরু করেছিল। পাশপাশি 'স্বদেশি' চিন্তা চেতনার জাগরণ উন্মেষ ও বিস্তার ঘটতে থাকে। সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী পটভূমিতে ঔপনিবেশিক সরকারের আর্থিক নীতির সমালোচনার অন্যতম একটি দিক ছিল এই যে, ভারত থেকে সংগৃহীত করের বড় অংশ দেশের বাইরে নির্গমণ। এই সম্পদ নিষ্কাশন রুখতে জাতিগঠনের মাধ্যমে জাতিগত স্বনির্ভরতা অর্জনের দিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন তৎকালীন চিন্তাবিদরা। জাতি ও জাতির অর্থনীতির বিকাশ ঘটাতে গেলে পশ্চাদপদ চিন্তাভাবনা এবং ধারণাগুলির অবসান ঘটানোর কথা তাঁরা চিন্তা করেছিলেন। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন এবং তার সঙ্গে সম্পৃক্ত দেশি দ্রব্য কেনা ও বৃটিশ দ্রব্য বয়কট আন্দোলন স্বদেশি অর্থনৈতিক চিন্তার বিকাশ এবং শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রেরণা জোগানোর সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশি শিক্ষা, সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে জাতীয় চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল। এই সময় থেকে ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল দেশ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার সাংস্কৃতিক রূপান্তর ঘটানো। এই পর্বে স্বদেশি যুগের বুদ্ধিজীবীদের উদ্ভব হয়েছিল পশ্চিমী শিক্ষার হাত ধরে। আবার স্বদেশি আন্দোলনের অন্যতম দিক ছিল পশ্চিমী শিক্ষার প্রতি একধরনের বিতৃষ্ণা। এই সময় স্বদেশি আন্দোলনকারীরা একদিকে সরকারি স্কুল কলেজের বয়কটের ডাক দিয়েছেন আবার তার পাশপাশি সমান্তরালভাবে 'জাতীয়

শিক্ষা'র একটি স্বাধীন কাঠামো গড়ে তোলায় সচেষ্ট হয়েছেন। অমিত ভট্টাচার্য লিখছেন, জাতীয় নিয়ন্ত্রণাধীন জাতীয় শিক্ষার গুরুত্ব সতীশচন্দ্র মুখার্জীকে প্রভাবিত করে এবং তিনি জাতীয় শিক্ষা কাউন্সিল গঠন করার বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। (ভট্টাচার্য, ২০২৩) ততদিনে ১৯০১ সালে বোলপুরের নিকটবর্তী শান্তিনিকতনে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম গড়ে তুলেছেন, যা জাতীয় শিক্ষার ধারণার বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। এই অধ্যায়ের সূচনাংশে বিশ্বভারতীর গড়ে ওঠা এবং মেয়েদের শিক্ষার সূচনা, মেয়েদের হস্টেল নির্মণের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এদিকে ১৯১০ সালে 'সোসাইটি ফর দ্য প্রমোশন অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন ইন বেঙ্গল' যেটি বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের তত্বাবধানে ছিল, এন সি ই তে একত্রিত হয়েছিল। স্বাধীনতার পর ১৯৫৫ সালের ২৪ ডিসেম্বার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ভারত সরকারের সম্মতিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

**যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা**

১৯৪৭ সালে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের পর নবগঠিত ভারত সরকার CET কে সর্বভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে ক্যাম্পাসে গৃহ নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি কেনার জন্য বেশ কয়েক লক্ষ টাকা অনুদান আসে। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কর্মকর্তারা সেই সময় থেকে এই প্রতিষ্ঠান কে একটি স্বতন্ত্র ও স্বকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার কথা ভাবতে শুরু করেছেন। অধ্যাপক ত্রিগুণা সেন, যিনি ১৯৪৪ সালে  এর প্রিন্সিপাল ও কর্নধার ছিলেন। দ্বিতীয় উপাদান একই বছরে ডঃ বিধানচন্দ্র রায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সভাপতি হন। যাদবপুরের CET কে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার সুপারিশ আসে ১৯৪৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের কাছ থেকে। ১৯৫৫ সালে সেপ্টেম্বার মাসে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচনন্দ্র রায় বিধানসভায় 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বিল' পেশ করেন। সদস্যদের আলাপ আলোচনার পর ১৯৫৫ সালে ২৪ সেপ্টেম্বার বিলটি গৃহীত হয়। রাজ্যাপালের সম্মতি আসে ১৪ নভেম্বার এবং সরকারিভাবে তা ২৪ ডিসেম্বার থেকে কার্যকরী হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা ঘটল ১৮ মার্চ ১৯৫৬ তে উপরাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের দ্বারা আনুষ্টানিক উদ্বোধনের মাধ্যমে। এই  তারিখটি ছিল জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তীর সময়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও নিয়মবিধি অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষা পরিষদের নিয়মবিধিতে পরিবর্তন আনা হল। প্রথম রেক্টর হলেন ত্রিগুণা সেন।  এই ভাবে ১৯০৬ সালে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ যে যাত্রা শুরু করেছিল তা  বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মাধ্যমে ১৯৫৬ সালের ১৮ মার্চ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক সূচনার মাধ্যমে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের নিরলস কর্ম প্রচেষ্টা স্বীকৃতি পেল। ক্রমে নতুন বিভাগ শুরু হল। ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের গোড়া পত্তন হয়েছিল ১৯০৬ সালে পড়ে এই বিভাগ থেকে ভারতের প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট হন জ্যোতি দেশাই। ১৯২১ সালে প্রাক্তন ছাত্রদের সমিতি তৈরি হয়। বর্তমান ফ্যাকাল্টি গুলির নাম ছিল কলেজ। কলেজ অব আর্টস, কলেজ অব

ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি, কলেজ অব সায়েন্স। এখানে সুচনাকাল থেকেই সহশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এই ক্যাম্পাসের চরিত্র স্বদেশি যুগ থেকেই প্রতিবাদী। সেই প্রতিবাদী, স্বকীয় চরিত্র প্রজন্মের পর প্রজন্ম ছাত্রছাত্রীদের লালন করে চলেছে। শ্রী অরবিন্দ ছিলেন বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ এবং শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন স্যার গুরুদাস ব্যানার্জী, আনন্দ কুমার স্বামী, সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, রাধা কুমুদ মুখার্জী প্রমুখ। স্বাধীনতার পরবর্তী কালে সহশিক্ষার হাত ধরে মেয়েদের শিক্ষার প্রচলন এবং হস্টেল নির্মিত হয়েছিল পর্যায়ক্রমে।

**স্বদেশী শিক্ষার পুনর্নির্মাণে গঠিত কমিশন, পলিশি ও সাংবিধানিক সংরক্ষণ**

স্বাধীনতার আগে থেকেই স্বদেশি শিক্ষার যে উদ্যোগ শুরু হয়েছিল তা লাগু করতে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সময়ে কমিশন তৈরি হয়েছিল এবং কমিশন যে পলিশি তৈরি করেছে পর্যায় ক্রমে যা উচ্চশিক্ষাকে ধীরে ধীরে বর্তমানের আকার দিয়েছে যার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাচ্ছি সমসাময়িক কালের এডুকেশন পলিশিতে। দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের লক্ষ্যে উচ্চ শিক্ষাকে যখন নিম্নআয়ের দেশগুলির সমৃদ্ধিতে ইউনাইটেড নেশনস একটি ফলপ্রসূ মাধ্যম হিসাবে বিবেচনা করেছে। ভারতীয় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে 'ইউনিভার্সিটি এডুকেশন কমিশন রিপোর্ট অব ১৯৪৮-৪৯' যা রাধাকৃষ্ণন রিপোর্ট নামে পরিচিত এবং 'এডুকেশন কমিশন রিপোর্ট ১৯৬৪' যা কোঠারি কমিশন রিপোর্ট হিসাবে পরিচিত— দুটি প্রতিনিধি স্থানীয় রিপোর্ট। এই দুটি রিপোর্ট ন্যাশনাল এডুকেশন পলিশি – ১৯৬৮-র এবং ১৯৮৬-র পথ প্রশস্ত করেছিল। যা ১৯৯২ সালে সংশোধিত হয়, এই সংশোধিত রিপোর্ট মূলত আলোকপাত করেছিল ভারতীয় জনগণের সমৃদ্ধিতে উচ্চশিক্ষার ভুমিকার ওপর। তারপর ২০২০ সালে জাতীয় উচ্চশিক্ষার নীতি প্রকাশিত হয়েছে। পরিকল্পিত ভাবে উচ্চশিক্ষার যাত্রা শুরু হয় মূলত ১৯৫৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে। ১৯৫৬ সালে আইন হিসাবে লাগু হয়। এই আইন বিশবিদ্যালয়গুলিতে গুণগত মানে উন্নত শিক্ষণ, পরীক্ষা, গবেষণার মান নির্ধারণের কথা বলা হয়। স্বাধীন ভারতে ১৯৪৮ সালে ইউনিভার্সিটি এডুকেশন কমিশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ দেশের স্বতন্ত্র শিক্ষা ব্যবস্থা নির্মাণের যাত্রা শুরু করে। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন এখানে সভাপতিত্ব করেন। এখানে তিনিই মূলত শিক্ষকদের দায়িত্বের কথা বলেন যিনি ছাত্রদের তৈরি করতে পারবেন সামাজিক বিন্যাস পরিবর্তন করার জন্য। জ্ঞানের ধারণা, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং নেতৃত্ব ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় সমন্বয়ের প্রতি। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক স্তম্ভ গণতন্ত্র, ন্যায়, স্বাধীনতা, সাম্য ইত্যাদি উচ্চ শিক্ষার তত্ত্ব এবং অনুশীলনের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়। এই রিপোর্টে মূলত সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এক দশক পর কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৬৪-৬৬ সালে। এই রিপোর্টে উৎকর্ষের দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, শিক্ষিত ডিগ্রী প্রাপ্ত অথচ অদক্ষ—এটি অর্থনৈতিক বিকাশে সহায়ক নয়। এই বিষয়টি সমাধানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মেয়েদের শিক্ষার প্রতি

গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তফশিলি জাতি এবং উপজাতি জনগণের মধ্যে শিক্ষা সম্প্রসারের দিকটিতেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। জাতীয় লক্ষ্য পূরণে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তরে শিক্ষার কিভাবে একটি সফল মাধ্যম হিসাবে কাজে লাগানো যায় তার উল্লেখ করা হয়। ১৯৮৬ সালে শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় নীতির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই পলিশিতে মেয়েদের শিক্ষা এবং স্বশক্তিকরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এখানে স্পষ্টতই উল্লেখ করা হয়, শিক্ষা মেয়েদের অবস্থান পরিবর্তনের চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করবে এবং তফশিলি জাতি, উপজাতি এবং প্রতিবন্ধী ছাত্রীদের অন্তর্ভুক্তির কথা বলা হয়।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এই রিপোর্টে গুরুত্ব আরোপ করা হয়, পিরামিডের নীচের অংশটিকে উন্নত করার কথা বলা হয়। পিরামিডের একেবারে উঁচু অংশ যেখানে সাধারণত আলোকপাত করা হয়, সেই অংশটি উৎকৃষ্টতম হিসাবে গড়ে তুলে নীচের অংশ গুলি সমৃদ্ধ করার কথা বলা হয়। শিক্ষায় সমান অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে যাবতীয় বাধা দূর করার কথা বলা হয়, গ্রাম–মফস্বল এলাকার ছাত্র ছাত্রীদের স্কলারশিপ দিয়ে শিক্ষার অধিকার লাগু করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ১৯৮৫-১৯৯৫ এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ‘রাধাকৃষ্ণন কমিশন’ এবং ‘কোঠারি কমিশনের’ মূল বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষার পলিশিতে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে বদলের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়। ১৯৮৬ সালের পলিশির ৩৪ বছর পর ২০২০ সালে ৩১ শে জুলাই ন্যাশনাল এডুকেশন পলিশি (NEP, 2020) প্রকাশিত হয়। এখানে দীর্ঘস্থায়ী বিকাশ এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষার বিস্তারকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এখানে লিঙ্গসাম্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, এখানে সমাজ রূপান্তরের থেকেও দীর্ঘস্থায়ী বিকাশের ওপর আরোপ করা হয়েছে, এখানে “Socio -economically disadvatanged groups” এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করার কথা বলা হয়েছে, এস সি, এস টি, ও বি সি এবং তৃতীয় লিঙ্গের ছাত্রদের সমৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। এছাড়া প্রতিবন্ধী, পিছিয়ে থাকা গ্রাম-মফস্বলের ছেলে মেয়েদের এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে থাকা ছাত্রদের গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

**রবীন্দ্র শিক্ষাচিন্তা এবং স্বদেশি শিক্ষার মাধ্যমে জাতিগঠনের প্রয়াস**

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার সমসময়ে নারী শিক্ষার বিষয়টি প্রাধান্য না পেলেও পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের শিক্ষার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে দেখেছেন। একদিকে যেমন ‘স্ত্রীশিক্ষা’, ‘শ্রীভবন সম্বন্ধে আমার আদর্শ’ ইত্যাদি প্রবন্ধে এ বিষয়ে তাঁর নারীশিক্ষা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা ও দর্শন প্রকাশিত হয়েছে তেমনি তৎকালীন শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন বিশিষ্টজনেদের লেখা চিঠিতে তাঁর মনোগত ইচ্ছা ব্যক্ত হয়েছে। তার মধ্যে মনোরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়, অজিত চক্রবর্তী, হেমলতা সেন প্রমুখকে লেখা চিঠি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শান্তিনিকেতনের বিশিষ্টজনেদের কন্যাদের নিয়ে প্রথম নারীশিক্ষার প্রচলন এবং তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজে সহশিক্ষার গোড়াপত্তন খুব সাবলীল ছিল না। শান্তিনিকেতনের প্রথম পর্বে মেয়েদের শিক্ষা এবং

সেই উদ্যোগে আশ্রমের বিদূষী নারীদের অবদান উল্লেখযোগ্য। শান্তিনিকেতনে মেয়েদের প্রথম হস্টেল শ্রীসদন নির্মাণ এবং মেয়েদের সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি এবং মেয়েদের দেখবহালের জন্য পরিদর্শিকাদের আগমন সেযুগের রক্ষণশীল সমাজকে আলোড়িত করেছিল। প্রথম যুগের আবাসিকাদের আবাসজীবন এবং নারীশিক্ষার প্রথম যুগে রবীন্দ্র সান্নিধ্যে পাঠলাভের অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন স্মৃতিকথায়। রাণী চন্দ, অমিতা সেন প্রমুখের স্মৃতিচারণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগে মেয়েদের শিক্ষা ও আবাসজীবনের বিশেষত্ব দুটি অংশে আলোচিত হয়েছে। প্রথম অংশে রবীন্দ্রচিন্তায় নারী শিক্ষা ও লিঙ্গসাম্যের প্রতিফলন, দ্বিতীয় অংশে বিশ্বভারতীর প্রথম মেয়েদের হস্টেল নির্মাণের ইতিবৃত্ত আলোচিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তায় ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের পরিকল্পনার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তাঁর আশ্রম শিক্ষা সম্বন্ধীয় 'আশ্রমের রূপ ও রীতি', 'বিশ্বভারতী','শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম' ইত্যাদি প্রবন্ধে ও 'শিক্ষা' (ঠাকুর, ১৯০৮) নামক সংকলনের প্রবন্ধগুলিতে। রবীন্দ্রনাথকে তাঁর শৈশবের স্কুলজীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁকে প্রথাবদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি বীতশ্রদ্ধ করেছিল। এবং তাঁর এই তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁকে বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা নির্মাণ সম্বন্ধে আগ্রহী করেছে তা বলা বাহুল্য। জীবনস্মৃতিতে তিনি বর্ণনা করছেন কিভাবে তাঁর শৈশবে স্কুলের রীতি প্রকৃতি এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের আচরণ তাঁর পক্ষে নিতান্ত দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। তিনি খুব দৃঢ়তার সঙ্গেই প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার নিন্দা করেছেন এবং আশ্রম শিক্ষার গুরুত্বের কথা বলছেন, "অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে আমার মনে এই কথাটি জেগে উঠেছিল, ছেলেদের মানুষ করে তোলবার জন্যে যে একটা যন্ত্র তৈরী হয়েছে, যারা নাম ইস্কুল, সেটার ভিতর দিয়ে মানবশিশুর শিক্ষার সম্পূর্ণতা হতেই পারে না। এই শিক্ষার জন্যে আশ্রমের দরকার, যেখানে আছে সমগ্র জীবনের সজীব ভূমিকা।" (ঠাকুর, ১৩৯৬, পৃ -২২৩)

তিনি শিক্ষার্থীদের মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশকে সমান ভাবে গুরুত্ব দিয়ে সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও প্রতিভার বহুমাত্রিক প্রকাশকেই শিক্ষার প্রকৃত অর্থ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। শিক্ষালাভকে জীবন বিচ্ছিন্ন কোনো বাহ্যিক প্রক্রিয়া হিসাবে মনে করেন নি। তপোবনের শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্নিহিত বার্তাটি তিনি শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থায় সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন। সেখানে যেমন গুরুগৃহে শিষ্যরা থেকে শিক্ষালাভ করত, দৈনন্দিন জীবনের নানাবিধ কাজে নিযুক্ত থাকত এবং ছাত্রদের ব্রহ্মচর্য সম্পন্ন হত গুরুগৃহে। তবে তিনি তপোবনের শিক্ষার সময়োপযোগী আত্তীকরণ ও প্রয়োগ চেয়েছিলেন, এ সম্পর্কে তিনি লিখছেন—"তপোবনের বাহ্য অনুকরণ যাকে বলা যেতে পারে তা অগ্রাহ্য, তা মিথ্যে। তার ভিতরকার সত্যটিকে আধুনিক জীবনযাত্রার আধারে প্রতিষ্ঠিত করা চাই।" (ঠাকুর, ১৩৯৬, পৃ-২৩৩) তাই আবাসজীবন এখানে নিছক ছাত্রছাত্রীদের থাকার জায়গা হিসাবে আসে নি, এসেছে তপোবনের মত আশ্রম শিক্ষা সম্পন্ন করার চক্রটির একটি আবশ্যকীয় অঙ্গ হিসাবে। তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যে

আদর্শগুলি প্রয়োগের কথা ভেবেছিলেন সেগুলি শুধুই ক্লাশের মধ্যে চর্চিত হয় না। হস্টেলের সারাদিনের মধ্যে নানাভাবে এই জীবনবোধ আবাসিকদের মধ্যে সঞ্চারিত করার চেষ্টা করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়টির কাঠামো আবাসিক। শুধুমাত্র এখানে কর্মরত আশ্রমিক শিক্ষক ও অধ্যাপক, কর্মীদের সন্তান ভিন্ন সকল ছাত্রছাত্রী হস্টেলে থাকতে বাধ্য থাকে। শিশু শিক্ষার্থী থেকে গবেষকদের আবাসজীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রতিটি হস্টেলের রোজনামচা ও দৈনন্দিন কর্মপ্রণালী আবাসিকদের আশ্রমিক হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করে। হস্টেলের নিয়মাবলী রাবীন্দ্রিক আশ্রমিক শিক্ষাব্যবস্থা অনুযায়ী তৈরী হয়। পাঠভবনের ছাত্রীদের হস্টেল[৩] গুলিতে ছাত্রীদের সারাটা দিন নানা ধরনের আশ্রমিক কাজ ও অভ্যাসের অনুশীলন করতে হয়। সকালে বৈতালিকে উপাসনা ও গান হবার পর পড়াশুনা শুরু হয়। তারপর বেশ কয়েকটি ক্লাশ। বিকেলে আশ্রমমাঠে খেলাধুলা ও শরীরচর্চা। বিকেলে আবার হস্টেলে উপাসনা করতে হয় যা মূলত উপনিষদের শ্লোক।

বিশ্বভারতীর উচ্চমাধ্যমিকের স্কুল উত্তর শিক্ষার মেয়েরা যারা হস্টেলে থাকে শ্রীসদন মেইন ব্লক সেখানেও নানধরনের নিয়ম রয়েছে। এক্ষেত্রেও সকাল থেকে রাত অব্দি বিভিন্ন আশ্রমিক কার্যপ্রণালীর মধ্যে থাকতে হয়। হস্টেলে দায়িত্বপ্রাপ্তদের তত্ত্বাবধানে নিয়মাবলী সম্পন্ন হয়। বুধবার সকালে উপাসনা মন্দিরে উপাসনায় সাদা পোষাকে উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক। এবং আবাসিকদের জন্য বিভিন্ন ঋতু উৎসবে যোগদান আবশ্যিক। তবে স্নাতক, স্নাতকোত্তর[৪] ও গবেষণার[৫] ছাত্রীদের হস্টেলে নিয়ম কানুন কিছুটা শিথিল। কারণ মনে করা হয় পাঠভবন উত্তর শিক্ষা পার হয়ে আসার পর ছাত্রছাত্রীরা প্রকৃত আশ্রমিক হিসাবে নিজেদের গড়ে তুলতে পারবে। তারা স্বেচ্ছায় আশ্রমিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তা অনুসরণ করবে। তাই উচ্চশিক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের জন্য নিয়ম কানুন কিছুটা হলেও শিথিল। এখানে শুধুমাত্র মেয়েদের হস্টেলগুলির কথা উল্লেখ করলেও অনুরূপভাবে পাঠভবনের ছেলেদের হস্টেল পাঠভবন ছাত্রাবাসেও আশ্রমিক নিয়ম প্রযুক্ত হয়, উত্তর শিক্ষা বয়েজ, স্নাতক ও স্নাতকোত্তের ছাত্রদের জন্য বিদ্যাভবন বয়েজ, নন্দন হস্টেল ইত্যাদিতে নিয়মকানুনের বাধ্যবাধকতা নেই। এখানে লিঙ্গ বৈষম্যের বিষয়টি এসে যায়। ধর্ম, জাতি, বর্ণ, অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে আবাসিকরা হস্টেলে বসবাস করতে শেখে। এবং যাবতীয় সামাজিক ধর্মীয় অর্থনৈতিক ভেদাভেদ মুছে যেতে থাকে এই একত্রবাসে যা রবীন্দ্রনাথের মানবসমাজে সমন্বয় ও প্রীতিপূর্ণ সহাবস্থানের অভিলাষের একটি ছবি বলা যায়। সকলে ব্যক্তিগত, পারিবারিক পরিচয় ব্যতিরেকে আশ্রমিক পরিচয়ে পরিচিত হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন -

> সেই তখনকার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যরা যে শিক্ষা, যে ব্রত অবলম্বন করে বড়ো হয়ে উঠেছিলেন, বীর হয়ে উঠেছিলেন, সেই শিক্ষা সেই ব্রত গ্রহণ করার জন্যেই তোমাদের এই নির্জন আশ্রমের

---

[৩] পাঠভবনের মেয়েদের হস্টেল মাধবী, করবী ।

[৪] বিশ্বভারতীর স্নাতক, স্নাতকোত্তর স্তরের মেয়েদের হস্টেল মৃণালিনী, প্রতিমা, শ্রীসদন।

[৫] বিশ্বভারতীর গবেষক ছাত্রীদের হস্টেল বিড়লা, গোয়েঙ্কা।

মধ্যে আমি আবাহন করেছি। তোমরা আমার কাছে এসো – আমি সেই প্রাচীন ঋষিদের সত্যবাক্য, তাঁদের উজ্জ্বল চরিত মনের মধ্যে সর্বদা ধারণ করে রেখে তোমাদের সেই মহাপুরুষদের পথে চালনা করতে চেষ্ঠা করব- আমাদের ব্রত পতি ঈশ্বর আমাকে সেই বল, সেই ক্ষমতা দান করুন ... যদি আমাদের চেষ্ঠা সফল হয় তোমরা প্রত্যেকে বীর পুরুষ হয়ে উঠবে- তোমরা ভয়ে কাতর হবে না, দুঃখে বিচলিত হবে না, ক্ষতিতে ম্রিয়মান হবে না, ধনের গর্বে স্ফীত হবে না, মৃত্যুকে গ্রাহ্য করবে না, সত্যকে জানতে চাইবে, মিথ্যা কেমন থেকে কথা থেকে কাজ থেকে দূর করে দেবে, সর্বদা জগতের সকল স্থানেই মনে এবং বাইরে এক ঈশ্বর আছেন এইটে নিশ্চয় জেনে আনন্দমনে সকল দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত থাকবে। কর্তব্য কর্ম করবে প্রাণপণে, সংসারের উন্নতি ধর্মপথে থেকে করবে, অথচ যখন কর্তব্যবোধে ধনসম্পদ ও সংসার ত্যাগ করতে হবে তখন কিছুমাত্র ব্যাকুল হবে না। তাহলে তোমাদের দ্বারা ভারতবর্ষ আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠবে- তোমরা যেখানে থাকবে সেইখানেই মঙ্গল হবে, তোমরা সকলের ভালো করবে এবং তোমাদের দেখে সকলে ভাল হবে। (ঠাকুর, ১৩০৯, পৃ -৩০১)

তিনি প্রাচীন ভারতের আশ্রম শিক্ষা সম্পর্কে লিখছেন—"তাঁরা বাল্যকালে গৃহ ছেড়ে নির্জনে গুরুর বাড়িতে যেতেন। সেখানে খুব কঠিন নিয়মে নিজেকে সংযত করে থাকতে হত। গুরুকে একান্তমনে ভক্তি করতেন, গুরুর সমস্ত কাজ করে দিতেন। দৈনন্দিন কাজ সকলকেই করতে হত তাঁরা যত বড়ো ধনীর পুত্র হোন না কেন। কঠিন বিছানায় শুতেন, পায়ে জুতো নেই মাথায় ছাতা নেই- সাজসজ্জা বড়োমানুষী কিছুমাত্র নেই। সমস্ত মনের সমস্ত চেষ্টা কেবল শিক্ষালাভে, কেবল সত্যের সন্ধানে, কেবল নিজের দুষ্প্রবৃত্তি দমনে, নিজের ভালো গুণকে ফুটিয়ে তুলতে নিযুক্ত থাকত" (ঠাকুর, ১৩০৯, পৃ -৩০১) (শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম)। রবীন্দ্রনাথ আশ্রম শিক্ষায় গুরুত্ব দিচ্ছেন শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশে, আশ্রমজীবনে বস্তুবাহুল্য বা উপকরণ লাঘব করার কথা বলছেন, এবং তাঁর প্রত্যয় ছিল আশ্রম শিক্ষায় শিক্ষিত হলে ছাত্রদের মধ্যে আত্মকর্তৃত্ব, স্বনির্ভরতা, আত্মকর্তৃত্ব ও সৃষ্টিকর্তৃত্ব, উৎসুক্য ও কৌতুহল বৃদ্ধি পাবে। কারণ এখানে তারা আড়ম্বরহীন বাহুল্যবর্জিত প্রকৃতিসংলগ্ন জীবনযাপন ছাত্রদের মধ্যে সার্বিক বিকাশ ঘটাবে। এই বিষয়গুলি ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত করার ক্ষেত্রে হস্টেলগুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা, দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে শিক্ষার প্রত্যক্ষযোগ এই বিষয়গুলিও রবীন্দ্রনাথ গুরুত্ব দিয়েছেন আশ্রম শিক্ষায়। প্রকৃতির মুক্তাঙ্গনে শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশ সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব বলে তিনি মনে করেছেন। তিনি লিখছেন—

ছেলেরা বিশ্বপ্রকৃতির অত্যন্ত কাছের সামগ্রী। আরামকেদারায় তারা আরাম চায় না, গাছের ডালে তারা চায় ছুটি। বিরাট প্রকৃতির অন্তরে আদিম প্রাণের বেগ নিগূঢ়ভাবে চঞ্চল, শিশুর প্রাণে সেই বেগ গতিসঞ্চারণ করে... আমাদের আশ্রমের ছেলেরা এই প্রাণময়ী প্রকৃতিকে কেবল

যে খেলায় ধুলায় নানা রকম করে কাছে পেয়েছে তা নয়, গানের রাস্তা দিয়ে নিয়ে গেছি তাদের মনকে প্রকৃতির রঙমহলে" (ঠাকুর, ১৩০৯, পৃ -২২৪)

বিশ্বভারতীর পুরোনো হস্টেলগুলির গঠন কাঠামো দেখলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয় প্রকৃতির অবারিত বিস্তারকে বদ্ধ করার চেষ্টা করা হয় নি। হস্টেলের মধ্যে প্রচুর গাছ, ফাঁকা জায়গা, বেদী, বিস্তৃর্ণ প্রাঙ্গণ হস্টেলগুলিকে আশ্রমোপযোগী করে তুলেছে। জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো শিক্ষাব্যবস্থায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। জীবনের প্রাত্যহিকতার সাথে নিবিড় যোগাযোগ শিক্ষার্থীদের বিকাশের সহায়ক বলে তিনি মনে করতেন। তিনি 'আশ্রমের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে লিখছেন—

মনে পড়ছে, কাদম্বরীতে একটি বর্ণনা আছে – তপোবনে আসছে সন্ধা...কর্মপর্যায়ের দ্বারা তপোবনের সঙ্গে তাদের নৃত্য প্রবাহিত জীবনের যোগধারা। প্রাণায়মের ফাঁকে ফাঁকে কেবলই যে সামমন্ত্র আবৃত্তি তা নয়, সহকারিতার সখ্য বিস্তারে সকলে মিলে আশ্রমের সৃষ্টিকার্য পরিচালন; তাতে করে আশ্রম হত আশ্রমবাসীদের নিজ হাতের সম্মিলিত রচনা, কর্মসমবায়ে আমাদের আশ্রমে এই সতত উদ্যমশীল কর্মসহযোগীতা কামনা করছি... আমি যে বিদ্যানিকেতনের কল্পনা করেছি পড়ামুখস্থ, কড়া পাহারা ঠেলেঠুলে তার মধ্যে পরস্পরের সেবা এবং পরিবেশ রচনার কাজকে প্রধান স্থান দিয়েছি। (ঠাকুর, ১৩০৯, পৃ -৩০১)

বিশ্বভারতীতে হস্টেলগুলিই আশ্রমগৃহের ভূমিকা পালন করে। শিক্ষাকে তিনি নিছক জীবিকা নির্বাহের যন্ত্র হিসাবে না দেখে সাসটেনেবল শিক্ষাব্যবস্থা হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। পুঁথিগত পড়াশুনা শুধু নয় তিনি শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্গত করেছেন বাগান তৈরি, সুতোর কাজ, বাটিক বাঁধনির কাজ, কাঠের কাজ, চামড়ার কাজ, ইত্যাদি। এবং প্রতিটি হস্টেলে এই গুলি যথাযথ ভাবে অনুশীলন করার ব্যবস্থা রয়েছে। তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি বিশ্ববিদ্যালয় শুধুমাত্র জ্ঞান উৎপাদনেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। আশেপাশের গ্রামগুলির সমস্যা সুবিধা অসুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে ছাত্রছাত্রীরা যাতে অবগত হন সে বিষয়ে তিনি পল্লীশিক্ষা প্রবন্ধগুলিতে বলেছেন। অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের সাথে আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের প্রতিনিয়ত সেই কাজে নিযুক্ত করেছেন ও গুরুদায়িত্ব দেবার কথা ভেবেছেন। তিনি লিখছেন—

সকল দেশেই শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীণ জীবনযাত্রার যোগ আছে। আমাদের দেশে কেবলমাত্র কেরানিগিরি ওকালতি ডেপুটিগিরি দারোগা গিরি মুন্সেফি প্রভৃতি ভদ্রসমাজে প্রচলিত কয়েকটি ব্যবসায়ের সঙ্গেই আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ যোগ। যেখানে চাষ হইতেছে, কলুর ঘানি ও কুমারের চাক ঘুরিতেছে, সেখানে এ শিক্ষার কোনো স্পর্শও পৌঁছায় নাই। অন্য কোনো শিক্ষিত দেশে এমন দূর্যোগ ঘটিতে দেখা যায় না। তাহার কারণ, আমাদের নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের মাটির উপরে নাই, তাহা পরগাছার মতো পরদেশীয় বনস্পতির শাখায় ঝুলিতেছে। ভারতবর্ষে যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার

অর্থশাস্ত্র, তাহার কৃষিতত্ত্ব, তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠা স্থানের চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গো পালন করিবে, কাপড় বুনিবে এবং নিজের আর্থিক সম্বল লাভের জন্য সমবায়প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র শিক্ষক ও চারিদিকের অধিবাসীদের সংগে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে" (ঠাকুর, ১৩৪০, পৃ -৫৬)।

শান্তিনিকেতনের আবাসজীবন বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে আশ্রম শিক্ষাব্যবস্থার স্বাতন্ত্র্যের কারণেই। প্রসাশনিক ভাবেও হস্টেল সুপার স্বতন্ত্র ভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। আশ্রম সম্মিলনীর বাৎসরিক আলোচনা সভায় সব সিদ্ধান্ত আশ্রমিকদের একত্রিত মতামতে নির্ধারিত হত। এখানে হস্টেলগুলি বিশ্বভারতীর শিক্ষার উদ্দেশ্যমূলকতার সঙ্গে একমাত্রায় বাঁধা। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাবীন্দ্রিক আদর্শের সাথে মিথোস্ক্রিয়ার মাধ্যমে আবাসজীবন এখানে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এই আবাসজীবনের স্মৃতি সারাজীবন বহন করে চলেন। তার নমুনা হিসাবে উল্লেখ করা যায় বেশ কয়েকটি স্মৃতি কথা। সাহিত্যিক অহনা বিশ্বাস শান্তিনিকেতনে আবাসজীবনের স্মৃতি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন "মেয়েদের হস্টেল-জীবন অন্দরের কথামালা" (বিশ্বাস, ২০০৯) বইতে। ঋতা বসু শান্তিনিকেতনের আদিতম হস্টেল শ্রীসদনে বসবাস কালের স্মৃতিচারণ করেছেন 'শ্রীসদনের শ্রীমতীরা' (বসু, ২০১৬) গ্রন্থে। এ ছাড়াও শান্তিনিকেতনের আবাসিক নারীরা বহু কবিতা গান রচনা করেছেন পরবর্তী জীবনে এবং শান্তিনিকেতনের আবাসজীবনের অপরিসীম মাধুর্য্যের স্মৃতি ও প্রভাব ব্যক্ত করেছেন। বলা বাহুল্য, বিশ্বভারতীতে প্রায় একদশকের আবাসজীবন আমাকে হস্টেল সম্পর্কিত এই গবেষণায় অনুপ্রাণিত করেছে।

রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষা' (ঠাকুর, ১৯০৮) প্রবন্ধে স্বদেশি শিক্ষার গঠন করার জন্য প্রকৃতিবান্ধব এবং ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারী শিক্ষা প্রচলনের কথা বলছেন। শান্তিনিকেতন নির্মাণের সূচনাকাল থেকেই স্ত্রীশিক্ষার প্রতি তাঁর যে মনোযোগ এবং আগ্রহ দেখা যায় তার একটি বিশ্বস্ত খতিয়ান রয়েছে (ঠাকুর, স্ত্রীশিক্ষা) 'স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধে। বিশ্বভারতীতে মেয়েদের প্রথম হস্টেল শ্রীসদনের নির্মাণ এবং প্রতিষ্ঠার মধ্যে নিহিত আছে রবীন্দ্রনাথের বিকল্প শিক্ষাদর্শ (ঠাকুর, শ্রীভবন সম্বন্ধে আমার আদর্শ) আশ্রম শিক্ষার দেশীয় তপোবন আদর্শের প্রতিফলন সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করেছেন 'আশ্রমের রূপ ও রীতি' (ঠাকুর, আশ্রমের রূপ ও রীতি), 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' (ঠাকুর, ১৩৯৬), 'বিশ্বভারতী' (ঠাকুর, ১৩৯৬), 'শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম' (ঠাকুর, ১৩৯৬), ইত্যাদি প্রবন্ধে। অজিত কুমার চক্রবর্তী 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ এবং প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন (চক্রবর্তী, ১৩৫৮)। রবিজীবনীকার প্রশান্ত কুমার পাল রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের উদ্যোগ বিষয়ে বিশদে আলোচনা করেছেন (পাল, ১৩১৫-২০)। সুধীরচন্দ্র কর 'কল্যাণব্রতী রবীন্দ্রনাথ' এ রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের

প্রায়োগিক দিক অর্থাৎ তাঁর কর্ম উদ্যোগের বিশ্লেষণ করেছেন (কর, ১৩৭০)। আভা নাথ শিক্ষা ও সমাজের একত্র বিন্যাসে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার কথা উল্লেখ করেছেন। (নাথ, ১৪০৭) ক্ষুদিরাম দাস রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তার বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। দিক্ষীত সিনহা (২০১০), উমা দাসগুপ্ত এবং অজিত কুমার নিয়োগী রবীন্দ্রনাথের শ্রীনিকেতন পর্বের সামাজিক কর্ম উদ্যোগ বিষয়ে বিশদে আলোচনা করেছেন। কিভাবে 'ব্রতীবালক দল' গঠিত হল এবং তারা গ্রামগঞ্জে 'পিছিয়ে পড়া' মানুষদের কাছে শিক্ষা উপকরণ এবং শিক্ষার বার্তা পৌঁছে দিতেন, বর্ণিত হয়েছে।

O' Connell 'Sriniketan' (1920-41) অংশে বর্ণনা করছেন কিভাবে রবীন্দ্রনাথ দরিদ্র সাধারণের জন্য, সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির উন্নতিকল্পে ব্রতী হয়েছেন (O'Connell, 2002) এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জনজীবনকে জুড়ে দিতে ব্রতী হয়েছেন, দলিত সাধারণের শিক্ষা এবং সার্বিক উন্নতির জন্য রবীন্দ্রনাথের পল্লীপুনর্গঠন, পল্লীশিক্ষা বিষয়ে বিশদে পরিকল্পনার কথা বর্ণনা করা হয়েছে এখানে (O'Connell, 2002)। এছাড়াও কৃষ্ণকৃপালনি (Kripalani, 1961) রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক আগ্রহ এবং সচেতন উদ্যোগের কথা উল্লেখ করছেন। শিক্ষার মুক্ত আকাশ রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র পুরুষের জন্য নয়, তিনি মেয়েদের জন্য যেমন চেয়েছিলেন, তেমনি চেয়েছিলেন জনসাধারণ যারা শিক্ষার উজ্জ্বল আলো থেকে বঞ্চিত, তাদের অন্তর্ভুক্তি, অংশগ্রহণ এবং তাদের কাছে শিক্ষা পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন (Tagore, 1964)। উমা দাশগুপ্ত মূলত আলোকপাত করেছেন, ঔপনিবেশিক শাসনের পরবর্তীকালে জাতীয় শিক্ষার গঠনে রবীন্দ্র শিক্ষা দর্শন কিভাবে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল (Gupta, 2009)। শিক্ষা এবং জাতীয়তাবদের আন্তঃসম্পর্ক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ভাবনা তিনি বিধৃত করছেন।

**অস্পৃশ্যতাবিরোধী চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ এবং শান্তিনিকেতনে বর্ণাশ্রম**

অস্পৃশ্যতার দোহাই দিয়ে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কাছে ব্রাত্য এবং ঘৃণিত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে অবগত ছিলেন। এ বিষয়ে আপাতভাবে নীরবতা থাকলেও কোনো কোনো রবীন্দ্র সমালোক এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের অস্পৃশ্যতা বিরোধী চিন্তাভাবনা বিষয়ে বিশদে আলোচনা করেছেন, সুধীরচন্দ্র কর 'কল্যাণব্রতী রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬৩) এবং সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কার সমিতি' (১৯৬৬) তে। ১৯৩২ সালে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় মহাত্মা গান্ধী যে অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন, শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ আশ্রমবাসীদের নিয়ে সে আন্দোলনের সাড়া দেন। এই উপলক্ষে গঠিত হয় শান্তিনিকেতনে সংস্কার সমিতি। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (মুখোপাধ্যায়, ১৯৮২) এবং প্রশান্তকুমার পাল (পাল, ১৯৮২) রবীন্দ্রনাথের অস্পৃশ্যতা বিরোধী কার্যকলাপ সবিস্তারে বিধৃত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গণসচেতনতা মূলত 'অস্পৃশ্য' সাধারণের প্রতি তাঁর সহমর্মিতার বোধ থেকে উৎসারিত। রবীন্দ্রনাথের পরিবারের সংস্কার মুক্তির যে ধারা ছিল তা প্রবাহিত হয়েছিল তাঁর মননে এবং কার্য পরিকল্পনায়। গীতাঞ্জলি (১৯১০) রচনার পূর্ব পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ অস্পৃশ্যতাকে গ্রহণযোগ্য

মনে না করলেও অস্পৃশ্যতা কে লালন করে যে বর্ণাশ্রম ধর্ম তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন (সরকার, ২০০৫, পৃ-৪০)। এ বিষয়ে এক দ্বিধাগ্রস্থ রবীন্দ্রনাথের দেখা পাওয়া যায়। পল্লীবঙ্গের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচিতির সুযোগ ঘটে তাঁর ১৮৯১ সালে জমিদারি সূত্রে কুষ্টিয়ার শিলাইদহে এসে যখন তিনি হিন্দু সমাজের কিছু জাতির সঙ্গে পরিচিত হন যাদের ভদ্রলোক শ্রেণির হিন্দুগণ 'অস্পৃশ্য' বা 'ছোটোলোক' হিসাবে চিহ্নিত করেছে (সরকার, ২০০৫)। লক্ষ্য করেন নিম্নবিত্ত মুসলমান সমাজের সামাজিক অবস্থান। রবীন্দ্রনাথের এই দ্বন্দ্ব মূলত আদিব্রহ্ম সমাজ শিক্ষায় লালিত রবীন্দ্রনাথ এবং আধুনিক ও মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথের মধ্যের দ্বন্দ্ব। রবীন্দ্রনাথের পরিবারের ঐতিহ্যগত স্বাতন্ত্র্য এবং তাঁর পূর্বপুরুষদের সংস্কারমুক্ত মননের প্রভাব তাঁকে অস্পৃশ্যতার মত দৃঢ়মূল সংস্কারকে অগ্রহণযোগ্য ভাবতে সহায়তা করেছিল। রবীন্দ্রনাথের পরিবার 'পিরালি ব্রাহ্মণ' হিসাবে পরিচিত ছিল এবং ব্রাহ্মণ সমাজে তাদের সামাজিক মর্যাদা হ্রাস পেয়েছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ব্রাহ্মসমাজের উদ্ভব এবং এই সমাজের ধারক এবং বাহক হিসাবে বিত্তবান ঠাকুর পরিবার সর্বাগ্রগণ্য হয়ে উঠলে এই পরিবারে হিন্দুত্বের প্রতি আকর্ষণ তীব্রতা হ্রাস পায়। তাঁরা হিন্দু সমাজের সংস্কারগুলি নির্লিপ্তভাবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করেছিলেন। হিন্দু সমাজের বহু কুসংস্কার তাঁরা বেরিয়ে এলেও বর্ণাশ্রম তথা ব্রাহ্মণত্বের প্রভাব বলয় থেকে সম্পুর্ণভাবে বেরিয়ে আসা সম্ভব হয় নি। রাজা রামমোহনের লোকহিতকর এবং সমাজসংস্কারমূলক কাজের প্রধান সহায় ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কার থেকে নিজেকে বের করে এনেছিলেন অনেক ক্ষেত্রে। ১৮৪২ সালে তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজে ভার গ্রহণ করার পর প্রকাশ্যে বেদ পাঠের রীতি ঘোষিত হয়। ১৮৬১ সালে তিনি উপবীত ত্যাগ করেন এব উপনয়ন প্রথা বর্জন করেন (Sastri, 1974)। পরবর্তীকালে তিনি আবার বর্ণাশ্রম প্রথায় মোহাবিষ্ট হন। তাঁর মধ্যে এই দ্বিধার পরিচয় পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের উপনয়নের সময়। পিতার মত রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও বর্ণাশ্রম সম্পর্কে দ্বিধা থাকলেও সংস্কারমুক্তির চেতনা থেকে তিনি অস্পৃশ্যতার সংস্কার তিনি সমূলে ত্যাগ করেন।

তৎকালীন বাঙালী সমাজে অস্পৃশ্যতার ভয়ংকর প্রকোপ সম্পর্কে সম্যক ভাবে পরিচিত হন ১৮৯১ সালে জমিদারী দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন শিলাইদহ, পতিসরে অবস্থান করেন। তিনি শিলাইদহের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন—"আমি পল্লিগ্রামে দেখিয়া আসিলাম সেখানে নমঃশূদ্রদের ক্ষেত্র অন্য জাতিতে চাষ করে না, তাহাদের ধান কাটে না, তাহাদের ঘর তৈরি করিয়া দেয় না... অর্থাৎ পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে মানুষের কাছে মানুষ যে সহযোগিতা দাবি করিতে পারে আমাদের সমাজ ইহাদিগকে তাহার অযোগ্য বলিয়াছে, বিনা অপরাধে আমরা ইহাদের জীবনযাত্রাকে দুরূহ ও দুঃসহ করিয়া তুলিয়া জন্মকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইহাদিগকে প্রতিদিন দন্ড দিতেছি।"(কর, ১৯৬৩, পৃ-৬৮) জমিদারি তদারকি উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ এই সমাজকে এবং তথাকথিত স্পৃশ্য এবং অস্পৃশ্য এই দুই অংশের পারস্পরিক সম্পর্ককে নিখুঁত ভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন (সেন, ১৯৬২, পৃ -১০-১১)। তবে বর্ণাশ্রম প্রথার

প্রতি পিতা এবং পুত্র রবীন্দ্রনাথ বীতশ্রদ্ধা ছিল না। ১৯০১ সাল নাগাদ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়, ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বোর্ডিং বিদ্যালয়' এর নাম রাখেন 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম'। রবীন্দ্রনাথকে 'গুরুদেব' নামে ভূষিত করার পিছনে ব্রহ্মবান্ধব উপাধায়ের প্রভাব ছিল যা বর্ণিত হয়েছে রবীন্দ্রজীবনীতে (মুখোপাধ্যায়, ১৯৮২)। রবিজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সবিস্তারে বর্ণনা করছেন কিভাবে ব্রহ্মবাধব উপাধ্যায়ের প্রভাবে শান্তিনিকেতনে বর্ণাশ্রম আদর্শ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ছাত্ররা জুতো ও ছাতার ব্যবহার করত না, নিরামিষ আহার করত, এবং উল্লেখযোগ্য ভাবে আহারের সময় জাতিভেদ অনুযায়ী পংক্তিভোজনের রীতি চালু হয়েছিল। এবং এই বিধান মনুসংহিতায় বর্ণিত ব্রহ্মচারীর জন্য নির্দিষ্ট আচারের অনুরূপ (মুখোপাধ্যায়, ১৯৮২)। কুঞ্জলাল ঘোষকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে দেখা যাচ্ছে, অব্রাহ্মণ শিক্ষক কুঞ্জলাল ঘোষকে ব্রাহ্মণ ছাত্ররা প্রণাম করতে অসম্মত হলে তিনি হিন্দু সমাজের বিরোধিতা না করার আদেশ দেন। তবে একই চিঠির শেষে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'অব্রাহ্মণকে প্রণামের ব্যবস্থা কি কোথাও নাই?"[৬] এই প্রশ্ন থেকে বোঝা যায় বর্ণাশ্রম অনুযায়ী বিধান দিলেও তিনি আন্তরিক ভাবে এ বিষয়ে দ্বিধামুক্ত ছিলেন না। 'সমস্যা' প্রবন্ধে ১৮৮৬ সালে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন-

> বর্তমান বঙ্গসমাজ যে এতটা ঘোলাইয়া গিয়াছে তাহার গুরুতর কারণ আছে। প্রাচীন কালে স্ত্রী পুরুষ বা সমাজের উচ্চনীচ শ্রেণির মধ্যে শিক্ষার ন্যূনাধিক্য ছিল বটে, কিন্তু শিক্ষার সাম্যও ছিল। সকলের বিশ্বাস, লক্ষ্য, আকাঙ্ক্ষা, রুচি ও ভাব এক প্রকারের ছিল। সমাজ সমুদ্রের মধ্যে তরঙ্গের উঁচু-নিচু অবশ্যই ছিল, কিন্তু তেল-জলের মতো একটা পদার্থ ছিল না। পরস্পরের মধ্যে যে বিভিন্নতা ছিল তাহার ভিতরের ও জাতীয় ভাবের একটি ঐক্য ছিল, সুতরাং এরূপ সমাজে জটিলতার কোনো সম্ভবনা ছিল না। সে সমাজ সবল ছিল কি দুর্বল ছিল সে কথা হইতেছে না, কিন্তু তাহার সর্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্য ছিল, অর্থাৎ তাহার অঙ্গপ্রতঙ্গের মধ্যে সামঞ্জস্য ছিল, কিন্তু এখন সেই সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া গেছে। (ঠাকুর, ১৮৮৬)

একদিকে আদি ব্রহ্মসমাজের নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ব্রহ্মসমাজের শিক্ষক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের বর্ণাশ্রম সম্পর্কিত মনোভাবকে প্রভাবিত করেছিল কিন্তু যে রীতিতে মানবিকতার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় তা তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি। ১৮৮৫ সালে 'ব্রাহ্মণ' কবিতায় সত্যকামের জন্মপরিচয় জানার পর মহর্ষি গৌতম বলছেন,

অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত।[৭]

---

[৬] কুঞ্জলাল ঘোষকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি।

[৭] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ব্রাহ্মণ, চিত্রা কাব্যগ্রন্থ।

১৯০০ সালে তিনি 'কৃষ্ণকলি' কবিতায় যার বর্ণনা দিচ্ছেন, নিকটবর্তী কোনো মাঠে কোনো গ্রাম্য কিশোরীর। "এ ক্ষেত্রে কিশোরীটির জাত উদ্ধার করা কঠিন কিছু নয়। কেননা তৎকালীন শিলাইদহের জনবিন্যাসের ধরন বিবেচনায় রাখলে নিম্নবর্গীয় কোনো হিন্দু কন্যা বা নিম্নবিত্তের কোনো মুসলমান কন্যার পক্ষেই সম্ভব মাঠের মধ্যে ঐভাবে গরু চরানোর কাজে নিযুক্ত হওয়া। সামাজিক ভাবে অস্পৃশ্য এই কিশোরীকে এইভাবে সৌন্দর্যশালিনী হিসেবে গড়ে তোলার পেছনে ক্রিয়াশীল রবীন্দ্র-মনোভাব এখানে পরোক্ষভাবে হলেও অস্পৃশ্যতাবিরোধীতার পরিচয় দেয়" (সরকার, ২০০৫, পৃ-৪৫)।

রবীন্দ্রনাথের এই সাম্যের মনোভাব তাঁর 'গোরা' (১৯১০) উপন্যাসে ছাপ ফেলেছিল সুগভীর ভাবে। এখানে গোরা চরিত্র নির্মিত হয়েছে হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও শেষ পর্যন্ত বিশ্বমানবতাবাদের মিশ্রণে। গোরা 'অস্পৃশ্য' জনসমাজের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে আন্তরিক ভাবে। রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করছেন, "গোরার প্রত্যহ সকালবেলায় একটা নিয়মিত কাজ ছিল। সে পাড়ার নিম্নশ্রেণীর লোকেদের ঘরে যাতায়াত করিত। তাহাদের উপকার করিবার বা উপদেশ দিবার জন্য নহে – নিতান্তই তাহাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিবার জন্যই যাইত। শিক্ষিত দলের মধ্যে তাহার এরূপ যাতায়াতের সম্বন্ধ ছিল না বলিলেই হয়" (ঠাকুর, ১৩৯৬, পৃ-১৫৫) 'ঘরে বাইরে' (১৯১৫) উপন্যাসে নিখিলেশ বলে "আমার ভারতবর্ষ শুধু ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ নয়। আমি স্পষ্টতই জানি আমার নীচের লোক যত নাবছে, তারা যত মরছে ভারতবর্ষই মরছে" (ঠাকুর, পৃ-২৪০)। 'বোষ্টমী' (১৯১৪) গল্পের পটভূমি হিসাবে 'শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে শচীন্দ্রনাথ অধিকারী শিলাইদহের সর্বক্ষেপী নামের এক বোষ্টমীর কথা উল্লেখ করছেন যার সঙ্গে মিলে যায় গল্পের আনন্দী বোষ্টমীর চরিত্র নির্মাণ বৈশিষ্ট্য। সর্বক্ষেপী সম্পর্কে তিনি লিখছেন, "গ্রামের ভদ্র পাড়ায় ইনি কারো সঙ্গে মিশতে পারতেন না... এর গুরু কে ছিলেন তাও জানতাম না,তবে ঐ অঞ্চলে এর বারো-চৌদ্দ জন শিষ্য ছিল তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে।.. এই পরিচয়হীনা বৈষ্ণবীটির সঙ্গে অভিজাত জমিদার রবীন্দ্রনাথের যে ঘনিষ্ঠতা দেখেছি, তাতে আশ্চর্য হবারই কথা।" (অধিকারী, ১৯৭৪, পৃ-১১৪) অচলায়তন নাটকে (১৯১২) দর্ভক চরিত্রটি নিসংন্দেহে নিম্নশ্রেণির হিন্দুর প্রতিনিধিত্ব করছে নাট্যকার স্পষ্টতই উল্লেখ করছেন তাকে অন্ত্যজ পতিত জাতি হিসাবে। ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনে এই শ্রেণিটি তফসিলি হিন্দু হিসাবে চিহ্নিত হয়। সদিরাজপুরে নমঃশূদ্র পাড়ার পাষাণ মন্ডল রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল। পাষাণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বোটে প্রায় আলাপ আলোচনা করতেন। শচীন্দ্রনাথ অধিকারী জানাচ্ছেন এই পাষাণ মন্ডল প্রতিবছর মহোৎসব করতেন। নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের অবিসংবাদিত নেতা হরিচাঁদ ঠাকুর 'মতুয়া' ধর্মমতের প্রচলন করেন, এই মতুয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে ডঙ্কা, কাঁসি, শিঙ্গা সহযোগে মহোৎসবের বিশেষ প্রচলন রয়েছে। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠাকালে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "কোনো জাতি যদি স্বাজাত্যের ঔদ্ধত্ববশত ধর্ম ও সম্পদকে একান্ত আপন বলে মনে করে, তবে সেই অহংকারের প্রাচীর দিয়ে সে তার সত্য সম্পদকে বেষ্টন করে রাখতে পারবে না... স্বজাতির অচল সীমানার মধ্যে আপনাকে

সংকীর্ণভাবে উপলব্ধি করাই কি সবচেয়ে বড়ো গৌরব। এই বিশ্বভারতী ভারতবর্ষের জিনিস হলেও একে সমস্ত মানবের তপস্যার ক্ষেত্র করতে হবে।... এই জন্যই ভারতের ক্ষেত্রে বিশ্বভারতীকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই"(মুখোপাধ্যায়, ১৯৩৬, পৃ-৯০)।

'রথের রশি' (১৯৩২) নাটকে অস্পৃশ্যতার বিরোধী বার্তা দিয়েছেন তিনি, 'চণ্ডালিকা' (১৯৩৩) নৃত্যনাট্যের কেন্দ্রীয় বিষয় অস্পৃশ্যতার কুসংস্কার বিরোধিতা। জীবনের শেষ পর্যায়ে 'তাসের দেশ' (১৯৩৯) শীর্ষক প্রতীকনাট্যে রবীন্দ্রনাথ অস্পৃশ্যতার ভিত্তি বর্ণাশ্রমকে কঠোরভাবে ব্যঙ্গ করেছেন। 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের 'প্রথম পূজা' (১৯৩২, আগস্ট), 'শুচি' (১৯৩২, নভেম্বর), 'স্নান সমাপন, 'প্রেমের সোনা', 'মুক্তি' 'রংরেজিনী' (১৯৩২, ডিসেম্বর) ইত্যাদি কবিতায় এবং 'পত্রপুট' কাব্যের "ওরা অন্ত্যজ ওরা মন্ত্রবর্জিত" (১৯৩৬, মে) কবিতায়, 'বীথিকা' কাব্যের 'সাঁওতাল মেয়ে' (১৯৩৫), 'অচলা বুড়ি' (১৯৩৭) কবিতায় অস্পৃশ্যতা বিরোধী বার্তা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। 'কালান্তর' (১৯৩৭) (ঠাকুর, কালান্তর, ১৯৩৭) প্রবন্ধে তিনি জাতিবিভেদ কিভাবে হিন্দুসমাজের একাধিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষতিকর সামাজিক ব্যবধান সৃষ্টি করে এবং চূড়ান্তভাবে মানবতাকে অপমান করে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 'নবযুগ" (১৯৩৩), 'পল্লীপ্রকৃতি' গ্রন্থের 'গ্রামবাসীদের প্রতি' (১৯৩১) প্রবন্ধে সাঁওতাল ছেলে মেয়েদের প্রতি সাধারণ হিন্দু সমাজের আচরণের অমানবিকতার কথা বলেছেন। তিনি লিখছেন, "মনের মধ্যে উৎকণ্ঠা নিয়ে আজ এসেছি গ্রামবাসী তোমাদের কাছে। পূর্বে তোমরা সমাজবন্ধনে এক ছিলে, আজ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে পরস্পরকে কেবল আঘাত করছ। আর একবার সম্মিলিত হয়ে তোমাদের শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। বাহিরের আনুকূল্যের অপেক্ষা কোরো না।"(ঠাকুর, ১৪১৭, পৃ -২০) শ্রীনিকেতনের একটি উৎসবে ১৯৩১ সালে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "আমাদের দেশে আমরা পরবাসী, অর্থাৎ আমাদের জাতের অধিকাংশের দেশ আমাদের নয়। সে দেশ আমাদের অদৃশ্য, অস্পৃশ্য। যখন দেশকে মা বলে আমরা গলা ছেড়ে ডাকি তখন মুখে যাই বলি মনে মনে জানি, সে মা গুটিকয়েক আদুরে ছেলের মা। এই করেই কি আমরা বাঁচব।"(ঠাকুর, ১৯৪০, পৃ-৪৩৬)

১৯৩০ সালে রাশিয়া ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেন কিভাবে সমান সুযোগ সুবিধা পেয়ে দেশের মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে। বিপরীতে আমাদের দেশে কিভাবে জীবনযাত্রার সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বঞ্চিত। 'রাশিয়ার চিঠি' তে তিনি লিখছেন, "যা দেখেছি আশ্চর্য ঠেকছে, অন্য কোনো দেশের মতোই নয়। একেবারে মূলে প্রভেদ। আগাগোড়া সকল মানুষকেই এরা সমান করে জাগিয়ে তুলছে।" (ঠাকুর, ১৪১৭, পৃ-৪৫) রাশিয়ার সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পর্যবেক্ষণ তাঁকে ভিন্ন বাস্তবতার সন্ধান দেয়। তিনি লিখছেন -

> রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের শেষ দশকে নিম্ন শ্রেণীভুক্ত শ্রমজীবী মানুষ তথা নিম্নবর্গের সাধারণ মানুষকে যে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোণে দেখতে শুরু করেছিলেন, পাশাপাশি তাঁর

> অস্পৃশ্যতাবিরোধী মনোভাবও অভিনব মাত্রা লাভ করেছিলো, তার পেছনে উল্লিখিত ভ্রমণের প্রভাব পড়া খুবই স্বাভাবিক। বস্তুত এটা ছিল রবীন্দ্রনাথের অস্পৃশ্যতাবিরোধিতার তৃতীয় পর্যায়, অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথকে যেখানে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। (সরকার, ২০০৫, পৃ -৭৯)

গান্ধী অস্পৃশ্যদের 'হরিজন' হিসাবে এবং বিবেকানন্দ 'দরিদ্র নারায়ণ' শব্দটি ব্যবহার করলেও শান্তিনিকেতনে অস্পৃশ্যতানিরোধ কমিটি গঠনকালে রবীন্দ্রনাথ তার নাম দিলেন 'সংস্কার সমিতি' কারণ শব্দগুলির মধ্যে একটি অনুকম্পার ভাব আছে বলে তিনি মনে করতেন। 'অস্পৃশ্য' দের তিনি উল্লেখ করেছেন 'দুর্গত' হিসাবে। কর্মীদের তিনি এই ভাবেই তৈরি করেছিলেন যাতে তারা বুঝতে পারে তারা করুণাবশত কাজ করে না, বরং তারা বিশেষ গোষ্ঠীর লঙ্ঘিত মানবাধিকার পুনপ্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত। ১৯৩৫ সালের ১লা ডিসেম্বর সর্বভারতীয় কর্মসূচীর অংশ হিসাবে শান্তিনিকেতনে 'সংস্কার সমিতি' (মুখোপাধ্যায়, ১৯৩৬, পৃ-৪৫১) গঠিত হয়। সমিতির নেতা ছিলেন সুধীরচন্দ্র কর। সমিতির প্রচার পত্রে লেখা হয়, "বিদ্যালয়, তীর্থক্ষেত্র, সভা–সমিতি প্রভৃতিতে কোথাও কাহারও আসিবার কোনো বাধা থাকিবে না। কাহারও জাতি লক্ষ্য করিয়া আত্মসম্মানে আঘাত দিবার অন্যায় ব্যবস্থা থাকিবে না,কাহাকেও আমরা সামাজিকভাবে হীন মনে করিব না, অস্পৃশ্য করিয়া রাখিব না, সকল জাতিকেই জল -চল করিয়া লইতে হইবে।" (মুখোপাধ্যায়, ১৯৩৬, পৃ-৪৫১) সামাজিক সমস্ত কুসংস্কার বিশেষত অস্পৃশ্যতা দূর করা এই সমিতির লক্ষ্য ছিল৷ ২৪ শে সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ একটি প্রতিজ্ঞাপত্রে শান্তিনিকেতনের কর্মীদের নিকট থেকে এই মর্মে সম্মতি সাক্ষর করিয়েছিলেন যে অস্পৃশ্যতা প্রশয় দেওয়া হবে না। ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রে লেখা ছিল, 'এতকাল হিন্দুসমাজে যাহারা অন্ত্যজ জাতি বলিয়া গণ্য, অদ্য হইতে তাহাদের সহিত পানাহারে সামাজিক বাধা মানিব না। ইহাতে সমাজে তিরস্কৃত হইলেও এই প্রতিজ্ঞা পালন করিব" (মুখোপাধ্যায়, পৃ-১৫৬) সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা থেকে জানা যায় মোট সাতচল্লিশ জন এই পত্রে সাক্ষর করেছিলেন।

**ক। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনাকাল এবং শান্তিনিকেতনে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের সমান্তরালে মেয়েদের হস্টেল নির্মাণ**

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়কে 'আবাসিক' প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিকল্পনা করেছিলেন, সূচনাকাল থেকেই ছাত্র এবং শিক্ষক সকলে আশ্রমে বসবাস করে পঠনপাঠন পরিচালনা করতেন বা অংশ নিতেন। এই আবাসজীবন চরিত্রগত থেকে স্বতন্ত্র। বিশ্বভারতীর আবাসজীবন তপোবন ব্রহ্মচর্যাশ্রম চতুরাশ্রমের ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। রবীন্দ্রচিন্তায় যে আবাসজীবনের প্রতীতি ছিল, তপোবন শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে তিনি স্বদেশি শিক্ষার পুনর্গঠন চেয়েছিলেন। যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম থেকে ছাত্র এবং শিক্ষক পাঠ আদান প্রদানে মগ্ন থাকবেন। এই আবাসজীবন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বাস্তুতন্ত্রের মত যেখানে

ব্যক্তির ছাত্রসত্তা সার্বিক ভাবে বিকশিত হবে। চতুরাশ্রমের ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিভাগের একটি প্রতিফলন এই আবাসজীবনে লক্ষিত হয়। ঔপনিবেশিক শিক্ষার বিপরীতে তপোবন শিক্ষা সংস্কারকে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের আবাসজীবনে গ্রহণ করেছিলেন। শান্তিনিকেতনে সূচনা কাল থেকে নারীশিক্ষা প্রচলন এবং মেয়েদের হস্টেল নির্মাণের সময় ক্রম উল্লেখ করা হল—শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা- ১৯০১ সালে, বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা – ১৯২১ সালে, নারীভবনের সূচনা ১৯২১ সালে, এরপর কিছু সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে যায় নারীভবন। নির্মিত হয় বিচ্ছিন্ন কিছু ছাত্রীনিবাস—দ্বারিক, লেবুকুঞ্জ, নতুন বাড়ি ইত্যাদি (১৯২১-১৯২৯) কিছু সময়ের জন্য এগুলিও বন্ধ হয়। অবশেষে শ্রীভবন নির্মিত হয় ১৯২৯ সালে। এই শ্রীভবন পরবর্তীতে শ্রীসদন ছাত্রীনিবাস হিসাবে পরিচিত হয়। 'শ্রীসদন' বিশ্বভারতীতে প্রথম মেয়েদের হস্টেল।

চিত্র – ১ পাঠভবনের ছাদ থেকে গৌরপ্রাঙ্গনের পশ্চিমদিক, Edward Hopper র তোলা, রবীন্দ্র ভবন চিত্র সংগ্রহশালা থেকে সংগৃহীত।

### বিশ্বভারতীতে নারীশিক্ষার উষালগ্ন

রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীশিক্ষা' নামক প্রবন্ধটি তাঁর মেয়েদের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে অভিমত সুস্পষ্ট ভাবে অনুধাবন করা যায়। এখানে তিনি মেয়েদের শিক্ষাকে একটি লৈঙ্গিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন,

> শিক্ষাব্যবস্থায় মেয়ে পুরুষে কোনো ভেদ থাকিবে না, এ কথা বলিলে বিধাতাকে অমান্য করা হয়। বিদ্যার দুটি দিক আছে – একটি বিশুদ্ধ জ্ঞানের দিক, একটি ব্যবহারের। যেখানে বিশুদ্ধ জ্ঞানের দিক সেখানে মেয়ে পুরুষে কোনো পার্থক্য নাই - কিন্তু যেখানে ব্যবহারের দিক সেখানে পার্থক্য আছেই। মেয়েদের মানুষ হইতে শিখাইবার জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা চাই। কিন্তু মেয়েদের মেয়ে হইতে শিখাইবার জন্য যে ব্যবহারিক শিক্ষা তার একটি বৈশিষ্ট্য আছে।" (ঠাকুর, ১৩২২, পৃ-১৫)

মেয়েদের এই 'মেয়ে হইতে শিখাইবার' শিক্ষা তৎকালে গুরুত্ব পেত। জন স্টুয়ার্ট মিল 'সাবজেকশন অব ওম্যান' এ সোফিকে এই মেয়ে হয়ে উঠবার শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, যেখানে তারা সামাজিক লৈঙ্গিক ভূমিকার একটা অংশ হিসাবে শিক্ষাগ্রহণ করে লৈঙ্গিক সামাজিক ভূমিকাকেই মসৃণ করে তুলবে ও পিতৃতান্ত্রিক পরিষেবাকে পোক্ত করে তুলবে। তিনি আরো লিখছেন, আমাদের দেশে সাধারণত ছেলেদের শিক্ষাব্যবস্থা যতখানি সুষ্টু নীতির মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে, ঠিক ততখানি আন্তরিকতা ও আগ্রহ নিয়ে মেয়েদের শিক্ষাব্যবস্থার চেষ্টা কমই দেখা গিয়েছে। নারী শিক্ষায় তদানীন্তন কালে, সেই অনগ্রসরতার যুগেও কবি জ্ঞানানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক শিক্ষার প্রতিও বিশেষ যত্ন নেন। দৈনন্দিন জীবনে মেয়েদের সবরকম গৃহকর্ম, রোগীর সেবা, অতিথি আপ্যায়ন, প্রাথমিক চিকিৎসা, সূচিশিল্প, রন্ধনকার্য, গৃহসজ্জা ও পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে নানারকম খেলাধুলা, নৃত্যগীত, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদির বিশেষ ব্যবস্থাপনার মাঝে শিক্ষাকে সব রকম ভাবে সুপ্রকাশিত করার চেষ্টা করেছিলেন। বানী নিয়োগী 'শ্রীসদনের ইতিকথা' বইতে রবীন্দ্রনাথের নারীশিক্ষা সম্বন্ধে উদ্যোগ সম্পর্কে লিখছেন, "নারীর কল্যাণময়ী অন্নপূর্ণা রূপটি তিনি স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বত্র প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন।"(নিয়োগী, ১৪০৬, পৃ-৪০) নারী শিক্ষা সূত্রপাতের প্রথম যুগে এই 'কল্যাণময়ী অন্নপূর্ণা' রূপটির গুরুত্ব ছিল যথেষ্ট। 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' এর কাজ ততদিনে এগিয়েছে। শহরের চার দেয়ালের বাইরে নীরস শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে একদা জনশূন্য মাত্র দুটি ছাতিম গাছের তলায় কবিগুরুর ঐকান্তিক সাধনা ও ভাবাদর্শের পীঠস্থান বিশ্বভারতী নির্মিত হল। ব্রহ্মবিদ্যালয় সুষ্ঠুভাবে চলতে শুরু করলে রবীন্দ্রনাথ মন দিলেন নারীবিদ্যালয় স্থাপনে। রবিজীবনীতে বর্ণিত হচ্ছে, "শান্তিনিকেতনে ধীরে ধীরে নারী সমাগম বাড়ছিল। শরৎকুমার চক্রবর্তী বিলেত গেলে মাধুরীলতা শিশুছাত্রদের পড়াবার দায়িত্ব নেন, 'বড়োমা' হেমলতা দেবীর কাছে এই শিশুরা মায়ের স্নেহ লাভ করত। রবীন্দ্রনাথ শিশুদের তত্ত্বাবধান ও পড়াশুনার ক্ষেত্রে মেয়েদের ভূমিকাকে মূল্যবান মনে করতেন। দায়িত্বটিকে ইচ্ছাধীন না রেখে নিয়মানুগ করবার বাসনায় তিনি অজিতকুমারের মা সুশীলা দেবীকে শিশুবিভাগের ভার দেওয়ার কথা লিখেছিলেন ৪ শ্রাবণ ১৩১৫; ১৯০৮, ১৯ জুলাই এর পত্রে।" (পাল, ১৯৯৩, পৃ-৬৯) নারীশিক্ষার প্রারম্ভিক যুগে আশ্রমবাসী অধ্যাপকদের পুত্রকন্যা ও তাদের আত্মীয় স্বজনের কন্যারাই ছিলেন নারীশিক্ষার প্রাণকেন্দ্র। এ বিষয়ে রবিজীবনীকার প্রশান্তকুমার পালের লেখায় তথ্য পাওয়া যায়। তিনি লিখছেন, "যে সব মেয়েরা ইতিমধ্যে শান্তিনিকেতেনে এসে পড়েছেন, তাঁদের জন্য শিথিল ধরনের একটি শিক্ষাব্যবস্থা ছিল। আলোচ্য সময়ে আরো কিছু মেয়ে শান্তিনিকেতনে এলেন। বিভুচরণ গুহঠাকুরতার বালবিধবা ভগ্নী লাবণ্যলেখা রবীন্দ্রনাথের কন্যাস্থানীয়া হয়ে কার্তিক মাসে শিলাইদহে তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেন ওপরে শান্তিনিকেতনবাসিনী হন। পূজাবকাশে ঢাকা গিয়ে ক্ষিতিমোহন তাঁর কিশোরী শ্যালিকা হেমলতা (টুলু) ও বন্ধু প্রসন্নকুমার সেনের দুই কন্যা হিরণ ও ইন্দুকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। জগদানন্দের কন্যা তরুবালা এবং পারুল তখন শান্তিনিকেতনে। এঁদের নিয়ে একটি ছোটো বালিকা

বিদ্যালয় গড়ে উঠল।"(পাল, ১৯৯৩, পৃ–৬৯) মাত্র পাঁচ ছয় জন ছাত্রী নিয়েই ১৩১৫ বঙ্গাব্দে প্রথম শুরু হয় নারী বিদ্যালয়। তখনও কোনো স্থায়ী পাঠকেন্দ্র স্থাপিত না হওয়ায় ছাত্রীরা বালকদের সঙ্গেই পড়াশুনা করতেন। এইভাবেই প্রায় বালক বিদ্যালয়ের সঙ্গে নারী বিদ্যালয়ের সূচন হয়। এই নারী বিদ্যালয় সম্বন্ধে ৩১ চৈত্র (১৩ এপ্রিল) মনোরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "বিদ্যালয়টি বেশ পূর্ণ হয়ে এসেছে। ক্রমে এর পাশে একটি বালিকা বিদ্যালয়ের ছোট্ট চারা আপনিই গজিয়ে উঠেছে। এবং হু হু করে সেটা বেড়ে ওঠবার মতলব করচে। অনেকদিন থেকে মনে ইচ্ছা ছিল কিন্তু ভয়ে এগই নি – ঠাকুর যখন আপনি ঘরে এসেছেন পূজা না করে ত আর নিষ্কৃতি নেই"(ঠাকুর, চিঠিপত্র ১৩, পৃ-৭৯)। কিন্তু শান্তিনিকেতনের আদিপর্বে এই বিদ্যালয় বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। নানারকম বাধাবিপত্তি ও প্রশাসনিক কিছু কাজে মোহিতচন্দ্র সেনের স্ত্রী সুশীলা দেবী মেয়েদের তত্ত্বাবধানের জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন (আষাঢ়, ১৩১৬)। রবি জীবনীর ষষ্ঠ খন্ডে জীবনীকার লিখছেন পূজাবকাশের পর সুশীলা দেবী আর ফিরে আসেন নি। তারপর নারী বিদ্যালয়টিও বন্ধ হয়ে যায়।

নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট সচেতন ও আশাবাদী ছিলেন। বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও নিরলস ভাবে স্ত্রীশিক্ষার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তিনি ব্রতী হন। পরবর্তীতে নারী বিভাগ সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও স্ত্রীশিক্ষা সূত্রপাতের আদিপর্বে অনেক সমস্যা তৈরি হয়েছিল। এবিষয়ে প্রথম যুগের নারী বিদ্যালয়ের ছাত্রী হেমলতা গুপ্তের একটি চিঠি উল্লেখযোগ্য –

> ১৩১৫ বঙ্গাব্দের পূজাবকাশের পর ঢাকার প্রসন্নকুমার সেনের দুই কন্যা হিরণ ও ইন্দুলেখাকে নিয়ে বালিকা বিদ্যালয়ের সূচনা। হেমলতা গুপ্ত আসেন সে বছর পৌষ উৎসবের পর। পরে গয়া প্রবাসী তারকচন্দ্র রায়ের কন্যা প্রতিভা ও তাঁর ভ্রাতা শ্রীশচন্দ্র রায়ের কন্যা সুধা আসেন। এই কয়েকজনই ছিলেন বালিকা বিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রী। 'দেহলী' বাড়ির একতলা ছিল ছাত্রীনিবাস। রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ কন্যা মীরা দেবী ও কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ তাঁদের দিদিমা রাজলক্ষ্মী দেবীর তত্ত্বাবধানে থাকতেন 'দেহলী'- সংলগ্ন 'নতুন বাড়িতে'। মীরা দেবী ওই বালিকা–বিদ্যালয়ে যোগ দেন। আর একজন সমসাময়িক অনাবাসিক ছাত্রী ছিলেন রাধাকান্ত গুহঠাকুরতার বালবিধবা কন্যা লাবণ্যলেখা দেবী। ... অল্প কিছুকাল এই বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা সাগরিকা। তিনি নীচুবাংলায় তাঁর জ্যাঠাইমা হেমলতা দেবীর কাছে থাকতেন। (ঠাকুর, চিঠিপত্র ১৩, পৃ - ২৭৬-৭৭)

রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র থেকেও জানা যাচ্ছে, মোহিতচন্দ্র সেনের বিধবা পত্নী সুশীলা দেবী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের দেখাশুনা করার দায়িত্ব নেওয়ার পর তাঁর দুই কন্যা মীরা ও উমাকেও সঙ্গে আনেন এবং তাঁরাও বিদ্যালয়ে যোগ দেন। কিন্তু সুশীলা দেবী বেশিদিন দায়িত্বে ছিলেন না। তিনি চলে গেলে তাঁর স্থানে এসেছিলেন রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের জননী গিরিবালা দেবী। তাঁর দুই কন্যা

কল্যাণী ও কাত্যায়নী এই বিদ্যালয়ে যোগ দেন। হেমলতা দেবীর (গুপ্ত) চিঠির বিশেষ অংশ থেকে এও জানা যায়, সে সময়ে অর্থাৎ নারীশিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল তাকে ঠিক সহশিক্ষা বলা যেত না। সে সময়ের নিয়মাবলীতে কিছুটা কড়াকড়ি বজায় ছিল। ছাত্রীনিবাসের বাইরে মেয়েদের চলাফেরার অনুমতি ছিল না ও ক্লাসও হত ছাত্রীনিবাসের সংলগ্ন ঘরে – অবশ্য সেখানে সে ক্লাসের ছেলেরাও এসে পড়ে যেত। ছাত্রীদের খাবার আসত 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' বিদ্যালয়ের রান্নাঘর থেকে। এই বিদ্যালয়ের নিয়মাবলী বিষয়ে অজিতকুমার চক্রবর্তী মহাশয়কে কবিগুরুর ৯ অক্টোবর ১৯০৯ সালে লেখা একটি চিঠির অংশ উল্লেখ করা হল—

> স্ত্রীবিদ্যালয় সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম স্থির করা কর্তব্য। নতুবা ওখানকার বালকবিদ্যালয়ের সঙ্গে হয়ত্ত তার সুর মেলবার আশঙ্কা আছে। বিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের ও অনেকের মন বোধহয় এ সম্বন্ধে পীড়িত হচ্ছে – সেটা ঠিক কল্যাণকর নয়। অবশ্য যেখানে কোনো অন্যায় নেই সেখানে কারো সংস্কারের দিকে তাকাবার দরকার নেই – কিন্তু সংস্কারকে একেবারেই অশ্রাব্য করারও প্রয়োজন দেখিনে। তার মানে, কাজ থাকলে কাজ চালাতে হবে, কিন্তু যেখানে কাজ নেই সেখানে সতর্ক হওয়া উচিত। মেয়েরা শান্তিনিকেতনে, জগদানন্দের বাড়ীতে বা নীচের বাংলোয় অত্যন্ত প্রয়োজন ব্যতীত স্বেচ্ছামত যাতায়াত করতে পারবে না, এই নিয়ম করে দিয়ো – ক্লাসের প্রয়োজনের বাইরে অধ্যাপকদের সঙ্গেও তাদের যোগ থাকবে না। ওদের ওঠা খাওয়া প্রভৃতির সময় সুনির্দিষ্ট থাকবে এবং বাইরে বেড়াতে যাওয়ার সময় তাদের কর্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাবে এইরকম স্থির থাকা ভাল। (ঠাকুর, চিঠিপত্র ১৩, পৃ -২৭৭-২৭৮)

আশ্রমপিতা মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে যেমন সচেতন ছিলেন তেমনি মেয়েদের নিরাপত্তা ও নিয়মশৃঙ্খলার কঠোরতার প্রতিও তাঁর দায়িত্ববোধ ছিল প্রখর। পরবর্তীকালে এখানে সহশিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়। সেযুগে এই ব্যবস্থাপনা খুব সহজ ছিল না। বঙ্গীয় নবজাগরণের মধ্যে তিনি মেয়েদের তদানীন্তন আধুনিকতার আলোর শরীক হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যয়ের লেখা 'শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী' থেকে জানা যায় তৎকালে সে সময়ে পর্দা প্রথা কি হারে বিদ্যমান ছিল। তিনি লিখছেন, "মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে একত্রে পড়ে, ক্লাশের পরে ছাত্রদের সঙ্গে আর কোনো সম্বন্ধ ছিল না। সে সময়ে পর্দা প্রথা পুরোপুরি না থাকলেও কতখানি ছিল তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায় একটি ঘটনা হইতে। রথীন্দ্রনাথের বিবাহের পর পুত্রবধু প্রতিমা দেবী ও আশ্রম বালিকারা 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' অভিনয় করে। এই অভিনয় বিদ্যালয়ের ছাত্ররাও দেখিতে পায় নাই – আমরা তো দূরের কথা। শান্তিনিকেতনের দোতলায় অভিনয় হয়। পৌষ মেলায় মেয়েদের বাজী দেখারও অধিকার ছিল না। পরে মেয়েদের একটি চারচাকা শকটে ভরিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে মন্দিরের কোণায় গাড়ী লইয়া যাইতাম, শকটের ঝিলিমিলি দিয়া মেয়েরা মেলা দেখিত। সহশিক্ষা

প্রথা বোধ হয় বাংলাদেশে এই প্রথম। বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা অবধি কবিকে নানা ধরনের বাধার সম্মুখে পড়তে হয়। তবে এ ধরনের বাধার পরিপূর্ণ রূপটি কিন্তু কোথাও সুষ্ঠুভাবে জানা যায় নি। প্রশান্তকুমার পাল মহাশয়ের বক্তব্যে জানা যায়, "সম্ভবত শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের পক্ষ থেকে কিছু প্রতিবন্ধকতা আসছিল। ১৩১৬ (১৯০৯) ৭ শ্রাবণ (২৩ জুলাই) রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহনকে লেখেন, "দীনু বালিকা বিভাগ সম্বন্ধে নানা কথা লিখেছে তৎসম্বন্ধে আমার যা বক্তব্য তাকে বলে দিয়েছি ছাত্রীসংখ্যার তুলনায় ব্যায়াধিক্যও অন্যতম সমস্যা ছিল।"প্রায় দুই বৎসর চলার পর আদি পর্বের নারী–বিদ্যালয়টি যখন উঠে যায় তখন কবির মনঃপীড়ার শেষ ছিল না। তিনি এ সম্বন্ধে তাঁর মনোবেদনার কথা ২ কার্তিক (১৯ অক্টোবর, প্রবাসী) অজিত চক্রবর্তী মহাশয়কে ব্যথিত চিত্তে লেখেন — "মেয়ে বিদ্যালয় উঠে গেছে কিন্তু তার বেদনা আমার মন থেকে কিছুতে যাচ্ছে না। এক একবার মনে করছি, এই বিদ্যালয়টিকে আর কোনো একটি অনুকূল জায়গায় গড়ে তোলবার চেষ্টা করতে হবে। দেশে যার প্রয়োজন আছে তাকে সহজে ত্যাগ করা চলে না।" (অজিত চক্রবর্তী মহাশয়কে লেখা চিঠি, প্রবাসী) ১৩১৬, ১২ কার্তিক (২৯ অক্টোবর) ১৯১০ অন্যতমা ছাত্রী ইন্দুলেখা চৌধুরীকে আশ্বাস দিয়ে লেখেন, "তোমাদের জন্য আমার মন ব্যথিত আছে সে তোমরা জান, যদি পেরে উঠি আবার তোমাদের কাছে আনার ব্যবস্থা করব।" এটি নিছক আশ্বাস ছিল না সে কথা জানা যায় ২২ কার্তিক (৮ নভেম্বর) শিলাইদহ থেকে ক্ষিতিমোহনকে লেখা পত্রে, "এখানে কন্যা বিদ্যালয় খুলিবার জন্য রথীর সঙ্গে কথা চলিতেছে। স্থানাভাব আছে – একটি কাছারির ঘর প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইতেছে, সেটি হইলে তবে এখানে জায়গা হইবে।" (পাল, রবিজীবনী ৬য়, পৃ-১৮৪) রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের শিক্ষার বিষয়ে বিশেষ ভাবে আগ্রহী এবং সংবেদনশীল ছিলেন তাঁর চিঠিপত্র তার সাক্ষ্য বহন করে। তাঁর একান্ত সুহৃদ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য থেকে জানা যায় তিনি তাঁর পরবর্তী জীবনে নারীশিক্ষার জন্য যেভাবে প্রাণপাত চেষ্টা করেন তা সংক্ষেপে বলা যায় না। তিনি আরো ও বলেন যে কেবল নারীদের জন্যই তিনি একটি বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। অর্থের অভাবে কবির এ ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি। আর্থিক অস্বচ্ছলতায় উদবিগ্ন কবি কখনো মনে করেছিলেনার সব বিভাগ তুলে দিয়ে তিনি কেবল কলাভবন, সংগীতভবন ও নারীদের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা সমেত শ্রীভবনটি রাখবেন। কবির মনের এই কথা গুলি জানা যায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' প্রবন্ধ থেকে। এই প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয় প্রবাসী প্রথম খন্ড বৈশাখ – আশ্বিন ১৩৪৮ সংখ্যায়।

সূচনাপর্বে 'দেহলি', 'নতুনবাড়ি', 'দ্বারিক' 'লেবুকুঞ্জ' ইত্যাদি যেসব বাড়ি একদিন ছাত্রীনিবাস রূপে ব্যবহৃত হয়েছিল, একমাত্র 'দেহলি' এবং 'নতুনবাড়ি' ছাড়া অন্যান্য বাড়িগুলি আর এখন দেখা যায় না। কালের স্রোতে এবং প্রয়োজনের তাগিদে এই ঘর গুলি অবলুপ্ত হলেও অতীতের বহু বিদগ্ধ মানুষ এবং প্রাচীন আশ্রমিকদের অনেকের লেখায় পুরাতন ছোট ছোট ছাত্রীনিবাস গুলির নানান স্মৃতি আজো উজ্জ্বল হয়ে আছে। এই প্রসঙ্গে বলি ছাত্রীনিবাস হিসাবে ব্যবহৃত পুরোনো বাড়িগুলির বিশেষ কিছু মূল্যবান তথ্য

পাওয়া যায় অনাথনাথ দাসের লেখা 'শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন' বইতে। নানান স্মৃতিবিজড়িত পুরোনো দিনের এই বাড়িগুলির উল্লেখ রয়েছে নানা জায়গায়। শালবিথিতে প্রবেশের মুখেই ডান দিকে পড়ে 'দেহলি' বাড়ি। এ বাড়িতে একদা কবি নিজে বাস করেছেন। এ বাড়ি প্রথমে একতলা ছিল, পরে দোতলা করা হয় এবং একতলায় একসময় ছাত্রিনিবাস হয়েছিল। এর পরেই পর পর কয়েকটি খড়ের চালের একতলা বাড়ি যাকে বলা হয় 'নতুন বাড়ি'। পুরোনো দিনের অনেক স্মৃতিবিজড়িত এই বাড়িগুলি জীর্ণ হলেও সময়োচিত সংস্কারের মাধ্যমে এগুলির পুর্বরূপ বজায় রাখার চেষ্টা হয়েছে। এ বাড়িতে এক সময় শিক্ষকেরা অনেকেই বাস করেছেন। সম্ভবত এ বাড়িরই এক অংশ আজ 'আলাপিনী মহিলা সমিতি'র সভাগৃহ রূপে ব্যবহৃত হয় আর 'দেহলি' বাড়ি আজ শিশু পাঠ নিকেতন – কবি পত্নী মৃণালিনী দেবীর স্মৃতিবিজড়িত' মৃণালিনী আনন্দ পাঠশালা। 'দেহলি' বাড়ির দক্ষিণ দিকে অবস্থিত 'দ্বারিক' নামে দোতলা বাড়িটি নির্মিত অ্যান্ড্রুজ এবং পিয়ারসনের জন্য। এখানে এককালে উপর তলায় ছিল কলা শিক্ষার্থীদের ক্লাশ এবং নীচের তলায় সংগীত বিভাগের ক্লাশ নিতেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরে কিছুদিন এ বাড়িও ছাত্রীনিবাস হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এ বাড়িটি বর্তমানে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত। দ্বারিক বাড়ির দক্ষিণ দিকে অবস্থিত 'লেবুকুঞ্জ' নামক একটি বাড়িতে কবিকন্যা মীরা দেবী থাকতেন। এ সময়ের বেশ কিছু পরে ১৩২৮ বঙ্গাব্দে এখানে বহিরাগত ছাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা হয় এবং মেয়েদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন স্নেহলতা সেন নামে এক বিদূষী মহিলা (নিয়োগী, ১৪০৬, পৃ-৪৫)। এই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বাড়িগুলিই সেদিনের ছাত্রীনিবাস। কালানুক্রমে ধীরে ধীরে নারীশিক্ষার অগ্রগতির ফলে স্থায়ী ছাত্রীনিবাস শ্রীসদন প্রতিষ্ঠিত হয়।

নারী শিক্ষার প্রাক্কালে তাঁকে নানাভাবে বিব্রত হতে হয়েছিল। তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজ এই নারীশিক্ষা খুব সহজ ভাবে নেয় নি। সমালোচনা আর বাধাবিপর্যয়ে প্রথম যুগে নারীবিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। আবার শুরু হয় রবীন্দ্রনাথের অসীম আগ্রহে। নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তাধারা ছিল অতি সুস্পষ্ট এবং যুক্তিপূর্ণ। 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকাতে সার সংগ্রহ নামক প্রতিবেদন থেকে তাঁর নারী শিক্ষা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা জানা যায়। সেখানে লেখা হচ্ছে, নারী জাতির 'হৃদয়টি খুব উচ্চ হইলেও তাহা কল্যাণ ইচ্ছায় পূর্ণ না হইলে তাহার সার্থকতা নাই'–অতএব মেয়েদের শিক্ষার বিষয়ে কবির উদ্যোগ ছিল 'উদার ও ব্যাপক'। জ্ঞানশিক্ষা এবং ব্যবহারিক শিক্ষার সঙ্গে মেয়েদের মানসিক শিক্ষার দিকটিও তিনি চিন্তা করেছিলেন। ১৩২৯ সাল নাগাদ তখনো ছাত্রী সংখ্যার পরিমাণ তেমন বেশি না হলেও আশ্রমে স্বয়ং কবিগুরুর পরিচালনায় নারীদের পঠন পাঠনের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে নানারকমের উৎসব অনুষ্ঠান তখন শুরু হয়েছে। 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকার মাঘ সংখ্যা ১৩২৯ তে দেখা যায় 'শ্রীপঞ্চমী' উপলক্ষে আশ্রমে 'বসন্তোৎসব' সমারোহের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছিল। "এইদিন সন্ধ্যা বেলায় গুরুদেব ছাত্রীদের লইয়া কলাভবনে গান করিয়াছিলেন। ছাত্রীরা সকলেই বাসন্তী রঙে ছোপানো শাড়ি পরিয়াছিল, মাথায় সকলের ফুল গোঁজা ছিল। ... এই গানের দলকে চমৎকার দেখিতে হইয়াছিল।" (শান্তিনিকেতন পত্রিকা, মাঘ সংখ্যা,

১৩২৯) শান্তিনিকেতন পত্রিকা ফাল্গুন সংখ্যা থেকে জানা যায় এই সময় রবীন্দ্রনাথ আশ্রমের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কলকাতার বসন্তোৎসব করেছিলেন এবং 'বসন্ত' নাটক ও রচনা করেন। বসন্তের গান গাওয়া হয়। এইভাবে নিয়মিত পঠন–পাঠনের সঙ্গে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের পরিচালনা ও নির্দেশনায় শান্তিনিকেতনে একটি উচ্চমানের নৃত্যগীতের সংগে মেয়েরা অংশগ্রহণ শুরু করে। অমিতা সেন 'শান্তিনিকেতনে আশ্রমকন্যা' গ্রন্থে বর্ণনা করছেন ১৯১০ সালে রথীন্দ্রনাথের বিয়ে উপলক্ষে মেয়েদের নাটকে অংশগ্রহণের কথা—

> নববধূ প্রতিমা দেবীকে নিয়ে বিদ্যালয়ের মেয়েরাও আনন্দোৎসবে মেতে গেল। নববধূকে নিয়ে মেয়েরা করবে 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' অভিনয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে শুরু হল মহড়া, লক্ষ্মীর ভূমিকায় নববধূ প্রতিমা, রাণী কল্যাণীর ভূমিকায় হেমলতা। তারপর অভিনয়ের দিনে দেখা দিল মহা সমস্যা। মেয়েরা বেঁকে বসল। পুরুষদের সামনে তারা অভিনয় করবে কি করে? আজ যেটা সমস্যাই নয় সেদিনে সেটা মহা সমস্যা এবং অসম্ভবই বলা চলে। এদিকে অভিনয় যদি সবাই দেখতেই না পারল তবে অভিনয়ের সার্থকতা কোথায়? রবীন্দ্রনাথকে ভাবিয়ে তুলল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমস্যার সমাধান তিনিই করলেন। ব্যবস্থা হল একেবারে উল্টো, মেয়েরা যথারীতি মঞ্চে অভিনয় করল, পুরুষেরা অভিনয় দেখলেন চিকের আড়ালে বসে। আনন্দ থেকে কাউকে বঞ্চিত হতে হল না। এইভাবে বালকবালিকাদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাধারা প্রাণোচ্ছ্বল গতিতে এগিয়ে চলল। (ঠাকুর, ১৯৭৭, পৃ -৯)

একটি ছাত্রের আত্মহত্যার ঘটনায় আশ্রমে শোকের ছায়া নেমে আসে। বালিকাদের আবাস তুলে দিতে হয়। বালিকারা যে যার ঘরে ফিরে গেল। অমিতা সেনের মাসিমার কাছে এই ঘটনা শুনেছেন কিভাবে রবীন্দ্রনাথ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিদায় দিয়েছিলেন বালিকাদের।

চিত্র -২ আশ্রমমাঠ, শ্রীসদনের সামনে মেয়েরা বাস্কেট বল খেলছে, শম্ভু সাহার তোলা ছবি, রবীন্দ্রভবন ছবি সংগ্রহশালা থেকে সংগৃহীত।

চিত্র – ৩ লেদার বাটিক, শিল্পকর্মে নিমগ্ন ছাত্রী। S.P Gavande এর তোলা ছবি। রবীন্দ্রভবন ছবি সংগ্রহশালা থেকে সংগৃহীত।

চিত্র – ৪ শান্তিনিকেতনে মেয়েদের শিক্ষার সূচনাপর্বে মেয়েদের সহশিক্ষা এবং বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহনের ছবি। পুরোনো লাইব্রেরী, পাঠভবন, S.P Gavande এর তোলা ছবি। রবীন্দ্রভবন ছবি সংগ্রহশালা থেকে সংগৃহীত।

চিত্র – ৫ চৈত্যর সামনে শ্রীসদনের ছাত্রীরা। শম্ভু সাহার তোলা ছবি। রবীন্দ্রভবন চিত্র সংগ্রহশালা থেকে সংগৃহীত।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সমসময় থেকেই নারীরা শান্তিনিকেতনের কর্মকাণ্ডে সামিল হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ নারীদের কল্যাণ স্পর্শে আশ্রমের উজ্জীবন চেয়েছিলেন। মেয়েদের শিক্ষা এবং মেয়েদের অংশগ্রহণে তিনি উৎসাহী ছিলেন তা তাঁর লেখা চিঠিপত্র থেকে উপলব্ধ হয়। শান্তিনিকেতনে বিদূষী নারীরা যাঁরা প্রধানত উচ্চবর্ণ এবং উচ্চবর্গ পরিবার থেকে আগত তাঁরা রবীন্দ্রনাথের আশ্রম নির্মাণের কর্মে ব্রতী হয়েছিলেন (Mukhopadhyay, 2016)। সেকালের নারীদের স্মৃতিকথা থেকে অনুভূত হয়, কিভাবে আশ্রম জীবনে, রবীন্দ্র সান্নিধ্যে তাঁরা ব্রহ্মবিদ্যালয়ে ছাত্রী হিসাবে, আবাসিকা হিসাবে, আশ্রমিক হিসাবে আনন্দময় সময় কাটিয়েছেন, যে সময়কে ফিরে দেখেছেন পুনরায় স্মৃতিকথায়। স্মৃতিকথায় তাঁদের যে আত্মপরিচয়ের বোধ এবং পরিবারের বাইরে নতুন আত্ম পরিচয়ে অন্বিত হওয়ার ছাপ দেখতে পাওয়া যায় তা অনন্য। একজন নারী আশ্রমের বৃহৎ পরিবারে নিজেকে যেভাবে আবিষ্কার করছেন, রবীন্দ্রনাথের আদর্শের বাস্তবায়নে যে ভূমিকা নিচ্ছেন অথবা রবীন্দ্রনাথ তাঁদের যে ভূমিকায় দেখতে চাইছেন তার ভিত্তিতে তাঁরা যেভাবে নিজেদের গড়ে তুলছেন–এই আত্মনির্মাণের মধ্য থেকে যে নবনির্মিত 'আত্ম' প্রতিফলিত হচ্ছে তাঁদের স্মৃতিকথায় এই 'আত্ম'টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে শিক্ষার হাত ধরে নারীর আত্মপরিচয় নির্মাণের একটি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। 'শিক্ষিতা', 'আধুনিক', 'আবাসিকা', 'ছাত্রী', 'আশ্রমিক', এই পরিচিতিগুলির প্রতিফলন স্মৃতিকথাগুলিতে। এই পরিসরে কিছু স্মৃতিকথার উল্লেখ করা যায়, অমিতা সেনের, 'শান্তিনিকেতনে আশ্রমকন্যা', 'চলে যায় দিন' (সেন, ২০০১), 'শিরিষ বকুল আমের, মুকুল' (সেন,

২০০০), ‘আনন্দ সর্বকাজে’ (সেন, ১৩৮৯)-এ দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্র সান্নিধ্যে তাঁর আত্ম উদ্বোধন। যে আত্মবোধ বিচ্ছিন্ন নয় তার চারপাশ থেকে। রানীচন্দের ‘সব হতে আপন, (চন্দ, ১৪০১) ‘গুরুদেব’ (চন্দ, ১৩৬৯), ‘আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ’ (চন্দ, ১৩৪৯) এ যে শিক্ষিতা, আবাসিকা আশ্রমিক ছাত্রীর দেখা পাওয়া যায় তা তৎকালের শান্তিনিকেতনের নির্মাণ, রবীন্দ্রনাথের নারীশিক্ষাদর্শের রূপায়ণ। উল্লেখ করা যায় প্রতিভা গুপ্তের ‘শিক্ষাগুরু’, রমা চক্রবর্তীর ‘ভরা থাক স্মৃতিসুধায়’ (চক্রবর্তী, ১৪০৮), চিত্রনিভা চৌধুরীর ‘রবীন্দ্রস্মৃতি’ (চৌধুরী, ২০১৭), ইন্দিরা দেবীর ‘আবির্ভাব’ (দেবী, ১৩৬৮), মহাশ্বেতা দেবীর ‘আমাদের শান্তিনিকেতন’ (দেবী, ২০০১), মৈত্রেয়ী দেবীর ‘পঁচিশে বৈশাখ’, কণিকা বন্দোপাধ্যায়ের ‘আনন্দধারা’ জ্যোৎস্না বন্দোপাধ্যায়ের ‘আমাদের শান্তিনিকেতনে যা দেখেছি, যা পেয়েছি’ (বন্দোপাধ্যায়, ১৩৯১) ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়।

**শান্তিনিকেতনে মেয়েদের হস্টেল নির্মাণ; রবীন্দ্রনাথের লিঙ্গসাম্যের উদ্যোগ**

‘শ্রীভবন সম্বন্ধে আমার আদর্শ’ প্রবন্ধে আশ্রমপিতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতীতে নারী শিক্ষা ও মেয়েদের হস্টেলের বিষয়ে তাঁর মনোভাব সম্যক প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সময়ের শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা বিশ্বভারতী নিউজ, শান্তিনিকেতন পত্রিকা, এছাড়াও রবীন্দ্র জীবনী, রবিজীবনী এবং রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে শান্তিনিকেতনে মেয়েদের পড়াশুনা এবং হস্টেল নির্মাণ কালীন তর্ক বিতর্ক ও আলোচনার হদিশ পাওয়া যায়। আশ্রমের সূচনাপর্বের নারীবিদ্যালয় এবং ছাত্রীনিবাস ‘দেহলি’, ‘নতুনবাড়ি’, ‘দ্বারিক’, ‘লেবুকুঞ্জ’ এই ছাত্রীনিবাসগুলি কিভাবে একত্রিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শান্তিনিকেতনে মেয়েদের প্রথম হস্টেল ‘শ্রীভবন’ যা পরবর্তীকালে ‘শ্রীসদন’ নামাঙ্কিত হয়। “শ্রীভবন সম্বন্ধে আমার আদর্শ” প্রবন্ধটিতে একদিকে যেমন কবির ভাবাদর্শ, নারীশিক্ষা বিষয়ে তাঁর ধ্যান ধারণার একটি সুস্পষ্টতা রয়েছে তেমনি ছাত্রীনিবাসের প্রশাসনিক পরিকাঠামোসহ নিয়মশৃঙ্খলা, শান্তি সংহতি রক্ষা করার বিষয়টিও উল্লিখিত হয়েছে। আশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক বা সূচনা পর্বে ‘শ্রীসদন বা শ্রীভবনের কোনো উল্লেখ নেই। নারী বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাবার পর পুনরায় আশ্রমবাসী গুরুকন্যাগণ সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে থাকেন। কবির বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের কন্যা রমা কর, হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়ের কন্যা মায়া, সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর ভাগিনী উমা আর ভগিনেয়ী আগমনী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের দুই ভগিনী কল্যাণী ও কাত্যায়নী। এছাড়াও ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের তিনকন্যা সহ সুরেন ঠাকুরের দুই কন্যা। অমিতা সেনের স্মৃতিকথা[৮] থেকে এই তথ্য গুলি জানা যায়। আশ্রমের আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে এই বাড়িগুলি প্রায় অধিকাংশইগুলিই পাকা ছিল না। ১৯১৯-১৯২১ সালের মধ্যে গুরুপল্লী তৈরির কিছুদিন পর পুনরায় কয়েকজন ছাত্রী নিয়ে শুরু হয় ‘নারীভবন’। যদিও নারীভবন সৃষ্টির অনেক আগে থেকেই আশ্রমের

---

[৮] অমিতা সেনের আশ্রমজীবনের স্মৃতিকথা গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি ‘শান্তিনিকেতনে আশ্রম কন্যা’, অমিতা সেন, (১৯৭৭). শান্তিনিকেতন আশ্রম কন্যা (প্রকাশকাল -৭ই পৌষ, ১৩৮৪). কলকাতা, টেগোর রিসার্চ ইন্সটিটিউট।

গুরুকন্যাগণ পঠন–পাঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ‘ব্রহ্মচর্যাশ্রম’সৃষ্টির সূচনা থেকেই রবীন্দ্রনাথের যে নারীবিদ্যালয় গড়ে তোলার প্রাণপণ আন্তরিক চেষ্টা ছিল তা নারীবিদ্যালয় উঠে যাবার প্রায় এগারো-বারো বছর পর আবার বহিরাগত ছাত্রীদের বসবাসের জন্য সেকালের দ্বারিক বাড়ির দক্ষিণ অংশে ‘লেবুকুঞ্জ’ সৃষ্টি হয়। মীরা দেবীর স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় ‘দেহলি’ বাড়ির পাশে নির্মিত ‘নতুন বাড়ি’তে বসবাসকারী সকল ছাত্রীদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় সে সময়ে কিছু মেয়েদের থাকার ব্যবস্থা হয় ‘লেবুকুঞ্জে’। মেয়েদের বোর্ডিং যখন খোলা হল তখন স্নেহলতা সেন মেয়েদের তত্ত্বাবধানের জন্য থাকতেন বোর্ডিং এ। ১৩২৮ সালের শান্তিনিকেতন পত্রিকায় মাঘ মাসের আশ্রম সংবাদে (শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৩২৮) একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল যেখানে দেখা যাচ্ছে, ১৩২৮ অর্থাৎ ১৯২১ সাল নাগাদ শান্তিনিকেতনে আবাসিক ছাত্রীদের জন্য একটি নতুন ছাত্রীনিবাসের ব্যবস্থা হয়। উদ্ধৃত করা হল— “সম্প্রতি আশ্রমে একটি ছাত্রীনিবাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্তা স্নেহলতা সেন কিছুদিন হইতে আশ্রমে আসিয়া বাস করিতেছেন। মহিলাটি বালিকাদের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। তাছাড়া তিনি অধ্যাপনায় ও সাহায্য করিতেছেন।” (শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৩২৮,পৃ-১৩)

**শান্তিনিকেতনে নারী সমিতি**

অবিভক্ত বাংলা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছাত্রীরা আসতে শুরু করলে ছাত্রীনিবাসে স্থানাভাব দেখা দেয়। ইতিমধ্যে ১৩২৮ সালে আশ্রম বিদ্যালয় ধীরে ধীরে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ২৩ শে ডিসেম্বর ১৯২১ সালে ৮ই পৌষ ১৩২৮ বোলপুর শান্তিনিকেতনে আশ্রমের সাংবৎসরিক সভায় প্রশাসনিক নিয়মকানুনের সঙ্গে ‘নারীসমিতি’ তৈরি হয়। Visva–Bharati Memorandum Association Statutes and Regulation পুস্তিকার তৃতীয় পাতায় নারী সমিতি (Women’s Committee) সম্বন্ধে বিশদে বিবরণ পাওয়া যায়। নারী বিভাগ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ‘শান্তিনিকেতন নারী সমিতি’ নামে সম্পূর্ণ পৃথক সমিতি তৈরি হয়। মহিলা ছাত্রী, মহিলা আগন্তুকদের শান্তিনিকেতনে অবস্থানকালে তাঁদের থাকা, খাওয়া, শরীরচর্চা, গৃহবিজ্ঞান, প্রাথমিক চিকিৎসা, রোগীর সেবাশুশ্রূষা, কলা ও সংগীত বিদ্যা ইত্যাদি শিক্ষণের ব্যাপারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় তত্ত্বাবধান করাই ছিল এই সমিতির মূল লক্ষ্য।

আশ্রমের নারীদের পরিচালনা করা থেকে ছাত্রীনিবাসগুলি দেখাশোনা করা সমিতির কাজের মধ্যে পড়ত। ছাত্রীনিবাসের তত্ত্বাবধায়ক স্নেহলতা ছিলেন এই সমিতির সদস্য ও সম্পাদক। এছাড়াও সদস্য ছিলেন কিরণবালা সেন, প্রতিমা ঠাকুর, সুধীরা বসু, যুগলমোহিনী সেন প্রমুখ। স্নেহলতা দেবী শান্তিনিকেতনে এলে আশ্রমপিতা তাঁকে নারী বিভাগের দায়িত্ব নিতে আন্তরিকভাবে অনুরোধ করেন স্নেহলতা তা সাগ্রহে স্বীকার করেন ও আজীবন পালন করেন” (নিয়োগী, ১৪০৬, পৃ-১১১)। ধীরে ধীরে ‘লেবুকুঞ্জ’এ বহিরাগত ছাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা হলে নিয়মিত ভাবে রবীন্দ্রনাথ স্নেহলতা দেবীকে চিঠি লিখে

ছাত্রী আবাসটি পরিপূর্ণ সংস্কারের বিষয়ে খোঁজ নিতেন। ১৩২৯ সালের শ্রাবণ সংখ্যা শান্তিনিকেতন পত্রিকা থেকে জানা যাচ্ছে যে এখানে ক্রমাগত বহিরাগত ছাত্রীদের স্থানাভাব বাড়ছে। রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের জ্ঞানশিক্ষার সঙ্গে ব্যবহারিক শিক্ষার প্রতিও সচেতন ছিলেন। কন্যা মীরা দেবীকে তিনি চিঠিতে লিখছেন এ বিষয়ে। প্রাথমিকভাবে বন্ধ হয়ে গেলেও ১৯৩১ সালে কলাভবনের কৃতি ছাত্রী যমুনা সেন 'কারুসংঘ' তৈরি করেন। নারীশিক্ষার প্রথম যুগে ১৩২৬ সালে আসামের তাঁতশিল্প দেখে মুগ্ধ কবি এখানে তাঁতশিল্পের সূচনা করেন। ধীরে ধীরে ছাত্রীনিবাসের ছাত্রী সংখ্যা বাড়তে থাকে। সূচনা পর্বে ছাত্রীনিবাসে ছাত্রী সংখ্যা ছিল সীমিত মাত্র ১৪ জন। ১৩২৬ সালে শান্তিনিকেতন পত্রিকাতে দেখা যাচ্ছে সে সময় ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৪০ জন এবং ছাত্রী ১৪ জন। স্নেহলতা দেবীর তত্ত্বাবধানে নারীভবন ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে চলে। সে সময়ের নানা পত্রপত্রিকাতে কবিগুরুর বিভিন্ন ধরনের নারীভবন সংক্রান্ত পরিকল্পনা, চিন্তাভাবনা, সম্বলিত মূল্যবান চিঠিপত্র এবং তখনকার বহু বিদগ্ধ মানুষজন এবং ছাত্রছাত্রীদের বিবরণ থেকে নারীভবনের সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশের কথা জানতে পারা যায়। যখন কবিগুরুর নির্দেশনায় আশ্রমের মেয়েরা নাচ, গান, নাটকে অংশগ্রহণ শুরু করে। রক্ষণশীল সমাজ এবিষয় নিয়ে সমালোচনা শুরু করলেও রবীন্দ্রনাথের অদম্য প্রচেষ্টায় তা অব্যহত থাকে। এদিকে ছাত্রীনিবাসে তখন ছাত্রী সংখ্যা বাড়তে থাকে। এ সময়ে আসেন তটিনী দাস, শান্তা চট্টোপাধ্যায়, আশা অধিকারী, রাজেশ্বরী বাসুদেব প্রমুখ। এঁরা থাকতেন লেবুকুঞ্জে। আশ্রম বিদ্যালয়ে শিশু বিভাগের সঙ্গে ছাত্রীনিবাসের একটি নিবিড় সম্বন্ধ সে যুগে ছিল। স্নেহলতা সেন, ললিতা মুখার্জীর উদ্যোগে গৃহদীপ গার্লস গাইড প্রতিষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তার নাম দেন 'সহায়িকা'। এবং 'সহায়িকা'র জন্য গান রচন করেন "অগ্নিশিখা এসো, এসো"। নারীশিক্ষার চরম অনগ্রসর যুগেও রবীন্দ্রনাথ নারীশিক্ষা সম্পর্কে প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৯২৯ সালে নির্মিত হয় বিড়লাকুঠী। ইতিমধ্যে স্নেহলতা দেবী গয়া চলে যান। ছাত্রীনিবাসের দায়িত্ব গ্রহণ করেন হেমবালা সেন মহাশয়া। অকুণ্ঠ নিষ্ঠা ও গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি তাঁর কাজ করেছেন। প্রবাসী পত্রিকার স্বনামধন্য সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ নারীশিক্ষা সম্পর্কে লিখেছিলেন। ১৩৩০ সালে প্রবাসী অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'নারীবিভাগ' নামে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় –

> শান্তিনিকেতন আশ্রমে বিশ্বভারতীর অন্তর্গত নারী বিভাগ হইতে স্ত্রীলোকেদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আপাততঃ এখানে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে সংগীত-চিত্রকলা, বস্ত্রবয়ন, বই বাঁধানো প্রভৃতি হাতের কাজ শিক্ষা দেওয়া চলিতেছে। সেই সঙ্গে স্বাস্থ্যতত্ত্ব, রোগী পরিচর্যা, শাকসবজি ফলমূলের বাগান তৈরি গৃহকর্মপ্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে ছাত্রীরা পারদর্শিতা লাভ করে ইহাই আমার ইচ্ছা। নারীশিক্ষায় আগ্রহবান ব্যক্তিদের নিকট হইতে যথেষ্ট আনুকূল্য পাইলে দেশ বিদেশ হইতে উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী সংগ্রহ করিয়া এখানে উচ্চ আদর্শের নারীশিক্ষা গড়িয়া তুলিতে কৃতকার্য হইব। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেশের বিদ্যোৎসাহী বদান্য ব্যক্তি বিশেষের

নিকট হইতে এককালীন মাসিক বা বাৎসরিক অনুদান প্রার্থনা করিতেছি।আশা করি আমাদের আবেদন বৃথা যাইবে না। (প্রবাসী, ১৩৩০,পৃ -২৩০)

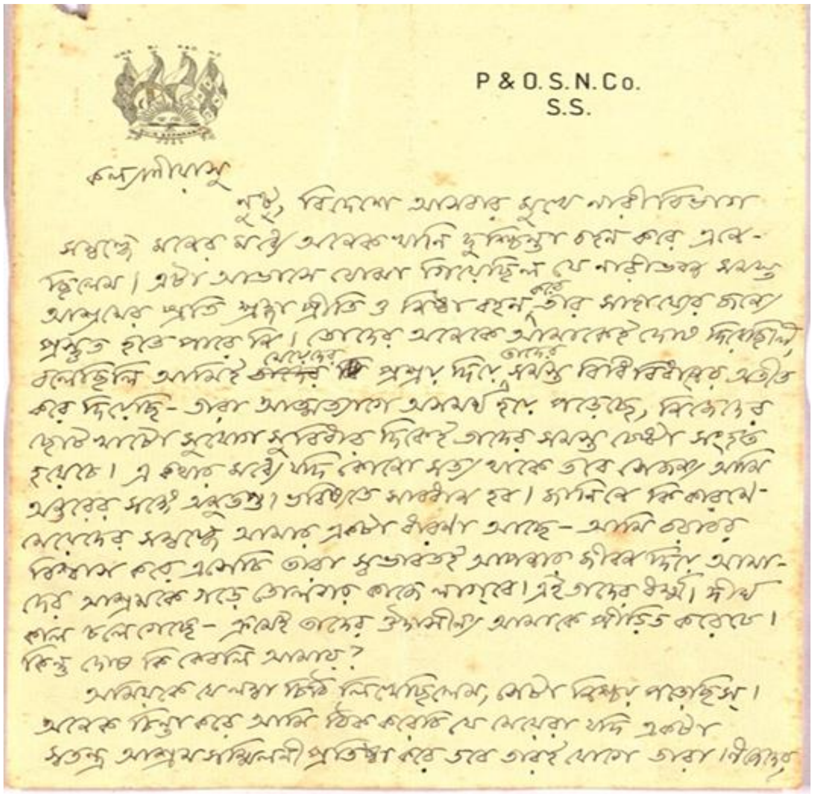
P & O.S.N.Co.
S.S.

কল্যাণীয়াসু

সুস্থ, বিদেশে আসবার মুখে নারীবিভাগ সম্বন্ধে মনের মধ্যে অনেকখানি দুশ্চিন্তা বহন করে এনেছিলেম। একটা আশ্বাস বোঝা গিয়েছিল যে নারীভবন সমস্ত আশ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা প্রীতি ও নিষ্ঠা বহন করে তার সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত হতে পারে নি। তোদের অনেকে আমাকেই দোষ দিয়েছিল, বলেছিলি আমিই মেয়েদের প্রশ্রয় দিয়ে তাদের সমস্ত বিধিবিধানের অতীত করে দিয়েছি— ওরা আত্মত্যাগে অসমর্থ হয়ে পড়েছে, নিজেদের ছোটখাটো সুযোগ সুবিধার দিকেই তাদের সমস্ত চেষ্টা সংহত হয়েছে। এ কথার মধ্যে যদি কোনো সত্য থাকে তবে সেজন্য আমি অন্তরের মধ্যে অনুতপ্ত। ভবিষ্যতে সাবধান হব। জানিনে কি কারণে মেয়েদের সম্বন্ধে আমার একটা দুর্বলতা আছে— আমি বরাবর বিশ্বাস করে এসেছি ওরা স্বভাবতই আপনার জীবন দিয়ে আমাদের আশ্রমকে গড়ে তোলবার কাজে লাগবে। এই তাদের ধর্ম। দীর্ঘ কাল চলে গেছে— ক্রমেই তাদের ঔদাসীন্য আমাকে পীড়িত করেছে। কিন্তু দোষ কি কেবলি আমার?

অমিয়কে যে লম্বা চিঠি লিখেছিলেম, সেটা নিশ্চয় পড়েছিস। অনেক চিন্তা করে আমি ঠিক করেছি যে মেয়েরা যদি একটা স্বতন্ত্র আশ্রমসম্মিলনী প্রতিষ্ঠা করে তবে তবেই যোগ্য তারা। নিজেদের

চিত্র – ৬ হেমবালা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি। রবীন্দ্রভবন চিঠি সংগ্রহশালার সৌজন্যে প্রাপ্ত।

বিদেশ থেকে বহু বিদুষী মহিলা এসে এখানে নারীশিক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন যেমন, দেজিরে লেভি, ডঃ স্টেলা ক্র্যামরিশ, ফ্রান্সের আঁদ্রে কার্পেলে, মেরী ভ্যান ইগান, মিস গ্রোচেন গ্রীন, মিস ফ্লাউম, মিস বসনেক, মার্গারেট সিগেল। নারীভবন সৃষ্টি হবার পর বহু বিদূষী মহিলার অবদানে পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে সেদিনের নারীশিক্ষার প্রগতিশীল ধারাটি। ইতিমধ্যে নারীশিক্ষার প্রসার ঘটায় বিশেষ সুযোগ সুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ছাত্রীরা আসতে শুরু করেন। রাজপুতানা থেকে এসেছিলেন একজন। এলেন কবির স্বদেশী যুগের বন্ধু প্রেমতোষ বসুর কন্যা ইভা এবং চিত্তরঞ্জন দাশের ভগিনী ঊর্মিলা দেবীর কন্যা সতী। জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি গৃহকর্মের শিক্ষাও তাদের ছাত্রীনিবাসে নিতে হত, সবকাজ নিজে হাতে করতে হত আবাসিকাদের। ১৩৩০ সালে আশ্বিন সংখ্যায় শান্তিনিকেতন পত্রিকায় আশ্রম সংবাদে ছাত্রীদের 'ঋতুমঙ্গল' অভিনয়ের খবর জানা যায় (শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৩৩০ আশ্বিন সংখ্যা) সে সময় রণজিৎ সিং এর কাছে এস্রাজ বাজানো শিখতেন। হেমবালা সেনের যোগ্য পরিচালনায় নারীভবন ক্রমোন্নতির দিকে এগিয়ে চলে। ক্রমাগত ছাত্রী অগমনের চাপ বেড়ে চলেছে। বহু ছাত্রীর

আবেদন স্থানের অভাবে গ্রহণ করা যাচ্ছিল না। কিন্তু নতুন আবাসের ব্যবস্থা না থাকায় সবাইকে গ্রহণ করা যাচ্ছিল না। **১৯২৭** সালের **২৭** জানুয়ারী  নারীভবনের ছাত্রী সংখ্যা ছিল মোট ৪৪ জন। পরিদর্শিকা মহাশয়াকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র থেকে জানা যায় নারী শিক্ষার অগ্রগতিতে তাঁর আগ্রহের সুস্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়। ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিকল্প ব্যবস্থার সংবাদ পাওয়া যায় এপ্রিল **১৯২৮** সালের বিশ্বভারতী বুলেটিনের ৯৪ পৃষ্ঠায়  মহিলা কলেজ সংবাদ সূত্রে। এই প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে ছাত্রীনিবাসের স্থানাভাবের জন্য অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার সুবিস্তৃত খেলার মাঠ, উন্মুক্ত এবং সুন্দর বাগানযুক্ত একটি ছাত্রীনিবাস নির্মিত হচ্ছে। **১৯২৮** সালের বিশ্বভারতী বুলেটিনে দেখা যায় –

> A building is being erected for the housing of girls' students, with actual play ground and attached garden. Regular instruction with practical training is going on. All the girl students are expected to attend the Kala Bhavan for a course of music and painting. By the special arrangement with the Culcutta University, students both boys and girls after completing the V. B. Course, may if they so desire go up for I.A and B.A examination of Calcutta University. (বিশ্বভারতী বুলেটিন, এপ্রিল **১৯২৮**, পৃ-৯৪)

এরপর আবাসিক ছাত্রছাত্রী বাড়তে থাকে **১৯২৮** সালে মোট আবাসিক ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৪০ জন। তৎকালে আবাসিক অধিবাসীদের মধ্যে ছিল গভীর আন্তরিকতা ও সহযোগিতার মনোভাব।

চিত্র –৭ নারীভবনের ঠিকানায় হেমবালা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি। রবীন্দ্রভবন চিঠি সংগ্রহশালা থেকে সংগৃহীত।

**বিশ্বভারতীর প্রথম মেয়েদের হস্টেল শ্রীসদন প্রতিষ্ঠা**

১৯২৯ সালে সালে বিশ্বভারতী বার্ষিক প্রতিবেদনে একটি সংবাদের মাধ্যমে ‘শ্রীভবন’ প্রতিষ্ঠার পর্বটি চিহ্নিত করা যায়। ৪০,০০০ টাকা ব্যয়ে ‘বিড়লালয়’ নামে একটি দোতলা বাড়ি নির্মিত হয়। এই বাড়ি নির্মাণ কাজ শেষ হয়ে যাবার পর আশেপাশে ছড়ানো তিন চারটি অস্থায়ী ছাত্রীনিবাস যথা ‘দ্বারিক’, ‘লেবুকুঞ্জ’ নতুনবাড়িতে যে সব ছাত্রীরা থাকতেন তাঁদের সবাইকে একত্রিত করে ১৯২৯ সালের ডিসেম্বার মাসে এই বিড়লাভবনে স্থানান্তরিত করা হয়। বাদলদাস বিড়লা নামে একজন সহৃদয় ব্যক্তির অর্থানুকুল্যে উপযুক্ত খোলা মাঠ, সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ ও মনোরম বাগান সহ সবরকম সুবিধা সহ মেয়েদের একটি আবাসস্থল নির্মিত হয় (নিয়োগী, ১৪০৬, পৃ – ১২০)। প্রথমে এই গৃহের কোনো নামকরণ না হলেও পরে রবীন্দ্রনাথ এই গৃহের নাম ‘শ্রীভবন’ নাম দেন। পরবর্তী কালে ‘শ্রীসদন’ নামকরণ হয়। দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত ২৬ জুলাই ১৯৯৭ শ্রী অরুনেন্দু বন্দোপাধ্যায়ের লেখা ‘রবীন্দ্রনাথের ডিজাইন ভাবনা’ নামক প্রবন্ধে (বন্দোপাধ্যায়, ১৯৯৭, পৃ-৪৪) রবীন্দ্রনাথকে লেখা সুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয়ের একটি চিঠি ছাপা হয়েছে। চিঠিতে বিড়লা ভবন তথা বিড়লাকুঠী নির্মাণের প্রস্তুতিপর্বের কিছু তথ্য জানা যায়— “বিড়লা ভবন প্ল্যান সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে একখানি চিঠিতে লেখেনঃ বিড়লা ভবন এর প্ল্যান পছন্দ হল কিনা জানতে পারি নাই।”(বন্দোপাধ্যায়, ১৯৯৭) শ্রীভবন ছাত্রীনিবাসের পরিকল্পনা বিখ্যাত শিল্পী ও স্থপতি সুরেন কর মহাশয়ের। রবীন্দ্রনাথ অনুমোদন করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে এই গৃহটির নাম শ্রীভবন দেন রবীন্দ্রনাথ। তখন এখানে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৪৭ জন। বিশ্বভারতী বার্ষিক প্রতিবেদনে লেখা হচ্ছে –

> Total number of boarders at the end of the year was 47 of which 40 from Bengal. 2 from Madras, 1 from Up, 1 from Gujrat, 3 from Ceylon. The distribution according to dept – School 26, Collage 12, Kala Bhavana 9, total 49. Miss Hembala Sen was incharge as the lady supdt., practically through out the year. (বিশ্বভারতী অ্যানুয়েল রিপোর্ট, ১৯২৯, পৃ -৩০)

অমিতা সেন প্রথম যুগে শ্রীভবনের পুরোনো ছাত্রীদের অন্যতম। হেমবালা সেনের ভাতুষ্পুত্রী। তিনি শান্তিনিকেতনে সংগীত চর্চা করেছিলেন, তাঁর সংগীত প্রীতির কথা রবীন্দ্রনাথও জানতেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় অমিতা সেনের কৃতিত্বে খুশি হয়ে শ্রীভবনের ঠিকানায় চিঠি পাঠিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। অমিতা সেন তাঁর স্মৃতিকথায় পরম গৌরবময় শিক্ষাজীবনের অবসানেও অনন্ত শ্রদ্ধায় শ্রীভবনকে মনে রেখেছেন এবং স্মৃতিচারণ করেছেন। সমসাময়িক আরো একজন কৃতী ছাত্রী ছিলেন রমা মুখার্জী। ১৯৩০ সালে আবাসিক ছাত্রী হিসাবে শ্রীভবনে যোগ দেন। বিত্তশালী সম্ভ্রান্ত পরিবারে মানুষ হয়েও রমা দেবী সে কালের একান্ত সাধারণ আড়ম্বড়হীন আশ্রমিক জীবনকে অতি সহজেই গ্রহণ করেছিলেন এবং কবির

সান্নিধ্যে সাহিত্যে শিক্ষালাভ করেছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্নমুখী শিক্ষাপ্রসার প্রসঙ্গে তদানীন্তন আশ্রমিক সূধীরচন্দ্র কর 'শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা' বইতে লিখেছিলেন, "লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যগীত সেলাই এবং খেলাধুলার সর্বমুখী আয়োজন করে শান্তিনিকেতনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের শিক্ষার পথ সুগম করেন, তাঁর বড়ো অবদান, শ্রীভবন।"(কর, ১৩৬০)

চিত্র –৮ বিশ্বভারতীর প্রথম মেয়েদের হস্টেল শ্রীসদন। শম্ভু সাহার তোলা ছবি, রবীন্দ্রভবন চিত্র সংগ্রহশালা থেকে সংগৃহীত।

১৯৩০ সালে বিদেশ ভ্রমণে যাবার আগে রবীন্দ্রনাথ নারীশিক্ষা বিষয়ে তাঁর ভাবনা চিঠিতে লেখেন হেমবালা সেন কে। চিঠিটি উল্লিখিত হল—

"কল্যাণীয়াসু হেমবালা,

আমাদের আশ্রমের মেয়েদের আসনটি আর একবার নতুন যত্নে নির্মলসুন্দর ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করে গেলুম। নিশ্চই জেনো, আশ্রমের প্রাণ প্রতিষ্ঠার ভার মেয়েদের পরেই। পুরুষেরা শুষ্ক নিয়মকে বড়ো বলে জানে। স্বভাবতই প্রাণের নিয়মকে মেয়েরা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে থাকে। এই জন্যই আশ্রমের মেয়েদের স্থানটিকে এত যত্নে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস পেয়েছি। তোমরা আমার প্রত্যাশা পূর্ণ করবার চেষ্টা করবে এই বিশ্বাস মনে নিয়ে আমি বিদায় নিলুম। তোমরা আমার একান্ত মনের আশীর্বাদ গ্রহণ করবে। ইতি ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৩০

শুভাকঙ্ক্ষী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" (ঠাকুর, ১৩৮১, চিঠিপত্র ১১, পৃ -৮২)

তাঁর স্থির ধারণা ছিল আশ্রমের মেয়েদের দ্বারাই আশ্রমের পরিবার সুগঠিত হবে এই আশা নিয়েই তাঁর সাহিত্যসচিব অমিয় চক্রবর্তীকে লিখেছিলেন, 'কেননা যেদিন থেকে আশ্রমে আমি মেয়েদের স্থান দিয়েছি, সেইদিন থেকেই আমার মনে এই কল্পনা ছিল যে আশ্রম রচনায় মেয়েদের ত্যাগ এবং সেবা সুন্দর ও প্রানবান হয়ে উঠবে" (ঠাকুর, ১৩৮১, চিঠিপত্র ১১, পৃ-৮২)। তিনি আরো লিখছেন, "আমার মনে ছিল মেয়েদের আগমনে আশ্রমে এই সেবাশুশ্রূষার অমৃতধারা কল্যাণে পূর্ণ হয়ে দেখা দেবে... এবং আশ্রমের মধ্যে একটি সামাজিকতার ভাবকে সরস করে তুলবে।" (ঠাকুর, ১৩৮১, চিঠিপত্র ১১,পৃ -৮২) সামাজিক সংস্কার ও সবরকম বাধাবিপত্তির ঊর্ধ্বে নারীশিক্ষার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধনের ইচ্ছা নানাভাবে নানাজনের চিঠিতে প্রকাশিত হয়েছে। অমিয় চক্রবর্তীকে আরো একটি চিঠিতে লিখছেন,

> মেয়েরা যদি আশ্রমসম্মিলনী স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত করে ও তার মধ্যে ওখানকার গুরুপত্নীরাও স্থান গ্রহণ করেন তাঁদের সকলের যোগে শ্রীভবনের ও সেইসঙ্গে সমস্ত আশ্রমের শ্রী উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। মনে আশা করে আছি একদা ওখানে নারী বিভাগটি বৃহৎ ও বিচিত্র হয়ে উঠবে এবং তার থেকে আপনিই নারী বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভাবিত হবে। এখন থেকে মেয়েরা সকলে মিলে তার ক্ষেত্রকে নিষ্কন্টক ও তার বিধিনিষেধ গুলিকে যদি সুদৃঢ় করে তোলেন, ওখানকার চিত্তকে সম্পূর্ণ অনুকূল করেন তাহলে কাজ অনেকদূর এগিয়ে যাবে। (ঠাকুর, ১৩৮১, চিঠিপত্র ১১,পৃ -৮৪)

শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠাতা আচার্যের আন্তরিক ইচ্ছা ও নিরলস প্রচেষ্টায় সবরকম সুবিধাযুক্ত চারিদিক খোলামেলা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণযুক্ত একটি স্থায়ী ছাত্রীনিবাস নির্মিত হয়।

**শ্রীসদনের গঠন শৈলী**

শ্রীসদন গৃহটির গঠন শৈলী নির্মাণ করেছিলেন সুরেন কর। আশ্রম প্রাঙ্গণের অন্যান্য বাড়ির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি হয়েছিল এই ছাত্রীনিবাস। প্রবেশপথে ঢুকলেই নজরে পড়ে ছোটোবড়ো তিনটি খিলানযুক্ত খাঁজকাটা সুবিস্তৃত বারান্দা। বারান্দার দুপাশে দুটি নাতিদীর্ঘ একজন থাকার সবরকম ব্যবস্থা যুক্ত আবাস গৃহ। এখানেই থাকতেন ভারপ্রাপ্তা পরিদর্শিকাগণ। প্রয়োজনবোধে এইখানেই এসেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছাত্রীনিবাস পরিদর্শনে বা ছাত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার্থে। বারান্দার সঙ্গে সুদীর্ঘ একটি বসার ঘর। উপরের ব্যবস্থাও ঠিক এইরকম। বড় বড় জানলার সবকটিই গারদহীন, যা এখন কল্পনা করাই যায় না। নিরাপত্তার দাবিতে আজ সর্বত্রই জাল দেওয়া। একটু লক্ষ করলেই এ বাড়ির বিশেষ ধরনের ছাদটি পুরোনো দিনের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যকে মনে করিয়ে দেয়। সুউচ্চ ভিতসহ এ বাড়ির উচ্চতা সহজেই সবার নজর পড়ে। ঢোকার পথে এ বাড়ির নির্মাণ বৈচিত্র্য সে যুগের আভিজাত্যপূর্ণ বড় বাড়ির কিছুটা আদল আসে। পরবর্তীকালে তৈরি রানী বিড়লালয়, মনোরমা গোয়েংকালয়, কলাভবন এবং সংগীতভবনের দক্ষিণ প্রান্তে পূর্বমুখী আনন্দসদন, প্রতিটি বাড়িই তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হলেও 'শ্রীভবন' ছাত্রীনিবাসের

গঠনশৈলীর এমন একটি ছাপ আছে যা অন্য সব বাড়ির তুলনায় কিছুটা ভিন্ন ছাঁদের। এ বাড়ির নির্মাণের প্রথম যুগে বাড়িটির আশেপাশে দিগন্তবিস্তৃত গাছপালা বিহীন দুস্তর প্রান্তর ছাড়া আর কিছু নজরে পড়তে না তখন আবাসিকা ছাত্রীদের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়। (নিয়োগী, ১৪০৬, পৃ -৬৭) শ্রীসদন বাড়ির সুউচ্চ দেওয়ালের উপরের দিকে নজর দিলেই দেখা যায় প্রতি দেওয়ালের উপরিভাগে দু তিনটি ছোটো ছোটো সুদৃশ্য প্রকোষ্ঠ এর শোভা বৃদ্ধি করে আজও বিদ্যমান। এ ধরনের প্রকোষ্ঠ সিংহসদনেও দেখা যায়। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর পরিচালনায় 'শ্রীভবনের' বসার ঘর এবং শ্রীভবনের প্রবেশপথের দেওয়াল অলংকরণ ম্লান হয়ে গেলেও আজও বিদ্যমান। সেদিনের আবাসিক ছাত্রীদের মধ্যে চিত্রনিভা চৌধুরী, অনুকণা দাশগুপ্ত, সাবিত্রী গোবিন্দ, গীতা রায়, মন্দিরা গুপ্ত, যমুনা বসু, রানী চন্দ, নিবেদিতা ঘোষ প্রমুখ গুণী ছাত্রীদের পরম নিষ্ঠা এবং যত্নে অঙ্কিত দেওয়াল চিত্র আজও কলাশিল্পীদের শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। ১৯৩২ সালে বিশ্বভারতী নিউজ ডিসেম্বরে লেখা হচ্ছে – "The decoration of the walls of the reception room of Sree Bhavana Girls' hostel which began in the last session has been just completed. All the work has been done by the following students of Kala Bhavana, Chitralekha Choudhury, Anukana Dasgupta, Sabitri Gobind, Gita Roy, Mandira Gupta, Jamuna Bose, Rani Chanda and Nibedita Ghose. The frist five have left the Bhavana on the completion of their studies." (বিশ্বভারতী নিউজ, ১৯৩২)

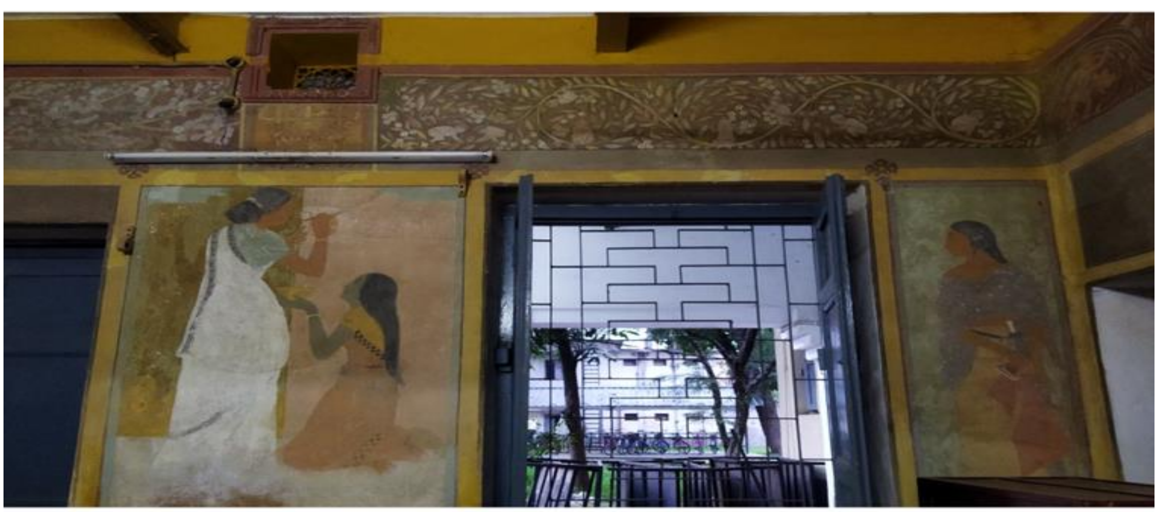

চিত্র –৯ শ্রীসদনের অতিথিশালায় দেয়ালচিত্র, নিজস্ব চিত্র, ক্ষেত্রসমীক্ষাকালীন ছবি।

চিত্র – ১০ শ্রীসদনের অতিথিশালায় দেয়ালচিত্র, ক্ষেত্রসমীক্ষাকালীন ছবি, নিজস্ব চিত্র ।

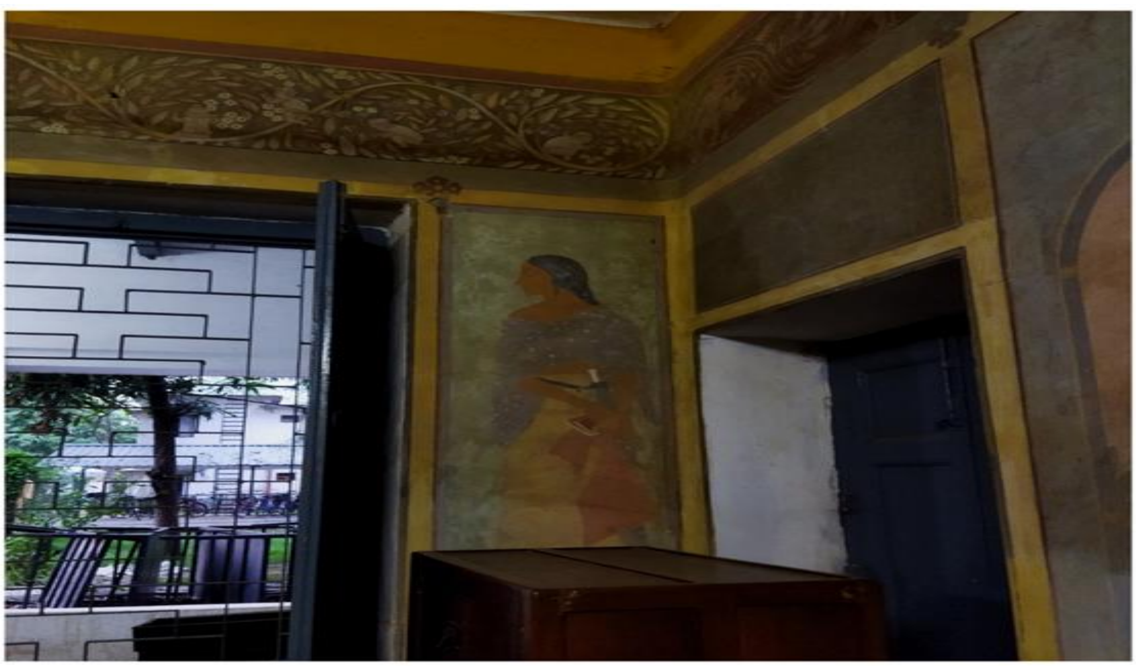

চিত্র - ১১ শ্রীসদনের অতিথিশালায় দেয়ালচিত্র, নিজস্ব চিত্র, ক্ষেত্রসমীক্ষা কালীন ছবি।

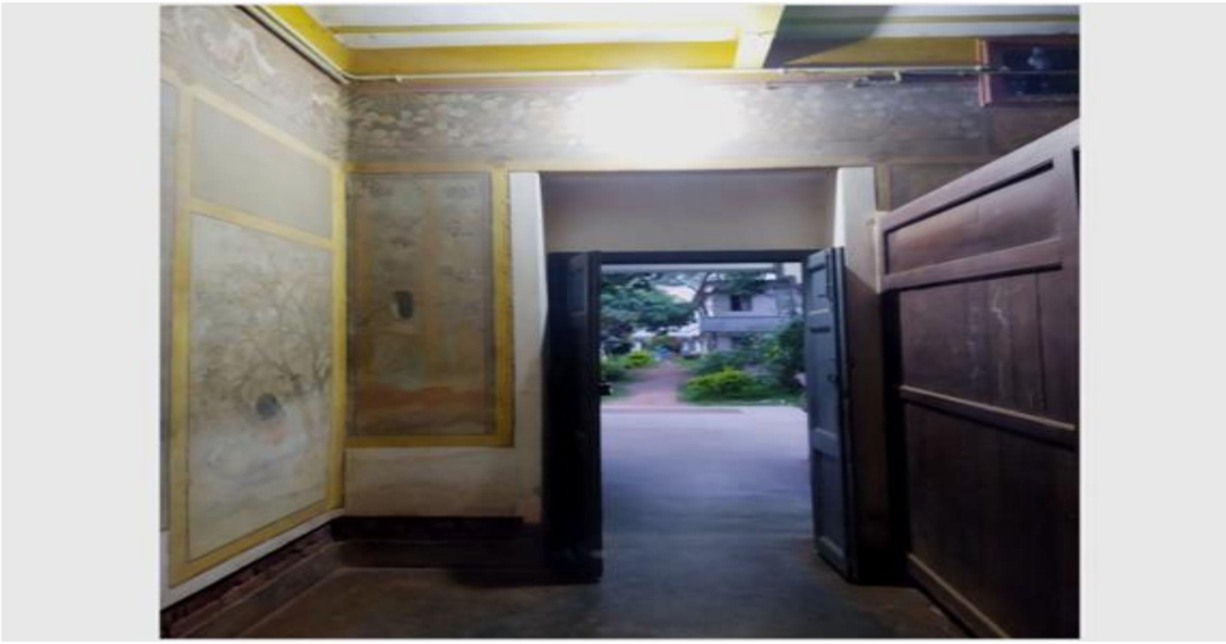

চিত্র – ১২ শ্রীসদনের অতিথিশালায় দেয়ালচিত্র, নিজস্ব চিত্র, ক্ষেত্রসমীক্ষাকালীন ছবি। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু তাঁর ছাত্রীদের (আবাসিক) নিয়ে শ্রীসদন ছাত্রীনিবাসের অতিথিশালায় কিছু ছবি এঁকেছিলেন। বর্তমানে মলিন হয়ে পড়লেও ছবিগুলি তার ঐতিহ্য বহন করে চলেছে।

শ্রীভবনের প্রবেশপথ মাত্র একটি। সুবিস্তৃত সামনের বারান্দার বাম পাশ দিয়ে ঢুকেই বাঁ হাতেই পড়ে খোলা বারান্দা যা বর্তমানে সাইকেল রাখার বারান্দা নামে পরিচিত। অমিতা সেনের লেখা থেকে যায় যে কোনো একদিন এক বিশেষ কারণে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ শ্রীভবনের ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলার জন্য এই বারান্দাতেই এসে বসেন। এই বারান্দার সংলগ্ন বাঁ হাতের ঘরখানিকে বলা হয় ‘পুতুলঘর’। পাঠভবনের শিশুছাত্রীদের উপযোগী নানা ধরনের হাতে তৈরি পুতুলসহ একটি আলমারি ছিল এই ঘরে। (নিয়োগী, ১৪০৬, পৃ -১২১) এই ঘরে এসেছেন এবং আতিথ্য গ্রহণ করেছেন প্রাক্তন ছাত্রী ও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, সোনিয়া গান্ধী, প্রিয়াংকা গান্ধী। এই ছাত্রীনিবাসের আসবাবপত্রগুলিও ছিল অতি সাধারণ। ২৬ শে জুলাই ১৯৯৭ সালে দেশ পত্রিকায় শ্রী অরুণেন্দু বন্দোপাধ্যায়ের লেখা ‘রবীন্দ্রনাথের ডিজাইন ভাবনা’ নামে প্রবন্ধ থেকে জানা যায় রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষাকৃত কম খরচে শক্ত পোক্ত দৃষ্টিনন্দন এবং দীর্ঘস্থায়ী হবে এমন আসবাবপত্রের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়োজন ছাড়াও ছাত্রছাত্রীদের আসবাবপত্রের কিছু বিন্যাস রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় স্থান পায়। শ্রীভবনের আসবাবপত্রের ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠাতা আচার্যের প্রভাব কিছুটা ছিল বলে মনে করা হয়। বাহুল্যবিহীন আসবাবপত্র সহ শ্রীসদনের ঘরগুলির প্রতিটিতে ছিল ছয় জন করে থাকার ব্যবস্থা। একখানি মজবুত তক্তা, পড়ার জন্য একটি উঁচু টুল, একটি টেবিল আর সবাইকে আলাদা তাক না দিতে পারায় দেওয়ালের তাক ভাগ করে সবাইকে ব্যবহার করতে হত। পাঠকক্ষে মাটিতে বসে পড়ার রীতিতে অপেক্ষাকৃত নিচু পালিশ করা লম্বা ধরনের কাঠের বড় পাটাতন ছিল। তার

সঙ্গে উপযুক্ত লম্বা ধরণের ছটি টেবিলে বসে প্রায় ত্রিশ জন ছাত্রী পাঠাভ্যাস করতে পারত। ১৯৩৬ -৩৭ সাল নাগাদ শ্রীভবনে ছাত্রীদের পাঠানুশীলন কার্যক্রম শুরু হয়। 'শ্রীভবন সম্বন্ধে আমার আদর্শ', 'My ideals with regard to the Sree Bhavana' – প্রবন্ধ গুলিতে শ্রীভবন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ভাবনা বর্ণিত হয়েছে। সাধনা করের লেখা "আমাদের গুরুদেব" প্রবন্ধ থেকে জানা যায় কবিগুরু একদিন শ্রীভবনের সব মেয়েদের ডেকে বলেছিলেন, "তোমাদের বাসস্থানকে আমি নাম দিয়েছি 'শ্রীভবন'। শ্রী মানে লক্ষ্মী – লক্ষ্মী শুধুমাত্র ধনের প্রতীক নন তাঁর থেকেও বড়ো শ্রীরূপিণী মেয়েরা লক্ষ্মী। কারণ শ্রীতে তাদের জন্মগত অধিকার। বিলাসিতায় নয়, শ্রীতে মন্ডিত হয়ো তোমরা।"(কর, ১৩৪৮, পৃ -৭১০) নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতীয় নারীর শিক্ষাদর্শ সর্বতোভাবে বজায় রেখেই কবি বাস্তবজীবনের প্রয়োজনীয় সবরকম আধুনিক শিক্ষাকে নারীশিক্ষায় স্থান দিয়েছিলেন। তা ছাড়া তাঁর পরিবারের উন্নত কৃষ্টি এবং নারীজীবনের উন্নত দীপ্ত গরিমা তাঁকে অনেকাংশে নারীশিক্ষায় অগ্রসর ভুমিকা গ্রহণে সাহায্য করেছিল।

শ্রীভবনের সমবেত জীবনই ছিল এর মূল আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য। সেখানে ছাত্রী, কর্মী, পরিদর্শিকারা সবাই ছিলেন এক পরিবারভুক্ত, সবাই সাবার প্রতি একান্তভাবেই সহানুভূতি ও দরদী ছিলেন, দৈনন্দিন জীবনের সব কাজই করতে হত সবাইকে নিজে হাতে। জাপানী প্রথায় যুযুৎসু শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের আত্মরক্ষায় বলীয়ান করে তুলতে চেয়েছিলেন। রানী চন্দের 'সব হতে আপন' বইতে শ্রীভবন সম্পর্কে মনোগ্রাহী বর্ণনা রয়েছে। সেদিনের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা কিভাবে পরিচালিত হত, ছাত্রীদের পঠন–পাঠনের কাজ প্রাতঃকালে উপাসনার মধ্য দিয়ে কি ভাবে আরম্ভ হত, কিভাবে সারাদিনের কার্যক্রম ঘণ্টার তালে তালে সম্পাদিত হত, কি কি কাজ নিযে হাতে করতে হত, সবকিছুর এক সামঞ্জস্যপূর্ণ বিবরণে সেদিনের শ্রীভবনের একান্ত সহজ সরল শৃঙ্খলাবদ্ধ আড়ম্বরহীন জীবনকে তুলে এনেছেন 'সব হতে আপন' (চন্দ, ১৪০১, পৃ-৫৫) বইতে। রানী চন্দ এবং তাঁর দিদি অন্নপূর্ণা শান্তিনিকেতনে শিক্ষা লাভের জন্য এসেছিলেন। রানী চন্দ কলাভবনে এবং অন্নপূর্ণা সংগীত ভবনে ভর্তি হয়েছিলেন। খুব বেশি দিন শ্রীভবনে না থাকলেও রাণী চন্দ তাঁর স্মৃতিকথায় শ্রীভবনের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মনোজ্ঞ প্রাঞ্জল বর্ণনা দিয়েছেন। সকাল সন্ধ্যায় নিয়মিত মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে শুরু হত আশ্রম বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কর্ম পরিক্রমা। অতি প্রত্যুষে ঘন্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শয্যা ত্যাগের পর ছাত্রীদের লণ্ঠনের আলোতে বিছানাপত্র তুলে ঘরদোর পরিষ্কার করে তখনই চৌবাচ্চার তোলা জলে স্নান সেরে প্রাতঃউপাসনার জন্য তৈরি হতে হত। হ্যারিকেনের আলোতে চলত সেদিনের সব কাজ— লণ্ঠন পরিষ্কার, আলো জ্বালানো সব কাজ উচ্চশ্রেণির ছাত্রীরা করত। জলের কলের ব্যবস্থা না থাকায় আশ্রম প্রাঙ্গণে ছোটো ছোটো কয়েকটি অগভীর কুয়ো ছিল। জলের অভাব দূর করার জন্য সুরেন কর একটি বিরাট কুয়ো তৈরি করেন। বিদ্যুতবিহীন হস্টেলে হ্যারিকেনের আলোয় ছাত্রীনিবাসের যাবতীয় কাজ চলত। সকালে ঘন্টা পড়ার পর প্রত্যেক ছাত্রীকেই ঘরের কোথাও স্থির চিত্তে কিছুক্ষণ বসতে হত তারপর পরের ঘন্টাটি পড়ার পর সবাই একত্রে শ্রীভবনের সামনে একত্রিত হয়ে

সমবেত প্রার্থনা করতেন –"ওঁ পিতা নোহসি, পিতা নো বোধি, নমস্তেস্তু, মা, মা হিংসীঃ" সুরেন কর মহাশয়ের স্ত্রী রমা কর শ্রীভবনের মেয়েদের গান শেখাতেন। আশ্রমজীবনের একেবারে প্রথম যুগের ছাত্রীরা শিক্ষান্তে অনেকেই নারীশিক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্নধর্মী মনোভাব আচার আচরণের ছাত্রীদের কিছু কিছু আচরণ কবিকে কখনও কখনও ব্যাথিত করেছিল। ১৯২৯ সালের ৭ ই মার্চ বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্রী এবং শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের কন্যা নুটু কে রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে লিখছেন –

> কল্যাণীয়াসু নুটু
>
> বিদেশে আসবার মুখে নারীবিভাগ সম্বন্ধে মনের মধ্যে অনেকখানি দুশ্চিন্তা বহন করে এনেছিলাম। এটা আভাসে বোঝা গিয়েছিল যে নারীভবন সমস্ত আশ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা প্রীতি ও নিষ্ঠা বহন করে তার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হতে পারে নি। তোদের অনেকেই বলেছিলি মেয়েদের প্রশ্রয় দিয়ে তাদের সমস্ত বিধি বিধানের অতীত করে দিয়েছি, তারা আত্মত্যাগে অসমর্থ হয়ে পড়েছে, নিজেদের ছোটোখাটো সুবিধের দিকেই তাদের সমস্ত চেষ্টা সংহত হয়েছে। ... মেয়েদের সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা আছে আমি বরাবর বিশ্বাস করে এসেছি তারা স্বভাবতই আপনার জীবন দিয়ে আমাদের আশ্রমকে গড়ে তোলবার কাজে লাগবে। এই তাদের ধর্ম। দীর্ঘকাল চলে গেছে ক্রমশই তাদের ঔদাসিন্যে আমাকে পীড়িত করছে। (সেন, ১৯৭৭, পৃ -৯৫/৯৬)

বিদ্যাশিক্ষার ঊর্ধ্বে কল্যাণময়ী নারী–সম্প্রদায় ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থকে জয় করে সমগ্র আশ্রম পরিবেশকে নিজেদের প্রাণের সম্পদের বিনিময়ে গড়ে তুলবে এই ছিল তাঁর আশা। নিরাশ হয়েছেন কখনও। এই সব তিক্ততার ঊর্ধ্বে নারীশিক্ষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন প্রায় সারাজীবন। কলাভবনের ছাত্রী হয়ে এসেছিলেন শ্রীভবনের আবাসিকা সাবিত্রী গোবিন্দ। শ্রীভবনের অন্যতমা আবাসিকা কলাবিভাগের ছাত্রী চিত্রনিভা চৌধুরী এসেছিলেন ১৯২৮ সালে। পরবর্তীকালে তিনি আসেন অধ্যাপিকা রূপে। শ্রীভবনের দেয়ালচিত্র নন্দলাল বসুর নির্দেশনায় কয়েকজন ছাত্রী করেছিলেন।

চিত্র – ১৩ শ্রীসদনের অতিথিশালায় দেয়ালচিত্র। নিজস্ব চিত্র। ক্ষেত্রসমীক্ষাকালীন ছবি।

শ্রীভবনের বড়ো জানলাগুলি ছিল একেবারে খোলা এবং গারদহীন। সেখান দিয়ে অনায়াসেই যে কোনো ছাত্রী ভারপ্রাপ্তা দিদির অগোচরে জানালা টপকে বেরিয়ে পড়তে পারতেন। এ বিষয়ে সাবিত্রী দেবী স্মৃতিকথায় লিখেছেন। শ্রীসদনের তৎকালীন প্রণেত্রী হেমবালা দেবী মেয়েদের নিরাপত্তার কথা ভেবে রবীন্দ্রনাথকে নবনির্মিত গরাদবিহীন জানলা সম্বন্ধে তাঁর আপত্তির কথা জানালেন, এতজন মেয়ের দায়িত্ব নিয়ে থাকেন চারিদিকে ফাঁকা একখানা বিশাল বাড়িতে। এ বিষয়ে তিনি তাঁর দুশ্চিন্তার কথা গুরুদেবকে জানিয়ে অন্তত শ্রীভবনের চারিদিকে একটি বাউন্ডারি ওয়াল দেওয়ার কথা জানালে কবি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন – "কি! আমি কি এখানে জেলখানা তৈরি করব মেয়েদের তাতে আটকে রাখার জন্যে? না তা কিছুতেই হবে না।" (শ্রেয়সী, ১৩৯৮, পৃ–১৪)

চিত্র – ১৪ গারদহীন শ্রীসদনের জানালা। শম্ভু সাহার তোলা ছবি, রবীন্দ্রভবন চিত্র সংগ্রহশালা থেকে সংগৃহীত।

তিনি আরো বলেন, "আমাদের মেয়েরা খুব ভালো, আমি ওদের বিশ্বাস করি যে ওরা নিজেদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে, এ ছাড়া ওদের সঙ্গে সোনাদানা কিছুই নেই।" (শ্রেয়সী, নব পর্যায়, ৭ই পৌষ, ১৩৯৮, পৃ-৮) ১৯২২-২৩ সালের প্রায় ছয় দশক পরেও ছাত্রীনিবাসের নিরাপত্তার দাবীতে বিশেষ অনুরোধের ফলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মতামত ও রবীন্দ্রনাথের মতই ছিল—"আবাসনের খোলা বারান্দা জাল দিয়ে ঘিরে কি শ্রীসদনে জেলখানা তৈরি হবে?" (শ্রেয়সী, নব পর্যায়, ৭ই পৌষ, ১৩৯৮, পৃ-৮) এই কথাই শুনেছিলেন সেদিনের ভারপ্রাপ্তা পরিদর্শিকা। যে বেড়াজাল যে বেষ্টনীর প্রতি কবির এত অনীহা ছিল প্রয়োজনের তাগিদে নিরাপত্তার দাবীতে সেখানে সর্বত্রই তারের বেড়া, লোহার বেষ্টনী অথবা সুউচ্চ প্রাচীর। শ্রীসদনের বর্তমান প্রাচীর সুদৃশ্য এবং কারুকার্যখচিত জালির কাজ–করা অপেক্ষাকৃত নীচু, বর্তমানে শ্রীসদনের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। ভিতরে অসংখ্য বৃক্ষের মাঝে বিভিন্ন ভবনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্লক।

চিত্র – ১৫ শ্রীসদন, ক্ষেত্রসমীক্ষাকালীন ছবি, নিজস্ব চিত্র, ২০১৯।

সেকালের পুরোনো ছাত্রী শৈলনন্দিনী দেবীর লেখা "গুরুদেবের আশ্রমে ছাত্রী জীবন" প্রবন্ধে শ্রীভবনে অতিথি সেবা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবটি ফুটিয়ে তুলেছেন বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখে। তিনি অতিথি আপ্যায়নে সুস্বাদু খাবার প্রদানের সঙ্গে সাংস্কৃতিক দিকটিও নজরে রাখতে বলেছিলেন। আবাসিকারা অসুস্থ হলে তার বন্ধুরা পালাক্রমে সারারাত জেগে সেবা করত। কবি রোগীণী ছাত্রীকে যেমন দেখতে আসতেন তেমনি সেবা করত যে মেয়েরা তাদের জন্য যথাযথ খাবারের ব্যবস্থা করতেন। এ ভাবে ছাত্রীদরদী শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ পঠন-পাঠনের সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে রোগীর সেবা, অতিথি আপ্যায়ন ইত্যাদি নানাবিধ দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় প্রয়োজনীয় শিক্ষায় সেদিনের ছাত্রীদের সুশিক্ষিত করে তুলেছিলেন। তিনি শ্রীভবনের ছাত্রীদের শ্রীনিকেতনে নিয়ে গিয়ে বাগান করার বিষয়েও শিক্ষা দিয়েছিলেন। মাস্টারমশাইরা ছাত্রীদের শ্রীনিকেতনে নিয়ে গিয়ে গুটিপোকার চাষ, আখের ক্ষেত দেখাতেন, তেমনি বর্ষাকালে একহাঁটু জলে দাঁড়িয়ে বাকীদের সঙ্গে ধানের চারা পোতার কাজেও উৎসাহিত করতেন। পুঁথিগত বিদ্যার পাশে পাশে নিজের আশপাশ ও গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে যাতে পরিচয় হয় তাই এই প্রচেষ্টা। প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে একাত্মতাবোধ সৃষ্টির জন্য এই প্রচেষ্টা। শ্রীনিকেতনের গ্রামোন্নয়ন ও পল্লী সংগঠনের কাজের সঙ্গে যাতে শ্রীভবনের ছাত্রীরা যুক্ত হতে পারেন এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমস্ত কাজকর্মে ছাত্রছাত্রীরা যাতে স্বাবলম্বী হতে পারেন এ বিষয়ে কবির দূরদৃষ্টি ছিল। ধীরে ধীরে মেয়েদের মধ্যে পরিবর্তন আসছিল। সাজে পোশাকে, আচার আচরণে আশ্রম পরিবেশ থেকে ভিন্ন হয়ে উঠছিল। ভারপ্রাপ্তা হেমলতা দেবী সামলে

উঠতে পারছিলেন না। তাঁর ছাত্রীনিবাস পরিচালনা সম্পর্কে শান্তিনিকেতন–বিশ্বভারতী পত্রিকায় ২২৪ পাতায় লেখা হচ্ছে—

> ছাত্রীদের প্রতি তিনি যেমন দরদী ছিলেন তেমনই নিয়মশৃংখলা বজায় রক্ষায় কঠোর ছিলেন। এই কঠোরতা কাহারও কাহারও মনে হইত অতিরিক্ত নীতিপরায়ণতা মাত্র। বালিকাদের পক্ষে অসময়ে বাহিরে যাওয়া আসা সম্বন্ধে যে সব নিয়ম প্রত্যেক হস্টেলে আছে তাহা কর্তব্য বোধেই পালন করিতেন। তাহাতে সকলে সন্তুষ্ট ছিলেন না। (শান্তিনিকেতন–বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৩২, পৃ-২২৪) ।

হেমলতা দেবী শেষ অবধি পদত্যাগ করেন।

**নারীর 'শ্রী' এবং 'কল্যাণী' রূপের ধারণা এবং রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীশিক্ষা ভাবনা**

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশেষ কয়েকটি প্রবন্ধে নারীর কল্যাণী রূপটির প্রতিফলনে আশ্রমের সমৃদ্ধি চেয়েছিলেন। পড়াশুনার পাশাপশি জীবনযাত্রার যাবতীয় কাজে মেয়েদের পারদর্শী করে তুলতে চেয়েছিলেন। ১৯৪১ সালে রবীন্দ্র প্রয়াণে হেমবালা দেবীর ঢাকা মহিলা সভায় পঠিত "রবীন্দ্রস্মৃতিপূজা" নামক প্রবন্ধে মেয়েদের শিক্ষা ও সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য কবির আন্তরিক চেষ্টার কথা বলেছেন। তিনি লিখছেন, "প্রাণের যত্ন এবং ভালোবাসা দিয়ে নারী গৃহ ও বাহিরকে পূর্ণ ও সুন্দর করিয়া তুলিবেন। এমন শিক্ষা নারীকে দিতে হইবে যাহাতে দেশের ও গৃহের সমস্ত কর্ম নারী শ্রী ও কল্যাণে পরিপূর্ণ করিবেন।" (দেবী, ১৯৪১) রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা থেকে হেমবালা দেবীকে চিঠি লিখেছিলেন এবং তাতে মেয়েদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, চিঠিটি উদ্ধৃত হল—

> মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে এই সংকল্প আমাকে রাস্তায় বের করেছে। যদি কিছুমাত্র সিদ্ধিলাভ করি তা হলে দেহের দুঃখ মনের গ্লানি ভুলতে পারব।... যদি যথেষ্ট দাক্ষিণ্য জোটে তবে আমার দেশের মেয়েদের হাতে আমার শেষ দান দিয়ে যাব বিদ্যাদান। দেশের মেয়েদের আমি বরাবর ভালোবেসেছি, বোধহয় তাদের কল্যাণেই সরস্বতী আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন –সরস্বতীর সেই প্রসাদের অংশই যদি আমি কোনো অভঙ্গুর পাত্রে মেয়েদের জন্যে রেখে যেতে পারি তবে ভাগ্যদেবতার জয়ধ্বনি করে বিদায় নেব।
>
> ইতি ২৮ অক্টোবার ১৯৩০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (শ্রেয়সী, ১৯৮৯, পৃ-১১৫)।

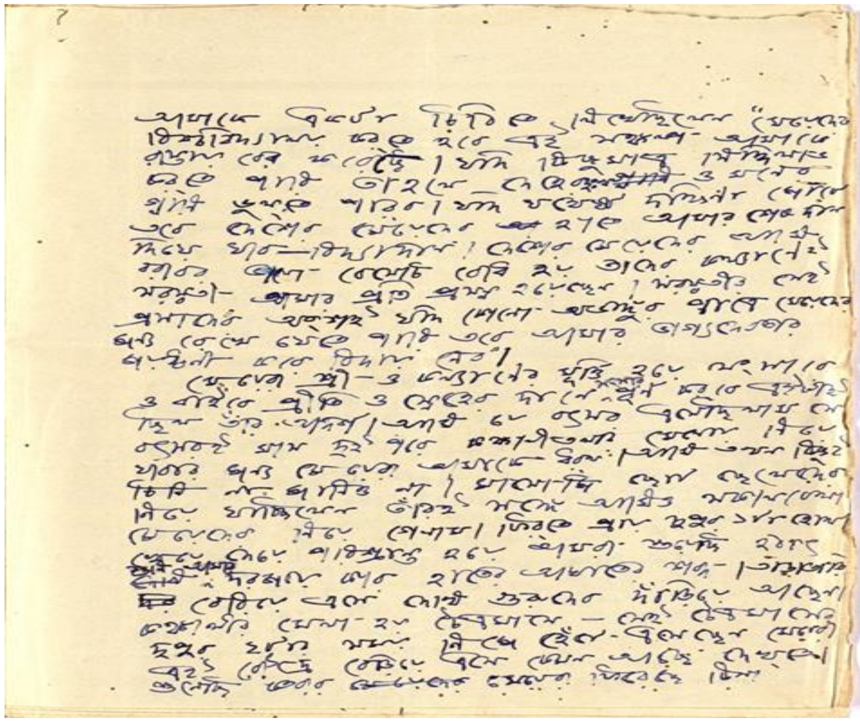

চিত্র – ১৬ মনোরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি। ৩১ চৈত্র, ১৩ এপ্রিল ১৩১৫ রবীন্দ্রভবন চিঠি সংগ্রহশালা থেকে সংগৃহীত।

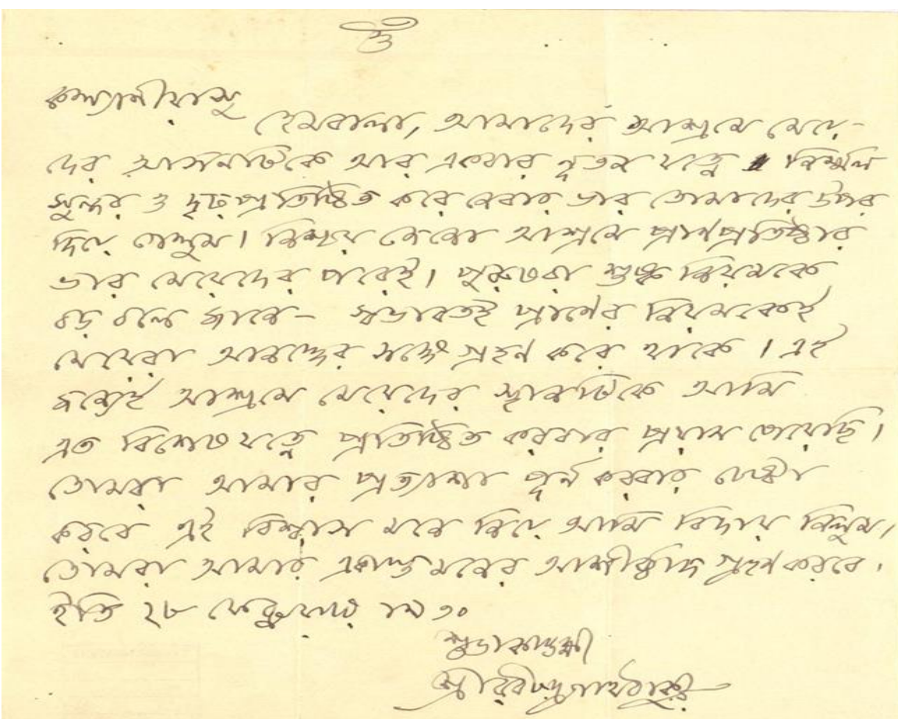

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

হেমবালা, আমাদের আশ্রমে মেয়ে-
দের আসনটিকে আর একবার নূতন যত্নে বিমল
সুন্দর ও দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করে রেখবার ভার তোমাদের উপর
দিয়ে গেলুম। কিন্তু কেবল আশ্রমে প্রাণপ্রতিষ্ঠার
ভার মেয়েদেরই। পুরুষেরা শুষ্ক নিয়মকে
বড়ো বলে জানে— স্বভাবতই প্রাণের নিয়মকেই
মেয়েরা আপনার সঙ্গে গ্রহণ করে থাকে। এই
জন্যেই আশ্রমে মেয়েদের স্থানটিকে আমি
এত বিশেষ যত্নে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস পেয়েছি।
তোমরা আমার প্রত্যাশা পূর্ণ করবার চেষ্টা
করবে এই বিশ্বাস মনে নিয়ে আমি বিদায় নিলুম,
তোমরা আমার একান্ত মনের আশীর্বাদ গ্রহণ করবে।
ইতি ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩০

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিত্র – ১৭ হেমবালা দেবীকে আমেরিকা থেকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি, ২৮ই অক্টোবর, ১৯৩০, রবীন্দ্রভবন চিঠি সংগ্রহশালা থেকে সংগৃহীত।

শ্রীভবনের প্রথম যুগের ভারপ্রাপ্তা পরিদর্শিকা স্নেহলতা সেন, হেমবালা দেবী শ্রীভবনের মেয়েদের সন্তানস্নেহে আগলে রেখেছিলেন। বাড়ির স্নেহ মমতার বন্ধনকে ফেলে আসা ছাত্রীদের মনের কথা তারা সর্বদাই মনে করতেন। নিঃস্বার্থ, সংবেদনশীল, স্নেহশীলা পরিদর্শিকাদের অবদানে শ্রীভবন তৎকালীন শান্তিনিকেতনে একটি বিশেষ রূপ পেয়েছিল। হেমবালা দেবীর অবসর গ্রহণের পর কবিপুত্রবধূ প্রতিমা দেবী ১৯৩৮ সালের ৫ ই জুলাই ছাত্রীনিবাসের পদে অধিষ্ঠিত হন। বিশ্বভারতী সংবাদে তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় –“Sreejukta Pratima Devi takes complete charge of the Sree Bhavana as pranetri from the 5th July, 1934 and she will be assisted by Hembala Devi resident Paridarsika of Sree Bhavana” ( বিশ্বভারতী নিউজ, ১৯৩৪, পৃ-৯০) প্রতিমা দেবী প্রনেত্রীর পদ অলংকৃত করলেও আবাসিক পরিদর্শিকারূপে শ্রীভবনের দায়িত্বে ছিলেন কবির ব্যক্তিগত সচিব অমিয় চক্রবর্তীর স্ত্রী হৈমন্তী চক্রবর্তী। ডেনমার্কের কন্যা হিয়রডিস সিগার ১৯২৭ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভারতে আসেন, জাহাজেই কবি তাঁর নাম দেন হৈমন্তী। নিয়মিত পঠন পাঠনের সঙ্গে শ্রীভবনের ছাত্রীদেরও শ্রীনিকেতনের বয়নশিল্প শিক্ষাকেন্দ্রে যোগদানের ব্যবস্থা ছিল। তখন শ্রীভবনই ছিল একমাত্র ছাত্রীনিবাস যেখানে দেশবিদেশের ছাত্রীরা রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে শিক্ষার্থিনী হিসাবে এখানে জড়ো হয়েছিলেন। “শ্রীভবন সম্বন্ধে আমার আদর্শ” প্রবন্ধে তিনি লিখছেন,

> এখানে ছাত্রী নেত্রী ও পরিচারিকারা মিলে একটি ঘনিষ্ঠ সামাজিক সম্বন্ধ গড়ে তুলবে। এই কথা মনে রাখতে হবে শ্রীভবনটি কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা দল বিশেষের গড়ে তোলা সামগ্রী নয়; যারা যারা এখানে আছে তারা সকলেই আপন প্রাণের যোগে প্রতিদিন একে প্রাণবান করে রাখবে। এর মধ্যে একান্ত যত্নে সৌন্দর্য, নির্মলতা সুব্যবস্থা ও ভদ্র আচার সঞ্চার করে দিয়ে তারা যেন এর জন্যে মনে মনে গৌরব অনুভব করতে পারে। (ঠাকুর, ১৪১৭, পৃ-২২)

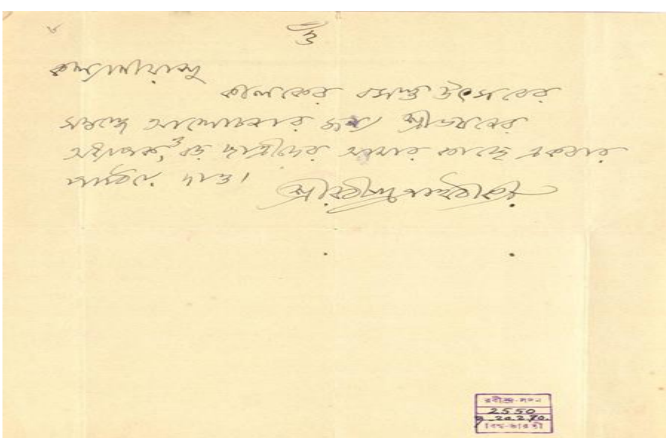
ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কালকের বসন্ত উৎসবের সম্বন্ধে আলোচনার জন্য শ্রীভবনের অধিবাসিনী ও ছাত্রীদের সবার কাছে একবার পাঠিয়ে দাও।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিত্র – ১৮ রমা করকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি ৭ ই মার্চ, ১৯২৯, রবীন্দ্রভবন চিঠি সংগ্রহশালা থেকে সংগৃহীত।

তিনি শ্রীভবন সম্পর্কে আরো বলেছেন—

> সংক্ষেপে আমার বক্তব্য এই যে, শ্রীভবনের দায়িত্ব স্বীকার করে স্বায়ত্ত্বশাসন প্রতিষ্ঠিত করা, সৌজন্য রক্ষা করা, পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্য পালন করা, সুব্যবস্থা ও সুশৃংখলতা অক্ষুণ্ণ রাখা দ্বারা শ্রীভবনে সৌন্দর্য ও কল্যাণের উচ্চ আদর্শ সৃষ্টির ভার প্রধানত ছাত্রীদের নিজের পরেই। নিজের প্রাণের যোগে এই সৃষ্টিকর্ম সাধন করতে থাকলে স্বভাবতই এ জায়গাটি তাদের আপন হয়ে উঠবে, একে ভালোবাসতে পারবে এবং সেই ভালোবাসার প্রণালী দিয়ে এখানকার শ্রেষ্ঠ দান তারা অন্তরের মধ্যে সহজে গ্রহণ করতে পারবে। (শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৩৪১, পৃ - ৯৯)

'শ্রীভবন সম্বন্ধে আমার আদর্শ' এই প্রবন্ধটি ছাড়াও 'শ্রীভবন–ছাত্রীদের পালনীয় কর্তব্য' নামে ছাত্রীনিবাসের মেয়েদের পালনীয় কিছু নির্দেশ ও নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন। তৎকালীন রক্ষণশীল বাঙালী পরিবারের অবরোধ প্রথা থেকে বেরিয়ে আশ্রমে আবাসিক ছাত্রীরা যাতে অতিরিক্ত স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে সমাজকে সমালোচনার সুযোগ না দেয় সেই সতর্কতা থেকেই এই নিয়মগুলি প্রণয়ণ করেন। কবি নিজে হাতে ছাত্রীদের পালনীয় কর্তব্য সমূহের বিস্তারিত বিবরণ লিখেছিলেন –

১। প্রাতে উঠিবার ঘন্টা পড়িলেই পাঁচ মিনিটের মধ্যে ছাত্রীরা লাইনে সমবেত হইবে। ২। তারপর প্রাতঃকৃত্য, ঘর পরিষ্কার করা, বিছানা গুছাইয়া রাখা, ব্যায়াম ও স্নান করণীয়। ৩। প্রথমে আপন আপন কাপড় কাচিয়া নির্দিষ্ট স্থানে মেলিয়া দিবে। ক্লাশ শেষ হইলে শুকনো কাপড় তুলিয়া রাখিবে। ৪। ঘন্টা পড়িলে উপাসনায় যোগ দিবে। ৫। ক্লাশে যথোচিত পরিচ্ছন্ন হইয়া আসিবে ও বইখাতা আসন আনিতে অন্যথা করিবে না। ৬। ক্লাশের আরম্ভে অধ্যাপক আসিলে দাঁড়াইয়া নমষ্কার করিবে। ৭। অবকাশ প্রাপ্ত ছাত্রী ক্লাশের সময় প্রাঙ্গণে খেলা গোলমাল করিয়া ঘোরাঘুরি করিবে না। ৮। বিছানা, বইখাতা, লিখিবার সামগ্রী, কাপড়চোপড় পরিপাটি ও ঘরের মেঝে নির্মল করিয়া রাখা অবশ্য কর্তব্য। ৯। আশ্রমের পথে ছেঁড়া কাগজ, ভাঙ্গা কাঁচ পড়িয়া থাকিতে দেখিলে নিকটবর্তী আবর্জনা পাত্রে ফেলিয়া দিবে। ১০। বিনা অনুমতিতে অন্যের দ্রব্যে হস্তক্ষেপ বা বিদ্যালয়ের দ্রব্য ব্যবহার করা নিষেধ। ব্যবহারের পর যথাস্থানে ফেরৎ দিবে। ... বিদ্যালয়ের দেয়ালে টেবিলে ও আসবাবে কিছু লিখিবে না। ১১। কোনো ঘরে খাট বা অন্য কোনো আসবাব স্থানান্তর করা অবৈধ। ১২। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর এক ঘণ্টা বিশ্রামের জন্য নির্দিষ্ট। তাহার পরে পাঠচর্চার সময় সেই সময় কোনো সুস্থ ছাত্রী বিছানায় থাকিবে না বা বিনা অনুমতিতে বাহিরে যাবে না। ১৩। নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত কারখানা, রান্নাঘর, গ্রন্থভবন, কলাভবন, আরোগ্যভবন, সিংহসদন, খেলার মাঠ অর্থাৎ শ্রীভবনের বাহিরে কোথাও বিনা অনুমতিতে যাওয়া নিষিদ্ধ। রিহার্সাল বা বক্তৃতা সভায় যাইবার সময় পরিদর্শিকাকে জানাইয়া যাইবে। রিহর্সল, বাহিরে যাইবার পূর্বে নির্দিষ্ট বোর্ডে বা শ্লেটে কোথায় যাইতেছে লিখিয়া যাইবে। খেলায় না গিয়া কোথাও বেড়াইতে চায় জানাইয়া যাইবে। পরিদর্শিকার

অনুমতি ব্যতীত কাহারও বাড়িতে নিমন্ত্রণ যাওয়া নিয়ম বিরুদ্ধ। ১৪। প্রত্যেকে আপন সম্পত্তির তালিকা শয্যাপার্শ্বে টাঙ্গাইয়া রাখিবে, কিছু হারাইলে গৃহ শিক্ষিকাকে জানাইবে। পরিদর্শিকার অনুমতি ব্যতীত কেহ কোনো দ্রব্য ক্রয়, বিক্রয় বা দান করিতে পারিবে না। ১৫। পাঠভবনের ছাত্রীরা টাকাকড়ি বা মূল্যবান সামগ্রী পরিদর্শিকার হাতে অর্পণ করিবে। ১৬। আহারের পূর্বে হাত মুখ ধুইয়া সময় অতিক্রম না করিয়া ভোজনশালায় নিজের নির্দিষ্ট আসনে বসিবে। তৎকালে ভোজ্যপদার্থের আলোচনা পরিহার্য। পরস্পর বাক্যালাপ মৃদুস্বরে কর্তব্য। আহার ব্যাপার যেন অশোভন অসংযত ও অপরিস্কৃত না হয়। ১৭। রাত্রে শুইতে যাইবার পূর্বে সম্মিলিত উপাসনায় যোগ দিবে। পরে পা ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া শুইতে যাইবে। বিছানায় যাইবার পূর্বে পরদিন প্রাতঃকালের ব্যবহার্য কাপড় গামছা আসন খাতা গুছাইয়া রাখিবে। ১৮। আত্মীয় স্বজন অধ্যাপক ও সহপাঠী ছাত্রদের সহিত দেখা করিবার আবশ্যক হইলে পরিদর্শিকার অনুমতিক্রমে যাথানির্দিষ্ট ঘরে ও সময়ে ও নির্দিষ্ট পরিমাণ কাল ধরিয়া দেখা করিতে পারিবে। অন্য সময়ে বা দীর্ঘকালের জন্য দেখা করার প্রয়োজন হইলে কর্তৃপক্ষের অনুমতি আবশ্যক। ১৯। রাত্রি আটটার পর শ্রীভবনের বাহিরে থাকা অনিয়ম। কোনো কারণে বিলম্বের সম্ভবনা থাকিলে পরিদর্শিকার অনুমতি চায়।

প্রতিমা দেবী শ্রীভবনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তারপর। সেদিনের আশ্রমকন্যা নন্দিতা কৃপালনি, গৌরী দেবী, যমুনা দেবী, খুকু অমিতা সেন, সুকৃতি চক্রবর্তী, সেবা মিত্র, মমতা, সুনীপা অণু চক্রবর্তীর কথা সুকৃতি চক্রবর্তীর স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায়। এই আশ্রমকন্যা ও তদানীন্তন শ্রীভবনের আবাসিক ছাত্রীদের নৃত্য পরিবেশনায়, তাঁদের অঙ্গসজ্জায় এমন কি মঞ্চসজ্জার ক্ষেত্রেও প্রতিমা দেবীর অনুপম শিল্পবোধ, সূক্ষ্ম অনুভূতি ও নানান কলাকুশলতার পরিচয় মেলে। প্রতিমা দেবী শ্রীভবনের দায়িত্বে আসায় শ্রীভবনের এক বিশেষ অধ্যায়ের সূচনা হল। সুধীরচন্দ্র কর মহাশয়ের লেখা থেকে জানা যায় প্রতিমা দেবী নৃত্যে নানারকম কলাকৌশল রূপ সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন, নন্দলাল বসুর কন্যা গৌরীদেবী ‘নটীর পূজা’ র নৃত্যরূপ দিলেন ১৯২৭ সালে, তা সারা দেশে সাড়া ফেলেছিল। কবির ৭০ তম জন্ম বার্ষিকী উৎসবে ‘শাপমোচন’ নৃত্যনাট্যটি পরিচালনা করলেন প্রতিমা দেবী। এর মাধ্যমেই শুরু হল নৃত্যনাট্যের সূচনা। নারীশিক্ষা প্রসারের সঙ্গে ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ক্রমে আশ্রম প্রাঙ্গণের সমুদয় ছাত্রীনিবাসের একত্রীকরণেই সৃষ্টি হয়েছিল এই সুবিস্তৃত ছাত্রীনিবাসটি।

দেশবিদেশের ছাত্রীরা নিয়ে এলেন আশ্রমে চলাফেরার স্বাচ্ছন্দ্য আর ভিন্ন দেশ তথা ভারতের অন্য প্রান্ত থেকে বিচিত্র সংস্কৃতির প্রভাব। নারী জাগরণের উন্মাদনায় আলগা হল নিয়মের কড়াকড়ি। আশ্রমের কাজে যোগ দিলেন কিছু সংখ্যক বিদেশিনী নারী। কেউ এলেন শিখতে, কেউ এলেন শেখাতে। আশ্রমের গুরুপত্নীরাও কর্মযজ্ঞে এগিয়ে এলেন। রবীন্দ্রনাথ সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মেয়েদের অংশগ্রহণের বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। তাঁর উদ্যোগে মেয়েরা পড়াশুনার পাশাপাশি তারা নাচ গান নাটক ইত্যাদিতেও সক্রিয় অংশ নিত। এই অংশগ্রহণ এবং তাতে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা এই বিষয়টি নিয়ে

সমকালে তীব্র সমালোচনা হয়েছিল। আধুনিক, উদার ভদ্র পরিবারের শিক্ষিত মেয়েদের এই সামাজিক অংশগ্রহণ সমাজ যেমন ভালো চোখে দেখেনি তেমনি রবীন্দ্রনাথকেও সহ্য করতে হয়েছিল অজস্র ব্যঙ্গাত্মক আক্রমণ। ছাত্রীদের জন্য হস্টেল নির্মাণ ও তৎকালের মেয়েদের সার্বিক বিকাশের জন্য নেওয়া পদক্ষেপের একটি ছিল। বিশ্বভারতীর প্রথম মেয়েদের হস্টেল শ্রীসদন সম্পর্কে ঋতা বসু তাঁর 'শ্রীসদনের শ্রীমতীরা' গ্রন্থের 'শ্রীসদনের জন্মবৃত্তান্ত' অংশে লিখছেন,

> শ্রীমতীদের লীলাক্ষেত্র শ্রীসদনের জন্ম ইতিহাসটি কিন্তু মোটেই সহজ নয়। অনেক চড়াই উতরাই পেরিয়ে লড়াই করে সে আজকের এই জায়গায় এসে পৌছেছে...শান্তিনিকেতনের মেয়ে বোর্ডিং একটা সামাজিক বিপ্লবই বটে। আমরা এক সময়ে নিজেদের অজান্তেই এর অঙ্গ ছিলাম, তখন মনে হল এই অসাধারণ সৌভাগ্যের খবরটি সবাইকে না জানালেই নয়। (বসু, ২০১৬, পৃ -৫২)

সূচনাকাল থেকে থেকে বিশ্বভারতীতে মুলত ছেলেদের পড়াশুনার ব্যবস্থা ছিল। ১৯০৮ সালের আগে পর্যন্ত শান্তিনিকেতনের স্কুলে শুধুমাত্র ছেলেরাই লেখাপড়া করত। অথচ সেই সময় আশ্রমে পড়ুয়া মেয়েদের অভাব ছিল না। রবীন্দ্রনাথের নিজেরই দুই মেয়ে মাধুরীলতা ও মীরাও ছিল এই দলে। একটি বালিকা বিদ্যালয়ের চারা আপনিই গজিয়ে উঠেছে এবং হু হু করে সেটি বেড়ে ওঠার মতলব করছে। অনেকদিন থেকে ১৯০৮ সালের পরে কোনোরকম আড়ম্বর সভাসমিতি প্রস্তাবনা ছাড়াই ভেতরের প্রয়োজন থেকেই মেয়েরা স্কুলের অঙ্গ হয়ে উঠল। ঋতা বসু তাঁর বইতে উল্লেখ করছেন "১৯০৯ সালে রবীন্দ্রনাথ স্কুলের প্রাক্তন অধ্যক্ষ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখছেন "বিদ্যালয়টি বেশ পুর্ণ হয়ে এসেছে। ক্রমে ক্রমে তার পাশে মনে ইচ্ছে ছিল। ভয়ে এগোয়নি। ঠাকুর যখন আপনিই ঘরে এসেছেন, পূজা না করে আর নিষ্কৃতি নেই।" (বসু, ২০১৬, পৃ -৫২) পরিচিতি বা আত্মীয়তার সূত্রে যে মেয়েরা পড়তে এল তাদের থাকবার জন্য বোর্ডিং এর ব্যবস্থা করা হল। বোর্ডিং-এর দেখাশোনা করার জন্য এলেন মোহিতচন্দ্র সেনের বিধবা স্ত্রী সুশীলদেবী। তিনি শান্তিনিকেতনের মেয়ে বোর্ডিং এর প্রথম সুপার। তখন শান্তিনিকেতন মেয়েদের জন্য খুব খোলামেলা ছিল না। মেয়েরা মোটামুটি আড়ালেই থাকত, ঋতা বসু লিখছেন—"অদ্ভুত মনে হলেও পড়াশুনার সময়টা বাদ দিয়ে তখনকার আশ্রমে রীতিমতো পরদাপ্রথা চালু ছিল। একবার মেয়েরা লক্ষ্মীর পরীক্ষা নাটকটা করেছিল। সেই নাটকের পুরুষ দর্শকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও আগাগোড়া ছিলেন পরদার আড়ালে ভাবা যায়? মেয়েরা ইচ্ছামতো ঘোরাঘুরি করতে পারত না। পৌষ উৎসবের মাঠ যেখানে এখন স্কুলের বাচ্চা মেয়েরাও ছাড়া গরু, সেই মাঠেই মেয়েদের স্বাধীনতা ছিল না। একটা প্রকান্ড কাঠের গাড়িতে তাদের বসিয়ে বড় ছেলেরা আর মাস্টারমশাইরা মিলে সেটাকে টেনে নিয়ে যেত মেলার মাঠে। বেচারা মেয়েরা গাড়িতে বসেই বাজি পোড়ানো দেখত" (বসু, ২০১৬, পৃ-৫৩)। এহেন শান্তিনিকেতনে মেয়েরা বোর্ডিং-এ থেকে ছেলেদের পাশে বসে একসঙ্গে পড়াশোনা করবে সেটা আজ যত সহজে ভাবা যাচ্ছে একশো বছর আগের সমাজে সেটা ছিল না। মেয়েরা বাড়িতে বসে একটু আধটু অক্ষর চিনলেই যেখানে

যথেষ্ট ভাবা হত, সেখানে সহশিক্ষার কথা তো কল্পনাও করা যায় না। হলেই বা রবীন্দ্রনাথের স্কুল। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের স্কুল খোলার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সাত বছর কোন উদ্যোগ নেন নি, কেন নেন নি তা তাঁর 'ভয়ে এগোয়নি' কথাটার মধ্যে নিহিত। মেয়েদের স্কুল চালু হবার কিছুদিনের মধ্যে রক্ষণশীল সমাজের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল ভয়াবহ আকারে। "শান্তিনিকেতন নিয়ে বঙ্গ সমাজে তোলপাড়, চারদিকেই গেল গেল রব...মোটকথা মেয়েদের উপস্থিতিতে আশ্রমের পবিত্র বাতাস বিষিয়ে উঠছে, এটাই ঘরে-বাইরে প্রধান অভিযোগ হয়ে দাঁড়াল। এই তালিবানি মনোভাবের জন্য আশ্রম অশান্ত হয়ে উঠল। আশ্রমের এক ছাত্র  সরোজ চক্রবর্তীর আত্মহত্যার পিছনে হস্টেলের একটি মেয়ের ভুমিকা আছে বলে গুজব উঠল। রবীন্দ্রনাথ এবং হস্টেল সুপার সুশীলাদেবীকে আসামী বানিয়ে সমাজ কাঠগোড়ায় দাঁড় করাল। ট্রাস্টিরা খরচের কথা তুলে সহশিক্ষার বিরুদ্ধে আপত্তি তুললেন। সুশীলাদেবী কাজ ছেড়ে দিলেন। এরপর রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমারের মা গিরিবালাদেবী মেয়ে বোর্ডিং-এর ভার নিলেন। কিন্তু তিনিও কিছুদিন পর আর এলেন না। ১৯১০ সালে মেয়ে বোর্ডিং বন্ধ হয়ে গেল। স্কুলটিও বন্ধ হল। "অত্যন্ত দুঃখ ও অনিচ্ছা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাধ্য হলেন পিছু হটতে। তিনি অজিত চক্রবর্তীকে লিখলেন মেয়েদের স্কুল উঠে গিয়েছে কিন্তু তার বেদনা আমার মন থেকে কিছুতেই যাচ্ছে না। এক একবার মনে করছি সেই বিদ্যালয়টিকে কোন ও অনুকূল জায়গায় গড়ে তুলবার চেষ্টা করতে হবে,দেশে যার প্রয়োজন আছে তাকে সহজে ত্যাগ করা চলে না।" (বসু, ২০১৬, পৃ-৫৪) মেয়েদের পড়াশুনার থেকেও পরিবারের বাইরে থাকা নিয়ে সমস্যা ছিল বেশী। পরিবারের পুরুষ সদস্যদের প্রত্যক্ষ নজরদারির বাইরে থাকাটা সমাজের কাছে স্বস্তিজনক ছিল না। লেখিকা স্পষ্টতই লিখছেন—"স্কুলের থেকেও সমাজের বেশি আপত্তি ছিল মেয়েদের বোর্ডিং এ থাকা নিয়ে। ১৯০৮ সালের রক্ষণশীলতাকে স্ত্রীশিক্ষা যতটা নাড়া দিয়েছিল তার থেকে অনেক বেশি করেছিল মেয়ে-বোর্ডিং।" (বসু, ২০১৬, পৃ-৫৫) তারপর রবীন্দ্রনাথ নোবেল পাবার পর বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হবার পর ১৯২২ সালে দ্বিতীয়বার বোর্ডিং স্কুলের যাত্রা শুরু হল। দ্বারিক বাড়ির পাশে লেবুকুঞ্জে তখনকার মতো মেয়েদের থাকার ব্যবস্থা হল। বোর্ডিং এর ভার নিলেন স্নেহলতা দেবী। রবীন্দ্রনাথ খুশি হলেন। সমাজের প্রয়োজন ছিল বলেই মেয়েরা আস্তে আস্তে দলে ভারী হতে লাগল। "মেয়েদের জন্য এবার একটি বড় বাড়ি না হলেই নয়। ১৯২৮ সালে তৈরী হল শ্রীভবন। সেটাই আজকের শ্রীসদন।" (বসু, ২০১৬, পৃ-৫৫) শান্তিনিকেতনে এমনকী সার্বিকভাবেই মেয়েদের শিক্ষার ইতিহাসে এই মেয়েদের হস্টেল গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ১৯১০ সালে প্রবল বিরোধিতায় যা উঠে গিয়েছিল তা দশ-পনেরো বছরের মধ্যেই তা শুরু হল। মেয়েরা হস্টেলে থাকল এবং ছেলেদের পাশে বসে পড়াশুনা করার সঙ্গে সঙ্গে আঁকা নাচ গান নাটক সব কিছুতেই অংশ নিল। শান্তিনিকেতনের জীবনে সেই সময় যতগুলো বড় পরিবর্তন ঘটেছে শ্রীসদন তার মধ্যে অন্যতম। সমাজের নানা বিরোধিতা কমে গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ নোবেল পাবার পর। সারা বিশ্বে নাম ছড়িয়ে পড়ার পর পুরোনো বাধাগুলো আর ধোপে টিকলো না। ভারতবর্ষের নানা জায়গা

থেকে মেয়েরা পড়তে এলো এখানে। ঋতা বসু জানাচ্ছেন "নারী নরকের দ্বার, মাত্র পনেরো বছর আগের এই মানসিকতার আমূল পরিবর্তন ঘটাল শান্তিনিকেতনের মেয়ে হস্টেল-শ্রীসদন।" (বসু, ২০১৬, পৃ -৫৬)

আদর্শগত পার্থক্যের কারণে বিশ্বভারতীর সঙ্গে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসজীবনের সঙ্গে এখানকার আবাসজীবনের কিছু মৌলিক পার্থক্য ঘটেছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে হস্টেল ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার সুত্রে শুধুমাত্র থাকার জায়গা হিসাবে এসেছে। দূরের কিছু ছাত্রছাত্রীর হস্টেলে থাকার ব্যবস্থা হয় হস্টেলে। অন্যদিকে বিশ্বভারতীতে আবাসজীবন এসেছে একটি জীবনচর্যার অঙ্গ হিসাবে। আশ্রম শিক্ষালাভের সঙ্গে সেখানে বসবাসের একটি অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রয়েছে। সেখানে শিক্ষা শুধুমাত্র দশটা থেকে পাঁচটার কয়েকটি ক্লাশ ও শ্রেণিকক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সেখানে শিক্ষা একটি বিশেষ জীবনচর্যা, যা দিনের সবটুকু সময়ের উপস্থিতি দাবী করে। তবে বেশকিছু ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যেমন জে এন ইউ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি যেগুলি শুধুমাত্র উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে উঠলেও এর ক্যাম্পাসগুলি ধীরে ধীরে একটি নিজস্ব সংস্কৃতি বোধ গড়ে তুলেছে যা ছাত্রছাত্রীদের প্রভাবিত করে। কিন্তু বিশ্বভারতীর ক্ষেত্রে বিষয়টা ভিন্নতর কারণ প্রচলিত শিক্ষাব্যাবস্থার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় তপোবন শিক্ষাব্যবস্থার মত আশ্রম শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যই এই বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলেছিলেন। এই বিশেষ আদর্শ ও উদ্দেশ্যমূলকতা এই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে এবং এর অন্তর্গত আবাসজীবনকে বাকী বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসজীবন থেকে আলাদা করেছে। ভারতীয় প্রাচীন আশ্রম শিক্ষাব্যবস্থার মত শান্তিনিকেতনে তৈরী হয়েছে আবাসজীবন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়টি সূচনাপর্ব থেকেই আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যা তিনি আশ্রম সম্মিলনীর নিয়মাবলীতে উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্র আদর্শকে লাগু করার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়টিই নয়, রবীন্দ্রনাথের আশ্রম শিক্ষাকে বলবত ও সঞ্চারিত করার ক্ষেত্রে হস্টেলগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য। ছাত্রছাত্রীদের কাছে আশ্রম শিক্ষাকে দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ হিসাবে আরো নিবিড় করেতুলেছে হস্টেলগুলি এবং সেইসূত্রে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকার থেকে স্বাতন্ত্র্য স্থাপিত হয়েছে এই আবাসিক এলাকার।

চিত্র – ১৯ শ্রীসদনে মেয়েদের দৈনন্দিনের ছবি, শম্ভু সাহার তোলা ছবি, রবীন্দ্রভবন ছবি সংগ্রহশালা থেকে সংগৃহীত।

চিত্র – ২০ শ্রীসদনে মেয়েদের দৈনন্দিনের ছবি, S.P Gavande র তোলা ছবি, রবীন্দ্রভবন ছবি সংগ্রহশালা থেকে সংগৃহীত।

চিত্র – ২১ শ্রীসদনে মেয়েদের দৈনন্দিনের ছবি, শম্ভু সাহার তোলা ছবি, রবীন্দ্রভবন ছবি সংগ্রহশালা থেকে সংগৃহীত।

এইভাবে রবীন্দ্রনাথের নারীশিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ ও বিশিষ্টজনদের লেখা চিঠি থেকে, প্রথম যুগের ছাত্রী ও আবাসিকাদের স্মৃতিচারণা এবং ছাত্রীনিবাসের পরিদর্শিকাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনার পাশাপাশি রবীন্দ্র জীবনীকারদের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ থেকে শান্তিনিকেতনে মেয়েদের শিক্ষা ও আবাসজীবন সম্বন্ধে একটি ধারাবাহিক চিত্র পাওয়া যায়। তার মধ্যে শ্রীসদন গার্লস হস্টেলের অবস্থান এবং ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আশ্রম শিক্ষার সূচনা থেকে মেয়েদের পড়াশুনার ব্যবস্থা ছিল না, শুরু হল মেয়েদের শিক্ষা এবং সহশিক্ষা। দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথ আশ্রমের কাজে মেয়েদের অংশগ্রহণের বিষয়ে আশাবাদী হচ্ছেন সেকথা বিভিন্ন চিঠিতে জানাচ্ছেন। মেয়েদের 'কল্যাণময়ী মূর্তি' র প্রভাবে আশ্রমের 'শ্রী' বিস্তারের কথা বলছেন। তৃতীয়ত, ছাত্রীরা পড়াশুনা ছাড়াও আরো নানা কাজে অংশগ্রহণ করছেন, নাটক করছেন তাঁরা, অনুষ্ঠানে শ্রীসদনের মেয়েদের অংশগ্রহণের জন্য রবীন্দ্রনাথ হস্টেলের ওয়ার্ডেনকে চিঠি লিখছেন। একটা পরিসর পরিবারের বাইরে পিতৃতান্ত্রিক ঘেরাটোপের বাইরে গিয়ে তাঁরা নিজেদের জন্য পাচ্ছেন, যা থেকে জন্ম নিচ্ছে অজস্র আবাস জীবনের স্মৃতিকথা। অমিতা সেন, রানী চন্দ, বাণী নিয়োগী প্রমুখের স্মৃতিকথায় শ্রীসদন একটি বিশেষ জায়গা নিচ্ছে। যার প্রবাহ থামে নি, সেই স্রোত থেকেই বহু পরবর্তীতে অহনা বিশ্বাস, ঋতা বসুর স্মৃতিকথা আমরা দেখেছি। সমাজের বাঁকা চোখের সামনে তৎকালে মেয়েরা হস্টেলে থেকে পড়াশুনা করেছেন, বিভিন্ন কাজে অংশ নিয়েছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে বিভিন্ন অবস্থানের মেয়েদের একত্রবাস শ্রীসদনকে রবীন্দ্র সমকালেই করে তুলেছিল একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ একটি পরিসর।

বিশ্বভারতী সুচনা পর্বে নারী শিক্ষার প্রচলনে সেকালের উচ্চবর্গীয়, উচ্চবর্ণীয় নারী যারা বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের বাড়ির কন্যারা অংশ নিয়েছিলেন। রক্ষণশীল সমাজে এই অংশগ্রহণ ছিল বৈপ্লবিক নিঃসন্দেহে। তবে এই সূচনা পর্ব থেকে স্বাধীনতা এবং ১৯৫৬ সালে বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হওয়া অবধি নিম্নবর্গীয় নারীদের অংশগ্রহণ দেখা যায় না। অংশগ্রহণের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে সাংবিধানিক সংরক্ষণ পর্যন্ত। তারা ততটাই জায়গা পায় যতটা সংরক্ষণে বরাদ্দ। পরের অধ্যায়ে যে প্রান্তিক প্রথম প্রজন্মের ছাত্রীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে কেস স্টাডির ভিত্তিতে তাদের বক্তব্য আলোচিত হল।

**পরিশেষ**

বিশ্বভারতী এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় যে দুটি গবেষণার ক্ষেত্র হিসাবে গৃহীত হয়েছে তাদের নির্মাণের প্রেক্ষাপটে সাদৃশ্য থাকলেও তাদের নির্মাণের কারণ এবং পটভূমি আলাদা। দুটি বিশ্ববিদ্যালয় ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে ভিন্ন ভাবে নির্মিত হয়েছে। স্থানিক, ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক ভাবে ভিন্ন দুটি পরিসর যেখানে দুটি ক্যাম্পাসের চরিত্র সম্পূর্ণ ভাবে আলাদা। নির্মাণের প্রেক্ষাপট থেকে ১৯০১ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯৫৫ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের পর থেকে তাদের বিবর্তনের বা রূপান্তরের গতি প্রকৃতি আলাদা। প্রাথমিক ভাবে যে তুলনামূলক আলোচনা করা যায়, বিশ্বভারতী ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে গড়ে ওঠে, একটি পরিবারের প্রভাব বরাবর ক্রিয়াশীল থেকেছে এবং রবীন্দ্রনাথের আদর্শে বিশ্বভারতী একটি নির্দিষ্ট আদল পায়। অন্যদিকে যাদবপুর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে গড়ে উঠেছে। দ্বিতীয়ত, বিশ্বভারতী একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় অন্যদিকে যাদবপুর রাজ্যের অধীনস্থ। তৃতীয়ত, বিশ্বভারতী ভৌগোলিক ভাবে মফস্বলে অবস্থিত, বীরভূম জেলার বোলপুরে, অন্যদিকে যাদবপুর রাজ্যের রাজধানী শহর মহানগর কলকাতায় অবস্থিত। চতুর্থত, দুটি বিশ্ববিদ্যালয় দৃশ্যত ভিন্ন এবং পরিকাঠামোগত ভাবে ভিন্ন। পঞ্চমত, দুটি বিশবিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক চরিত্র আলাদা। ষষ্ঠত, দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের সংস্কৃতি আলাদা। দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভাব আলাদা। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্রছাত্রী গবেষকদের গঠন ও ভিন্ন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক চরিত্র, পরিকাঠামো আলাদা, আবাসজীবনের নিয়ম, বিবর্তন ভিন্ন ভাবে এগিয়েছে। দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের পাঠ অভিজ্ঞতা আলাদা। গ্রন্থাগার, মুক্ত প্রাঙ্গণ, উদযাপন, খাদ্য সংস্কৃতি, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, পরিসরে বিদ্যমান ক্ষমতা সম্পর্ক ভিন্ন। জ্ঞানচর্চার অভিমুখ আলাদা। এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠান ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ছাত্রদের সমীকরণ, প্রতিবাদের বয়ান আলাদা। এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রছাত্রীদের পাঠ এবং আবাসজীবনের অভিজ্ঞতা আলাদা। এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয় দুটি ভিন্ন পরিস্থিতিতে এবং ভিন্ন কারণে নির্মিত হয়ে উঠেছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। ভিন্নতা থাকলেও দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশি শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন। ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে দেশীয় শিক্ষার নির্মাণ, স্বদেশি শিক্ষার পুনর্গঠন, সংরক্ষণ,

পলিশি সংস্কার ইত্যাদির পরেও ‘পুনর্গঠন’ এবং ‘সংস্কার’ এর পরবর্তী পর্বে ‘রূপান্তর’ এর মাধ্যমে প্রান্তিক স্বরের প্রতিষ্ঠা পাবার সম্ভবনা তৈরি হতে পারে। ঔপনিবেশিক শিক্ষার ক্ষমতাতন্ত্র থেকে বেরিয়ে এলেও এদেশের বর্ণাশ্রমকেন্দ্রিক ক্ষমতাতন্ত্রের সঙ্গে কীভাবে সমঝোতা করেছিল এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়, যার ছাপ বর্তমানে তাদের ছাত্রছাত্রীদের প্রভাবিত করছে, দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রান্তিক ছাত্রীদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে পরবর্তী অধ্যায় গুলিতে বিষয়টিতে আলোকপাত করা হল।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

# গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের সার্বিক তথ্যের রেখাচিত্র

# দ্বিতীয় অধ্যায়

# গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের সার্বিক তথ্যের রেখাচিত্র

অধ্যায়টি গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের জনতাত্ত্বিক, সামাজিক এবং শিক্ষামূলক তথ্যের উপর আলোকপাত করেছে। যদিও এই গবেষণায় ব্যবহৃত গবেষণা-পদ্ধতি গুণগত, এই অধ্যায়টিতে অন্বিষ্ঠ দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশগ্রহণকারীদের সামগ্রিক পরিচিতির জন্য একটি বৃহত্তর কাঠামো দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের বয়স, লিঙ্গ এবং আর্থ-সামাজিক পটভূমির একটি বিস্তৃত পর্যালোচনা করা হয়েছে। তাছাড়াও এই অধ্যায়টি অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষাগত স্তরগুলি অন্বেষণ করবে, তাদের অধ্যয়নের ক্ষেত্র এবং একাডেমিক কৃতিত্ব সহ, তাদের জ্ঞান এবং দক্ষতার বিষয়ে আলোকপাত করবে। এই তথ্যগুলি অংশগ্রহণকারীদের অবস্থান এবং পটভূমি বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি তাদের অভিজ্ঞতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং গবেষণার ফলাফলের উপর সম্ভাব্য প্রভাবগুলি চিহ্নিত করতে সহায়তা করবে। আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং সাংস্কৃতিক পটভূমির মতো সামাজিক কারণগুলির পাশাপাশি বয়স, লিঙ্গ এবং জাতিগত পরিচয়ের মতো তাদের জনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করলে আরও নিপুণভাবে বোঝা যায় যে অধ্যয়নের সময় এই পরিবর্তনশীল বিষয়গুলি কীভাবে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রতিক্রিয়াকে রূপ দিতে পারে। এছাড়াও, এখানে তাদের শিক্ষাগত পটভূমি এবং একাডেমিক কৃতিত্বের স্তরগুলি অন্বেষণ করা হয়েছে, যা তাদের জ্ঞান বা দক্ষতার যে কোনও সম্ভাব্য বৈচিত্র্য শনাক্ত করতে সহায়তা করবে যেগুলি গবেষণার ফলাফলকে প্রভাবিত করতে ক্রিয়াশীল থাকে।

দুটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্যধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়জন করে মোট বারো জন প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক ছাত্রীর সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়েছে। একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, অন্যটি রাজ্য সরকারের অধীনস্থ। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বীরভূম জেলার মফস্বল এলাকায় অবস্থিত একটি ক্যাম্পাস, অন্যটি রাজ্যের রাজধানী শহর কলকাতায় অবস্থিত। দুটি বিশ্ববিদ্যালয় বৈশিষ্ট্য এবং চরিত্রগত ভাবে ভিন্ন যা তাদের নির্মাণের ইতিবৃত্ত থেকে স্পষ্ট এবং দুটি বিশ্ববিদ্যালয় ভিন্ন সংস্কৃতি বহন করে ও সঞ্চারিত করে। বিশ্ববিদ্যালয় দুটিতে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে ছাত্রছাত্রীরা উচ্চশিক্ষার জন্য আসেন। এই ভিন্নধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রান্তিক ছাত্রীদের অবস্থানের ভিত্তিতে রাজ্যের একটা সার্বিক চিত্র উঠে আসার সম্ভবনা রয়েছে। এই বারোজন ছাত্রী সমাজের প্রান্তিক অবস্থান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছেন, যাদের প্রত্যেকের প্রান্তিকতার চরিত্র আলাদা। প্রাথমিকভাবে সাধারণ তথ্যসংগ্রহের জন্য প্রশ্নাবলী পুরণ করেছেন অংশগ্রহণকারীরা, পরবর্তীতে আরো পাঁচটি পর্যায়ে নিবিড় সাক্ষাৎকার থেকেও কিছু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। ছাত্রীদের বিষয়ে সংগৃহীত তথ্য থেকে তাদের অবস্থান এবং বাস্তবতা অনুধাবনের সূত্রপাত হয়। একজন ছাত্র বা ছাত্রী বিবিধ পরিচিতি বোধের মধ্যে অবস্থান করেন, যার ভিত্তিতে তাদের সংযুক্তির বোধ তৈরি হয় (Davis, 2006)। এই সংযুক্তি বোধের রূপান্তরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত তাদের অভিজ্ঞতা। অন্যদিকে স্কট ব্যক্তির আত্মবোধ নির্মাণকে স্থির বিষয় হিসাবে দেখছেন না। প্রতিষ্ঠানের মধ্যে

ব্যক্তির আত্মবোধ পরিবর্তিত হয় আর্থ-সামাজিক বিষয়ের দ্বারা। অংশগ্রহণকারীদের সংযুক্তির বোধ এবং আত্মবোধ নির্মাণের ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল ধ্রুবক গুলি তাদের বেড়ে ওঠা ও পারিপার্শ্বের মধ্যে নিহিত থাকে (Davis, 2006; Scott, 2011)। বিবিধ পরিচিতি এবং আত্ম পরিচিতি বোধের মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের সাংবিধান স্বীকৃত পরিচিতি, আত্মপরিচিতির বোধ, সামাজিক ভাবে আরোপিত বিধি প্রসূত পরিচিতি— এই পরিচিতিগুলির মধ্যে দ্বান্দিক সম্বন্ধ তৈরি হয়। ছাত্রীদের সম্বন্ধে সাধারণ তথ্যগুলি তাদের সামাজিক, লিঙ্গগত, অর্থনৈতিক, শ্রেণিগত, জাতিগত, ধর্মগত, সাংবিধানিক, পারিবারিক, ভৌগোলিক, শিক্ষাগত, বৈবাহিক, ভাষাগত পরিচিতির নির্মাণকে অনুধাবন করতে সহায়তা করে, যে পরিচিতিগুলি একক ভাবে এবং একত্রিত ভাবে ভিন্ন প্রকার প্রভাব তৈরি করে, অন্যদিকে দুই তিনটি পরিচিতি একত্রিত হলে ভিন্ন বাস্তবতা নির্মাণ করে এবং আরোপিত এবং একাত্মতার ভিত্তিতে পরিচিতির বোধ চিহ্নিতকরণ এবং পরিচিতি সম্বন্ধীয় রাজনীতিটি নির্মাণের বিষয়টি উপলব্ধ হয়।

সংগৃহীত তথ্য একত্রীকরণ এবং বিন্যাসের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক কোড ব্যবহৃত হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য এবং মানবিক সত্তা কোডের মধ্যে ছায়াবৃত হয়। তাই আলোচনায় প্রত্যেকের পরিবর্তিত নাম ব্যবহৃত হল। এক্ষেত্রে একদিকে যেমন তাদের স্বতন্ত্র সত্তা রক্ষার প্রয়াস থাকে, তারা শুধুমাত্র সংখ্যা বা কোড হিসাবে প্রতিভাত হন না, তেমনি তাদের ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষিত হয়। জাতিগত এবং সামাজিক অবস্থান বোঝানোর জন্য পদবী একই রাখা হল।

| **অংশগ্রহণকারীদের কোড** | **পরিবর্তিত নাম** |
|---|---|
| অংশগ্রহণকারী বি. বি ১ | রিনি মুর্মু |
| অংশগ্রহণকারী বি. বি ২ | পপি হেমব্রম |
| অংশগ্রহণকারী বি. বি ৩ | বেণু হাসদা |
| অংশগ্রহণকারী বি. বি ৪ | টিনা দাস |
| অংশগ্রহণকারী বি বি ৫ | হেম চন্দ |
| অংশগ্রহণকারী বি. বি ৬ | কুহু মাহাতো |
| অংশগ্রহণকারী যা. বি ৭ | নিশা দাস |
| অংশগ্রহণকারী যা. বি ৮ | পিউ দাস |
| অংশগ্রহণকারী যা. বি ৯ | সাকিনা |
| অংশগ্রহণকারী যা. বি ১০ | কেয়া দাস |
| অংশগ্রহণকারী যা. বি ১১ | সুধা মাল |
| অংশগ্রহণকারী যা. বি ১২ | ইউমী দর্জি |

- বি. বি – বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।
- যা. বি – যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

- নকল নামগুলি অংশগ্রহণকারীদের সাক্ষাৎকারের আলোচনায় ব্যবহার করা হয়েছে।

এই অধ্যায়ে তিনটি পর্যায়ে তথ্য তালিকা ভুক্ত হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ছাত্রীদের প্রাথমিক সাধারণ তথ্য, দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের পারিবারিক অবস্থান ও পরিস্থিতির তথ্য এবং তৃতীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় এবং হস্টেল কেন্দ্রিক তথ্যগুলি পরিবেশিত হয়েছে। বারোজন অংশগ্রহণকারীর প্রাথমিক তথ্যগুলি তাঁদের ব্যক্তি হিসাবে একদিকে যেমন চিহ্নিত করে তেমনি তাঁদের বাস্তবতার স্বাতন্ত্র্য গুলিও উঠে আসে। ধর্ম, জাতি, ভাষা, বয়স ইত্যাদি দিক থেকে তাঁরা ভিন্ন পরিচিতি, ভিন্ন আত্মবোধ এবং ভিন্ন বাস্তবতার মধ্যে রয়েছেন। সাংবিধানিক ভাবে তাঁরা যে "তালিকা" ভুক্ত, তার ভিত্তিতে তাঁদের আরেকটি পরিচিতিবোধ নির্মিত হয়। ব্যক্তির আত্মবোধ এবং পরিচিতির একটি বয়ান তৈরি হয় সামাজিক স্তর বিভাজনের ধ্রুবক গুলির ওপর ভিত্তি করে। এই ছাত্রীরা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে একধরনের পরিচিতিতে পরিচিত হয়, অন্যদিকে তাঁদের আত্মবোধ ভিন্ন। দুইয়ের মিশ্রণে তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার অভিজ্ঞতা নির্মিত হয়। সাধারণ তথ্যগুলি এখানে তুলনামূলকভাবে উপস্থাপিত হল।

**অংশগ্রহণকারী ছাত্রীদের প্রাথমিক সাধারণ তথ্য**

**তালিকা ৫ - সাধারণ তথ্য (ক)**

| **বিশ্ববিদ্যালয়** | **অংশগ্রহণকারী** | **সাংবিধানিক তালিকা ভুক্ত** | **জাতি** | **ধর্ম** | **বয়স** | **বিবাহিত/ অবিবাহিত** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **বিশ্বভারতী** | ১ | এস টি | সাঁওতাল | সারনা ধরম | ২৩ | অবিবাহিত |
| | ২ | এস টি | সাঁওতাল | সারনা ধরম | ২০ | অবিবাহিত |
| | ৩ | এস টি | সাঁওতাল | সারনা ধরম | ২৭ | অবিবাহিত |
| | ৪ | এস সি | চর্মকার | হিন্দু | ২৯ | বিবাহিত |
| | ৫ | ও বি সি (বি) | কর্মকার | হিন্দু | ৩০ | অবিবাহিত |
| | ৬ | ও বি সি (বি) | নমশূদ্র | কুরমী | ২২ | অবিবাহিত |
| **যাদবপুর** | ৭ | এস সি | নমশূদ্র | হিন্দু | ২৭ | অবিবাহিত |
| | ৮ | এস সি | নমশূদ্র | হিন্দু | ২৯ | অবিবাহিত |
| | ৯ | ও বি সি (এ) | সুন্নী | মুসলিম | ২৮ | বিবাহিত |
| | ১০ | এস সি | নমশূদ্র | হিন্দু | ৩০ | অবিবাহিত |
| | ১১ | ও বি সি (বি) | মাল | হিন্দু | ২৬ | অবিবাহিত |
| | ১২ | এস টি | নেপালী | হিন্দু | ২৮ | অবিবাহিত |

অংশগ্রহণকারী্রা জাতিগত পরিচয়ে ৩ জন সাঁওতাল জনগোষ্ঠী ভুক্ত, ৪ জন নমশূদ্র, ১ জন নেপালী, ১ জন সুন্নী মুসলিম, ১ জন মুচি অর্থাৎ চর্মকার, ১ জন কর্মকার এবং ১ জন মাল সম্প্রদায়ভুক্ত। এবং সাংবিধানিক তালিকা অনুসারে ৪ জন এস টি অর্থাৎ তফশিলি উপজাতি, ৪ জন এস সি অর্থাৎ তফশিলি জাতি এবং ৪ জন ও বি সি অর্থাৎ অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়, এই চারজনের মধ্যে ১ জন ও বি সি (এ) ৩ জন ও বি সি (বি) তালিকাভুক্ত। সাতজন অংশগ্রহণকারী নিজেদের ধর্মগত পরিচয় হিন্দু হিসাবে উল্লেখ করেছেন, একজন মুসলিম, ৩ জন সারনা ধর্মের এবং একজন 'কুরমী' ধর্মাবলম্বী হিসাবে নিজেকে উল্লেখে করেছেন। সাঁওতাল সম্প্রদায়ভুক্ত তিন জন অংশগ্রহণকারী নিজেদের অনুশীলিত ধর্ম 'সারনা ধর্ম' এর কথা বলেছেন। উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত একটি প্রকৃতি কেন্দ্রিক ধর্ম 'সারনা ধরম'। অন্যদিকে 'কুরমী' ধর্ম বিশেষ জাতিসত্তা থেকে উদ্ভুত একটি ধর্ম। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ২ জন বিবাহিত এবং বাকীরা অবিবাহিত। এই ছাত্রীদের বয়স সর্বোচ্চ ৩০ থেকে সর্বনিম্ন ২০।

**সাধারণ তথ্য (খ)**

| বিশ্ববিদ্যালয় | অংশগ্রহণকারী | শিক্ষাগত অবস্থান | বিষয় | মাতৃভাষা | ভাষাগত দক্ষতা | উচ্চশিক্ষায় পরিবারের সমর্থন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **বিশ্বভারতী** | ১ | এম এ | সাঁওতালি | সাঁওতালি | বাংলা | হ্যাঁ |
| | ২ | এম এ | সাঁওতালি | সাঁওতালি | বাংলা | না |
| | ৩ | এম ফিল | বাংলা | সাঁওতালি | বাংলা | না |
| | ৪ | পিএইচ ডি | ভুগোল | বাংলা | ইংরেজি | হ্যাঁ |
| | ৫ | পিএইচ ডি | ভুগোল | বাংলা | ইংরেজি | হ্যাঁ |
| | ৬ | এম এ | ফিজিক্যাল এডুকেশন | আঞ্চলিক হিন্দী | বাংলা | হ্যাঁ |
| **যাদবপুর** | ৭ | এম ফিল | ভূগোল, সোসাল সায়েন্স, | বাংলা (মুর্শিদাবাদী) | বাংলা | হ্যাঁ |
| | ৮ | এমফিল | ভূগোল, সোসাল সায়েন্স | বাংলা | বাংলা | না |
| | ৯ | এমফিল | রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নারীবিদ্যা চর্চা | বাংলা উর্দু মিশ্রিত | বাংলা | না |
| | ১০ | এমফিল | রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নারীবিদ্যা চর্চা | বাংলা | ইংরেজি | হ্যাঁ |
| | ১১ | পিএইচ ডি | বাংলা | বাংলা | ইংরেজি | হ্যাঁ |
| | ১২ | এম এ | দর্শন | নেপালি | ইংরেজি | হ্যাঁ |

প্রান্তিক ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষায় ভাষা একটি প্রধান সমস্যা। মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে না পারায় তারা বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন এবং অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৩ জনের মাতৃভাষা সাঁওতালি। ১ জনের মাতৃভাষা নেপালি, ১ জনের মাতৃভাষা হিন্দী। এবং ৭ জনের মাতৃভাষা বাংলা। এই বাংলা ভাষার মধ্যে অঞ্চল অনুসারে বদলে যায় ভাষার শব্দ ব্যবহার, উচ্চারণ, বাক্য গঠন। যে গুলি প্রামাণ্য বাংলা ভাষার কাছে 'ভিন্ন' এবং 'আঞ্চলিক' হিসাবে প্রতিভাত হয়। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ১ জনের মাতৃভাষা মুর্শিদাবাদী বাংলা। আরেকজনের মাতৃভাষা উর্দুমিশ্রিত বাংলা। একই ভাবে ১ জন অংশগ্রহণকারীর মাতৃভাষা 'আঞ্চলিক' হিন্দী। নিজের মাতৃভাষায় অধিকাংশই পড়াশোনা করতে পারেন না। ভিন্ন ভাষায় স্কুলিং এবং অন্য ভাষায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৪ জন এম এ র ছত্রী, ৩ জন পি এইচ ডি করছেন এবং ৫ জন এম ফিল করছেন। অংশগ্রহণকারী ছাত্রীদের মধ্যে ৪ জন অধ্যয়নের বিষয় বদলেছেন। ৮ জন অংশগ্রহণকারী একই বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছেন। ২ জন স্নাতক স্তরে ভূগোল পড়লেও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সমাজ বিজ্ঞান পড়েছেন এবং গবেষণা করেছেন। ২ জন স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়েছেন এবং এম ফিল করছেন মানবী বিদ্যায়। বিষয় বদলের কারণ হিসাবে তারা জানাচ্ছেন চাকরি পাবার সুবিধা এবং বিভিন্ন ধরনের রোজগারের পরিসর বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভবনার কথা।

**তালিকা ৬ – অর্থনৈতিক অবস্থান**

প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক ছাত্রীদের পারিবারিক, অর্থনৈতিক অবস্থান এবং পরিবারের মধ্যে ছাত্রীটির অর্থনৈতিক অবস্থান - এই দ্বিমাত্রিক অবস্থানের ভিত্তিতে তৈরি হয় ছাত্রীটির নিজস্ব অর্থনৈতিক বাস্তবতা। উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে চাকরিতে যুক্ত হয়ে বা রোজগারের মাধ্যমে সে এই অর্থনৈতিক বাস্তবতা পেরিয়ে ভিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থানে প্রবেশ করে, যাকে 'নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্ম' (Dhawan et al. 2022) চিহ্নিতকরণের সঙ্গে যুক্ত। বা ব্যক্তির 'কনজিউমার' হয়ে ওঠার সঙ্গে সম্পর্কিত। উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে দ্বিমাত্রিক[১] রূপান্তরের একটি - 'সমাজ রূপান্তর' এর একটি দিক নির্দেশ এখানে সূচিত হয়। পারিবারিক, নিজস্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং সরকারী সহায়তায় (বৃত্তি, স্কলারশিপ ইত্যাদি) এই ছাত্রীরা সেই পর্যায়ে বা পটভূমিতে পৌঁছান যেখান থেকে অর্থনৈতিক ভাবে স্বনির্ভরতা লাভের সম্ভবনা তৈরি হয় এবং যা তাদের বিদ্যমান সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্ষমতা সম্পর্ককে যুঝতে সহায়তা করে (Dhawan, 2022)। পরিবারের মেয়েটির জন্য বা তার পড়াশোনার জন্য পরিবার কতটা ব্যয় করতে রাজী হন – এটি 'নারীর দারিদ্র' বিষয়টির সঙ্গে সম্পর্কিত। পরিবার স্বচ্ছল হলেও পরিবারে মেয়েটি দারিদ্রের মধ্যে থাকতে পারেন।[২] প্রতিটি ছাত্রীর অর্থনৈতিক অবস্থান চিহ্নিত করা হল।

---

[১] অধ্যাপক ডীনা যোয় বেলুইজি ২০১৯ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বক্তৃতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে দুটি রূপান্তরের কথা বলছেন, সমাজ গঠন, জ্ঞান গঠন।

৫ নারীর দারিদ্রের ভিন্ন মাত্রার কথা বলছেন বোসরাপ, যেখানে পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থানের সঙ্গে জটিল সম্বন্ধ রয়েছে পরিবারের মেয়েটির অর্থনৈতিক অবস্থানের।

**ক। অংশগ্রহণকারী ছাত্রীদের অর্থনৈতিক অবস্থান**

| বিশ্ববিদ্যালয় | অংশগ্রহণ কারী | মাসিক খরচ (হাজার) | হস্টেলের খরচ | ব্যক্তিগত আয় (মাসিক) | সরকারী সাহায্য | পরিবার থেকে প্রাপ্ত মাসিক আর্থিক সহযোগিতা | বৃত্তি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **বিশ্বভারতী** | ১ | ৪০০০ | ২,২০০ | টিউশন থেকে ৫০০ | হস্টেলে থাকা বিনামূল্যে | না | প্রতিবন্ধী হিসাবে |
| | ২ | ৩৫০০ | ২,২০০ | নেই | হস্টেলে থাকা বিনামূল্যে | ২,৫০০ | এস টি স্কলারশিপ |
| | ৩ | ৪০০০ | ২২০০ | টিউশন ৫৫০/- | হস্টেলে থাকা বিনামূল্যে | ২,৫০০ | এস টি স্কলারশিপ |
| | ৪ | ৪০০০ | ২২০০ | স্কলারশিপ | হস্টেলে থাকা বিনামূল্যে | না | এস টি স্কলারশিপ |
| | ৫ | ৭০০০ | ২২০০ | টিউশন/ স্কলারশিপ ১০০০/- | হস্টেল ফিজ দিতে হয় | না | জে আর এফ |
| | ৬ | ৩৫০০ | ২২০০ | টাইপিং ৭০০/- | হস্টেল ফিজ দিতে হয় | না | মেরিট কাম মিনস স্কলারশিপ |
| **যাদবপুর** | ৭ | ৬০০০ | ৩০০০ | নেই | হস্টেলে থাকা বিনামূল্যে | ৩,০০০ | এস সি স্কলারশিপ |
| | ৮ | ৭০০০ | ৩০০০ | টাইপিং, এডিটিং | হস্টেলে থাকা বিনামূল্যে | ৩,০০০ | নন নেট স্কলারশিপ |
| | ৯ | ৫০০০ | ৩০০০ | অতিথি অধ্যাপক | হস্টেল ফিজ দিতে হয় | ৩,০০০ | নন নেট স্কলারশিপ |
| | ১০ | ৭০০০ | ৩০০০ | নেই | হস্টেলে | না | এন এফ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | থাকা বিনামূল্যে | | ও |
| | ১১ | ৬৫০০ | ৩০০০ | টাইপিং ১০০০/- | হস্টেল ফিজ দিতে হয় | না | নন নেট স্কলারশিপ |
| | ১২ | ৬০০০ | ৩০০০ | টিউশন | হস্টেল ফিজ দিতে হয় | ৩,০০০ | এস টি স্কলারশিপ |

## খ। অংশগ্রহণকারী ছাত্রীদের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থান

| **বিশ্ববিদ্যালয়** | **অংশ গ্রহণ কারী** | **পরিবারে সদস্য** | **পরি বারের গঠন** | **পারি বারিক পেশা** | **পরিবারে চাকুরী জীবী** | **পরিবারে আয় করেন কতজন** | **পরিবারে মাসিক আয়** | **মাথাপিছু পারিবারিক মাসিক আয়** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **বিশ্বভারতী** | ১ | ৮ | যৌথ | দিনমজুর | 0 | ২ | ১৮,০০০ | ২,২৫০ |
| | ২ | ১১ | যৌথ | চাষবাস, চাকরী | ১ | ৩ | ২২,০০০ | ২,০০০ |
| | ৩ | ৯ | যৌথ | চাষবাস | 0 | ১ | ১৪,০০০ | ১,৫৫৫ |
| | ৪ | ৩ | একক | দিনমজুর | 0 | ১ | ১৫,000 | ৫,০০০ |
| | ৫ | ৪ | একক | আটা মিলের কর্মী | ০ | ২ | ২৫,০০০ | ৬,২৫০ |
| | ৬ | ১৩ | যৌথ | ধোপা | ০ | ২ | ১৮,০০০ | ১,৩৮৪ |
| **যাদবপুর** | ৭ | ১২ | যৌথ | সবজি ব্যবসা | ০ | ৩ | ৩০,০০০ | ২,৫০০ |
| | ৮ | ৫ | একক | দিনমজুর | ১ | ২ | ২০,০০০ | ৪.০০০ |
| | ৯ | ১০ | যৌথ | আইস ক্রীম ডিলার | ০ | ১ | ২৮,০০০ | ২,৮০০ |
| | ১০ | ৩ | একক | চাষবাস, লটারীর দোকান | ০ | ১ | ১৫,০০০ | ৫,০০০ |
| | ১১ | ৬ | যৌথ | জুতোর দোকান | ১ | ২ | ২৫,০০০ | ৪,১৬৬ |
| | ১২ | ৮ | যৌথ | সাফাই কর্মী | ০ | ২ | ২০,০০০ | ২,৫০০ |

বিশ্ববিদ্যালয় দুটির মোট বারোজন (প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয়জন) ছাত্রী যাঁরা তফসিলী জাতি, উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ভুক্ত এবং বর্তমানে উচ্চশিক্ষায় নিযুক্ত রয়েছেন তাঁরা বেশ কয়েকটি পর্যায়ে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। বিদ্যালয় থেকে তাঁরা বৃত্তি পেয়েছেন, উচ্চশিক্ষায় এসে তাঁরা মেরিট কাম মীন্স, ন্যশনাল ফেলোশিপ ফর ওবিসি, ন্যাশনাল ফেলোশিপ ফর এস সি, এস টি[৩] এবং ননেট ফেলোশিপের আর্থিক সহায়তায় পড়শুনা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই ফেলোশিপের অর্থ তাঁরা নিজেরদের পড়াশুনা ছাড়াও পরিবারকে সহায়তা করেন। ভাইবোনদের পড়াশুনা, পরিবারের সদস্যদের অসুস্থতা, পরিবারের ব্যবসায় ঘাটতি ইত্যাদিতে তারা সহায়তা করে থাকেন। নিজেরা অবসর সময় টিউশনী পড়িয়ে, এডিটিং, টাইপিং ইত্যাদি কাজ করে হাতখরচের টাকা রোজগার করেন। আর্থিক অসুবিধা এবং অনিশ্চয়তা তাদের মানসিক ভাবে দোলাচলের মধ্যে রাখে যে অভিজ্ঞতা তাঁরা বলেছেন সাক্ষাতকারে। অংশগ্রহণকারীদের পরিবারগুলির মধ্যে সর্বাধিক মাসিক আয় ৩০ হাজার টাকা, সর্বনিম্ন আয় ১২ হাজার টাকা। তাদের স্কলারশিপ এবং টিউশনী থেকে নিজস্ব আয় কিছু রয়েছে। টিউশনী থেকে সর্বাধিক ৪ হাজার থেকে সর্বনিম্ন ৫০০ টাকা তারা রোজগার করেন। নিজেদের আয় তারা কতটা নিজেদের জন্য এবং পড়াশুনার জন্য ব্যবহার করতে "অনুমতি" পান সে বিষয়ে বিশদে বলেছেন। একদিকে সামাজিক ভাবে তাদের পরিবারগুলির শ্রেণিগত আর্থিক প্রান্তিক অবস্থান, অন্যদিকে পরিবারের মধ্যে লিঙ্গবৈষম্যে জনিত কারণে 'নারীর দারিদ্র' তাদেরকে আর্থিক ভাবে প্রভাবিত করে। এই দ্বিমাত্রিক আর্থিক সমস্যা অন্যদিকে স্কলারশিপ ও নিজের রোজগারের টাকা দিয়ে তাঁরা নিজেদের পড়াশুনা চালিয়ে নিয়ে যান, নিজের লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তিনজনের পরিবারে চাকুরীজীবি রয়েছেন, অংশগ্রহণকারী ২ এর বাবা সিকিওরিটি গার্ড এবং অংশগ্রহণকারী ৮ এর দিদি বেসরকারী স্কুলে পড়ান এবং অংশগ্রহণকারী ১১ এর দাদা বেসরকারী কোম্পানীতে চাকরি করেন। পরিবারের মাসিক আয় থেকে পরিবারের সদস্যদের মাথাপিছু আয় যা দাঁড়ায়, তার ওপর ক্রিয়াশীল থাকে লিঙ্গবৈষম্য জনিত প্রভাব। মাথাপিছু যা আয় দাঁড়ায় এবং পরিবারের মেয়েটি যতটুকু ব্যবহার করতে পারে তার মধ্যে একটি স্পষ্ট ব্যবধান রয়েছে, এখানেই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে নারীর দারিদ্র বিষয়টি।

**ছাত্রীদের পরিবার সংক্রান্ত তথ্য**

**তালিকা ৭ - পারিবারিক তথ্য**

পরিবারগুলিতে নূন্যতম পরিষেবার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি তাদের বেড়ে ওঠা, আত্মবোধ, শ্রেণিচেতনা নির্মাণে বিশেষ ভূমিকা নেয়। এই ছাত্রীদের অনেকের শৈশব, কৈশোর কেটছে বিদ্যুৎহীন, প্রযুক্তিহীন, শৌচালয়হীন ভাবে। যা তারা ব্যবহার করতে শুরু করেছেন উচ্চশিক্ষা সূত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে হস্টেলে থাকা সূত্রে যা তাদের আবাসজীবনের অভিজ্ঞতাকে ভিন্ন একটি অবয়ব দিয়েছে। ইন্টারনেট, স্মার্টফোনের ব্যবহার তারা করেছেন নির্দিষ্ট একটা বয়সের পর, রিসোর্স উপলব্ধ হবার পরও সেগুলির

[৩] যার পূর্বে নাম ছিল রাজীব গান্ধী ফেলোশিপ।

পূর্ণ ব্যবহার করতে ও কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে তারা যে সমস্যার মধ্যে দিয়ে যান তার কারণ অনেক ক্ষেত্রেই আশৈশব বা আকৈশোর তারা এই পরিষেবা গুলি ব্যবহারের সুযোগ না পাওয়া। যা তাদের পরবর্তীকালের সমৃদ্ধিকে প্রভাবিত করেছে। আর্থ-সামাজিক অবস্থান একটি মেয়ের বেড়ে ওঠা, মূল্যবোধ নির্মাণ, আত্ম-বোধ নির্মাণে সক্রিয় ভূমিকা নেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সব দক্ষতার একটি চূড়ান্ত রূপ আশা করা হয়, সেগুলির ব্যবহার তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিখতে শুরু করে, তারফলে তাদের ‘উন্নতি’র চিত্ররেখ বাকীদের সঙ্গে সমান হয় না অনেক ক্ষেত্রেই। এই ব্যবধানটি স্পষ্ট হয় এই ছাত্রীদের বেড়ে ওঠার তথ্যের ভিত্তিতে নির্মিত ন্যারেটিভ থেকে, তাদের স্মৃতির বয়ান থেকে। লাইফ হিস্ট্রী রিসার্চের ন্যারেটিভ নির্মাণে আশৈশবের তথ্য সংগ্রহের একটি গুরুত্ব রয়েছে। প্রান্তিক প্রথম প্রজন্মের ছাত্রীদের পারিবারিক অভিজ্ঞতা যেভাবে তাদের চেতনা জগত নির্মাণ করে যা তাদের পরবর্তী বাস্তবতা এবং মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে। পারিবারিক হিংসার শিকার অনেকেই এবং দেখেছেন খুব কাছ থেকে। উচ্চশিক্ষার জন্য অর্থ সাহায্য, মানসিক সমর্থন ও সহায়তা তাঁরা অনেকক্ষেত্রেই পান না, বরং বাধা পেয়েছেন নানা ক্ষেত্রে। অংশগ্রহণকারীদের বক্তব্য পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বিশদে আলোচিত হয়েছে। তাদের পারিবারিক চাষ এবং ব্যবসায় অংশ নিতে হয়। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কেউ কেউ জানাচ্ছেন তারা পড়াশুনার জন্য উপযোগী জায়গা, অবসর, উপকরণ পেতেন না পরিবারে, যা তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর পাচ্ছেন, মানসিক সহায়তা পান নি, যা হস্টেলে এসে পেয়েছেন সিনিয়রদের কাছ থেকে, শিক্ষকদের কাছ থেকে। পরিবারে পড়াশুনার জন্য একান্ত নিজস্ব জায়গা তারা পান নি, হস্টেলে এসে সে জায়গা পেয়েছেন। পড়াশুনার সঙ্গে তাদের নিযুক্ত হতে হয় কাজে পড়াশুনার খরচ চালানোর জন্য। তথ্য গুলি তালিকা ভুক্ত হল।

**ক। পারিবারিক তথ্য**

| **বিশ্ববিদ্যালয়** | **অংশগ্রহণকারী** | **বিদ্যুৎ** | **ইন্টার নেট** | **নিজের যানবাহন** | **স্মার্ট ফোন** | **শৌচালয়** | **পড়ার জায়গা** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **বিশ্বভারতী** | ১ | এখন আছে। শৈশবে ছিল না | না | না | আছে | ৫ বছর আগে হয়েছে সরকারী | না |
| | ২ | আছে | না | হ্যাঁ সাইকেল | আছে | সরকারী | না |
| | ৩ | আছে, শৈশবে ছিল না | না | হ্যাঁ সাইকেল | নেই | সরকারী | না |
| | ৪ | আছে | হ্যাঁ | হ্যাঁ সাইকেল | আছে | আছে নিজস্ব | আছে |
| | ৫ | আছে | হ্যাঁ | না | আছে | আছে | না |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ৬ | এখন আছে শৈশবে ছিল না | না | হ্যাঁ সাইকেল | আছে | সরকারী | না |
| **যাদবপুর** | ৭ | এখন আছে ।শৈশবে ছিল না | না | হ্যাঁ সাইকেল | আছে | সরকারী | না |
| | ৮ | আছে | না | হ্যাঁ সাইকেল | আছে | সরকারী | না |
| | ৯ | ক্লাশ ফাইভে এসেছে | | না | | সরকারী | |
| | ১০ | উচ্চমাধ্যমিকের সময় এসেছে বিদ্যুৎ | না | না | নেই | সরকারী | না |
| | ১১ | তাছে | হ্যাঁ | না | আছে | আছে | আছে |
| | ১২ | আছে | হ্যাঁ | হ্যাঁ সাইকেল | আছে | আছে | না |

**খ। পারিবারিক তথ্য**

| **বিশ্ববিদ্যালয়** | **অংশগ্রহণকারী** | **পাকা বাড়ি** | **পানীয় জল** | **স্যানিটারী ন্যাপকিনের ব্যবহার** | **ঘরের ব্যবসা/ চাষে অংশগ্রহণ** | **গার্হস্থ্য হিংসার শিকার কিনা** | **বিবাহের চাপ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বিশ্বভারতী | ১ | না | কল | না | না | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| | ২ | না | কল | না | চাষে অংশ নিতে হয় | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| | ৩ | না | পুকুর | না | চাষে অংশ নিতে হয় | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| | ৪ | না | কল | না | না | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| | ৫ | না | পুকুর | না | না | হ্যাঁ | না |
| | ৬ | না | কল | না | না | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| যাদবপুর | ৭ | হ্যাঁ | কল | ছিল | মায়ের ব্যবসায় সাহায্য করতে হয় | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| | ৮ | না | কল | ছিল | কৃষিকাজে অংশ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | নিতে হয় | | |
| | ৯ | হ্যাঁ | কল | ছিল | কৃষিকাজে অংশ নিতে হয় | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| | ১০ | হ্যাঁ | কল | ছিল | না | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| | ১১ | না | কল | ছিল | না | হ্যাঁ | না |
| | ১২ | না | কল | ছিল | না | হ্যাঁ | হ্যাঁ |

প্রযুক্তি শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে বিংশ শতকের শেষ দুই দশক থেকেই। বর্তমানে প্রযুক্তি এবং কিছু ইলেক্ট্রনিক গ্যাজেটস ছাড়া উচ্চশিক্ষায় বর্তে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। ল্যাপটপ, কম্পিউটার, স্মার্ট ফোন ইত্যাদির ব্যবহার ছাড়া উচ্চশিক্ষায় টিকে থাকা অসম্ভব। এই ছাত্রীরা শৈশব থেকে এইগুলির সঙ্গে পরিচিত এবং অভ্যস্ত নন, উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁরা সমস্যার মধ্য দিয়ে যান এবং এইগুলির ব্যবহারযোগ্যতা সম্বন্ধে অবগত হন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রযুক্তি বিষয়ে অস্বস্তি এবং সমস্যার কথা বারবার উঠে এসেছে। ব্যবহার করতে পারার সুযোগ যাদের ছিল না, তারা সে বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়েন। অপরিহার্য প্রযুক্তির সহজলভ্যতা না থাকা তাদের বাস্তবতাকে প্রভাবিত করে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অধিকাংশজনই প্রযুক্তি ব্যবহারের পরিচিত ছিলেন না। পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তায় এইগুলি ব্যবহার করছেন। নিজের যানবাহন ছাড়া স্কুল, কলেজ, টিউশন এবং গবেষণার জন্য বিভিন্ন স্থানীয় অঞ্চলে যাতায়াত একদিকে যেমন অসুবিধাজনক তেমনি খরচসাপেক্ষ। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৭ জনের নিজস্ব সাইকেল ছিল/আছে, বাকী পাঁচজনের নিজস্ব কোন যানবাহন ছিল না। পানীয় জলের জন্য পাড়ার সরকারী কল বা টিউবওয়েল ব্যবহার করে ১০ জন ছাত্রীর পরিবার এবং  ২ জনের পরিবার পুকুর থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করে। শৌচালয় ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৪ জনের পরিবারে নিজস্ব শৌচালয় রয়েছে যা তারা স্বাস্থ্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারে এবং ৮ জনের পরিবার সরকার থেকে সুলভ শৌচালয় পেয়েছেন যার পরিকাঠামো এতটাই নিম্নমানের, তারা যথাযথ ভাবে ব্যবহার করতে পারেন না এই সরকারী শৌচালয়গুলি।

প্রান্তিক ছাত্রীদের শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরের ওপর নির্ভরশীল নয়, তাদের পরিবার, পরিবারের গঠন এবং পরিবারের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ ইত্যাদিও ক্রিয়াশীল থাকে তাদের অভিজ্ঞতা নির্মাণে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে চারজন একক পরিবার থেকে এসেছেন, বাকীরা এসেছেন যৌথ পরিবার থেকে। পরিবারের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ এবং সমীকরণ, উচ্চশিক্ষার অভিজ্ঞতায় তার প্রভাব আলোচিত হয়েছে পরবর্তী অধ্যায়ে। সামাজিক স্তরের মধ্যে পরিবারের অবস্থান, তার সঙ্গে জড়িত মূল্যবোধ এবং পাড়া মেয়েটির সামাজিক অবস্থান নির্মাণে ভূমিকা নেয়। মেধা বায়বীয় কোনো ধারণা নয়, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল একজন ব্যক্তিকে নির্মাণ করে তোলে। কি ধরণের পরিষেবা, পরিস্থিতির মধ্যে একজন বড় হয় তার ওপর নির্ভর করে তাঁর শিক্ষায় পারদর্শিতা এবং

দক্ষতা (Chaudhury,2011)। প্রান্তিক ছাত্রীরা অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন আবশ্যিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। তারা  মৌলিক পরিষেবা এবং অধিকার লাভ করেন নি, এক্ষেত্রে যেমন ক্রিয়াশীল থেকেছে তাঁদের পারিবারিক আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, অন্যদিকে লিঙ্গবৈষম্য, এবং জাতিগত বৈষম্য। কন্যাসন্তান দরিদ্র পরিবারেও থাকেন দরিদ্রতর। পরিবারের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং পরিবারের মেয়েদের অর্থনৈতিক অবস্থান সমান্তরালে চলে না। তাই সামাজিক, অর্থনৈতিক, জাতিগত ভাবে সার্বিক প্রেক্ষাপটে পিছিয়ে থাকা মেয়েটি পরিবারের মধ্যেও এক ধরণের প্রান্তিক অবস্থানে থাকেন। এই ছাত্রীরা যাঁরা উচ্চশিক্ষায় এসেছেন তাদের বেড়ে ওঠার দিনগুলিতে তাঁরা কি ধরণের পরিষেবা পেয়েছেন এবং কি ধরণের  প্রযুক্তির বা পরিষেবায় তাঁদের ব্যবহারিক সুযোগ ছিল না - তার ভিত্তিতে যে সব তথ্যগত এবং অভ্যাসগত কমতি নিয়ে তাঁরা বর্তমানে এসে পৌঁছেছেন, যা তাদের বর্তমানের কাজকর্ম, 'সমৃদ্ধি' ইত্যদিকে প্রভাবিত করছে। বিদ্যুৎ, শৌচাগার, স্যানিটারী ন্যাপকিন ইত্যাদির ব্যবহার তাদের অনেকেই বাড়িতে করেন নি। হস্টেলে এসে তাঁরা সরকারি সহায়তায় এই পরিষেবাগুলি লাভ করেছেন এবং স্কলারশিপ, অথবা স্বল্প রোজগারের মধ্যে কিছু পরিষেবা নিজেরা বহন করতে সক্ষম হয়েছেন। হস্টেলে এসে বাকী ছাত্রীদের মধ্যে তারা ব্যয় বহন করা কষ্টকর হলেও কিছু অভ্যেস তৈরি করেন যাতে বেখাপ না দেখায় অথবা মানিয়ে নেওয়া যায়। তারা সাক্ষাৎকারে বিস্তারিত জানাচ্ছেন 'মানিয়ে নেবার' অভিজ্ঞতা। নিজেদের পরিবারে অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই গার্হস্থ্য হিংসার শিকার হয়েছেন এবং অনেকে সরাসরি ভোগ না করলেও প্রত্যক্ষ করেছেন যা তাদের ব্যক্তিত্ব গঠনে ভূমিকা নিয়েছে এবং অবসাদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিবন্ধী ছাত্রীটি গার্হস্থ্য হিংসার মধ্যে না পড়লেও পরিবারে ভাষিক হেনস্থা, ব্যঙ্গ -বিদ্রূপের সম্মুখীন হয়েছেন, অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অনেকে গার্হস্থ্য হিংসার শিকার হয়েছেন এবং প্রত্যক্ষ করেছেন যা তাদের পরবর্তীতে হস্টেলের পরিসরে একাত্ম করেছে অপেক্ষাকৃত বেশি।

**তালিকা ৮ - পারিবারিক শিক্ষাগত পরিস্থিতি**

প্রথম প্রজন্মের ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার অভিজ্ঞতাকে প্রভাবিত করে সাংস্কৃতিক মুলধনের অপ্রতুলতা। তাদের পরিবারের অভিভাবকগণ নিজেদের পেশাগত দিক থেকে দক্ষ হলেও তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত না হওয়ার এই ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা বিষয়ে পরামর্শ দিতে সক্ষম হন না। 'প্রথম প্রজন্ম' এর ছাত্রী হিসাবে তারা সেই অভাবের সম্মুখীন হয়েছেন এবং সাংস্কৃতিক মূলধন সংগ্রহ করেছেন অন্য উৎস থেকে। পারিবারিক শিক্ষাগত অবস্থান একজন ছাত্রীর শিক্ষাগত সমৃদ্ধি এবং শিক্ষাগত পরিকল্পনাকে অনেকাংশে প্রভাবিত করে। উচ্চশিক্ষায় 'প্রথম প্রজন্ম' এর 'প্রান্তিক' ছাত্রীদের বাস্তবতা নির্মাণে পরিবারের শিক্ষাগত পরিস্থিতি ক্রিয়াশীল থাকে, সাক্ষাৎকার থেকে সংগৃহীত তথ্য তালিকায় প্রদর্শিত হল।

| বিশ্ববিদ্যালয় | অংশগ্রহণকারী | বাবার পড়াশুনা | মায়ের পড়াশুনা | ভাই বোনের সংখ্যা | ভাই বোনের পড়াশুনা |
|---|---|---|---|---|---|
| বিশ্বভারতী | ১ | নিরক্ষর | নিরক্ষর | ১ দিদি<br>২ ভাই | দিদি নিরক্ষর, ভায়েরা অষ্ঠম শ্রেনী, পঞ্চম শ্রেনী |
| | ২ | তৃতীয় শ্রেণী | চতুর্থ শ্রেনী | ২ দাদা | বড় দাদা প্রাইমারী পর্যন্ত, ছোটদাদা মাধ্যমিক পাশ |
| | ৩ | স্বাক্ষর | স্বাক্ষর | ২ দিদি<br>১ বোন | দিদিরা নিরক্ষর, বোন নবম শ্রেনী পর্যন্ত |
| | ৪ | মাধ্যমিক | তৃতীয় শ্রেনী | ১ দাদা | চাকুরিরত, পেশাগত দক্ষতা ভিত্তিক পড়াশোনা |
| | ৫ | অষ্টম শ্রেনী | মাধ্যমিক | নেই | |
| | ৬ | পঞ্চম শ্রেনী | পঞ্চম শ্রেনী | ২ দাদা<br>১ দিদি<br>১ ভাই | দাদারা প্রাইমারী পর্যন্ত, দিদি বিউটি পার্লার কোর্স করে বর্তমানে চাকুরীরত, ভাই দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়ে |
| যাদবপুর | ৭ | পঞ্চম শ্রেনী | দ্বিতীয় শ্রেনী | ১ দিদি<br>২ বোন<br>১ ভাই | দিদি নিরক্ষর, বিবাহিত, বোনেরা বিড়ি বাঁধে, ভাই ক্লাশ এইট পর্যন্ত |
| | ৮ | তৃতীয় শ্রেনী | স্বাক্ষর | ১ দিদি | উচ্চমাধ্যমিক পাশ |
| | ৯ | সপ্তম শ্রেনী | স্বাক্ষর | .১ দিদি<br>১ দাদা | দিদি প্রাইমারী পর্যন্ত<br>দাদা ক্লাস নাইন পর্যন্ত |
| | ১০ | অষ্টম শ্রেনী | দ্বিতীয় শ্রেনী | ১ বোন | আইন বিষয়ে স্নাতক |
| | ১১ | দ্বিতীয় শ্রেনী | তৃতীয় শ্রেনী | ১ দিদি | উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত |
| | ১২ | পঞ্চম শ্রেনী | নিরক্ষর | ১ দিদি<br>১ বোন | দিদি স্নাতক, বোন উচ্চমাধ্যমিক পাঠরত |

অংশগ্রহণকারীরা উচ্চশিক্ষায় প্রথম প্রজন্ম, তারা সারা শিক্ষাজীবন সাংস্কৃতিক মূলধনের অভাব বোধ করেছেন, যা তাদের শিক্ষার গতি ও প্রকৃতিকে প্রভাবিত করেছে। তাদের পরিবারের সদস্যরা, বাবা, মা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বহুদূরে কায়িক শ্রম করে সংসার চালান। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির সঙ্গে তাঁদের দূরত্ব তথ্যগত, ব্যবহারিক। এই ছাত্রীদের পিতা মাতা মূলত কায়িক শ্রমের সঙ্গে

যুক্ত। চাষবাস, দিনমজুরি এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায় তাদের পিতারা নিয়োজিত অন্যদিকে তাদের মায়েরা গৃহশ্রমিক, দিনমজুর, গৃহবধু। তাঁদের আয় এবং কর্মজগত উচ্চশিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহুদূরবর্তী। এই ছাত্রীরাও অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের চাষবাস এবং ব্যবসায় সময় দেন। পিতা মাতাদের শিক্ষা স্কুলের বাইরে নয়, অনেকক্ষেত্রে তাঁরা নিরক্ষর। তাঁদের সন্তানেরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে যান তাদের অভিজ্ঞতা ভিন্ন ভাবে নির্মিত হয়। সাংস্কৃতিক মূলধনের প্রশ্নে পারিবারিক অবস্থান তাদের পাঠ অভিজ্ঞতাকে সীমায়িত করে। একজন দিনমজুর যিনি স্বল্প বেতন এবং কাজের অনিশ্চয়তার মধ্যে সংসার চালাতে হিমশিম খান, তাঁর পক্ষে কন্যার পড়শুনার জন্য ব্যয় করা প্রায় অসম্ভব। সরকারী স্কুল কলেজ এবং স্বল্প স্কলারশিপের ভরসায় সংরক্ষণের মাধ্যমে যে মেয়ে উচ্চশিক্ষায় এসে পৌঁছান। তিনি স্কুল, কলেজের তথাকথিত প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিতে পারবেন অবশ্যই কিন্তু তার জন্য তাকে বহু কঠোর পরিশ্রম ও প্রতিকূলতা পেরিয়ে আসতে হয়। পরিবারগুলির অবস্থা ও অবস্থান তাঁদের শিক্ষাজগতে অবস্থানকে নিয়ন্ত্রণ করে অনেকাংশে। পরিবার গুলিতে দেখা যাচ্ছে অংশগ্রহণকারীদের ভাই বোনরা উচ্চশিক্ষায় সে অর্থে অংশ নেয় নি, একজনের দিদি স্নাতক হয়েছেন, অংশগ্রহণকারীদের দিদিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিরক্ষর অথবা প্রাইমারী পর্যন্ত পড়েছেন। অংশগ্রহণকারীদের ভাই বোনদের পড়াশোনা মূলত প্রাইমারী থেকে উচ্চমাধ্যমিকের মধ্যে থাকছে।

**তালিকা ৯ - স্থানান্তর সংক্রান্ত তথ্য**

স্থানান্তর প্রান্তিক ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে একটি আবশ্যকীয় অঙ্গ। নাগরিক পরিষেবা এবং জ্ঞান নির্মাণের যাবতীয় সুযোগ সুবিধার কেন্দ্রীকরণ ঘটেছে মেট্রোপলিটন শহর গুলিতে, দেশের 'সেরা' তকমা প্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় গুলি দেখা যাচ্ছে মূলত শহরে। প্রান্তিক ছাত্রীরা উচ্চশিক্ষার জন্য তাই শহরে আসছেন আর ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছেন নগর জীবনের শরিক (Kanagasabai, 2018)। শিক্ষাসূত্রে তারা 'নিজভূমি' ছেড়ে আসছেন 'উন্নতি', 'সমৃদ্ধি' এবং 'ভবিষ্যত নির্মাণ' এর আশায়। ধীরে ধীরে শহরে বসবাস করতে শুরু করে, হয়ে ওঠে শহরের 'নতুন নাগরিক'। শহরের 'ভীড়'টা ক্রমে যে বদলে যাচ্ছে তাতে কিছুটা অংশের জন্য অবদান রয়েছে শিক্ষাসূত্রে স্থানান্তরের। এই ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন আসেন, বাহ্যিক পরিসরের সঙ্গে তাদের একটি আদানপ্রদান তৈরি হয়। জ্ঞান নির্মাণের পাশাপাশি সমাজকেও প্রভাবিত করে প্রান্তিক, প্রথম প্রজন্মের ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষায় অংশ নেবার জন্য শহরে স্থানান্তর। স্থানান্তরের ফলে এই ছাত্রীদের সঙ্গে পারিপার্শ্বের সম্বন্ধ বদলে যায়। শহরে জ্ঞান নির্মাণের কেন্দ্রীকরণ ঘটেছে এবং গ্রাম, মফস্বল থেকে ছাত্রীদের শহরমুখী করে তুলেছে। অংশগ্রহণকারীদের স্থানান্তর সংক্রান্ত তথ্য তালিকাভুক্ত করা হল।

| বিশ্ববিদ্যালয় | অংশগ্রহণকারী | বাসস্থান | জেলা | বাড়ি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরত্ব (কিমি) | যাতয়াতের সময় (ঘণ্টা) | যান বাহন | যান বাহন বদল (বার) | নিজে যাতায়াত/ সঙ্গী থাকে |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **বিশ্বভারতী** | ১ | গ্রাম | পুরুলিয়া | ২০০ | ৭ | বাস, ট্রেন | ৩ | সঙ্গী থাকে |
| | ২ | গ্রাম | বর্ধমান | ৮০ | ৪ | বাস, ট্রেন | ২ | সঙ্গী থাকে |
| | ৩ | মফস্বল | বীরভূম | ৫০ | ২ | বাস | ২ | সঙ্গী থাকে |
| | ৪ | মফস্বল | হুগলী | ১৫০ | ৬ | ট্রেন, বাস, টোটো | ৩ | নিজে |
| | ৫ | মফস্বল | বীরভূম | ৬০ | ৪ | বাস, রিকশা | ২ | নিজে |
| | ৬ | মফস্বল | পুরুলিয়া | ২০০ | ৭ | বাস, ট্রেন অটো | ৩ | নিজে |
| **যাদবপুর** | ৭ | গ্রাম | মুর্শিদাবাদ | ২৫০ | ৮ | বাস, অটো | ৩ | নিজে |
| | ৮ | মফস্বল | মেদিনীপুর | ১৫০ | ৭ | ট্রেন | ২ | নিজে |
| | ৯ | গ্রাম | দক্ষিন চব্বিশ পরগনা | ১০০ | ৫ | ট্রেন | ২ | নিজে |
| | ১০ | গ্রাম | জলপাইগুড়ি | ৬৬০ | ১৯ | ট্রেন, বাস | ৫ | নিজে |
| | ১১ | মফস্বল | বীরভূম | ৮০ | ৭ | বাস | ২ | নিজে/ সঙ্গী থাকে |
| | ১২ | গ্রাম | দার্জিলিং | ৬৮০ | ২১ | ট্রেন | ৪ | সঙ্গী থাকে |

প্রান্তিক ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার অভিজ্ঞতা শ্রেণিকক্ষ এবং বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, শিক্ষাসূত্রে তারা যে সামাজিক পরিসরের মধ্য দিয়ে চলা ফেরা করেন, বাহ্যিক পরিসরগুলি তাদের আন্তঃস্তর বিন্যাসভিত্তিতে প্রভাবিত করে। পরিবার থেকে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে তারা শহরে আসেন, হস্টেলে থেকে পড়াশুনা করেন, এই পরিসর এবং যানবাহনের সুবিধা, একা যাতায়াতের পথে সমস্যা ইত্যদি তাদের প্রভাবিত করে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সব থেকে কম দূরত্বে ৫০ কিমি এবং সব থেকে বেশি দূরত্ব ৬৮০ কিমি। এবং সর্বাধিক পাঁচবার যানবাহন বদলে তাদের যাতায়াত করতে হয়। সর্বনিম্ন চার ঘন্টা এবং সর্বাধিক ২১ ঘন্টা সময় লাগে তাদের যাতায়াত করতে। একা যাতয়াতের পথে তাঁরা যে সব সমস্যার সম্মুখীন হন সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন। অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশ নিজে যাতায়াত করেন, কয়েকজনের ক্ষেত্রে দাদা, ভাই, বাবা, মা যাতায়াতে সঙ্গী হিসাবে থাকেন। পরবর্তী অধ্যায়ে ম্যাপে তাদের যাত্রাপথ চিহ্নিত হয়েছে। বাহ্যিক পরিসরের সঙ্গে ছাত্রীদের বা মেয়েদের যে সম্পর্ক এবং সমস্যা তা উন্মোচিত হয়েছে তাদের সাক্ষাৎকারে। যানবাহনের অপ্রতুলতা, বাহ্যিক পরিসরের ভয়াবহতা এবং একা যাতায়াতের অভিজ্ঞতা এবং বিশেষ ঘটনা তাঁরা বলেছেন।

**বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত তথ্য**

**তালিকা ১০ - বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত তথ্য**

সংরক্ষণ সম্বন্ধে যে বিতর্ক চলে আসছে তাতে 'জেনারেল ক্যাটাগরি' যেন 'কাস্টলেস' বা 'জাতিসংরক্ষণ বিযুক্ত' হিসাবে প্রতিভাত হয়, এদিকে জাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীরা যেন 'জাতি' পরিচয় নিয়েই প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করেন। এখন জাতিগত পরিচয় আর জাতিভিত্তিক সংরক্ষণ - এই দুইয়ের মধ্যে একটি ফারাক রয়েছে। অনেক ছাত্র ছাত্রী রয়েছেন যিনি মেধাতালিকার ভিত্তিতে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছেন, সংরক্ষণের মাধ্যমে আসেন নি। এবং জাতিভিত্তিক পরিচিতিকে নিজের আত্ম -পরিচিতির অংশ হিসাবে মনে করেন না, তিনি যখন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'জাতিগত' পরিচয়ে পরিচিত হন, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নিরপেক্ষ', 'গণতান্ত্রিক' পরিসরে জাতিভিত্তিক বৈষম্যের চেহারা স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। একটি বিশেষ জাতিভুক্ত হয়ে যখন তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'জেনারেল' হিসাবে প্রবেশ করেন তখন 'জেনারেল' আর 'উচ্চবর্ণ' সমার্থক থাকে না। এখানে জাতি আর সংরক্ষণের স্পষ্ট, জল অচল ভাগ করার জনপ্রিয় প্রবণতাটি ধোপে টেকে না। সতীশ দেশপান্ডে (Deshpande, 2016) তাঁর প্রবন্ধে বলছেন কীভাবে 'জেনারেল' ক্যাটাগরি নিজেদের 'জাতিমুক্ত' ভাবে এবং 'সংরক্ষিত' আসনের ওপর 'জাতি' পরিচয়ের ভার চাপায়, কিন্তু কার্য ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে 'জেনারেল' ক্যাটাগরিতে উচ্চবর্ণ ছাড়াও মেধার ভিত্তিতে আসছেন 'সংরক্ষিত' জাতি উপজাতির ছাত্রছাত্রী। অন্যদিকে, 'সংরক্ষিত' আসনে যে ছাত্রছাত্রীরা আসছেন তারা যে জাতি ভিত্তিক বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন, দেখা যাচ্ছে জাতিভিত্তিক সাংবিধানিক ভাবে বিশেষ 'ক্যাটাগরি'র অন্তর্ভুক্ত হলেও, সেটিই তাদের একমাত্র পরিচিতি নয়। এই পরিচিতির সঙ্গে সর্বৈব ভাবে একাত্মতা বোধ করেন না অনেকেই।

| **বিশ্ববিদ্যালয়** | **অংশগ্রহণ কারী** | **জাতিগত পরিচয়** | **কোন ক্যাটাগরিতে ভর্তি হয়েছে** | **প্রতিবন্ধীতা** | **পড়াশোনায় পরামর্শদাতা** | **শিক্ষার জন্য লোন/ঋণ** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **বিশ্বভারতী** | ১ | এস টি | এস টি | নেই | স্কুলের শিক্ষক | না |
| | ২ | এস টি | জেনারেল | নেই | পাড়ার দিদি | ভর্তির সময় ধার করতে হয়েছে |
| | ৩ | এস টি | প্রতিবন্ধী | আছে | স্কুলের শিক্ষক | না |
| | ৪ | এস সি | এস সি | নেই | ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র | না |
| | ৫ | ও বি সি | জেনারেল | নেই | স্বপ্রনোদিত | না |
| | ৬ | ওবিসি (বি) | ওবিসি(বি) | নেই | স্কুলের শিক্ষক | মাঝে মধ্যে ধার নিতে হয় |
| **যাদবপুর** | ৭ | ও বি সি | ও বি সি | নেই | স্বপ্রনোদিত | ভর্তির সময় ধার নিতে হয় |
| | ৮ | এস সি | এস সি | নেই | স্বপ্রণোদিত | না |
| | ৯ | ওবিসি (এ) | ওবিসি (এ) | ছিল | সিনিয়র দিদি | না |
| | ১০ | এস সি | এস সি | নেই | স্বপ্রনোদিত | ‘উজ্জীবন’ লোন |
| | ১১ | ও বি সি | জেনারেল | নেই | স্কুলের শিক্ষক | না |
| | ১২ | এস টি | এস টি | নেই | পাড়ার দিদি | ভর্তির সময় ধার নিতে হয় |

অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ১ জনের প্রতিবন্ধীতা রয়েছে। তার প্রতিবন্ধীতার মাত্রা ৬০%। সে মূলত সহায়তা ছাড়া হাঁটতে পারে না। ছোটবেলায় হুইল চেয়ারের সাহায্যে যাতায়াত করেছে বর্তমানে স্ক্র্যাচারের সহায়তায় স্বল্প হাঁটাচলা করতে পারে। অংশগ্রহণকারী ৯ এর ছোটবেলায় কথা বলার কিছু সমস্যা ছিল। উচ্চারণগত অস্পষ্টতা বা তোতলামি থাকার ফলে স্কুলে সে মানসিক ভাবে হেনস্থা হবার কথা জানায়, পরবর্তীতে সে এই সমস্যা কাটিয়ে উঠেছে। জাতিগত দিক থেকে পিছিয়ে রাখা ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যে সাংবিধানিক অধিকার স্বীকৃত রয়েছে, তার ভিত্তিতে তাদের পক্ষে উচ্চশিক্ষায় অংশ নেওয়া সহজ হয়েছে। তবে সকলেই সংরক্ষণের ভিত্তিতে অংশ নেন না। তারা মেধা তালিকার ভিত্তিতে অংশ নেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তিনজন মেধা তালিকার ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষায়

অংশ নিয়েছেন, একজন প্রতিবন্ধীতার সংরক্ষণের মাধ্যমে অংশ নিয়েছেন, বাকী আট জন্য তফশিলি জাতি, উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জন্য সাংবিধানিক সংরক্ষণের ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষায় অংশ নিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার ছাড়পত্র যারা সংরক্ষণের মাধ্যমে পেয়েছেন অথবা মেধার ভিত্তিতে পেয়েছেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামো এবং সংস্কৃতির অন্তস্থ বৈষম্য থেকে ছাড় পান নি, যা তাদের সাক্ষাৎকার থেকে উপলব্ধ হয়েছে।

**তালিকা ১১ - হস্টেল সংক্রান্ত তথ্য**

উচ্চশিক্ষাসূত্রে হস্টেলে এসে প্রান্তিক ছাত্রীরা একান্ত নিজস্ব পরিসর লাভ করেন স্থানিক এবং মানসিক ভাবে। উচ্চবর্ণের মেয়েরা হস্টেলে একই ভাবে নিজস্ব পরিসর পান কিন্তু প্রান্তিক প্রথম প্রজন্মের মেয়েরা হস্টেলে এসে পান নূন্যতম কিছু পরিষেবা যা পরিবারে তাদের পান না, পড়ার নির্দিষ্ট জায়গা, একান্ত নিজের একটি জায়গা, শৌচাগার, বিদ্যুৎ, পাখা ইত্যাদি। তাই হস্টেল তাদের কাছে শুধুমাত্র একান্ত পরিসর হয়েই থাকে না, হয়ে ওঠে আত্ম আবিষ্কার এবং সামনে এগিয়ে যাবার প্লাটফর্ম (কর্মকার, ২০১৮)। তাদের নবনির্মিত আত্ম রূপান্তরিত হতে থাকে হস্টেলের নিজস্ব পরিসরে, নিয়মকানুনের বেড়াজালের মধ্যে। পরিবার আর হস্টেলের স্থানিক, সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক পরিসরে তারা ব্যক্তি হিসাবে নিজেরা বদলাতে থাকে, পরিসর গুলিও সমান্তরালে বদলাতে থাকে।

| বিশ্ববিদ্যালয় | অংশগ্রহণ কারী | হস্টেল | হস্টেলে বসবাসের সময়সীমা (বছর) | বার্ষিক বাড়ীতে বাস(মাস) | বাড়ি যেতে চায় কিনা | রুম মেটের সংখ্যা | সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ | জাতিগত হিংসার শিকার কিনা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বিশ্বভারতী | ১ | শ্রীসদন | ৪.৫ | ৩ | না | ৮,৪,২ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| | ২ | আম্রপালী | ৪.৫ | ৩ | হ্যাঁ | ৮,৪,২ | হ্যাঁ | না |
| | ৩ | নগরী হস্টেল, শ্রীসদন | ১০ | ৩ | হ্যাঁ | ৮,৪,২ | না | না |
| | ৪ | শ্রীসদন, মৃনালীনী, বিনয়ভবন | ১৩ | হস্টেল বন্ধ হলে | না | ৮,৪,২,১ | না | না |
| | ৫ | শ্রীসদন | ১২ | ২ | না | ৫,৩ | না | না |
| | ৬ | আম্রপালী | ৪ | ৩ | না | ৪,৪,৫ | না | না |
| যাদবপুর | ৭ | যাদবপুর মেন হস্টেল | ৬ | ১ | হ্যাঁ | ৪,৫,২ | না | হ্যাঁ |
| | ৮ | ঐ | ১০ | ৪ | না | ৪,৬,৩ | না | না |
| | ৯ | ঐ | ৫ | ৩ | না | ৩,৪ | না | হ্যাঁ |
| | ১০ | ঐ | ১২ | ২ | না | ৬,৪,৩,২ | না | হ্যাঁ |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ১১ | ঐ | ১৮ | ১ | না | ৮,৪,২,১ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| | ১২ | ঐ | ৭ | ৩ | হ্যাঁ | ৬,৪,২ | হ্যাঁ | না |

অংশগ্রহণকারীদের অনেকে স্কুল থেকে হস্টেলে থেকেছেন, কলেজ এবং উচ্চশিক্ষা সূত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে থাকছেন। আর কিছুজন উচ্চশিক্ষা সূত্রে হস্টেলে থেকেছেন। অংশগ্রহণকারীরা সর্বাধিক ১৮ বছর থেকে সর্বনিম্ন সাড়ে ৪ বছর হস্টেলে থাকছেন/থেকেছেন। তাদের রুমমেট ছিল সর্বাধিক ৮ জন অর্থাৎ ডর্মেটরি থেকে সিঙ্গল সীটার রুমে তাঁরা থেকেছেন। শিক্ষাজীবনের ভিন্ন স্তরে তাঁরা বিভিন্ন ধরনের রুম বিন্যাসের মধ্যে থেকেছেন, রুমমেট ৮,৫,৪,২,১ এবং সিঙ্গেল রুমে তারা থেকেছেন। সমবয়সী সহপাঠী থেকে সিনিয়র এবং জুনিয়রদের সঙ্গে তারা রুম ভাগ করে নিয়েছেন। এই আবাসিকারা হস্টেল থেকে বাড়িতে যান বছরে কয়েকবার। বছরে সর্বাধিক ৪ মাস থেকে সর্বনিম্ন ১৫ দিন তারা বাড়িতে থাকেন। পরিবারের মধ্যে যে পার্সোনাল স্পেসের অভাব তারা চিরকাল বোধ করে এসেছেন, হস্টেলে এসে সমবয়সীদের মধ্যে ডর্মেটরির মধ্যেও একান্ত পরিসর পান। আবাসজীবন তাদের সেইসব পরিসর এবং পরিষেবা দেয় যা তারা বাড়িতে পেতেন না। শিশুকন্যা হিসাবে অনেকসময় পেতেন না। হস্টেলে ব্যক্তি হয়ে ওঠার অবকাশ পান, অবকাশ পান নিজের ইচ্ছা পছন্দ মত এগিয়ে যাওয়ার। পরবর্তী অধ্যায়ে মেয়েদের আবাসজীবনের অভিজ্ঞতা বিশদে আলোচনা করা হয়েছে। নিজস্ব, একান্ত পরিসর হিসাবে এবং বিকল্প পরিসর হিসাবে হস্টেল তাদের কাছে বিশেষ একটি জায়গা হয়ে ওঠে, বিশেষ আবেদন রাখে যা তাদের সাক্ষাৎকার থেকে উঠে এসেছে। বিশ্ববিদ্যালয়, হস্টেল এবং সামাজিক পরিসরে অংশগ্রহণকারীদের, লিঙ্গগত, জাতিগত, শ্রেণিগত বৈষম্যের অভিজ্ঞতা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৫ জনের প্রত্যক্ষ জাতিগত বৈষম্যের অভিজ্ঞতা রয়েছে, বাকিদের অপ্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধি রয়েছে।

**তালিকা ১২ - অংশগ্রহণকারী ছাত্রীদের শিক্ষাবর্ষে বিরতি এবং তার কারণ**

সাংস্কৃতিক মূলধনের অভাব, দারিদ্র,পরিকল্পনার দিশহীনতা ইত্যাদি কারনে এই ছাত্রীরা তাদের শিক্ষাজীবনের মধ্যে বহু সময় বিরতি নিয়েছেন। একটি পর্যায় শেষ হবার পর পরবর্তী পর্যায়ে যাবার আগে পরিকল্পনাহীনতা এবং পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে তারা মসৃণ ভাবে একটি পর্যায় থেকে আরেকটি পর্যায়ে যেতে পারেন নি। 'প্রথম প্রজন্ম' এবং 'প্রান্তিক' ছাত্রীদের একটি বড় অংশ স্কুলছুট এবং শিক্ষাজীবনের একটা পর্যায়ে এসে ছেড়ে যান, থেমে যান বিচিত্র কারনে। যারা শেষ পর্যন্ত উচ্চশিক্ষায় এসে পৌঁছান তাদেরও বিভিন্ন পর্যায়ে বিরতি রয়েছে যেখানে তারা পড়াশুনা ছেড়ে চলে যাবার কথা ভেবেছিলেন, তারপর আবার কোনো তাগিদে বা সহায়তায় শিক্ষালাভে সামিল হয়েছেন। উচ্চশিক্ষায় 'প্রান্তিক', 'প্রথম প্রজন্ম' এর ছাত্রীরা সেই কয়েকজন ব্যাতিক্রম যাঁরা প্রতিকূলতা পেরিয়ে, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিরতি বা ছুট হবার প্রভাবক গুলি পেরিয়ে এই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছেন।

তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে অংশগ্রহণকারীরা বিরতি নিয়েছেন, আবার ফিরে এসেছেন পড়াশোনায় যা তাদের উচ্চশিক্ষায় আসার প্রতিকূলতা এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থানকে চিহ্নিত করে।

| **বিশ্ববিদ্যালয়** | **অংশগ্রহণকারী** | **শিক্ষাবর্ষে বিরতি (বছর)** | | | | | **বিরতির কারণ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **দ্বাদশ পর্যন্ত** | **স্নাতক** | **স্নাতকোত্তর** | **এম ফিল** | **পি এইচ ডি** | |
| **বিশ্বভারতী** | ১ | ২ | ০ | ১ | ০ | ০ | পারিবারিক সমস্যা, তথ্যের অভাব |
| | ২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | বিরতি নেন নি |
| | ৩ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | পরিকল্পনার অভাব |
| | ৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | বিয়ে হবার ফলে |
| | ৫ | ০ | ২ | ০ | ০ | ০ | তথ্যের অভাব, পরিকল্পনার অভাব |
| | ৬ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | অবসাদ, অসুস্থতা |
| **যাদবপুর** | ৭ | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | তত্ত্বাবধানের অভাব |
| | ৮ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | তথ্যের অভাব |
| | ৯ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | বিরতি নেন নি |
| | ১০ | ২ | ০ | ০ | ১ | ০ | তত্ত্বাবধানের অভাব |
| | ১১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ১ | পারিবারিক হিংসা, অবসাদ |
| | ১২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | বিরতি নেন নি |

প্রান্তিক প্রথম প্রজন্মের ছাত্রীদের প্রাথমিক সমস্যা হল তথ্যের অভাব। তারা স্কুলে গেছেন মূলত বাকীদের দেখে, কোনো পরিকল্পনা ছাড়া। তার ফলে তারা দিশেহারা হয়ে পড়েন শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে। শিক্ষার ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়েছে অনেক ক্ষেত্রেই। তাঁরা যে সমস্ত কারণে বিভিন্ন সময় শিক্ষাবর্ষে বিরতি নিয়েছেন সেগুলি মূলত অসংখ্য প্রান্তিক প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীদের স্কুলছুট হবার কারণ, স্থায়ী ভাবে তারা শিক্ষাজগত থেকে বিদায় নিয়ে কাজে নিয়োজিত হন বা বিয়ে করতে বাধ্য হন, সেইসব কারণে অংশগ্রহণকারীরা বিরতি নিয়েছেন এবং পরিস্থিতি সামলে নিয়ে ফের শিক্ষায় যোগ দিয়েছেন। সেদিক থেকে প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক ছাত্রী উচ্চশিক্ষায় বহাল রয়েছেন তারা ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত। সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারীরা জানাচ্ছেন কীভাবে তারা এই কারণগুলি অতিক্রম করে উচ্চশিক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। শিক্ষায় বিরতির কারণ হিসাবে তাঁরা যে কয়েকটি কারণ পুনরাবৃত্ত ভাবে জানাচ্ছেন, সেগুলি হল – তথ্যের অভাব, পরিকল্পনার অভাব, তত্ত্বাবধানের অভাব, পারিবারিক সমস্যা, পারিবারিক হিংসা, বিয়ে, অবসাদ ইত্যাদি। প্রত্যেকজন প্রথম প্রজন্মের ছাত্রীর উচ্চশিক্ষার যাত্রাপথ

মসৃণ নয়, প্রত্যেকের রয়েছে ভিন্ন এবং মৌলিক যাত্রাপথ। সেখানে তারা যে কারণগুলির দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন, সেগুলি তাদের শ্রেণিগত, লিঙ্গগত, জাতিগত অবস্থানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। মূলত এই তিনটি অক্ষের ভিতরে তাদের যে অবস্থান তৈরি হয় সেই আর্থ-সামাজিক অবস্থানে এই কারণগুলির উৎপন্ন হওয়া এবং একজন ব্যক্তিকে অনিবার্য ভাবে প্রভাবিত করা সম্ভব। একজন প্রথম প্রজন্মের ছাত্রী যিনি বহুমাত্রিক ভাবে প্রান্তিক, তার উচ্চশিক্ষায় বিরতির কারণগুলির সঙ্গে তাঁদের উচ্চশিক্ষার অভিজ্ঞতার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। বারো জন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে ৩ জন শিক্ষাবর্ষে কোনো বিরতি নেন নি, বাকি ৯ জন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কখনও না কখন ও বিরতি নিয়েছেন। সর্বোচ্চ বিরতি নিয়েছেন ৩ বছর এবং সর্বনিম্ন বিরতি নিয়েছেন ৬ মাস।

**পরিশেষ**

আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা, বহুমাত্রিক পরিচিতি এবং ক্রম পরিবর্তনশীল আত্মবোধের মধ্যে প্রান্তিক একজন ছাত্রীর অবস্থান সূচিত হয়। পরিবারে গার্হস্থ্য হিংসা, লিঙ্গ বৈষম্য, বিবাহের চাপ, পড়াশোনার জন্য উপযোগী পরিবেশ এবং পরিষেবার অভাব তাদের মানসজগতকে প্রভাবিত করেছে অন্যদিকে পিছিয়ে পড়া সামাজিক অবস্থান, আর্থিক সমস্যা, ভাষাগত সমস্যা উচ্চশিক্ষায় একটি সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করায়। সাধারণ তথ্য সংগ্রহের প্রশ্নতালিকা থেকে যে তথ্যগুলি উঠে এসেছে তার ভিত্তিতে গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান এবং পারিবারিক পরিস্থিতি সুস্পষ্ট। তাদের বহুমাত্রিক প্রান্তিকতা যা তাদের পরিবার, সামাজিক অবস্থান, লিঙ্গ পরিচয়, জাতিগত পরিচয়, আর্থিক অবস্থান, ভৌগোলিক এলাকায় অবস্থান ইত্যাদির দ্বারা নির্মিত। এই প্রান্তিকতার বহুমাত্রা বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সাক্ষাৎকারে সংগৃহীত হয়েছে। এই তথ্যগুলি পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বিস্তারিত আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। পরবর্তী দুটি অধ্যায়ে কয়েক পর্যায়ে সংঘটিত সাক্ষাৎকার গুলির ভিত্তিতে এই ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার অভিজ্ঞতা আলোচিত হয়েছে।

# তৃতীয় অধ্যায়

## প্রথম প্রজন্মের আবাসিক ছাত্রীদের অভিজ্ঞতার বিশেষত্ব এবং নবনির্মিত আত্মবোধের বিন্যাস

# তৃতীয় অধ্যায়

# প্রথম প্রজন্মের আবাসিক ছাত্রীদের অভিজ্ঞতার বিশেষত্ব এবং নবনির্মিত আত্মবোধের বিন্যাস

ওকে ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ছি

ও যে চণ্ডালীণীর ঝি ...চণ্ডালিকা[১]

উচ্চশিক্ষা লাভের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আগত প্রান্তিক ছাত্রীদের দৃশ্যমানতা ক্রমবর্ধমান। সচেতনতা, আন্দোলন এবং সংরক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে প্রান্তিক ছাত্রীদের উপস্থিতি বেড়েছে লক্ষ্যণীয় ভাবে। উচ্চশিক্ষার বছরগুলিতে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ও প্রতিকুলতার সম্মুখীন হন প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক ছাত্রীরা। দুটি বিশ্ববিদ্যালয়, যাদের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে বৈশিষ্ট্য আলাদা, এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কিভাবে প্রথম প্রজন্মের ছাত্রীরা নিজেদের শিক্ষাজীবন যাপন করেন তার একটি তুলনা মূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠান হিসাবে দুটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরিসর হিসাবে তাদের রূপান্তর পাশাপাশি সামাজিক রূপান্তর পূর্বের তুলনায় কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, এই প্রেক্ষিতে প্রথম প্রজন্মের ছাত্রীদের অবস্থান দেখার অবকাশ রয়েছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডলে 'প্রান্তিকতা'র স্থান কি, প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক ছাত্রীরা কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে নিজেদের সম্ভবনা ও সমৃদ্ধি গড়ে তোলার অবকাশ পায় এবং একই সঙ্গে প্রতিকুলতার মধ্য দিয়ে যায়— প্রশ্নগুলি ক্রমে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে উচ্চশিক্ষায়। প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার অভিজ্ঞতা শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ এবং বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। পরিবার, সংশ্লিষ্ট সমাজ, পরিবার থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত অতিক্রান্ত দূরত্ব, নতুন শহর, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর, শ্রেণিকক্ষ, পাঠক্রম ইত্যাদির মধ্যে বিস্তৃত। তাদের আত্মবোধ নির্মাণের প্রভাবকগুলি গুরুত্বপূর্ণ তাদের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপট হিসাবে। একজন প্রান্তিক ছাত্রীর আত্মবোধ, পরিচিতি নির্মাণে তার পরিবার, সমাজ, পাড়া নিকটজনের সংস্পর্শ ক্রিয়াশীল। সংযুক্তি বোধের প্রভাবকগুলি (Davis, 2011) ব্যতিরেকে একজন ছাত্রীর অভিজ্ঞতা নির্ণয় সম্ভব নয়। তাদের অভিজ্ঞতা শুধুমাত্র শিক্ষক ও সহপাঠীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অশিক্ষক কর্মী, যাত্রাপথের বাহ্যিক পরিসর, পরিবারের সদস্য, সামাজিক দৃষ্টি, পিতৃতান্ত্রিক সমাজের পাড়া সংস্কৃতি ইত্যাদি সব কিছুর সঙ্গে ছাত্রীটির দৈনন্দিনের সম্বন্ধ তার উচ্চশিক্ষা জীবনের দিনগুলির অভিজ্ঞতাকে নির্মাণ করে তোলে। বিবিধ আত্মপরিচয়ের মধ্যে কয়েকটি সম্মিলিত হলে যে বাস্তবতা তৈরি হয়, একক ভাবে তা হয় না (John, 2015)। বহুমাত্রিক প্রান্তিকতার একত্র সমাবেশ তাদের যে ক্ষমতাক্রমের প্রান্তে রাখে এবং দৈনন্দিনের বাস্তবতা তৈরি করে সেই প্রক্রিয়াটি সরলীকৃত নয়।

---

[১] চণ্ডালিকা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই নৃত্যনাট্যে জাতিভিত্তিক বৈষম্যের ক্রুর রূপ দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, যেখানে চণ্ডাল কন্যা চণ্ডালিকা সমাজে ব্রাত্য থেকেছে জাতির কারণে, এই নাটকের একটি সংলাপ এখানে বিধৃত হল।

প্রান্তিকতা একক ভাবে যে প্রভাব তৈরি করে সম্মিলিত ভাবে ভিন্ন এবং তীব্র প্রভাব তৈরি করে। প্রথম প্রজন্ম ও প্রান্তিকতার সঙ্গে তাদের লৈঙ্গিক পরিচয় কিভাবে ভিন্ন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করে তোলে–এই সার্বিক উচ্চশিক্ষার অভিজ্ঞতা কি কি বিষয়ের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে আলোচিত হয়েছে। এই অধ্যায়ের মূল প্রশ্নগুলির একটি হল প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক আবাসিক ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার অভিজ্ঞতায় এবং অভিজ্ঞতার বয়ান নির্মাণে আর্থ-সামাজিক অবস্থান, পরিবার এবং বহুমাত্রিক প্রান্তিকতা কিভাবে ক্রিয়াশীল থাকে? অন্যটি হল, পরিবারের পিতৃতান্ত্রিক 'আভ্যন্তরীণ' পরিসরের বাইরে আবাসজীবন কিভাবে স্বতন্ত্র ও নিজস্ব 'ব্যক্তিগত' পরিসর হিসাবে প্রান্তিক ছাত্রীদের বাস্তবতাকে আকার দেয়, নবনির্মিত আত্মবোধের আধার হয়ে ওঠে?

পরিসর হিসাবে পরিবারে প্রান্তিক ছাত্রীদের লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার হতে হয় অন্যদিকে তারা হস্টেলে এসে নিয়মের নিগড়ের মধ্যেও একধরনের গণতান্ত্রিক পরিসর তারা পায় যেখানে সামাজিক বিভিন্ন স্তর বিভাজনের রেখাগুলি ক্রমে মুছে আসে। প্রান্তিকছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার অভিজ্ঞতা সমাজ, পরিবার এবং হস্টেল–পরিসরগুলি দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত। ছাত্রীদের দৈনন্দিন একদিকে তাদের উচ্চশিক্ষার অভিজ্ঞতা যেমন তৈরি করে তেমনি ব্যক্তি হিসাবে তাদের বদলে দেয়। পরিবার এবং হস্টেলে প্রথম প্রজন্মের ছাত্রীদের সংযুক্তি এবং অভিজ্ঞতা সাক্ষাৎকারের বিশ্লেষণ এই অধ্যায়ের মূল প্রতিপাদ্য। অধ্যায়টি কয়েকটি বিষয়ে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমত, আলোচিত হয়েছে 'নিরাপদ' পরিবার কাঠামো কেন ছাত্রীদের জন্য অনেকাংশে নিরাপদ নয়, কেন এবং কিভাবে তারা পরিবারের বাইরে নিরাপত্তা খুঁজছেন। দ্বিতীয়ত, সংশ্লিষ্ট সমাজ, পরিবার, গার্হস্থ্য হিংসা এবং বিবাহ ইত্যাদির সঙ্গে ছাত্রীদের সম্বন্ধ তাদের উচ্চশিক্ষার অভিজ্ঞতাকে প্রভাবিত করে। এরপর বিশ্লেষিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠলাভের সূত্রে তাদের স্বপ্ন, অনুপ্রেরণা এবং সংগ্রামের নির্মাণ, কিভাবে তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনার ভাষা এবং ভাষা বয়ান বদলে যায় আর্থ-সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে। এরপর আলোচিত হয়েছে শ্রেণিগত, জাতিগত, লিঙ্গগত প্রান্তিকতার সঙ্গে ভৌগোলিক প্রান্তিকতা প্রান্তিক ছাত্রীদের একটি ভিন্ন বাস্তবতার সম্মুখীন করে, শিক্ষাসূত্রে আন্তঃরাজ্য স্থানান্তর সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে বিশ্লেষিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠান এবং পরিসর হিসাবে হস্টেলের সঙ্গে এই ছাত্রীদের সংযুক্তি, হস্টেলজীবনে নির্মিত ছাত্রীদের নবনির্মিত আত্ম, তাদের আত্ম আবিষ্কার এবং আবাসজীবনে অভিজ্ঞতার 'ভিন্নতা' আলোচিত হয়েছে। এই অংশে মূলত আলোকপাত করা হয়েছে আবাসজীবন কীভাবে এই ছাত্রীদের নবনির্মিত আত্মের আধার হিসাবে এবং বিকল্প পরিসর হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই কয়েকটি অংশে আলোচনার মাধ্যমে অধ্যায়ের মূল গবেষণার প্রশ্নে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠান হিসাবে ভারতীয় পটভূমিতে পরিবারের মধ্যস্থ পিতৃতন্ত্রকে নিবেদিতা মেনন দেখেছেন অসাম্যের আকর হিসাবে। যেখানে কাঠামোগত ভাবেই নারীর অবস্থান অত্যন্ত ভঙ্গুর। এবং এই ভঙ্গুরতার ক্রম শৃঙ্খল অনুধাবন করা কষ্ট সাধ্য নয়। (Menon, 2012) পরিবারের সামাজিক অবস্থান, আন্তঃস্তরের ভিত্তিতে বদলে যায় পিতৃতন্ত্রের আদল এবং কার্যপ্রণালী (Sundar Rajan, 2000) এবং পরিবার আদতে

সেই প্রতিষ্ঠান যা রাষ্ট্রের প্রযুক্ত নিয়ম এবং ক্ষমতা সম্পর্ককে পুনরুৎপাদন করে (Basu, 2015) পরিবার মধ্যস্থ অসাম্যের প্রভাব নারীর ব্যক্তিজীবন এবং আত্মবোধকে কিভাবে প্রভাবিত করে সে বিষয়ে বিশদে বলছেন (Dhawan, 2011)। প্রান্তিক ছাত্রীরা যারা উচ্চশিক্ষায় অংশ নিয়েছেন তাদের সঙ্গে তাদের পরিবারের সম্পর্ক জটিল, সেখানে পিতৃতন্ত্রের রেখাচিত্র সরল নয়।

**'নিরাপদ', 'সুরক্ষিত' পরিবার কাঠামো এবং প্রান্তিক মেয়েদের 'নিরাপত্তা': একটি স্ববিরোধী বাস্তবতা**

উচ্চশিক্ষা 'প্রাপ্ত বাস্তবতা'র বাইরে এই ছাত্রীদের দিয়েছে 'অর্জিত বাস্তবতা'র ইঙ্গিত। সামাজিক স্তর ভেদে ও বিদ্যমান ক্ষমতা সম্পর্ক ভেদে, শ্রেণি, জাতি, বর্ণ, ধর্ম ভেদে মেয়েদের সামাজিক বাস্তবতার অভিজ্ঞতা ভিন্ন। কিন্তু উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদেরকে একটি নির্মাণের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। সমাজের সব ধরণের মানদণ্ডে পিছিয়ে থাকা প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক ছাত্রীটি যার কাছে আর্থিক মূলধনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক মূলধনও অপ্রতুল, তার সামনে উচ্চশিক্ষা একটি ভিন্ন 'অর্জিত বাস্তবতা'র দরজা খুলে দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে প্রান্তিক ছাত্রীটি পায় পরিবারের নির্ধারিত ভবিষ্যতের বাইরে নিজেকে আবিষ্কারের সুযোগ। পরিবারের 'যাঁতাকল' থেকে বেড়িয়ে তারা 'নিজের জীবন' খুঁজেছে নতুন জায়গায়, নতুন সংযুক্তিতে, নতুন পরিসরে।

উচ্চশিক্ষায় প্রান্তিক ছাত্রীদের কেন্দ্রীয় সমস্যাগুলির একটি হল সাংস্কৃতিক মূলধনের অভাব। পরিবারের অভিভাবকদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ ছিল না যেহেতু তাই সাংস্কৃতিক মূলধন তারা সংগ্রহ করতে পারেন নি অনেক ক্ষেত্রে। এই সাংস্কৃতিক মূলধন আর্থ-সামাজিক অবস্থানকে প্রভাবিত করে। উচ্চশিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সাংস্কৃতিক মূলধন তারা ভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করে অথবা তার অভাবে সমস্যায় পড়ে। আবার সাক্ষাৎকারগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে, সাংস্কৃতিক মূলধন এবং আর্থিক মূলধন যা একটি পরিবার বা অভিভাবকগণ সংগ্রহ করেন তা বন্টন বা হস্তান্তরের মধ্যে ক্রিয়াশীল লিঙ্গ বৈষম্য। সীমিত যে সাংস্কৃতিক মূলধন তারা সংগ্রহ করে বা সংগ্রহের সম্ভবনা তৈরি করে অথবা যে সাংস্কৃতিক মূলধন অর্জন করতে চায় এবং সেই লক্ষ্যে বিনিয়োগ করে, এই সাংস্কৃতিক মূলধন হস্তান্তরের ক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার লিঙ্গ বৈষম্য বজায় রাখে। পরিবার ক্ষমতা, মূলধন এবং সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে যে বৈষম্য অনুশীলন করে বৃহত্তর ক্ষমতা সম্পর্কের সমীকরণ বজায় রাখতে চায়। সাংস্কৃতিক মূলধন হস্তান্তরের ক্ষেত্রেও একই বৈষম্য বহাল রাখে। পরিবারের ছেলেটির 'ভবিষ্যৎ' গড়ে দিতে একটি অস্বচ্ছল পরিবারও যেভাবে সচেষ্ট থাকে, পরিবারের মেয়েটির জন্য সেভাবে সচেষ্ট থাকে না। পরিবারের মেয়ে যেহেতু বিয়ে হয়ে যাবে অথবা মেয়ে কতদূর যেতে পারবে, সাংস্কৃতিক মূলধন পরিবার সেখানে বিনিয়োগ করতে সম্মত হয় না। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ছাত্রী যিনি জাতিতে চর্মকার টিনা দাস জানায় কিভাবে তার বাবা তার দাদার পড়াশোনায় গুরুত্ব দিয়েছিল এবং তাকে অবজ্ঞা ভোগ করতে হয়েছে। তার বাবা দিনমজুর, পরিবার অস্বচ্ছল, কিন্তু এই দারিদ্রের মধ্যেও টিনা ধীরে ধীরে বুঝতে পেরেছে তার শিক্ষার প্রতি মনোযোগের অভাব লিঙ্গ বৈষম্য প্রসূত। তার

বাবা মাধ্যমিক পাশ করেছেন এবং মা তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছেন। মেয়েদের উচ্চশিক্ষার বিষয়ে পিতা মাতার বিনিয়োগের কার্পণ্য লিঙ্গ বৈষম্য প্রসূত হিসাবে চিহ্নিত করতে পেরেছেন অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কয়েকজন।

'ব্যক্তিগত পরিসর' হিসাবে পরিবারের একটি প্রতিষ্ঠিত চরিত্র থাকলেও মেয়েদের ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা এবং উদযাপনের ক্ষেত্রে পরিবারের ভুমিকা প্রশ্নাতীত নয়। 'ব্যক্তিগত পরিসর' এর প্রাথমিক শর্তই হল ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা। সাক্ষাৎকার থেকে দেখা যাচ্ছে অংশগ্রহণকারীদের পরিবার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিসরকে যুক্ত করে না, বরং দুটির বিপরীত সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। অবস্থান ভেদে আবার বদলে যায় ব্যক্তিগত পরিসরের পারিবারগত ধারণা। এই ব্যক্তিগত পরিসর বেষ্টিত থাকে নিষেধাজ্ঞার গণ্ডি দিয়ে। কি কি মেয়েটি করতে পারবে না, তার সীমা কতদূর তার ভিত্তিতে তার চারপাশে ক্রমাগত ঘুরতে থাকে নিষেধাজ্ঞার বলয়। এই নিষেধাজ্ঞাকেই মূলত ব্যক্তিগত পরিসর হিসাবে সজ্ঞায়িত করে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। তার ভিতরে নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষিত হয় না। অংশগ্রহণকারী ছাত্রীরা সমাজের যে শ্রেণির পরিবার কাঠামো থেকে এসেছেন সেখানে তাদের ব্যক্তিগত পরিসর এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা— এই দুইয়ের চরিত্র কি সে বিষয়ে তাদের ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট। তবে বাইরের জগত, উচ্চশিক্ষার পরিসর, নতুন সংযুক্তি, নবনির্মিত আত্মবোধ দিয়ে তারা বুঝতে পেরেছে পরিবার তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা করে নি, তাদের প্রকৃত অর্থে ব্যক্তিগত পরিসর পরিবারে নেই। টিনা এখন বোঝে 'ব্যক্তিগত পরিসর' এর অর্থ। যে পরিবারের নজরদারি কোনোভাবেই নিজস্ব পরিসরের সমার্থক বলে মনে করে না। এই ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে এসে হস্টেলে নিজেদের শর্তে সাময়িক ভাবে ব্যক্তিগত পরিসর খুঁজে পেয়েছেন। ব্যক্তি স্বাধীনতার বোধ থেকে উপলব্ধি করেছেন ব্যক্তিগত পরিসরের ধারণা। পরিবারের আরোপিত ব্যক্তিগত পরিসরের নিষেধাজ্ঞার বাইরে নিজেদের সীমা এবং সম্ভবনা সম্পর্কে ধারণা পেয়েছেন। পরিবারের আরোপিত ব্যক্তিগত পরিসরের নিষেধাজ্ঞার বাইরে নিজেদের সীমা এবং সম্ভবনা সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছেন। এদিক থেকে অংশগ্রহণকারীদের সাক্ষাৎকারের বয়ান থেকে উঠে আসছে, আবাসজীবন; প্রান্তিক ছাত্রীদের নিজস্ব শর্তে ব্যক্তিগত পরিসর। উচ্চশিক্ষাসূত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে হস্টেলে এসে প্রান্তিক ছাত্রীরা স্থানিক ও মানসিক ভাবে একটি ব্যক্তিগত পরিসরের অভিজ্ঞতা পায়। তাদের দৈনন্দিনকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করার এখানে নজরদারি থাকে না। এই সূত্রে সামাজিক পরিসর হিসাবে আবাসজীবন একটি স্বতন্ত্র আকার নিয়ে চলেছে ক্রমাগত। শিক্ষাসূত্রে প্রায় এক দেড় দশকেরও বেশি যারা হস্টেলে থাকছেন তারা পরিবারের বাইরে একটি মুক্ত পরিসরের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। হস্টেল ছাত্রীদের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থান অনুসারে ভিন্ন পরিসর হিসাবে উপযোগী হয়ে ওঠে। স্বচ্ছল পরিবারের উচ্চবিত্ত ছাত্রীটির কাছে হস্টেল পরিবারের বাইরে পরিচর্যাহীন হলেও স্বাধীন পরিসর হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। অন্যদিকে প্রান্তিক ছাত্রীদের কাছে হস্টেল ভিন্ন কারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। পরিবারে যেখানে মেয়েটির পড়তে বসার নির্দিষ্ট একটি জায়গা পর্যন্ত থাকে না, হস্টেলে

এসে নিজস্ব একটি টেবিল চেয়ার পেয়ে তারা উদ্ভাসিত হয়। একটি ছোট নিজের বিছানা একটা রুমের প্রান্তে নিজস্ব খানিকটা জায়গা তাকে দেয় নিজস্বতার স্বাদ।

উচ্চশিক্ষার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের পরিবারে অবস্থান বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। একটি পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে মেয়েটির অবস্থান তার উচ্চশিক্ষার অগ্রগতিকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করে। পরিবার গুলির গঠন, মেয়েদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, লৈঙ্গিক দারিদ্র ইত্যাদি বিষয়গুলি ক্রিয়াশীল থাকে। তাদের সাক্ষাৎকার থেকে উঠে এসেছে পরিবারের মধ্যে তাদের অবস্থান, পরিবারের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক।

চিত্র -২২ অংশগ্রহণকারীদের ঘর, ক্ষেত্রসমীক্ষাকালীন ছবি, নিজস্ব চিত্র, ২০২২।

নিশা দাস যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এম ফিল ছাত্রী, বয়স ২৭, জাতি নমশূদ্র, সে ভূগোলে স্নাতক পর্যন্ত পড়ার পর সমাজ বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর পড়েছে এবং এই বিষয়ে গবেষণা শুরু করেছে। নিশার পরিবার যৌথ। তারা চার বোন দুই ভাই। ভাই গ্র্যাজুয়েশন পর্যন্ত পড়েছে। তারপর বাবার সঙ্গে কাজ করে। তার ভাই এর পড়াশোনার প্রতি তেমন আগ্রহ ছিল না। নিশা জানায় পড়ার তাগিদ থাকলে বাড়ি থেকে তাকে পড়াত কিন্তু তার নিজের ইচ্ছা ছিল না। তার বড় দিদির বিয়ে হয়েছে। তার দিদির শ্বশুরবাড়িতে ঝামেলা। তাদের বাড়িতেই থাকে। দিদি পড়াশুনা করেনি। তখন তাদের পরিবারের অর্থনৈতিক সমস্যা ছিল। বাকি তার তিনটে বোন পড়াশুনা করে। যেখানে রোজগার করা পরিবারের সকলের মুখ্য প্রয়োজন সেখানে

পড়াশোনা আসে একটা হিসাবে, রোজগারের সময়ের সঙ্গে তারা আপোষ করে না, তাদের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা তাদের সেই অবকাশ দেয় নি। নিশা জানায় এখন তাদের পরিবার অর্থনৈতিক অনেক উন্নত হয়েছে। এখন পারিবারিক আয় বলতে তাদের নিজেদের নামে কুলপী আইস্ক্রীম কোম্পানীর ডিস্ট্রিবিউটরশিপ আছে।

শ্যামপুরের পপি হেমব্রমের মা লেখাপড়া জানেন না কিন্তু ছেলে মেয়েদের পড়িয়েছেন, কিন্তু তিনি মনে করেন, সবাই চাকরি না পেলেও তারা নিজেদের ছেলে মেয়েদের পড়াতে পারবে যেমন তার বৌমা শিক্ষিত তাই তার নাতনিকে বাড়িতে পড়াতে পারে। তিনি রোজগার ছাড়াও লেখাপড়া করার একটি গুরুত্ব দেখেছেন। পপির বাবা থাকেন কলকাতায়। উনি কলকাতা পুলিশের কনস্টাবল। নিরাপত্তা বিভাগের গার্ডের চাকরি করেন। তিনি বরাবরই পড়াশুনাকে গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন। ওদের বাড়িতে চাষ আছে, পপিও চাষের সব কাজ জানে। পপি অভিরামপুরে পড়ত উচ্চমাধ্যমিক। বাড়ি থেকে যাতয়াত করেছে, এখন বিশ্বভারতীর হস্টেল 'আম্রপালি' তে থাকে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সে স্নাতকোত্তরের ছাত্রী। সে এস টি ক্যাটাগরিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। সে এবং তার পরিবার সারনা ধর্ম পালন করে থাকে।

রিনি মুর্মুর বয়স ২৩, বিশ্বভারতীতে সাঁওতালি ভাষায় স্নাতকোত্তরের ছাত্রী। সে বাংলা ভাষাও জানে। বাড়ি থেকে তাকে যে স্বল্প টাকা দেওয়া হয় তা ছাড়াও সে টিউশন পড়িয়ে মাসে কিছু টাকা রোজগার করে। বাড়িতে আগে কেউ পড়াশুনা করে না। তারা তিন ভাই বোনই পড়াশুনা করেছে। বাবা একা খাটনিদার ছিল বাড়িতে। ওর মা চাইত যে ওরা পড়ুক। "মা বলত নিজের চেষ্টা থাকলে পড়তে পারবি, নিজের চেষ্টা না থাকলে পারবি না। তোদের থেকেও খারাপ ঘরের ছেলেরা নিজের চেষ্টায় অনেকদুর পড়ছে, আমাদের খারাপ অবস্থা কিন্তু এমনটাও তো নয় যে তোদেরকে কোনদিন না খাইয়ে রেখেছি। তোদের যদি চেষ্টা থাকে পড়তে পারবি"[২]। তার মা তাকে সদর্থক ভাবে চিন্তা করতে শিখিয়েছেন আর তার বিবাহিত দিদি আর দিদির স্বামী সাহায্য করেছে। উচ্চ মাধ্যমিকের সময় শিক্ষা উপকরণ এবং টিঊশনের টাকা দিয়েছেন তার ভগ্নীপতি। তার ভগ্নিপতি দিল্লীতে কার্পেন্টারের কাজ করেন, প্রচন্ড পড়াশোনার ইচ্ছা ছিল। তিনি নিজে পড়তে পারেন নি বলে তিনি চান রিনি পড়ুক তাকে সবরকম ভাবে সাহায্য করেন। দেখা যাচ্ছে একদিকে যেমন কেউ কেউ পরিবার থেকে অসহযোগিতা পেয়েছে, তেমনি পরিবারের অনেকে নিজের জীবনের পড়াশোনার অপূর্ণ ইচ্ছা সহযোগিতার মাধ্যমে পূর্ণ করতে চেয়েছে।

কুহু মাহাতোর পুরুলিয়ার সীমান্তে বাড়ি। সে বিশ্বভারতীর ছাত্রী। সে অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায় ভুক্ত একজন ছাত্রী এবং সংরক্ষণের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে শরীরবিদ্যায় স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ছাত্রী। ছোটবেলা থেকে খেলাধুলা ভালো করত এবং তার স্বপ্ন ছিল খেলোয়াড় হবার। সে বাংলা জানে। সে পড়াশোনা চালানোর জন্য টাইপিং করে, এডিট করে কিছু টাকা রোজগার করে। সে বলছে তার পড়াশোনা

[২] অংশগ্রহণকারী বি.বি ১, রিনি মুর্মু, সাক্ষাৎকার, স্থান-শান্তিনিকেতন

শুরু হবার পর তাদের চাষবাস বাড়াতে হয়েছে। তাদের পুকুর আছে। পুকুর থেকেও লাভ হয়। ওখানে মাছচাষ হয়। তাদের বাড়িতে মুর্গী আছে, গরু আছে। সে বলে,

> এখনতো একটা চাকরি পেতেই হবে। কেননা আমি সবার উপরে আছি। দিদি গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেছে, এম এ টা করব ভাবছিল কিন্তু টাকার কারণে করতে পারে নি। কিন্তু ভাবল বাবাকে আবার টাকা দিতে হবে, এদিকে হস্টেলে ভাই থাকে তাকে মাসে মাসে পাঁচহাজার টাকা দিতে হয়। সেটা চাপ হয়ে যাবে।[৩]

সে আরো জানায়, "আমরা গরীব বলে অনেকে মেশে না কিন্তু আমি সবার সাথে মিশি। আমি পড়াশুনায় ভাল তাই আমাকে স্যাররা ভালবাসে।  দেখো ঘটনা সেভাবে কিছু ঘটে না কিন্তু নীরবে পাত্তা দেয় না। স্ট্রাগলটাই দামী এই যে এত কষ্ট করে এখনো পড়াশোনা ছাড়িনি[৪]।

চিত্র – ২৩ অংশগ্রহণকারীদের বাসস্থান, বীরভূম, ক্ষেত্রসমীক্ষাকালীন ছবি, নিজস্ব চিত্র।

---

[৩] অংশগ্রহণকারী বি. বি ৬, কুহু মাহাতো, সাক্ষাৎকার, স্থান-শান্তিনিকেতন।

[৪] অংশগ্রহণকারী বি. বি ৬, কুহু মাহাতো, সাক্ষাৎকার, স্থান-শান্তিনিকেতন।

চিত্র – ২৪ অংশগ্রহণকারীদের বাসস্থান, ক্ষেত্রসমীক্ষাকালীন ছবি, জীবিকা হাঁস পালন, বীরভূম, নিজস্ব চিত্র।

**সংশ্লিষ্ট সমাজের সঙ্গে প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক ছাত্রীদের সম্বন্ধ : গার্হস্থ্ হিংসা, বিবাহ এবং পরিবার**

প্রান্তিক ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার অভিজ্ঞতা অনেকাংশে প্রভাবিত হয় পরিবার এবং সংশ্লিষ্ট সমাজের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের দ্বারা। পরিবার থেকে তারা কি ধরণের সহযোগিতা, অসহযোগীতা পান, হিংসার স্বীকার হন যা তাদের বাস্তবতার সাথে মানসিক স্বাস্থ্যকেও প্রভাবিত করে। পরিবার এবং অভিভাবকদের অধীনে 'নিরাপদ' জায়গা মেয়েদের নিরাপত্তা বোধের সঙ্গে সমীভূত হয়না। পিতৃতান্ত্রিক নিরাপত্তার নির্মাণ নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থী। নিরাপদ জায়গায় সীমিত পরিসরে পরিবারস্থ্ মেয়েরা 'স্বজন' এর দ্বারা নিপীড়িত, লাঞ্ছিত। তথাপি পরিসরটি 'নিরাপদ' হিসাবেই পরিগণিত হয় (Dhawan, 2011)। এই 'নিরাপত্তা' আরোপিত। পরিবারস্থ মেয়েটি আদৌ এই নিরাপত্তার মধ্যে নিরাপদ বোধ করেন কিনা তার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় না পরিসরটির বৈশিষ্ট্য। পারিবারিক হিংসা দেখে, সহ্য করেও পরিবারের 'নিরাপদ ভাবমূর্তি' বজায় রেখে পিতৃতান্ত্রিক উদ্দেশ্য বহাল রাখার অবকাশ নারীবাদী গবেষণা দেয় না। পরিবারস্থ্ মেয়েরা যখন নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন তখন তাকে কোনো ভাবেই প্রশ্নাতীত 'নিরাপদ' জায়গা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেকেই জানাচ্ছেন তাঁরা হয় নিজেরা পারিবারিক হিংসার ভোগ করেছেন অথবা অপ্রত্যক্ষ ভাবে সম্মুখীন হয়েছেন।

সুধা মাল, অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ভুক্ত, সে জেনারেল ক্যাটাগরিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। তার বয়স ২৬। পড়াশোনার পাশপাশি সে টাইপি, এডিটিং করে নিজে সে কিছু টাকা রোজগার করে। সে যাদবপুরে পি এইচ ডি গবেষক ছাত্রী যিনি প্রায় দশ বছরের বেশি রয়েছেন হস্টেলে, তিনি জানাচ্ছেন -

ভয়াবহ পারিবারিক হিংসার মধ্যে বড় হতে হয়েছে। একদম জন্ম থেকে দেখছি। মারামারি চিৎকার নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়। আতঙ্ক আর ভয়াবহতার মধ্যে বেড়ে ওঠা। তার ফলে একটা স্থির আত্মবিশ্বাস তৈরি হবার সুযোগ পায়নি কোনোদিন। একটা হীনমন্যতা, একটা সংকোচ যেমন মনের মধ্যে তেমনি জীবনযাপনে। আত্মপীড়ন করার প্রবণতা তৈরি হয়েছে। পড়াশুনাটা ছিল একমাত্র অবলম্বন। সেখানেও থাবা বসিয়েছে পরিবার। নষ্ট করার চেষ্টা করেছে। বারবার। সমালোচনা করেছে নোংরা ভাষায়, আক্রমণ করেছে যতভাবে পারা যায়। যাতে ভেঙ্গে যায়। তারপর যতরকম অসুবিধা করা যায় করেছে। পরিবার হল শোষণের মূল ক্ষেত্র বিশেষত মহিলাদের জন্য।[৫]

সে আরও বিশদে বলে, "পরিবারের একটি নির্দিষ্ট ক্ষমতা সম্পর্ক রয়েছে তোমাকে সেই ভাবেই থাকতে হবে, পরিবার একটি মহিলার জন্য যে বাক্স রেখেছে নিয়মের বাক্স সেখানেই ফিট করে থাকতে হবে, এটা তুমি চিনতে পারবে না যতক্ষন না তোমার অন্য কিছুর অভিজ্ঞতা হচ্ছে"।[৬] সুধা এখন জানে তার অবসাদ, মানসিক বিকলনের শিকড় কোথায়, আশৈশব গার্হস্থ্য হিংসা দেখে, ভোগ করে তার মনস্তত্ত্বের আদল বদলে গেছে, উচ্চশিক্ষায় এসে সে যথাযথ মানসিক শ্রম দিতে পারে না, এই বিষয়ে সে তার অত্যাচারী বাবার প্রবল নিয়ন্ত্রণস্পৃহা এবং হিংস্রতার কথা জানায় "আজন্ম দেখে আসছি হিংস্রতা, পরিবারের ভয়ংকর চেহারা, সেকি পরিবার থেকে পড়শোনার সাপোর্ট পাওয়া হাস্যকর না? আগে ভাবতাম এসব লুকিয়ে রাখতে হয়, এখন জানি লুকোনোর কিছু নেই"[৭] উচ্চশিক্ষার হাত ধরে এখন সুধা সুস্থ পরিবেশে থাকা নিশ্চিত করতে পেরেছে, সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের এখন সে নির্মাণ করতে পারবে বলে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে।

কেয়া দাস যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করতে এসে এস সি হিসাবে স্কলারশিপ পেয়েছে। যদিও স্কলারশিপের কিছু অংশ পরিবার কে দিতে হত সংসার চালানোর জন্য, স্কলারশিপ পাওয়াকে পরিবারের সদস্যরা অনেক ক্ষেত্রে চাকরি পাওয়া বলে মনে করে। কেয়ার সমস্যা হলে তার মামার বাড়ি থেকে কিছু সাহায্য পেত। তার মা পড়াশোনার বিষয়ে সর্বদা সমর্থনে ছিলেন, পরীক্ষার হলে নিয়ে যাওয়া আসা তার মা ই করতেন। কেয়ার শৈশবে নর্থ বেঙ্গলে তাদের এলাকায় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ছিল না, এখন চার পাঁচটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল হয়েছে, তাই কেয়া পড়েছে বাংলা মিডিয়ামে। সে জানায়, ইংলিশ নিয়ে এখনও সমস্যা তার হয়। তার বোন ওকালতি পড়েছে। কেয়ার বি এড আর তার বোনের ল পড়ার খরচ তার ঠাকুরদাদার জমি ছিল সেটা কিছুটা বিক্রি করে আর কিছুটা বন্ধক রেখে করা হয়েছে। রিলায়েন্সের টাওয়ার ছিল তাদের বাড়িতে সেখান থেকে কিছু টাকা তারা মাসিক ভাবে পেত। তারপর একটা 'গালা মালে'র দোকান নামে ছোট নটকন ছিল। তার বাবা মা দুজনেই চালাত। জায়গা জমি ছিল তাদের। সেখানে

---

[৫] অংশগ্রহণকারী যা. বি ১১, সুধা মাল, সাক্ষাৎকার, স্থান-যাদবপুর।

[৬] অংশগ্রহণকারী যা. বি ১১, সুধা মাল, সাক্ষাৎকার, স্থান-যাদবপুর।

[৭] অংশগ্রহণকারী যা. বি ১১, সুধা মাল, সাক্ষাৎকার, স্থান-যাদবপুর।

কাজ করত না তার বাবা। তারপর সিকিউরিটি গার্ড হিসাবে কাজ পায় তার বাবা। ২০১৫ তে স্ট্রোকে তার বাবা মারা গেলে এককালীন টাকা তারা পেয়েছে আর এখন পেনশন পায়। সে আরো জানায় লকডাউনে পেনশন বেড়েছে ৫'শ টাকা। 'উজ্জীবন' থেকে তিরিশ হাজার টাকা তুলে যে বি এড একটা কিস্তির টাকা দিয়েছে। তাদের পরিবারে আয় বলতে বাবার পেনশন, আর এখন তার বোন ল প্রাকটিস করছে। এতে তাদের সংসার বর্তমানে মোটামুটি স্বচ্ছল। কেয়া দাস যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এম ফিলের ছাত্রী, সে এস সি হিসাবে সংরক্ষণের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। তারা এখন একক পরিবারে থাকে, পূর্বে যৌথ পরিবার ছিল, নিজের পরিবারের পুরুষদের দ্বারা যৌন হেনস্থার সম্মুখীন হয়েছে, যা তাকে পরিবার, পারিবারিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছে। কেয়ার অভিজ্ঞতায় রয়েছে কিভাবে তার পরিবার দ্বৈত ভূমিকা নিয়েছে। একদিকে বাইরে কিভাবে তার পরিবার মেয়ের পড়াশোনা নিয়ে গর্ব করেছে, স্কলারশিপের টাকা ব্যবহার করেছে অন্যদিকে তাকে প্রতিনিয়ত মানসিক চাপ দিয়েছে, হেনস্থা করেছে, তার কোনো 'সাফল্য' উদযাপন করে নি। কেয়ার বাবার চাষবাস রয়েছে এবং একটা ছোট লটারীর দোকান তিনি চালান। উচ্চশিক্ষিত একজন ছাত্রী পরিবার থেকে বিচিত্র সমস্যার সম্মুখীন হলেও পরিবার তার থেকে আশা করে এবং দাবী করে অনেক বেশি, ছাত্রীরা তাদের অভিজ্ঞতার কথা জানাচ্ছেন, কেয়া জানাচ্ছেন, "ধরো এখন আমাদের যা বয়স এখন সেখানে আমাদের অনেক রেস্পন্সিবিলিটী এস যায়, আমরা এখন আর বাচ্চা নই। এখন এই আণ্ডার কারেন্ট হিসাবে অনেক কিছু চলতে থাকে"।[৮] পিতৃতান্ত্রিক পরিবার এবং সমাজ যা বিচিত্র ভাবে একটি মেয়েকে অবদমিত করে রাখে সেখানে তাদের অবস্থান তাদের অভিজ্ঞতা নির্মাণ করে।

পিউ দাস যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এম ফিলের গবেষক, সে ভুগোল নিয়ে পড়াশোনা করার পর সমাজ বিজ্ঞান পড়েছে। সে জানাচ্ছে অবিবাহিত কাকা বহুবার যৌন হেনস্থা করার চেষ্টা করেছে। তার বাবা এই সব কথা বিশ্বাস করে না। মা এই বিষয় নিয়ে প্রতিবাদ করলে বাড়িতে চূড়ান্ত অশান্তি হয়। মায়ের ওপর অত্যাচার শুরু হয়। মেয়েটির মায়ের উদ্যোগে ও জেদে সে হস্টেলে থাকে। মা তাকে এই পরিস্থিতি থেকে বাঁচাতে হস্টলে থাকার ব্যবস্থা করেছেন। একটি মেয়ের মা পরকিয়া সম্বন্ধে জড়িয়ে পড়ায় এবং সেই সুত্রে পালিয়ে যাওয়ায় পাড়ায় নিন্দা হয়েছে তাই মেয়েটি মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছিল এবং অবসাদের মধ্যে চলে যাচ্ছিল তাই পরিবারের লোকজন তাকে হস্টেলে রেখে দেয়। এবং তারপর তার অবস্থার উন্নতি হয়। সে এখন পড়াশুনা করতে পারে ভাল ভাবে এবং মানসিক ভাবেও সে এখন অনেক সুস্থ। সে এটাও জানায় "এই যে হস্টেলে আমার পরিবার সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না এটা আমাকে স্বস্তি দেয়। কেউ এই বিষয় নিয়ে খারাপ কথা শোনায় না যেটা আমাকে সহ্য করতে হয়েছে বেশ কিছু বছর, এখন বুঝি পুরো

[৮] অংশগ্রহণকারী যা. বি ১০, কেয়া দাস, সাক্ষাৎকার, স্থান-যাদবপুর।

ব্যাপারটা গ্রামে গঞ্জে এই বিষয়গুলো নিয়ে কি পরিমাণ কুৎসা হয় তোমার কোন ধারণা নেই দিদি”[৯]। পরিবার থেকে পড়াশোনার বিষয়ে সেভাবে সে সাহায্য পায় নি। মানসিকভাবে সে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল, ট্রমার মধ্যে তার কেটেছে বেশ কিছু সময় যা তার।

পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টি সংস্কারের আন্তঃস্তর পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মেল গেজ বহুস্তর রয়েছে। একজন উচ্চবর্গীয় পুরুষ একজন নিম্নবর্ণীয় নারীকে যে দৃষ্টিতে দেখেন আর একজন দলিত পুরুষের দ্বারা একজন দলিত নারী যেভাবে দৃষ্ট হন এই দুই দৃষ্টি সংস্কার ভিন্ন। সাক্ষাৎকার থেকে জানা যাচ্ছে, তারা পুরুষতন্ত্রের ‘সফট টার্গেট’। তাদেরকে নানা ভাবে বিরক্ত করা হয়। যাতে তারা ভেঙে যায়। তাদের এই স্পর্ধা সমাজ মেনে নিতে পারে না। উচ্চশিক্ষার জন্য তাদের মোবিলিটি বাড়ে সমাজে তাদের ভিজিবিলিটি বাড়ে তাই আক্রমণও বাড়ে। বাড় বেড়ে গেলে সহবত শেখানোর জরুরি মনে করে সমাজ। পড়াশুনার জন্য, গবেষণার জন্য যাতায়াতের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীরা লিঙ্গ বৈষম্যের মধ্যে পড়েন। এই মেয়েদের যাতায়াত খুবই সমস্যা জনক। পরিবার সাথে থাকে না অনেক সময়। তাদের নিজেকে সব কিছু করতে হয়। এবং তাতে বিপদে পড়ার সম্ভবনা অনেক বেশী। রিসার্চে যারা আসে তাদের বারবার বলা হয় বা তারা নিজেরাও ভাবে যে ফিল্ড ওয়ার্ক কিভাবে করবে। তারা এমন কিছু কাজ করতে চায় যাতে ফিল্ড ওয়ার্ক না থাকে। বা এমন জায়গায় থাকে যেখান থেকে কাজ করা সুবিধা বা কাছাকাছি। এই ভাবে তারা নিজেদের গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। এই ভাবে তারা নিজেদেরকে কমিয়ে আনে সমাজের চাহিদা অনুসারে। পরিবারের চাহিদা অনুসারে। সমাজ মানসে দলিত নারী যৌন ভাবে সুলভ এই জাতীয় একটি ভয়ঙ্কর ধারণা প্রবাহিত হয়। উচ্চশিক্ষায় অংশ নেওয়া নারীরা যখন ক্রমে সদর্পে পার করে দিচ্ছেন, ‘বিয়ের বয়স’। এবং সামাজিক পরিসরগুলিতে দৃশ্যমান হয়ে উঠছেন সেখানে তাঁদের যৌনতা তাঁদের স্বাভাবিক চলাফেরা আক্রান্ত হয়, কটুক্তির দ্বারা, কুপ্রস্তাবের দ্বারা। সাক্ষাৎকারে তাঁরা জানাচ্ছেন সেই সব অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার কথা।

অংশগ্রহণকারীদের বয়ান থেকে উঠে আসছে কিভাবে তাদের পরিবারে ব্যক্তি স্বাধীনতা লঙ্ঘন করা হয়েছে। ব্যক্তিসত্ত্বা, নবনির্মিত আত্ম তারা পরিবারের কাঠামোর মধ্যে রাখতে পারে নি যা তাদের এক ধরনের বিচ্ছিন্নতার সম্মুখীন করেছে। সমাজ ও সম্প্রদায়ের অদৃশ্য অথচ প্রকট চাপ যা প্রান্তিক ছাত্রী সমগ্র শিক্ষাজীবন ধরে অনুভব করেন। এই ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার অভিজ্ঞতা শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ এবং বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রান্তিক ছাত্রীদের শিক্ষাজীবনের অভিজ্ঞতার বিস্তৃতি আরো অনেক বেশি। তার পরিবারের বাইরের যে সমাজ, পাড়া সেখান থেকেও আসে পিতৃতান্ত্রিক আক্রমণ। প্রতিটি সামাজিক স্তর এক একটি নির্দিষ্ট পারিবারিক ও সামাজিক ভূমিকায় আশা করে। উচ্চশিক্ষার পরিসরে প্রান্তিক অবস্থান থেকে আসা মেয়েটি যখন বহির্জগতের সংস্পর্শে আসে এবং নির্ধারিত ভূমিকা পালন করতে

[৯] অংশগ্রহণকারী যা. বি ৮, পিউ দাস, সাক্ষাৎকার, স্থান-যাদবপুর

এবং তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে অস্বীকার করে তখন এই সমাজ আর সম্প্রদায়ের সঙ্গে তার একটা সংঘর্ষ তৈরী হয়। সমাজ নির্ধারিত নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজ এবং লৈঙ্গিক ভূমিকা পালন করতে যখন সে অস্বীকার করে এবং নির্দিষ্ট গন্ডীর বাইরে নিজেকে উদযাপন করে, তখন সমাজ, সম্প্রদায়ের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব বাঁধে। তার শিক্ষাজীবনের সঙ্গে বর্ধিত পরিধি আর অন্যদিকে সামাজিক ভাবে নির্দিষ্ট ভূমিকার প্রত্যাশা এই দুইয়ের মধ্যে সংঘর্ষ তার উচ্চশিক্ষার অভিজ্ঞতার অন্তর্গত। পরিবারের মতই বাহ্যিক পরিসরের সঙ্গে ছাত্রীটির সম্বন্ধ তার আর্থ-সামাজিক ক্ষমতা ও সামর্থ্যের সঙ্গে বদলায়।

অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেকেরই গার্হস্থ্য হিংসার অভিজ্ঞতা রয়েছে। কেউ প্রত্যক্ষ ভাবে ভোগ করেছে অথবা কেউ চোখের সামনে ঘটতে দেখেছে। তাই পরিবাবের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক একটি জটিল সমীকরণে এসে দাঁড়িয়েছে। একদিকে পরিবার ছেলেদের পড়াশোনা করাতে চায়, মেয়েরা পড়াশোনা যখন করছে সেখানে নানা সমস্যা ও নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে পুরুষ সদস্যরা, আবার পরিবারের নির্যাতিত মহিলারা চাইছেন মেয়ে পড়াশোনা করে চাকরি পেয়ে অবস্থার বদল ঘটাক, অন্যদিকে মেয়ে পড়াশোনা করলে তাকে বাড়িতে বিভিন্ন ভাবে লাঞ্ছিত, অপমানিত করলেও বাইরে তারা মেয়ের পড়াশোনার কথা বলে পরিবারের মর্যাদা নিয়ে গর্ব করছে। এই বিচিত্র সমীকরণ দেখা যাচ্ছে ছাত্রীদের সঙ্গে পরিবার গুলির।

পিউ দাস, এম ফিল গবেষক, বলছেন,

> মেট্রোপলিটন আর নন মেট্রোপলিটনে থাকার মধ্যে যে পার্থক্য আছে সেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ একজন যে মেট্রোপলিটনে থাকছে যে পিজা বার্গার খেয়ে মানুষ যে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে আর তার বাবা মা কর্পোরেটে কাজ করে। যদি মফস্বলের টিচার হয় বা আমি যেরকম বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি থেকে পড়াশুনা করেছি এখানে সেইখানে এইসব ডিস্ক্রিমিনেশন নেই। তুমি যদি বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সীটির পেজটা খুলে দেখো সেখানে কিন্তু রুরাল ক্যাম্পাস লেখা থাকবে। সেখানে যে বাচ্চারা আসে তারা প্রথম প্রজন্ম হায়ার এডুকেশনে আসে। মানে মাস্টার্স ডিগ্রী পড়তে এসেছে। সেখানে সবার প্রতি ব্যবহারটা কিন্তু একইরকম। সেখানে যে টিচাররা পড়াচ্ছে তারাও জানে যে এখানে যারা পড়তে এসেছে তারা প্রথম প্রজন্ম। আমার ব্যাচের কথা যদি বলি দু একজন ছেড়ে বা কি সবাই চাষবাস করা লোকজন বা দোকান আছে এইরকম। দু তিন জনের বাবা মা সরকারি কাজের সঙ্গে যুক্ত। সেটা ছাড়া বাকি সবাই কারো বাবা দুধ বেচে কারো জমিজমা রয়েছে, গরু ছাগল রয়েছে। মানে এগ্রিকালচারাল বেসড ওদের আর্নিং হয়। সেই ক্ষেত্রে টিচাররাও জানে যে যারা এসেছে তারা প্রথম প্রজন্মের। আমি বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটির কথা বলছি তাদের কারো কারো বাবামা হয়তো স্কুলেও যায় নি। তো সেই ক্ষেত্রে সেখানে টীচাররা জানে কি ভাবে বিহেভ করতে হবে, সেখানে অতটা ডিস্ক্রিমিনেশন হয় না। মফস্বলের ইউনিভার্সিটির টীচাররা তোমাকে পুস করবে বাইরে কোনো ভাল জায়গায় পড়তে যাবার জন্য। দিল্লীর ইউনিভার্সিটিতে যাও বা অন্য

কোথাও যাও। তারা কখনই তোমাকে বলবেনা যে তুমি এখানে আছো এখানেই থাকো। উনারা কোথাও না কোথাও বুঝতে পারেন যে যারা ফার্স্ট জেনারেশন লার্নার তাদের বাইরে যাওয়াটা খুব জরুরি। সবকিছু ব্যাপার বোঝার জন্য। তো এই ব্যাপারগুলো আমি দেখেছি। এই এক-দু নাম্বারে থাকা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় এই রুরালের এই পার্থক্যটা আমি দেখেছি। মফস্বলে যারা পড়ায় তারা কলকাতা যাদবপুর বা এইধরনের নানা জায়গা থেকে পি এইচ ডি করা লোকজন। আর এখন কেউ কেউ আসে যে এন ইউ থেকে। আর আমি যে সেন্টারে পড়ি সেখানে কেউ অক্সফোর্ড কেউ বার্কলে এইসব থেকে মানে বিদেশ থেকে পি এইচ ডি করে এসেছে। সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে আর এখানে যে টীচাররা আমাদেরকে পড়ান তারাও কিন্তু বিদ্যাসাগরে সেখানেও তারা হয়তো প্রথম প্রজন্মের ছাত্রই ছিল। মেদিনীপুর থেকে কলকাতা এটা যাওয়াই তাদের আওতার মধ্যে ছিল। আগে তো বিদ্যাসাগর ইউনিভার্শিটি হয় নি। এম এ বা গবেষণা করতে সবাই কলকাতাই আসত। আর যারা শহরের ইউনিভার্সিটি থেকে আসছে তারা আসলে বুঝতে পারে না প্রথম প্রজন্মদের আসলে কি অসুবিধা[১০]।

পিউ দাস জানায় তার বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতার কথা, পরিবার তার যাবতীয় মানবিক অধিকার লঙ্ঘন করেছে, সে জানায় "অন্যের অধিকার, বাউণ্ডারী ভায়োলেট করা এতটাই নর্মাল আমার পরিবারে যে আলাদা করে এগুলো সমস্যা বলে মনে হয় না আর কারো, আমি বাইরে এসে বুঝেছি জীবন কতটা আলাদা, হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে অন্য একটা বাস্তবতা দেখেছি তাই পার্থক্যটা এখন জানি"[১১] উচ্চশিক্ষা সূত্রে এই ছাত্রীরা পরিবারের বাইরে নিরাপত্তা বোধ করেছেন অথবা খুঁজেছেন। অথবা পরিবারের এই 'নিরাপত্তা' এই ছাত্রীদের কাছে থেকে কেড়ে নিয়েছে অনেক সম্ভবনা, সামনে এগিয়ে যাবার ইচ্ছা। অনেকেই এই 'নিরাপত্তা' সঙ্গে আপোষ করেন নি। তথাকথিত অনিরাপদ বাইরের পরিসরে লড়াই করে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। পিউ দাস বিয়ের বয়স নিয়ে পরিবারে এবং সমাজে কি ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন সে বিষয়ে বিশদে বলেছেন,

আমি অলরেডি ২৬। এই এজে আমার কমিউনিটিতে অনেকেরই বিয়ে হয়ে গেছে তাদের বাচ্চা আছে তারা স্কুলে যায় কারো কারো দুটো বাচ্চা। আমার বাবা যে এখন ও আমাকে বিয়ের জন্য কিছু বলে না সেটাই অনেক। বাবা বলেছে তিরিশ বছর পর্যন্ত যা করার কর তারপর ভাবা যাবে। এই যে জায়গাটা দিয়েছে এর বদলে আমার রেস্পন্সিবিলিটীটাও বেড়ে গেছে যে আমাকে নিজেকে একটা এগসাম্পল সেট করতে হবে। যে আমার বাবা আমাকে অপরচুনিটি দিয়েছে আমি যেন নিজেকে কোথাও একটা কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে নিজেকে নিয়ে যেতে পারি। অবশ্যই

[১০] অংশগ্রহণকারী যা. বি ৮, পিউ দাস, সাক্ষাৎকার, স্থান-যাদবপুর।

[১১] অংশগ্রহণকারী যা. বি ৮, পিউ দাস, সাক্ষাৎকার, স্থান-যাদবপুর।

আমার কলেজে আমার পড়ানোর ইচ্ছা নেই কারণ আমি জানি কলেজে পড়ালে নিজের কোনো রিসার্চ করা যায় না। কোনো একটা ইউনিভার্সিটির একটা চেয়ারে যেন নিজেকে আমি বসাতে পারি। বা আমার সেই যোগ্যতা হয়। সেইটার একটা প্রেশার আমার মনে হয় শুধু আমার নয় যারাই ফার্স্ট জেনারেশন লার্নার তাদের সবার আছে। এই নিয়ে স্ট্রেস ডিপ্রেশন থাকেই থাকে। তার কারন তারা পাথ টা ব্রেক করা টোটাল তারা আউট্রেজে যাচ্ছে একদম। আমার মনে হয় সেটা থাকে”[১২]।

যাদবপুরের এম ফিল গবেষক সাকিনা জানাচ্ছেন উচ্চশিক্ষার জন্য পরিবারে বিয়ের বিষয়ে কি ধরণের অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছে। তার বয়স ২৮, এই বয়সে তার বিয়ে করে নেওয়া দরকার বলে তার পরিবার মনে করে, সে পড়াশুনা করছে, বিয়ে করছে না দেখে ওর ওপর বিয়ের চাপ ছিল। সে তার নবনির্মিত আত্ম থেকে পরিস্থিতি যাচাই করে এখন, নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেয়। সে পরিবারের দেখা পাত্রের সঙ্গে বিয়ে করার বিষয়ে ঝামেলার সম্মুখীন হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তার বাড়ি থেকে দেখেশুনেই বিয়ে হয় কিন্তু সেই বিয়ে নিয়েও তাকে ঝামেলার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। সাকিনা ও বি সি (এ) কোটায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। বিশ্বভারতী বিশ্ববদ্যালয়ের ছাত্রী বেণু হাসদা উচ্চমাধ্যমিকের সময় দুবছর মাসির বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করেছে। তারপর শ্রীসদনে হস্টেলে থেকেছে সে। বেণু বাংলা এবং সাঁওতালি দুটো ভাষা জানে কিন্তু স্নাতকোত্তর পড়ার পর গবেষণার জন্য ইংরেজি প্রয়োজন বলে সে আর এগোতে চায় না। টিউশন করার পাশপাশি সে একটা কোচিং সেন্টারে পড়ায়। বেণু আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত এবং শারিরীক ভাবে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তাঁর। তাকে নিয়ে যাওয়া নিয়ে আসার জন্য সবসময় একজনকে লাগে। তার ছোট বোন পড়াশুনা করছে। তার বড় দিদি স্কুলে যায় নি। তারপরের বোন প্রাইমারি পর্যন্ত পড়েছে। তারপর আর স্কুলে যায় নি। তার মা স্কুলে যায় নি কোনদিন। আরা বাবা সেভেন বা এইট পর্যন্ত পড়েছিল। তার মা বাড়িতে থাকেন, মাঝে মাঝে ধানকাটা, ধানপোতার কাজ করে। তার বাবা দিনমজুর ছিলেন আর ভাই রাজমিস্ত্রী। শুধুমাত্র তার মাসির মেজোছেলে বিশ্বভারতী সাঁওতালি বিভাগে পড়ে। তাঁর অভিজ্ঞতা পরিবারে ও সমাজে ভিন্ন বাস্তবতার দ্বারা নির্মিত। তাদের গ্রামে একটা কোচিং সেন্টার এ তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বাচ্চাদের পড়ানোর। মাসে দুহাজার টাকা দেওয়া হয়। তার কথায়

বাড়িতে বিয়ের কথা বলছে না কিছু। আমার আঠাশ হল। ভাই বোনরা বিয়ে করেছে। তাদের বিয়ে করে যা অবস্থা সেইসব দেখে আমার বিয়ে করতে ইচ্ছা করে না। আমি যদি চাকরি পাই তাহলে তখন ভাবতে পারি বিয়ে করার কথা। তা না হলে এমনিতে আমি বিয়ে করব না। মায়ের খুব চিন্তা যে কাকে বিয়ে দেব কিভাবে হবে এইসব। আমার মা বলে যে জামা কাপড় নিজে

[১২] অংশগ্রহণকারী যা. বি ৮, পিউ দাস, সাক্ষাৎকার, স্থান-যাদবপুর।

> পড়তে পারবি কিন্তু সিঁদুরটা তো নিজে পড়তে পারবি না। সেটা তো বিয়ে করতে হবে। এগুলো ছাড়া মেয়েদের সমাজে কোন নিরাপত্তা নেই।[১৩]

একজন প্রতিবন্ধী ছাত্রীর ভবিষ্যতে কে দেখবে তাকে এ বিষয়ে নিরাপত্তাহীনতা রয়েছে। চাকরি না পেলে তাকে কেউ বিয়ে করবে না সে জানে, অন্যদিকে টাকার লোভে বিয়ে করে তাকে সমস্যায় ফেলবে সে বিষয়েও চিন্তিত।

চিত্র –২৫ অংশগ্রহণকারীদের ঘর[১৪], বীরভূম, ক্ষেত্রসমীক্ষাকালীন চিত্র, নিজস্ব চিত্র।

প্রাথমিক ভাবে 'মেয়েদের বয়স' ভারতীয় বাঙালী সমাজে একটি বিশেষ দৃষ্টিতে দেখা হয়। আবার এই বয়স বিষয়ে সামাজিক দৃষ্টির তারতম্য সামাজিক অবস্থানের ওপর নির্ভরশীল। এই ছাত্রীরা 'বিবাহযোগ্য' বয়সে উচ্চশিক্ষায় নিয়োজিত থাকায় পারিবারিক, সামাজিক চাপের সম্মুখীন হন।

**প্রান্তিক ছাত্রীদের 'ভিন্ন' কণ্ঠস্বর, স্বপ্ন, অনুপ্রেরণা এবং সংগ্রাম**

সাক্ষাৎকার থেকে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষার সাংবিধানিক অধিকার অংশগ্রহণকারীদের কাছে অনেক ক্ষেত্রে জীবনের বাইরে কিছু, স্বপ্ন হিসাবে প্রতিভাত হয়। এই পর্যায়ে মুলত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে আলোচিত হয়েছে প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক ছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের অভিজ্ঞতার বিশেষত্ব। কিভাবে অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে যায়, তাদের অভিজ্ঞতা। তাদের বয়ানে পরিলক্ষিত হয়েছে প্রান্তিক দলিত নারীর অভিজ্ঞতার 'ভিন্নতা' এবং স্বাতন্ত্র্য (Rege, 1998; Guru, 1995)। ভিন্নতার সাপেক্ষতাকে প্রশ্ন করলে দেখা

[১৩] অংশগ্রহণকারী বি. বি ৩, বেণু হাসদা, সাক্ষাৎকার, স্থান-শান্তিনিকেতন।

[১৪] কাঠের দেয়াল আর টিনের চালের অস্থায়ী ঘর।

যায় এই ভিন্নতার একটি স্বতন্ত্র ভিত্তিভূমি রয়েছে। আলোচিত হয়েছে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান কিভাবে তাদের শিক্ষাজীবনের ইচ্ছা, স্বপ্ন, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ইত্যাদি নির্ধারণ করে অন্যদিকে তাদের অভিজ্ঞতার বয়ান কিভাবে বহন করে চলে তাদের সামাজিক আন্তঃস্তরের নির্দিষ্ট অবস্থান। বাকীদের থেকে অভিজ্ঞতা ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র ভাষাভঙ্গিমা এমন কি তাদের অভিজ্ঞতার বয়ান নির্মাণ।

অংশগ্রহণকারীদের সাক্ষাৎকার থেকে একটা বিষয় ক্রমে স্পষ্ট হয়ে এসেছে প্রান্তিক ছাত্রীদের অভিজ্ঞতার জগত আলাদা। এই জগত উচ্চবর্ণ এবং উচ্চবর্গের গবেষকের দৃষ্টিগোচর হয় না অনেক ক্ষেত্রেই। অদলিত গবেষকের উপস্থাপিত বাস্তবতার অসত্যতা এবং অস্পুর্ণতার রয়েছে (Guru, 1995) ভিন্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থানের ব্যক্তি বিভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভাবে প্রভাবিত হয়। এই ভিন্নতা (Rege, 1998) একটি অবস্থান, এই শুধুমাত্র ভিন্নতা অপর নয়, স্বতন্ত্র। উচ্চশিক্ষার পরিসর, বিশ্ববিদ্যালয়, হস্টেল, উচ্চশিক্ষার দীর্ঘ বছরগুলি তাদের অভিজ্ঞতা অন্যদের থেকে ভিন্ন ভাবে নির্মিত হতে থাকে। তারা যে পরিস্থিতি থেকে আসেন সেই যাপনের, চর্যার সূত্র তাদের অভিজ্ঞতাকে ভিন্ন আদল দেয়। সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, প্রান্তিক ছাত্রীরা এক ধরনের কথা ক্রমাগত বলে যায়। পুনরাবৃত্ত ভাবে একই ধরনের কথা বলে। কিছু শব্দ ব্যবহার করছে তারা যা তাদের শ্রেণি অবস্থান, জাতিগত ও লৈঙ্গিক অবস্থানকে চিহ্নিত করে। প্রতিটি সামাজিক আন্তঃস্তরে অবস্থিত ব্যক্তি তার অভিজ্ঞতার জগতের ভিত্তিতে প্রভাবিত হয়, কথা বলে, শব্দ ব্যবহার করে এবং নিজেদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য গড়ে তোলে। তাদের অভিজ্ঞতার স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে তাদের অভিজ্ঞতার বয়ানের স্বাতন্ত্র্য উল্লেখযোগ্য ভাবে আলোকপাতের দাবী রাখে।

সাংবিধানিক অধিকার, শিক্ষার অধিকার তাদের কাছে প্রতিভাত হয় স্বপ্ন হিসাবে যে স্বপ্ন অর্জন করতে গেলে 'সংগ্রাম', 'লড়াই' করতে হয়। তাদের কথায় বারবার ফিরে আসে 'স্বপ্ন' আর 'সংগ্রাম'এর কথা। প্রথমত তাদের আশৈশব লালিত স্বপ্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার। তারা নিজেরা স্বপ্ন দেখে, জীবনে একটি লক্ষ্য, উদ্দেশ্য স্থির করে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ লাভকে কেন্দ্র করে। ভাগ্য বদলে যাবার কথা বলে তারা, নিজেদের জীবন কিভাবে তারা গড়েছে, কিভাবে তারা সংগ্রাম করে তাদের বাস্তবতা বদলেছে - তারা কিভাবে 'স্বপ্ন' দেখেছে 'একদিন' আসবে যেদিন তাদের আর কোনো দূরাবস্থা থাকবে না। তারা তাদের 'প্রাপ্ত বাস্তবতা' থেকে বেরিয়ে 'অর্জিত বাস্তবতা'য় প্রবেশ করবে। আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল হয়ে সামাজিক 'সম্মান' লাভ করবে। তারা বারবার উদাহরণ দেয় কাকে দেখে তারা অনুপ্রাণিত, কার মত জীবন তারা পেতে চেয়ে উৎসাহী হয়েছে। তাদের প্রত্যেকের জীবনেই রয়েছে এই জাতীয় কিছু 'অনুপ্রেরণা'। আরো একটি বিষয় তাদের কথায় পুনরাবৃত হয় কিভাবে তাদের 'স্বপ্নভঙ্গ' হয়েছে, কিভাবে তারা আশাহত হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ। এই কয়েকটি বিষয় তাদের সঙ্গে ছটি পর্যায়ের সাক্ষাৎকার হয়েছে তাতে উল্লখেযোগ্য ভাবে ফিরে এসেছে। বিশেষ আর্থ-সামাজিক স্তরে প্রথম প্রজন্মের ছাত্রীদের অবস্থান এবং বহুমাত্রিক প্রান্তিকতা তাদের

একধরনের ‘পরিচয়’ এর সঙ্গে, ‘আত্মবোধ’ এর সঙ্গে তাদের একাত্ম করে তোলে এবং একটি বাস্তবতার সঙ্গে অন্বিত করে, যার ভিত্তিতে তাদের ইচ্ছা, আকাঙ্খা, লক্ষ্য, আচরণের একটি ধরণ বা প্যাটার্ণ তৈরি হয়।

একটি ন্যারেটিভের নির্মাণ নির্ভর করে তার ন্যারেটর বা কথক কোন অবস্থানে রয়েছেন তার উপর। সাক্ষাৎকারে প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক ছাত্রীদের আর্থ–সামাজিক অবস্থান তাদের ন্যারেটিভ তৈরি করেছে নির্দিষ্ট ভাবে। একদিকে তাদের বাস্তবতা যেমন উঠে এসেছে তাদের বক্তব্যে তেমনি তাদের বক্তব্য গুলিকে যদি এক একটা টেক্সট হিসাবে ধরা যায় তাহলে ন্যারেটর হিসাবে তাদের যে অন্তর্লীন বাস্তবতা প্রতিফলিত হয়, তা স্বতন্ত্র। ব্যক্তির আন্তঃস্তর বিন্যাস ভিত্তিক অবস্থান ন্যারেটোলজি দ্বারা বিশ্লেষণ করা সম্ভব। ব্যক্তির ভাষা ব্যবহার, শব্দ ব্যবহার, বক্তব্যের ভঙ্গী, কথার পুনরাবৃত্তি ইত্যদি থেকে উপলব্ধ হয় তার বাস্তবতা স্বকীয় মাত্রা। প্রাপ্ত বাস্তবের সঙ্গে ব্যক্তির আন্তঃসম্পর্ক প্রতিফলিত হয়। কয়েক দফায় গৃহীত সাক্ষাৎকারের বক্তব্যগুলি থেকে উঠে আসা দৃষ্টিকোণ এবং অবস্থান উঠে আসছে তাদের বাস্তবতার বর্ণনাকে স্বীকৃতি দেয়। উচ্চশিক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে তাদের অভিজ্ঞতার স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে তাদের অভিজ্ঞতার বয়ানগুলিও স্বতন্ত্র। ‘স্বপ্ন’ দেখে তারা বিশ্ববদ্যালয়ে পড়ার। বিশ্ববিদ্যালয় এক ধরনের অলীক জীবনের প্রতীতি বয়ে আনে তাদের জন্য। কুহু মাহাতো বলছেন, “ছোটবেলা থেকেই আমার স্বপ্ন ছিল অনেক দূর পড়াশুনা করব, ইউনিভার্সিটি যাব। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, এটা একটা স্বপ্নের মতই”।[১৫] বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে তারা একটি ‘উন্নত’ জীবন পেতে চায়, ফলত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেলে তাদের মনে হয় একটি স্বপ্নের মধ্যে তারা প্রবেশ করেছে। তারা উদ্বেলিত হয়, উচ্ছ্বসিত হয়। সাক্ষাৎকার থেকে উঠে এসেছে তাদের স্বপ্নাভিলাষ। ‘স্বপ্ন’ শব্দটি উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগের সঙ্গে তারা সম্পৃক্ত করে। নিশা দাস বলে, “সেদিনটার কথা আমি সত্যিই বর্ণনা করতে পারব না যেদিন খবর পেলাম, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছি। যেন মনে হল স্বপ্ন সত্যি হল”।[১৬] নিপীড়িতের একটা ভিন্ন ভাষা যেমন আছে, তেমনি একটি নিজস্ব ভাষা ভঙ্গিমাও আছে। তাদের ন্যারেটিভ তার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। তারা উচ্চশিক্ষার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বারবার যে কথা গুলি বলেছেন, কিভাবে সে ও তার পরিবার স্বপ্ন দেখেছে তার বিশ্ববিদ্যালয় যাবার। তাদের এই ‘স্বপ্ন’ তাদের নাগালের জীবনের বাইরে যেন কিছু। বিশ্ববিদ্যালয়ে খাপ খাওয়াতে সমস্যা হয় সাকিনার, তারপর ও সে জানে, যে পরিস্থিতি থেকে সে উঠে এসেছে সেখানের তুলনায় এখানে সে ভাল পরিষেবা পায়, নানা কিছু জানতে পারে তাই সে এখানে খুশি। যাদবপুরের মূলস্রোতে সে ঢুকতে পারে নি বটে কিন্তু এখানে আসতে পারা তার স্বপ্ন ছিল তাই সে খুশি। সব কিছুই তার ভাল লাগে এখানে। সাকিনা বলছেন “এই ইউনিভার্সিটিতে পড়ি এটা আমার একটা স্বপ্নের মত লাগে। এই বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঘুরে বেড়াই এটা আমার কাছে একটা বড় পাওয়া। অনেক সামনে এগিয়ে যাবার কথা ভাবতে পারছি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের

[১৫] অংশগ্রহণকারী যা. বি ৬, কুহু মাহাতো, সাক্ষাৎকার, স্থান-শান্তিনিকেতন।

[১৬] অংশগ্রহণকারী যা. বি ৭, নিশা দাস, সাক্ষাৎকার, স্থান-যাদবপুর।

জন্যই”।[১৭] এইভাবে তাদের কথায় বারবার উঠে আসে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পাবার উচ্ছ্বাস, আনন্দ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্রে তারা একটি নতুন জীবনের আশ্বাস পায়। নিজের আর্থ-সামাজিক অবস্থান থেকে ভিন্ন বাস্তবতায় প্রবেশের ছাড়পত্র হিসাবে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি এবং উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগকে দেখে।

চিত্র- ২৬ অংশগ্রহণকারীদের পরিবার পরিদর্শনকালীন ছবি,[১৮] বড়পুকুরডাঙা, বীরভূম, নিজস্ব চিত্র।

চিত্র – ২৭ ক্ষেত্রসমীক্ষাকালীন অংশগ্রহণকারীদের বাসস্থানের ছবি[১৯], লাভপুর, বীরভূম।

[১৭] অংশগ্রহণকারী যা. বি ৯, সাকিনা, সাক্ষাৎকার, স্থান- যাদবপুর।

[১৮] হাঁসপালন অংশগ্রহণকারীর পরিবারের নারী সদস্যদের জীবিকা। তাদের রান্নাঘর খোলা উঠোনে। উনোন পাতা আছে উঠোনে। এই হাঁসপালন থেকে অর্থাৎ ডিম বিক্রি করে এবং হাঁস বিক্রি করে উপার্জিত টাকা অংশগ্রহণকারীর শিক্ষা উপকরণ কেনার কাজে লাগে।

[১৯] তাদের পরিবার ছাগল পোষে। পরিবারে জীবিকার পাশাপাশি হাঁস, মুরগী, ছাগল পোষে।

প্রান্তিক ছাত্রীদের কথায় উঠে আসে ‘অনুপ্রেরণা’র কথা। তারা অন্যদের দেখে ‘অনুপ্রাণিত’ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে। অর্থাৎ সাংস্কৃতিক মূলধন তারা সংগ্রহ করে ভিন্ন পরিসর থেকে। নিজের ইচ্ছায় কেরিয়ার বেছে নেবার অবকাশটা তাদের থাকে না। ‘সাফল্য’ এর একপ্রকার ধারণা তারা পোষণ করে। বেণু হাসদা অংশগ্রহণকারী যিনি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত এবং শারিরীক ভাবে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তাঁর। তিনই সাক্ষাৎকারে জানাচ্ছেন কীভাবে উচ্চশিক্ষা তাঁরা আশা, স্বপ্ন পূরণ করেছে। বেণু হাসদা বলেন “আমাদের গ্রামেরই একজন দাদা পড়াশুনা করে এখন বিশ্ববদ্যালয়ের অধ্যাপক। তার এখন সম্মান, টাকাপয়সা, কোনো কিছুরই অভাব নেই। তাকে দেখে আসলে মনে হত আমিও চাইলে পারি”[২০]। এলাকার উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যিনি উচ্চশিক্ষাসূত্রে কিছু রিসোর্স, ক্ষমতা এবং কিছু যোগাযোগ লাভ করেছেন তাকে ব্যক্তি ছাড়িয়ে সাফল্যের মোড়কে অতিকায় একজন হিসাবে তারা মনে করে, এবং সেই সব ব্যক্তিদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তারা নিজেদের জীবন পরিকল্পনা করে। বিশ্বভারতীর গবেষক ছাত্রী  হেম চন্দ ও বি সি (বি) তালিকাভুক্ত হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে জেনারেল ক্যাটাগরিতে, ভূগোল নিয়ে পড়াশোনা করে এখন সে গবেষক। তার পড়াশোনার অনুপ্রেরণার বিষয়ে সে জানায় “মা বলত ঐ দিদির মত হও। আমাদের গ্রামের একটা দিদি দারুন ব্রিলিয়ান্ট! আমাদের মনে হত ঐ দিদির মত হতে পারলে ভাল হবে। দিদি শহরে থেকে পড়াশুনা করে স্মার্ট হয়ে গেছে। স্কুল জীবন থেকে ঐ দিদিকে দেখতাম আমরা। তার পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ দেখে আমরা অনুপ্রাণিত হতাম”।[২১] ইউমী দর্জি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের এম এর ছাত্রী, সে দার্জিলিং থেকে এসে কলকাতায় পড়াশোনা করছে। সে ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করে যদিও তার মাতৃভাষা নেপালী। জানায় “আমাদের পাড়ারই এক দিদি খুব কষ্ট করে পড়াশুনা করল ওদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল, দিদির মা কাজকর্ম করে পড়াশুনা করালো ওকে তারপর এখন দিদি ভাল চাকরি করে, ওদের আর কোনো অসুবিধা নেই, সমস্যা নেই”[২২] ।

এই ছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করেছে তাদের পাড়ার দিদি, এলাকার শিক্ষিত দাদা, স্কুলের শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র দিদি। তাদের জীবন দেখে, পড়াশোনা দেখে, তাদের সহায়তায় এই ছাত্রীরা নিজেদের জীবন গড়ে তোলার স্পৃহা পেয়েছেন। এইভাবে তারা নিজেদের অনুপ্রেরণার কথা বার বার বলে যায়।

---

[২০] অংশগ্রহণকারী বি. বি ৩, বেণু হাসদা, সাক্ষাৎকার, স্থান-শান্তিনিকেতন।

[২১] অংশগ্রহণকারী বি. বি ৫, হেম চন্দ, সাক্ষাৎকার, স্থান-শান্তিনিকেতন।

[২২] অংশগ্রহণকারী যা. বি ১২, ইউমী দর্জি, সাক্ষাৎকার, স্থান-যাদবপুর।

চিত্র – ২৮ ক্ষেত্রসমীক্ষা কালীনঅংশগ্রহণকারীদের বাসস্থানের ছবি, বড়পুকুরডাঙা, বীরভূম।

তারা আরও অনেক স্বপ্ন দেখে। প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক ছাত্রী এবং তাদের পরিবার অপেক্ষা করে কোনো 'একদিন' এর জন্য যেদিন তাদের আর কোনো সমস্যা থাকবে না। বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চশিক্ষা কে তারা নিজেরদের 'প্রাপ্ত বাস্তবতা' কে অতিক্রম করার একটি মাধ্যম বলে মনে করে। পপি হেমব্রমের কথায়, "স্ট্রাগল করছি আমি নিজে এবং আমার মা ও আমার পড়াশুনার জন্য যাবতীয় ত্যাগ স্বীকার করেছে। একদিন না একদিন আর স্ট্রাগল করতে হবে না, সেদিনের আশায় এই সব করছি, চাকরি পেলে আর আমাদের সমস্যা থাকবে না"।[২৩] তারা মনে করে উচ্চশিক্ষা তাদের 'ভাগ্য' বদলে দেবে, বদলে দেবে তাদের সামাজিক অবস্থান। তারা অর্থনৈতিক ভাবে স্বচ্ছল হয়ে উঠবে এবং সামাজিক ভাবে ও মর্যাদা, সম্মান ইত্যাদির অধিকারী হবে। কুহু মাহাতো বলে, "স্ট্রাগল করছি, এটা আসলে শুধু পড়াশুনার জন্য লড়াই নয়, বেঁচে থাকার জন্য লড়াই। আমাকে বাঁচতে গেলে এই লড়াইটা করতে হবে, নইলে আমার কাছে আর কোনো রাস্তা খোলা নেই' একদিন সময় ভাল হবে এই ভাবে কাজ করে গেলে এটাই বিশ্বাস করি"।[২৪] এই লক্ষ্যে তারা অপেক্ষা করে, তাদের পরিবার অপেক্ষা করে। শ্রেণি, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ বৈষম্যে জর্জরিত বিচিত্র অভাব ও কমতিতে ম্লান ছাত্রীটি এবং তাদের পরিবার পরিস্থিতি বদলাবার অপেক্ষা করে। নিশা দাসের কথায় "দেখো লক্ষ্য ছাড়া কিছুই শেষ পর্যন্ত হয় না, একদিন আমার যা কিছু নেই সব হবে, একদিন আমার সব

[২৩] অংশগ্রহণকারী বি.বি ২, পপি হেমব্রম, সাক্ষাৎকার, স্থান-শান্তিনিকেতন।

[২৪] অংশগ্রহণকারী বি.বি ৬, কুহু মাহাতো, সাক্ষাৎকার, স্থান-শান্তিনিকেতন।

সমস্যার সমাধান হবে এই প্রত্যাশা নিয়েই কিন্তু পড়াশুনাটা করছি। তাছাড়া শুধুমাত্র জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে পড়ছি একথা বলার মত অবস্থায় আমি নেই সেকথা স্বীকার করে নেওয়া ভাল"।[২৫] তারা অপেক্ষা করে উচ্চশিক্ষা তাদের বাস্তবতার বদল ঘটাবে। সেই অপেক্ষা সাক্ষাৎকারে তাদের কথায় উঠে আসে বারবার, তাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা আর আকাঙ্খা প্রতিফলিত হয় তাদের কথায়, শব্দচয়নে, বাক্যের বিন্যাসে। পিউ দাস মনে করে, উচ্চশিক্ষায় গেলে একদিন সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। অনিশ্চিত ঐ 'একদিন' এর জন্য তারা অপেক্ষা করে। তাদের অপেক্ষা উঠে আসে বারবার তাদের সাক্ষাৎকারে। তারা আশা করে কাঠামোগত বৈষম্যের বেড়াজাল থেকে তারা একদিন মুক্তি পাবে উচ্চশিক্ষার হাত ধরে। এই উচ্চশিক্ষা আর বিশ্ববিদ্যালয় তাদের সেই পথে নিয়ে যাবে বলে তারা আশা করে।

তাদের সাক্ষাৎকারে পুনরাবৃত্ত হয় স্ট্রাগল শব্দটি। রিনি বলে, স্ট্রাগল করেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য। আর্থিক মানসিক  সব ধরণের স্ট্রাগল করতে হয়েছে পড়াশুনা চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্য।[২৬] তারা 'স্ট্রাগল পিরিয়ড' এর কথা বলে। সামাজিক স্তর বিভাজনের সবচেয়ে নিম্ন স্তরে দাঁড়িয়ে যারা, তারা উচ্চশিক্ষা পরিসরে যখন আসে, তাদের যাত্রাপথের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে লড়াই, সংগ্রাম ইত্যাদি শব্দগুলি ওতোপ্রোত ভাবে। টিনার কথায় "বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ও কি স্ট্রাগল করিনি? প্রতিনিয়ত খাপ খাইয়ে চলতে হয়। প্রতিদিন নিজেকে উপযুক্ত হিসাবে গড়ে তুলতে হয়। কখনো কখনো ক্লান্ত লেগেছে খুব কিন্তু আবার চালিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে এই ভাবেই এতদুর এসে পৌঁছেছিঃ।"[২৭] উচ্চশিক্ষার অভিজ্ঞতাকে তারা স্ট্রাগলের অভিজ্ঞতা হিসাবে দেখে। কেয়া বলে, "লড়াই ছাড়া এতদূর আসতে পারতাম বলে মনে হয় তোমার? ঘরে, বাইরে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বত্র লড়াই চালিয়ে যেতে হচ্ছে। একটা চাপ জানোতো আছে, সেটা ফিল করা যায় সব সময় হয়তো দেখা যায় না।"[২৮] নতুন শহরে নতুন জায়গায় এসে তাদের 'স্ট্রাগল' করতে হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ও তাদের স্ট্রাগল করতে হয়েছে। এককে সময় হতাশ হয়েছে এতকিছু করে শেষ পর্যন্ত ফল কি হবে তা ভেবে। ইউমী দর্জি এ প্রসঙ্গে জানায়, "এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার, পড়ার ইচ্ছা ছিল, এখানে পড়ছি আমি আর আমার পরিবার সকলেই এতে গর্বিত কিন্তু তারপর এই শহরে থাকতে গিয়ে আর এই এলিট ক্যাম্পাসে মানিয়ে নিতে গিয়ে আমাকে অনেক স্ট্রাগল করতে হয়েছে"।[২৯] এইভাবে তারা নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজেদের সংগ্রামকে একাত্ম করে দেখে। প্রত্যেকে এক একটা সংগ্রামের গল্প বলে যায়। একক অথবা পরিবারের সংগ্রাম। তাদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের অভিজ্ঞতা নির্মিত হয়ে চলে 'স্ট্রাগল' আর স্বপ্নের গল্পের নিবিড় বুনটে। এই ন্যারেটিভের কথক ছাত্রীরা বিচিত্র আইডেন্টিটির ভিতরে

[২৫] অংশগ্রহণকারী যা.বি ৭, নিশা দাস, সাক্ষাৎকার, স্থান-যাদবপুর।

[২৬] অংশগ্রহণকারী বি.বি ৩, বেণু হাসদা, সাক্ষাৎকার, স্থান-শান্তিনিকেতন।

[২৭] অংশগ্রহণকারী বি.বি ৪, টিনা দাস, সাক্ষাৎকার, স্থান-শান্তিনিকেতন।

[২৮] অংশগ্রহণকারী বি.বি ৬, কুহু মাহাতো, সাক্ষাৎকার, স্থান-শান্তিনিকেতন।

[২৯] অংশগ্রহণকারী যা.বি ১২, ইউমী দর্জি, সাক্ষাৎকার, স্থান-যাদবপুর।

চলাফেরা করে। কিছু পরিচিতি তারা নিজেরা বহন করে চলে তাদের ন্যারেটিভের মধ্যে, শব্দ ব্যবহারে। ক্রমাগত এগিয়ে যাবার স্বপ্ন দেখা এবং স্বপ্ন ভঙ্গ এবং স্ট্রাগল এই ধারাবাহিকতায় তাদের অভিজ্ঞতার ন্যারেটিভগুলি নির্মিত হয়েছে। তাদের অভিজ্ঞতার বর্ণনায় তাই পুনরাবৃত হয় স্বপ্ন, স্বপ্ন ভঙ্গ, সংগ্রাম আর প্রত্যাশার কথা। একটি ব্যবস্থার অবদমিত ব্যক্তি অথবা ব্যক্তি সমষ্টি একটি বিশেষ ভাবে কথা বলে, এক ধরনের শব্দ ব্যবহার করে, তাদের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা, লক্ষ্যের একটি আদল রয়েছে।

চিত্র – ২৯ অংশগ্রহণকারীদের বাসস্থান[৩০], ক্ষেত্রসমীক্ষকালীন ছবি, বড়পুকুরডাঙা, বীরভূম।

[৩০] রাঙ্গামাটি আর নীল দিয়ে দেয়াল নিকোনো আর মেঝে নিকোনো হয় গোবর দিয়ে। পরিবারের মেয়েরা এই কাজ করে থাকেন।

চিত্র -৩০ অংশগ্রহণকারীদের বাসস্থান, ক্ষেত্রসমীক্ষাকালীন ছবি, নিজস্ব চিত্র।

চিত্র – ৩১ অংশগ্রহণকারীদের বাসস্থান, ক্ষেত্রসমীক্ষাকালীন ছবি, বীরভূম, নিজস্ব চিত্র।

**ভৌগোলিক প্রান্তিকতা এবং শিক্ষাসূত্রে স্থানান্তর**

গ্রাম এবং মফস্বলের অংশগ্রহণকারীরা নারীর ক্ষমতায়ন বলতে যা বোঝেন, আর শহরের বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশগ্রহণকারীদের এই সম্পর্কিত মতামতের মধ্যে আসমান-জমিন পার্থক্য। যখন হস্টেলে লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে দেশের রাজধানী শহর উত্তাল, গ্রামে বেড়ে ওঠা ছাত্রীরা হস্টেলের নিয়মকানুনের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই আনছে না। কারণ তারা বাড়িতে পড়াশুনা করার নূন্যতম সুযোগটুকুও পেত না, সরকারী ভর্তুকীর দরুন মাসে মাত্র সাতশ টাকার বিনিময়ে তারা খাওয়া দাওয়া সমেত হস্টেলে থাকতে পারে। হস্টেলে এমন কিছু পরিষেবা পায় যা তারা বাড়িতে কোন দিন পায় নি। যেমন ইলেকট্রিসিটি, গ্রীষ্মকালে ফ্যান, বাথরুম ইত্যাদি। বাড়ীতে পড়তে বসার জায়গা পর্যন্ত ছিল না সেখানে তারা হস্টেলে নিরিবিলি পড়াশুনা করার জায়গা পায়, টেবিল চেয়ারও পায়। মফস্বলের হস্টেলের মেয়েরা রাত্রে হস্টেলে ফেরার সময়ের বিধিনিষেধ ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে হস্টেলের প্রতি বীতশ্রদ্ধ নয়, তাদের কাছে হস্টেল স্থানিক আশ্রয়ের পাশাপশি মানসিক আশ্রয়ও। কেউ কেউ ডমেস্টিক ভায়োলেন্স দেখে বড় হয়েছে, কেউ বাড়িতে কাকা, জ্যেঠা স্থানীয় লোকের দ্বারা যৌন হেনস্থার স্বীকার, কেউ বিবাহিত জীবনে নিপীড়িত, তাদের কাছে হস্টেল পড়াশুনা করে স্বাবলম্বী হবার ভিত্তি এবং তার সাথে পারিবারিক ও সামাজিক ভয়াবহতা থেকে আত্মরক্ষা করার সাময়িক আশ্রয়ও। শহরে মেয়েরা নানা ভাবে এম্পাওয়ার্ড হবার সুযোগ পায়। পরিবারে বা হস্টেলে যেখানেই থাকুক তারা নানা বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। কিন্তু গ্রামে বা মফস্বলে এই সুযোগ তুলনামুলক কম বা বলা যায় কোন সুযোগ নেই। সেক্ষেত্রে তারা যখন পড়াশুনা সুত্রে হস্টেলে আসে বাইরের বিশ্বের সঙ্গে, সমবয়সীদের সঙ্গে, পরিবারের বাইরে বৃহত জগতকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পায়। যা তার ব্যক্তিত্বের বিকাশে ও গঠনে বিশেষ ভুমিকা নেয়। আবাসজীবন তাকে প্রভাবিত করে অনেক বেশি। গ্রাম বা মফস্বল থেকে যখন শহরের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসে এবং হস্টেলে থাকে তখন ও পারিপার্শ্বের দ্বারা উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত হয় এবং নিজের অবস্থান সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়। স্বাধীনতার তাৎপর্য ও উপযোগিতা সম্বন্ধেও তাদের বক্তব্য ও উপলব্ধি আলাদা। ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রশ্নেও তাদের প্রতিক্রিয়া আলাদা। পারিবারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানের ভিন্নতা অনুযায়ী বদলে যাচ্ছে হস্টেল সম্পর্কে আবাসিকাদের মতামত এবং নির্ভরতা। হস্টেল জীবনের সুবিধা অসুবিধা বৈষম্যমুলক নিয়মের বিরুদ্ধে যে সব আন্দোলন তৈরী হয়েছে তার দাবী ও চাহিদাগুলি জরুরী এবং প্রাসঙ্গিক। কিন্তু এই দাবীগুলি সব স্তরের আবাসিক ছাত্রীদের প্রতিনিধিত্ব করে না।

শিক্ষাসূত্রে স্থানান্তর শিক্ষার একটি আবশ্যকীয় অঙ্গ হয়ে উঠেছে। মেট্রোসিটি, পাঁচতারা বিশ্ববিদ্যালয়, নাগরিক পরিষেবার কেন্দ্রীভবন উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলি হয়ে উঠেছে অনিবার্য যার ফলে 'নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্ম' হয় উচ্চশিক্ষার হাত ধরে এবং তারা আবশ্যিক ভাবে নাগরিক। জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রীকরণ এবং শহরমুখীতা এবং মধ্যবর্তী একটি ব্যবধান এই বিষয়টি ক্রমে অবয়ব পেয়েছে। (Kanagasabai, 2018)

উচ্চশিক্ষার জন্য ক্রম শহরমুখীতা এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক মূলধনের দিক থেকে, ভৌগোলিক ভাবে প্রান্তিক ছাত্রীরা যখন উচ্চশিক্ষার জন্য আসেন মেট্রোপলিটন সিটি তখন তাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় এই যাত্রা, যেখানে দুটি পরিসরের বাস্তবতা আলাদা। প্রান্তিক ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার অভিজ্ঞতা শ্রেণিকক্ষ এবং বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, শিক্ষাসূত্রে তারা যে সামাজিক পরিসরের মধ্য দিয়ে চলা ফেরা করেন, বাহ্যিক পরিসরগুলি তাদের আন্তঃস্তর বিন্যাসভিত্তিতে প্রভাবিত করে। পরিবার থেকে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে তারা শিক্ষালাভের জন্য শহরে আসেন, হস্টেলে থেকে পড়াশুনা করেন, এই পরিসর এবং যানবাহনের সুবিধা, একা যাতায়াতের পথে সমস্যা ইত্যদি তাদের প্রভাবিত করে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সব থেকে কম দূরত্বে ৫০ কিমি এবং সব থেকে বেশি দূরত্ব ৬৮০ কিমি। এবং সর্বাধিক পাঁচবার যানবাহন বদলে তাদের যাতায়াত করতে হয়। সর্বনিম্ন চার ঘন্টা এবং সর্বাধিক ২১ ঘন্টা সময় লাগে তাদের যাতায়াত করতে। একা যাতায়াতের পথে তাঁরা যে সব সমস্যার সম্মুখীন হন সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন। বাহ্যিক পরিসরের সঙ্গে ছাত্রীদের বা মেয়েদের যে সম্পর্ক এবং সমস্যা তা উন্মোচিত হয়েছে তাদের সাক্ষাৎকারে। বেণু হাসদা প্রতিবন্ধী ছাত্রী যিনি প্রান্তিক এবং প্রথম প্রজন্মের ছাত্রী। তাকে কেউ নিয়ে যায় বিশ্ববদ্যালয়ে কেউ নিয়ে আসে, একা সে কোথাও যেতে পারে না, সে শিশুকাল থেকেই হাঁটতে পারত না, তার দুই পায়ে চলচ্ছক্তি নেই। সে ঘরের মধ্যে খুব চেষ্টা করে এদিক ও দিক করতে পারে, কিন্তু একা সে বাইরে যেতে পারে না। তার ইচ্ছা হয় বাইরে ঘোরার, অনেক দূরে কোথাও ঘোরার, কিন্তু সুযোগ আসে নি বহুদিন। সে বিশ্ববিদ্যালয় এসে আপ্লুত হয়েছে এবং সে বলছে "আমি মাঝে মধ্যে ভাবি আমাকে যদি কেউ অনেক দূরে নিয়ে যেত, অনেক দূর জার্নি করতাম। তাহলে কত ভাল হত। আবার ভাবতাম আমি আর কি করে যাব এগুলো ভেবে আর লাভ নেই"[৩১] তারপর ডিপার্টমেন্ট থেকে তাকে দিল্লীতে একটা কনভেনশনে দুদিনের জন্য দিল্লী পাঠানো হয়। সেটাই হল তার প্রথম বাইরে যাওয়া ২০১৪ সালে। তার সাথে গেছিলেন হস্টেলের ওয়ার্ডেন। সেখানে তার আরো প্রতিবন্ধী মেয়েদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ওখানে কি সুন্দর থাকা খাওয়া। গরম জলে স্নান। হোটেল। ওখানে ডিসেবলড়া সবাই গেছিল। যিনি ইন্ডিয়া গেট দেখেছে সে সেখানে, মাথার ওপর দিয়ে প্লেন উড়ে যেতে দেখেছে। সে জানায়, "চাকরি পেলে আমি ঘুরতে যাব। এই জন্য আমি বলি স্বপ্ন দেখতে শেখো। স্বপ্ন দেখলে একদিন তা পূরণ হবে। আমি মনে মনে ভাবতাম কোথাও যদি বাইরে যেতে পারি। কিন্তু যেতে তো পারলাম শেষ পর্যন্ত। ছোটবেলায় আমি ভেবেছিলাম আমি কলেজে পড়ব। আমি কি পড়তে পারব? তারপর আমি পেয়ে গেলাম বিশ্বভারতীতে চান্স। আমি বোলপুর গেছি। দেখতাম ইউনিভার্সিটিটা। দেখতাম আর মনে হত এখানে বড় বড় লোকের

---

৩১ অংশগ্রহণকারী বি. বি ৩, বেণু হাসদা, সাক্ষাৎকার, স্থান-শান্তিনিকেতন।

ছেলে মেয়েরা পড়ে। এখানে কি আমি পড়তে পারব? আমি তো স্বপ্নেও যেতে পারব না। তো তারপর আমার স্বপ্নটা পূরণ হয়ে গেল"[৩২]

মানচিত্র- ৪ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশগ্রহণকারীদের উচ্চশিক্ষাসূত্রে স্থানান্তর চিহ্নিত হল। মানচিত্র- ৫ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশগ্রহণকারীদের উচ্চশিক্ষাসূত্রে স্থানান্তর চিহ্নিত হল।

যানবাহনের অপ্রতুলতা, বাহ্যিক পরিসরের ভয়াবহতা এবং একা যাতায়াতের অভিজ্ঞতা এবং বিশেষ ঘটনা ও তাঁরা বলেছেন। জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রীকরণের ফলে ক্রমে শহর মুখী হয়ে উঠেছে শিক্ষার জন্য স্থানান্তর। শিক্ষাসূত্রে স্থানান্তরের জন্য ছাত্রীদের বাহ্যিক পরিসরের প্রত্যক্ষ সংস্পর্ষে আসতে হয়। প্রতিনিয়ত এই ইন্টারঅ্যাকশনের মাধ্যমে কি ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন তারা হয় সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে সে বিষয়ে তাদের বয়ান। শিল্পা ফাডকে মুম্বাই এর পটভূমিতে দেখেছেন বাহ্যিক পরিসরের সঙ্গে মেয়েদের সম্বন্ধ। রাস্তায়, যানবাহনে কিভাবে তারা সমঝোতা করেন। উনি দেখেছেন মুম্বাই এর রাস্তায় মেয়েদের চলাফেরার ক্ষেত্রে সমস্যা এবং প্রতিকূলতা। কিভাবে মেয়েদের বাইরে চলা ফেরা সমাজের দৃষ্টিতে শোভন ঠেকে না। (Phadke, 2011) প্রথমত শিক্ষাসূত্রে পরিবারের সহায়তায় অথবা অসহায়তায় অচেনা একটি শহরে পাড়ি দিচ্ছেন। বাড়ি থেকে বাহ্যিক পরিসরে যাবার জন্য কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন তারা হন, বাহ্যিক পরিসরে কি ধরনের সমস্যার মুখোমুখি তাদের হতে হয় এবং এই পরিসর কিভাবে তাদের বদলে দেয়, উচ্চশিক্ষাসূত্রে

৩২ অংশগ্রহণকারী বি. বি ৩, বেণু হাসদা, সাক্ষাৎকার, স্থান-শান্তিনিকেতন।

তাদের এই স্থানান্তর তাদের গতিশীলতার অভিজ্ঞতা দিয়েছে ছাত্রছাত্রীদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এই বিষয়গুলি আলোচিত হল।

তাদের ব্যক্তি অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে এই স্থানান্তর তাদের যেমন দিয়েছে মুক্তির আনন্দ তেমনি বাহ্যিক পরিসর তাদেরকে কিছু অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করেছে। উচ্চশিক্ষাসূত্রে তারা বাইরের জগতটা দেখতে পায় নিজের মত করে, এই নতুন ভূমিকায় এই নতুন ভাবে তাদের পাবলিক স্পেস কিভাবে তাদের দেখছে বা তাদের সঙ্গে ব্যবহার করছে কি রকম তার ভিত্তিতে তাদের অভিজ্ঞতা নির্মিত হয়। যে মেয়েটি দাদা বাবা অথবা মা পরিবৃত হয়ে বাইরের স্পেস দেখেছে, যানবাহনে নিজেকে নিরাপদ রেখেছে সে উচ্চশিক্ষাসূত্রে নিজে বাইরের জগতটা দেখছে এবং বাইরের জগতের মুখোমুখি হচ্ছে। এই নবনির্মিত আত্ম, এই সাহস, এই আনন্দ এবং একই সঙ্গে লড়াই উচ্চশিক্ষাসূত্রে প্রাপ্ত বাস্তবতা—এইভাবে একজন গৃহপালিত মেয়ে হয়ে ওঠেন একজন ছাত্রী, একজন গবেষক, একজন আবাসিকা। আত্ম পরিচিতির এই নতুন মাত্রাগুলি তার সঙ্গে যুক্ত হয়। এবং আত্ম পরিচিতির বোধ ক্রমে রূপান্তরিত হতে হতে গড়ে তোলে একটি তৃতীয় মাত্রা। সুধা বীরভূমের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। হস্টেলে থেকে। তারপর উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণার জন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গেছেন, পরীক্ষা দিতে, ভর্তি হতে তাকে একাই যেতে হত। সম্পূর্ণ নতুন একটা শহরে সে একা গেছে এবং কাজ করেছে। তার কথায়, "এখন আমি স্কলার, স্কলারশিপ পাই। আগের দিনগুলো পেরিয়ে গেছে বলে কথা গুলো এত সহজে বলতে পারছি। সময়গুলোক খুবই ভয়ঙ্কর ছিল। একা ভোর বেলা ট্রেন ধরে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি, ভয় লাগত, অসহায় লাগত, গাড়ি করার টাকা ছিল না। আবার অনেক রাতে ফিরছি। দিনগুলো পেরিয়ে গেছে, এখন আর ভয় তেমন লাগে না। শিখেছি এইসব থেকে"[৩৩]। তিনি আরো বলছেন, "ট্রমা গুলো থেকে যায়, গল্প হিসাবে বলছি এখন, কিন্তু মনের মধ্যে সেইসব অপরিসীম দুর্ভোগের স্মৃতি ভয়ানক দাগ কেটে রেখে দেয়"[৩৪] যানবাহনে অনেকেই যৌন হেনস্থার স্বীকার। যাতায়াতের পথে ভীড় বাসে, ভীড় ট্রেনে তাদের যৌনাঙ্গে অযাচিত স্পর্শ করা হয়েছে। উচ্চশিক্ষাসূত্রে এই স্থানান্তর মেয়েটিকে বদলে দেয়, রূপান্তরিত করে এবং ক্রমে তার মধ্যে একটি নবনির্মিত আত্মের জন্ম দেয়। ব্যক্তিগত ইচ্ছা এবং আকাঙ্ক্ষার সূক্ষ্ম সন্তুষ্টি তাকে ব্যক্তি হিসাবে বদলে দেয়, আনন্দিত করে। বেণু হাসদা প্রতিবন্ধী, সে যখন বিশ্ববদ্যালয়ে আসে এবং উচ্চশিক্ষাসূত্রে ট্রেনে চড়ে দিল্লী যাবার সুযোগ পায় তার আজীবনের একটি আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়ে যায়। উচ্চশিক্ষা তাকে শুধু ডিগ্রী দেয় নি, দিয়েছে একপ্রকারের মুক্তির স্বাদ।

বাকীদের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে তারা বাইরে বেরিয়ে বিভিন্ন জায়গা যেতে পারা, গবেষণার জন্য ক্ষেত্রসমীক্ষা সূত্রে বিভিন্ন জায়গা ঘুরতে পারা, সেমিনার, কনফারেন্সে দেশ বিদেশে যেতে পারা এবং 'কাজ'

---

[৩৩] অংশগ্রহণকারী যা. বি ১১, সুধা মাল, সাক্ষাৎকার, স্থান-যাদবপুর।

[৩৪] অংশগ্রহণকারী যা. বি ১১, সুধা মাল, সাক্ষাৎকার, স্থান-যাদবপুর।

এর সূত্রে বিভিন্ন মানুষজনের সঙ্গে কথা বলা, পরিচিত হবার মধ্যে নিজেকে চিনতে পারে, খুশি হয়, তার আত্মবোধ রূপান্তরিত হতে হতে যায়। উচ্চশিক্ষা তাকে এই অবকাশগুলো তৈরি করে দিয়েছে। উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে সে ডিগ্রী পেয়েছে এবং বার্তি হিসাবে পেয়েছে গতিশীলতার মুক্তি যা তাকে ব্যক্তি হিসাবে উন্নত করেছে, অকুতোভয় করেছে। অংশগ্রহণকারীদের সাক্ষাৎকার থেকে উঠে এসেছে তাদের অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধি। অন্যদিকে এই বাহ্যিক পরিসরে তাদের শুধুমাত্র ভালো অভিজ্ঞতা হয়েছে তা নয়। এই পরিসরের মধ্যেস্থ পুরুষতন্ত্র, ম্যাসকুলিনিটি তাদের ছেড়ে কথা বলে নি। তাদের অগণিত অভিজ্ঞতা হয়েছে অপ্রীতিকর। যেখানে লিঙ্গ বৈষম্য, জাতি ও শ্রেণি বৈষম্যের স্বীকার হয়েছেন তারা। ইভ টিজিং, যৌন হেনস্থা, ভাষিক হেনস্থা, স্টকিং, বিশ্রী দৃষ্টিসংস্কার, ইত্যাদির সম্মুখীন হয়েছেন। প্রত্যেকের রয়েছে এই অভিজ্ঞতা। টিনা জানাচ্ছেন,

> লেডিসে সীট না পেলে দুর্ভোগ বাড়ে আসলে, বাড়ি থেকে ফিরছি বা বাড়ী যাচ্ছি, আমার ততদূরে বাড়ি নয় যে রিজার্ভেশন করে যাব বা টাকাও লাগে বেশি রিজার্ভেশনে। এমনি গেলে কম টাকায় হয়ে যায়। ভীড় ট্রেনে বহুবার সে যৌন হেনস্থার সম্মুখীন হয়েছি, প্রচন্ড রাগ হয়, ঘৃণা লাগে কিন্তু কিছু করার থাকে না সেই সব সময় গুলোতে[৩৫]।

এই অভিজ্ঞতা বিভিন্ন সময় আত্ম বিশ্বাস ভেঙেছে, দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছে তাদের আত্ম মর্যাদাবোধ, তারা ভয় পেয়েছে, সাহস হারিয়ে হাল ছেড়ে দেবার কথা ভেবেছে। তারপর শক্তি সঞ্চয় করে আবার লড়াই করেছে। ফিরে পেয়েছে হৃত আত্মবিশ্বাস, মর্যাদা বোধ এবং সাহস। ইউমীর যাত্রাপথ। দার্জিলিং থেকে কলকাতা। ৬৮০ কিলোমিটার। এই যাত্রাপথে তাকে কয়েকবার যানবাহন বদল করতে হয়। ইউমী জানায় দীর্ঘ পথ তাকে ট্রেনে আসতে হয়। সে রিজার্ভেশনে আসে। কিন্তু একটা ভয় তার থাকে। রাতে বা ভোরের দিকে ট্রেন থেকে নামলে সে স্টেশনে বসে অপেক্ষা করে সকাল হবার। তারপর গন্তব্যে যায়। ঘটনাক্রম তাদের ব্যক্তিত্ব, সত্তাকে ভেঙ্গে চুরে দিয়েছে আবার নির্মাণ করেছে।

সুধা মাল বাহ্যিক পরিসরে হেনস্থা নিয়ে থানায় গেছে, পুলিশকে জানিয়েছে। কয়েকটি যুবক তার পিছু নিয়েছিল কয়েকমাস ধরে। বিশ্ববিদ্যালয় যাওয়া কিম্বা আসার পথে তাকে ক্রমাগত উত্যক্ত করে গেছে। সে সাহস করে থানায় জানিয়েছে। সে ভয় পেয়েছিল শুরুতে তারপর বাড়িতে জানায়, ছেলেগুলি অত্যন্ত দূর্বৃত্ত হবার ফলে পরিবার থেকে পদক্ষেপ নিতে ভয় পায়। সুধা ক্রমাগত ভয় পেতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত থানায় জানায়। থানা থেকে ব্যবস্থা নেয় নি কিন্তু তার থানা যাওয়া এবং অভিযোগ জানানোতে পিছু নেওয়া বন্ধ করেছে ছেলেগুলি।

---

[৩৫] অংশগ্রহণকারী বি. বি ৪, টিনা দাস, সাক্ষাৎকার, স্থান-শান্তিনিকেতন।

মানচিত্র - ৬ সুধা মাল শিক্ষাসূত্রে স্থানান্তর।
বীরভূমের প্রান্তিক গ্রাম থেকে বিশ্বভারতী, তারপর যাদবপুর।

মানচিত্র - ৭ ইউমী দর্জির শিক্ষাসূত্রে স্থানান্তর।
দার্জিলিং থেকে মুর্শিদাবাদ, তারপর যাদবপুর।

রিনি জানাচ্ছেন, তিনি বাসে বা ট্রেনে একা যাতায়াতে অভ্যস্ত ছিলেন না। ধীরে ধীরে অভ্যেস করতে হয়েছে কারণ বাড়ীর লোকজনের সময় সব সময় হয় না। রিনি মুর্মু জানাচ্ছেন, যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কথা। তিনি যখন বিশ্বভারতীতে ভর্তি হবার কথা ভাবেন, তখন যোগাযোগের অসুবিধা ছিল প্রথামিক অন্তরায়। ট্রেনে সে পুরুলিয়া শহর থেকে আসতে পারবে। কিন্তু গ্রাম থেকে স্টেশন অবধি আসার জন্য যানবাহন ঠিকঠাক নেই। নিজস্ব গাড়ী ভাড়া করার মত টাকা নেই। একা আসা যাওয়া সমস্যা। ঘরের লোকজনের সঙ্গে এলে দুজনের ভাড়া লাগে। এই সব যাবতীয় সমস্যার সম্মুখীন সে হয়েছে। এই ভাবে দেখা যাচ্ছে শিক্ষাসূত্রে স্থানান্তরের ফলে একদিকে ছাত্রীদের গতিশীলতার পরিধি বাড়ছে, অন্যদিকে সংকট বাড়ে পাশাপাশি।

কেয়া দাস জানাচ্ছেন তার বাবা মারা যাবার পর তার বাড়িতে এমন কেউ নেই যে তাকে নিয়ে যাওয়া নিয়ে আসার কাজ গুলো করতে পারে। সে নিজেই যাতায়াত করতে শিখেছে। টিনা দাস বলছেন,

> আমার একটা ঘটনা মনে পড়ে – আমরা ম্যাপে দেখছিলাম কার বাড়ি কোথায়, আমার বাড়ি গ্রামে, তখন সবাই বলল তোর বাড়ি তো সব গাছেই ঢাকা। আমি কিন্তু বলতে একটু সংকোচ বোধ করতাম কোথা থেকে এসেছি কিন্তু সেটা বড় হবার সাথে সাথে চলে গেছে। অন্যদের কথা জানি না। বিশ্বভারতীতে অনেকজন রয়েছে গ্রাম থেকে, তাই এখানে ইনসাল্ট কেউ কাউকে করে না।

খুব কম জনই আছে যারা শহর থেকে পড়তে এখানে এসেছে। ফলে ঐ ব্যাপারটা এখানে ছিলনা তেমন। তখন ছোট ছিলাম তো নিজের একটা মনে হত সেখান থেকে।[৩৬]

যে পরিস্থিতিতে  তারা বড় হয়, সেইসব থেকে বহু দূরে বিশ্ববিদ্যালয় পরিসর। তারা এক ধরণের বেখাপ অবস্থার মধ্যে তারা পড়ে তার কারণ বিশ্ববিদ্যালয় পরিকাঠামো, পাঠক্রম কোনো কিছুই তাদের পরিচিত দুনিয়ার মত  নির্মিত নয়। তারা জানাচ্ছেন তাঁদের বিচ্ছিন্নতাবোধের কথা। তারা জানাচ্ছেন বাড়ি থেকে প্রথম বাইরে এসে বাড়ির সঙ্গে যে অ্যাটাচমেন্টটা ছিল সেটা ধীরে ধীরে বদলে গেল। এখানে ইউনিভার্সিটি তে ফ্রেণ্ডসারকেলটা বেশ ভাল গল্প করা আড্ডা দেওয়ার জন্য। এখানে টীচারদের সাপোর্ট অনেক বেশি  এবং টীচার স্টুডেন্টের ইন্টারএকশন ভাল।

মানচিত্র – ৮ টিনা দাসের যাত্রাপথ। হুগলি থেকে বিশ্বভারতী। মানচিত্র – ৯ রিনির স্থানান্তরের যাত্রাপথ। পুরুলিয়া থেকে বিশ্বভারতী।

**প্রতিষ্ঠান ও পরিসর হিসাবে হস্টেল এবং প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক ছাত্রীদের সংযুক্তি**

নবনির্মিত প্রতিষ্ঠান কাঠামোর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলগুলির অবস্থান নির্ণয় করা যায়। এই প্রতিষ্ঠানে আবাসিক এবং প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের সম্বন্ধ পারস্পরিক। অন্তত পিঞ্জড়া তোড়ের মত আন্দোলন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ার পর এই পারস্পরিক সম্পর্কের বয়ান অনেক স্থিতাবস্থা কাটিয়ে উঠেছে। হস্টেলে প্রযুক্ত নিয়ম, যে কোনো বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থ, ইচ্ছা ব্যাতিরেকে একক সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয় না। ভারতীয় পটভূমিতে পিঞ্জড়া তোড় আন্দোলন এই পারস্পরিকতার সম্বন্ধকে অনেকখানি মুক্ত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা নিয়েছে। নবনির্মিত প্রতিষ্ঠানে (Scott, 2011) আবাসিকদের নবনির্মিত আত্মবোধ (Shreeya, 2018)

[৩৬] অংশগ্রহণকারী বি. বি ৪, টিনা দাস, সাক্ষাৎকার, স্থান-শান্তিনিকেতন।

ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার অভিজ্ঞতাকে ভিন্ন অবয়ব দিয়েছে। সংযুক্তির যে কয়েকটি ধ্রুবকের কথা বলছেন নীরা যুভাল ডেভিস (Devis, 2011; Arunima, 2017) যার ভিত্তিতে ব্যক্তির আত্ম পরিচিতির বোধ গড়ে ওঠে। পরিবারে, নিজস্ব সমাজের সদস্য থেকে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার্থে এসে হস্টেলে আবাসিক হিসাবে বসবাস— এই যাত্রাপথে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রান্তিক ছাত্রীদের যে সম্বন্ধ তৈরি হয় এবং আত্মবোধ যেভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে, আত্মপরিচিতি নির্মিত হয় এই আলোচনায় বিশ্লেষিত হয়েছে। পরিবার, বিশ্ববিদ্যালয়, হস্টেল এই তিনটি পরিসর উচ্চশিক্ষায় প্রান্তিক ছাত্রীদের ক্ষেত্রে পরস্পর সম্পর্কিত। এই প্রতিষ্ঠন গুলির সঙ্গে ছাত্রীদের বিদ্যমান ক্ষমতা সম্পর্ক, স্বাধীনতার মাত্রা এবং পরিসর বদল এবং আত্মপরিচিতি নির্মাণের ক্ষেত্রে সংযুক্তির বিষয়গুলি বদল— এই প্রেক্ষিতে মূলত একজন প্রান্তিক, প্রথম প্রজন্মের ছাত্রীর উচ্চশিক্ষার যাত্রা আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। আবাস জীবন বেশ কয়েকটি কারণে বিকল্প হিসাবে সম্ভবনা তৈরি করেছে। বিদ্যমান ক্ষমতা সম্পর্কের বাইরে হস্টেল কর্তৃপক্ষের আওতার মধ্যে থেকেও মেয়েদের জন্য স্বাধীন পরিসর। এবং এই পরিসরের রয়েছে বিকল্প হয়ে উঠবার অবকাশ। চলমান হস্টেলকেন্দ্রিক আন্দোলনগুলি সেই ইঙ্গিত দেয়। পরিবারের সঙ্গে নারীদের ক্রম পরিবর্তনশীল সম্পর্ক, উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে মেয়েদের অংশ গ্রহণ এবং হস্টেলকেন্দ্র করে সর্বভারতব্যাপী আন্দোলন 'শিক্ষিত', 'আবাসিক' মেয়েদের জন্য আরেকটি 'বিকল্প' পরিসরের জন্ম দিয়ে চলেছে। পরিবারের ও হস্টেল একই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর অন্তর্গত দুটি প্রতিষ্ঠান। তারপরও দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য আছে। হস্টেলে সমবয়সী বা প্রায় সমবয়সীদের সঙ্গে বেড়ে ওঠে ছেলেমেয়েরা। আমার আলোচ্য মেয়েদের হস্টেল। আলোচনার জন্য মেয়েদের হস্টেল বেছে নেবার কারণ হল, সমাজের সর্বত্র মেয়েরা অবদমিত। হস্টেলও মেয়েদের জন্য কি ধরনের সুযোগ সুবিধা ও বৈষম্য আয়োজন করে তার একটি ছবি তুলে ধরা আমার উদ্দেশ্য। হস্টেলের নিয়মতান্ত্রিকতা ছাত্রীদের বিশেষ এক ধরনের জীবন যাপনে অভ্যস্ত করে তোলে। পড়াশুনার সুত্রে বিভিন্ন স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে মেয়েরা আসে। কিন্তু ধীরে ধীরে নিছক পড়াশুনা করার জায়গার থেকেও হস্টেল আরো বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। কখনো আশ্রয়, কখনো আত্মআবিষ্কারের মুক্তাঞ্চল। যা ছাত্রীদের দৃষ্টিভঙ্গি মানসভূমি নির্মাণে বিশেষ ভুমিকা নেয়। হস্টেল জীবনের প্রভাব থেকে যায় সারজীবন। পরিবারের দৈনন্দিন বেঁচে থাকার বিকল্প হিসাবে দেখা দেয় হস্টেলজীবনকে। ভিন্ন ধর্ম ভিন্ন জাতি ভিন্ন সংস্কৃতির পরিবার থেকে মেয়েরা হস্টেলে আসে, একসাথে থাকে। তারা জানাচ্ছেন বিভিন্ন অসুবিধা নানা পরিষেবার অভাব সত্ত্বেও তারা বাড়ির তুলনায় হস্টেলে থাকতে পছন্দ করেন। প্রত্যেকের হস্টেলে থাকতে পছন্দ করার কারণগুলো আলাদা। পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থা, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ ইত্যাদির ভিত্তিতে ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে কারণ।

অংশগ্রহণকারীরা প্রত্যেকেই জানাচ্ছে হস্টেলে তারা অনেক বেশী স্বাধীনতা পেয়েছে। বাড়িতে কি ধরণের পরাধীনতা তাদের ভোগ করতে হত সে সম্পর্কে অনেকের ধারণা সুস্পষ্ট নয়। তবে তারা এটুকু

বুঝতে পারে যে  হস্টেলে এসে তারা স্বাধীনতাটা বিশেষ ভাবে অনুভব করতে পারে। বাড়িতে সব কাজের জন্য কৈফিয়ত দিতে হয়, সব সময় উপযুক্ত কারণে নয়, অধিকাংশ সময়ই অকারণে। যাদবপুরের এক আবাসিক ছাত্রী কেয়ার মতে "প্রতিদিনের জীবনে যা করতে চাই তা অন্যের জন্য ক্ষতিকর না হলে, কারো কাছে জবাবদিহি করবো না, আমি স্বাধীনতা বলতে এটাই বুঝি, অনেকের কাছে এটা উগ্রতা মনে হলেও হস্টেলে আমি এই স্বাধীনতা পেয়েছি। কিন্তু বাড়িতে দেখেছি প্রতি পদক্ষেপ মাপা হয়, প্রশ্ন করা হয়।"[৩৭] বিশ্বভারতীর আবাসিক গবেষক সুধা তার দীর্ঘ আঠেরো বছরের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে জানাচ্ছেন, "বাড়িতে একটা অসম্ভব শাসনে থাকতাম আমি।সেখান থেকে যখন শান্তিনিকেতনের পাঠভবনের বাচ্চাদের হস্টেল সন্তোষালয়ে এলাম ক্লাস থ্রীতে, একটা বাঁধ ভাঙা স্বাধীনতার স্বাদ পেলাম।"[৩৮] বিশ্বভারতীর হস্টেলগুলোর এ বিষয়ে কিছু বিশেষত্ব রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ প্রথাগত শিক্ষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে এমন একটি শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যেখানে ছেলেমেয়েরা আনন্দের সঙ্গে প্রকৃতির কাছাকাছি থেকে পড়াশুনা করবে, শুধু পড়াশুনা নয়, রবীন্দ্রনাথ ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিত্বের ও প্রতিভার সার্বিক বিকাশ চেয়েছিলেন। নিয়মতান্ত্রিকতার প্রতি তাঁর কোন আস্থা ছিল না, বিধিনিষেধের বাইরে স্বতঃস্ফূর্ত শিক্ষাব্যবস্থা বিশ্বভারতীতে গড়ে তোলা হয়েছিল। তাই এখানে হস্টেলগুলো জেলখানার আদলে তৈরী নয়। অনেক জায়গা জুড়ে হস্টেল গুলো বানানো, উঠোন আছে, হস্টেলের ভিতরে অনেক গাছ, বসা বা পড়াশুনা করার জন্য বেদী আছে। একই ভাবে মেয়েদের হস্টেল গুলোও পর্যাপ্ত পরিসর নিয়ে নির্মিত। আবাসিকাদের কখনো মনে হয় না তারা আবদ্ধ অবস্থায় আছে। শান্তিনিকেতনের আদর্শের মধ্যে যেহেতু খুব বেশি শৃঙ্খলা বা নিষেধের বেড়াজাল নেই তাই এখানকার  মেয়েদের হস্টেলের ওপর তার কিছু প্রভাব আছে। তবে পুরোপুরি শৃঙ্খলা মুক্ত তা বলা যাবে না। হস্টেলে নির্দিষ্ট সময়ে ফিরতে হয়। কর্তৃপক্ষ ও ওয়ার্ডেন কিছু নিয়মের মধ্যে মেয়েদের রাখে। রবীন্দ্রমতাদর্শ অনুযায়ী যথার্থ স্বাধীনতা ও মুক্ত পরিবেশে শিক্ষা লাভের সুযোগ পায় ছেলেরা। মেয়েদের জন্য সে সুযোগ কিছুটা সংকুচিত। তবে অন্যান্য হস্টেলের তুলনায় পরিবেশগত দিক থেকে কিছুটা আলাদা, নিয়ম কানুনের দিক থেকে তেমন পার্থক্য নেই। তার কথায়, "হস্টেলেও খাবার বা ঘুমাবার নির্দিষ্ট সময় ছিল কিন্তু সবার সঙ্গে একসাথে কাজ গুলো করতাম তাই কখনো বোঝা মনে হয় নি।"[৩৯]

হস্টেলে মেয়েরা যে স্বাধীনতা পায় তার আসলে ব্যক্তিস্বাধীনতা, হস্টেলেও  প্রত্যেক আবাসিকাকে বেষ্টন করে থাকে নিয়মের বেড়াজাল কিন্তু তার ভিতরের অবকাশগুলো স্বাধীনতার বোধ তৈরী করে। সামগ্রিক ভাবে কিছু নিয়ম থাকলেও প্রতিটা দিন প্রতিটা মুহুর্তে আবাসিকাদের মনে হয় না তারা নিয়ন্ত্রিত

---

[৩৭] অংশগ্রহণকারী যা.বি ১০, কেয়া দাস, সাক্ষাৎকার, স্থান—যাদবপুর।

[৩৮] অংশগ্রহণকারী যা.বি ১১, সুধা মাল, সাক্ষাৎকার, স্থান—যাদবপুর।

[৩৯] অংশগ্রহণকারী যা.বি ১১, সুধা মাল, সাক্ষাৎকার, স্থান—যাদবপুর।

হচ্ছে। একজন শিশুর কাছে এই দৈনন্দিন স্বাধীনতা অপরিমিত আনন্দ আনে। হস্টেলে স্বাধীনতার বয়ানটা বদলে যায়। নতুন ধরণের নিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতার মিশ্র অনুভূতির মধ্যে মেয়েরা বড় হতে থাকে। নানা নিয়ম প্রয়োগ করে বাইরের জগত থেকে হস্টেলকে সুরক্ষিত করা হয় এবং হস্টেলের মধ্যেও নিয়ম প্রয়োগ করে পরস্পরের এক্তিয়ার ও কি করা যাবে বা যাবে না এ সম্পর্কে সীমা শেখানো হয়, এইসবের মধ্যেও শান্তিনিকেতনের ছাত্রী টিনার মতে "এই হস্টেলের চৌহদ্দীর ভিতরেই নিজের মত করে স্বাধীনতার মুহুর্ত তৈরী করে নিতে পারি।"[৪০] হেম বিশ্বভারতীর বিভিন্ন হস্টেলে প্রায় পনের বছর ধরে আছে। হস্টেলে এসে স্বাধীনতা সম্বন্ধে তার একটি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি তৈরী হয়েছে। তার বক্তব্য "স্বাধীনতা বলতে আমি বুঝি সারাদিন কি ধরনের অ্যাক্টিভটির মধ্যে নিজেকে রাখতে চাইছি, সেটা আমি পারছি কি না তাকেই বুঝি স্বাধীনতা। হস্টেলে পুরোটাই স্বেচ্ছাধীন আর পরিবারে সবই অনুমতি সাপেক্ষ, শর্তাধীন, একটা বয়সের পর মেয়েদের যে ধরণের স্বাধীনতা পাওয়া উচিত তা পরিবার অনেক ক্ষেত্রেই দেয় না।"[৪১] নিয়ন্ত্রণ বা অবদমন বলতে সাধারণত বিশেষ কিছু বিষয়ের কথা বলা হয় যেগুলো সমাজে অবদমন হিসাবে সমাজে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে, এবং প্রামাণ্য, সর্বজনস্বীকৃত। এখানে ছোট ছোট আপাত তুচ্ছ রোজদিনের বিষয় এবং ব্যক্তির সমস্যাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এইসব দৈনন্দিন খুব সূক্ষ্ম সমস্যাগুলিই মানুষের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। বিশেষত মেয়দের প্রতিদিনের জীবনের ছোটখাট অবদমনগুলোও তাদের ওপর আরোপিত নিয়ন্ত্রণগুলি বড় ইস্যুর আড়ালে চাপা পড়ে যায়। প্রতিবাদযোগ্য বিষয় হিসাবে অবয়ব পায় না। এই সব দৈনন্দিন নিয়ন্ত্রণ ও অবদমন থেকে মুক্ত থাকে হস্টেল। সেখানে প্রতিটি মুহুর্তের প্রতিটি কার্যকলাপের হিসাবনিকাশের ওপর কারোর নজরদারি থাকে না। সুধা হস্টেলে আছে প্রায় দশ বছর, পরিবার ও হস্টেলের মধ্যে স্বাধীনতার বৈসাদৃশ্য সম্পর্কে তার পর্যবেক্ষণ-

> আমাদের সঙ্গে যে ডে স্কলার ছাত্রীরা পড়ে, তারা বাড়িতে আমাদের মত স্বাধীনতা পায় না, কাছাকাছি ঘুরতে বা সিনেমা দেখতে যাবার জন্য বাড়ির পারমিশন লাগে তাদের, বছরে একবার যে শিক্ষামুলক ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেখানেও দেখেছি হস্টেলের ছেলেমেয়েরা বেশি সংখ্যায় যায়, মাত্র দু চার জন মেয়ে যায় বাকীদের বাড়ি থেকে যাবার পারমিশন দেওয়া হয় না, আমরা এই শিক্ষাভ্রমণে যাবার জন্য বাড়ি থেকেই টাকা নিই কিন্তু আমাদের মানে হস্টেলের মেয়েদের একটা জোর আছে এটা বলার যে যাবই, পরিবারের টাকা পয়সার অসুবিধা থাকলে অন্য ব্যাপার। বাড়িতে বড় হওয়া বড়লোক বা স্বচ্ছল পরিবারের মেয়েরাও যেত না, তারা আবার বাড়ির সঙ্গে বেড়াতে

[৪০] অংশগ্রহণকারী বি.বি ৪, টিনা দাস, সাক্ষাৎকার, স্থান—শান্তিনিকেতন।

[৪১] অংশগ্রহণকারী বি.বি ৫, হেম চন্দ, সাক্ষাৎকার, স্থান—শান্তিনিকেতন।

যেত। বন্ধু আর শিক্ষকদের সঙ্গে ঘুরতে যাওয়ায় নিরাপত্তা নেই এই অজুহাতে তাদের যেতে দেওয়া হয় না।[৪২]

যারা বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করছেন তারা প্রথমত, তারা হস্টেলের মেয়েদের মত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা করে। দ্বিতীয়ত, তারা হস্টেলের মেয়েদের ঈর্ষা করে, তাদের তুলনামুলক স্বাধীন জীবনকে কটাক্ষ করে, তাদের চারিত্রিক শুদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে, নানা ধরণের কটূ মন্তব্য করে থাকে। হস্টেল সমাজের বাইরে নয় সেখানেও বেশকিছু নিয়মশৃঙ্খলা রয়েছে। পরিবারের মত পরিচর্যা নেই। নানা বস্তুগত অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও অংশগ্রহণকারীরা প্রত্যেকেই মনে করেন হস্টেলেই তারা মানসিক স্বাধীনতা পেয়েছে। পরিবার ও হস্টেল দুটিই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্গত। তাই নারীর কাঙ্খিত সার্বিক স্বাধীনতা এই কাঠামোর মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয়। এই কাঠামোর মধ্যে অপেক্ষাকৃত বেশি স্বাধীনতা প্রাপ্তি ও প্রয়োগ সম্বন্ধে বড়জোর আলোচনা করা যায়।

হস্টেলে আসার পর নিজের সমস্ত কাজ নিজেকেই করতে হয়। বাড়িতে থাকলে পরিবারের সদস্যদের সাহচর্যে সাহায্যে বেড়ে ওঠার অবকাশ নেই। নিজের সমস্ত কাজ নিজে করার দীর্ঘদিনের  অভ্যেস ছাত্রীদের স্বনির্ভর করে তোলে। এই স্বনির্ভরতা শুধুমাত্র কাজকর্মের ক্ষেত্রে নয়, মানসিক ভাবেও তারা হয়ে ওঠে স্বাবলম্বী। শান্তিনিকতনের হস্টেলে দায়িত্বপ্রাপ্ত দূর্গাদি নিজের অভিজ্ঞতা এবং পর্যবেক্ষণের সূত্রে জানান—"হস্টেলের বাচ্চা নিজের সমস্যার শুরুতেই কাউকে বলে না, নিজে আপ্রাণ চেষ্টা করে সমাধান করার, একান্তই সম্ভব না হলে কর্তৃপক্ষকে বা বাড়িতে জানায়, এখানে যেমন অন্তর্মূখী হবার সম্ভবনা থাকে তেমনি উল্টোদিকে হয়ে ওঠে আবেগগত দিক থেকে স্বাবলম্বী।"[৪৩] হস্টেলে কিছু বাহ্যিক পরিষেবা মিললেও পরিবারের মত সুযোগ সুবিধা থাকে না  খাওয়ার, ঘুমাবার ক্ষেত্রে, সবাই একসাথে বড় হয়, আলাদা প্রতিজনের সুবিধা অসুবিধা খেয়াল করা হয় না। তাই নিজের সমস্ত কিছু নিজে সামলানোর প্রবণতা তৈরী হয়ে যায়। হস্টলে এলে স্বাবলম্বীতা বাড়ে, বাড়ির মানুষজন স্বাবলম্বী হতে পারে, কিন্তু হস্টেলে স্বাবলম্বী স্বনির্ভর হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না, হস্টেলে থাকতে হলে স্বাবলম্বী হতে বাধ্য হয়, সারাদিনের নিজের কাজ, সারাদিনের কতটা সময় পড়াশুনা বা অন্য কাজে ব্যয় করা হবে সবটা নিজেকে ভাবতে হয় ও করতে হয়। শান্তিনিকেতনে শৈশব থেকে হস্টেলে বড় হওয়া টিনার কথায় "আনন্দ দুঃখের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়াটাও স্বনির্ভরতার অংশ যেটা। আমার ক্ষেত্রে হস্টেলে এটা তৈরী হয়েছে। সারাজীবন কাজে লাগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে।"[৪৪] পাঠভবনের ছাত্রীনিবাসে দীর্ঘদিন দায়িত্ব প্রাপ্ত আছেন দূর্গাদি। তিনি প্রায় ত্রিশ বছর হস্টেলে দায়িত্বে থাকার অভিজ্ঞতা থেকে জানাচ্ছেন,

---

[৪২] অংশগ্রহণকারী যা.বি ১১, সুধা মাল, সাক্ষাৎকার, স্থান—যাদবপুর।

[৪৩] পাঠভবনর মেয়েদের হস্টেল মাধবীর দীর্ঘসময় দায়িত্বে ছিলেন দুর্গা চক্রবর্তী, সাক্ষাৎকার - শান্তিনিকেতন।

[৪৪] অংশগ্রহণকারী বি.বি ৪, টিনা দাস, সাক্ষাৎকার, স্থান—শান্তিনিকেতন।

> আমি দেখে অবাক হয়ে যাই স্কুল পিকনিকে হস্টেলের ছেলে মেয়েরা একসাথে পঁচিশ ত্রিশ জনের সার্ভ করছে, বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়ে সব, বাড়ির ছেলে মেয়েরা এই সব দায়িত্ব নিয়ে মোটেও করতে পারত না, হস্টেলের ছেলে মেয়েরা অনেক বেশী তৎপর। এতদিন ধরে দেখছি তো বাড়ির ছেলে মেয়েদের পঙ্গু করে রেখেছে বাবা-মা, তারা অনেক বেশি ছায়ার মধ্যে থাকে। আর হস্টেলের ছেলেমেয়েরা অনেক বেশি সক্রিয়”[৪৫]।

পাঠভবন শিক্ষক এবং ছাত্রাবাসের দায়িত্বপ্রাপ্ত পার্থ রায় জানাচ্ছেন, “হস্টেল আর বাড়িতে বড় হওয়া ছেলেমেয়েদের মধ্যে মৌলিক কিছু পার্থক্য থাকে, হস্টেলের ছেলেমেয়েরা একটা পর্যায়ের পর নিজেদের ভরসা করতে শেখে। একসাথে বড় হয় ফলে বন্ধুত্বকেও ভরসা করে, বহুদিন বাইরে থাকার ফলে বাড়ির সঙ্গে একটা মানসিক দুরত্ব তৈরী হয়। কিন্তু একসাথে কাজকরা একসাথে থাকার ফলে যে কোন পরিস্থিতি যে কোন সমস্যার সম্মুখীন হবার ক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাস আমি দেখেছি আবাসিক ছেলেমেয়েদের মধ্যে।”[৪৬] এছাড়াও তিনি ছেলেমেয়েদের বয়ঃসন্ধি সম্বন্ধে বলেছেন,

> সমবয়সীদের সাথে একত্রবাসে তারা খুব সহজে বয়ঃসন্ধিকালীন মানসিক দূর্যোগ কাটিয়ে উঠতে পারে। বাড়িতে অনেক সময় নিজের কথাগুলো বলার লোক পায় না বাচ্চারা বা ভয়ে লজ্জায় বলতে পারে না। সেদিক থেকে হস্টেলের ছেলেমেয়েরা অনেক সহজ পরিবেশ পায়। দুর্গাদি আবার আরো একটি দিক তুলে ধরলেন তাঁর বক্তব্যে-ছাত্রীরা অনেক সময় মনে করে আমরা মা বাবাকে ছেড়ে আছি, আমরা অনেক বড়, এরকম একটা ঔদ্ধত্য কাজ করে তাদের মধ্যে, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মাঝেমধ্যেই তুমুল ঝামেলা করে।[৪৭]

পরিবারের সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক আসলে তৈরী হয় নির্ভরতা থেকে। নিজের সম্পর্কে মেয়েরা যত বেশি হীনমন্যতা আর নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে, তত বেশি তাদের পরিবার নির্ভরতা বেড়ে যায়। সেই জায়গাগুলো যদি ধীরে ধীরে পূর্ণ হতে থাকে স্বাভাবিক ভাবেই পরিবারের সঙ্গে মানসিক দূরত্ব বা বিচ্ছিন্নতা তৈরী হবে। খুব ছোটবেলা থেকে বাবামার পাঠানো টাকায় পড়াশুনা করলেও, দৈনন্দিন কাজকর্মে ও মানসিক ভাবে স্বাবলম্বী হওয়ায়  আবাসিক ছাত্রছাত্রীরা অনেক বেশী পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। হস্টেলে এসে নিজের বিষয়ে নিজে সিদ্ধান্ত নিতে শেখে ছাত্রীরা, বাড়িতে থাকলে খুঁটিনাটি বিষয়ে নাক গলান বাড়ির সবাই, অন্যের সিদ্ধান্ত অনেক সময়ই চাপিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু হস্টেলে ছাত্রীদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতি মুহুর্তের খোঁজ যেহেতু বাড়ির লোক পান না তাই নিজের ব্যক্তিগত বিষয়ে নিজে সিদ্ধান্ত নেবার একটা অবকাশ তৈরী হয়।

---

[৪৫] পাঠভবনর মেয়েদের হস্টেল মাধবীর দীর্ঘসময় দায়িত্বে ছিলেন দুর্গা চক্রবর্তী। সাক্ষাতকার - শান্তিনিকেতন।

[৪৬] পাঠভবনের শিক্ষক পার্থদা, সাক্ষাতকার, শান্তিনিকেতন।

[৪৭] পাঠভবনের শিক্ষক পার্থদা, সাক্ষাতকার, শান্তিনিকেতন।

পোষাক খাবার প্রসাধন ইত্যাদি বিষয়ে নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এভাবে ধীরে ধীরে পরিণত মনস্ক হয়ে ওঠে।

পরিবারে ব্যক্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ বা ক্ষমতা প্রযুক্ত হয়, অন্যদিকে হস্টেলে একসাথে বহুজনের জন্য একই ভাবে সামষ্টিক ভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করে হস্টেল প্রতিষ্ঠানটি। ক্ষমতা প্রয়োগের এই দুটি ভিন্ন পদ্ধতি ব্যক্তির ভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। শ্রীলথা বাটলিওয়ালা ক্ষমতা প্রয়োগ সম্পর্কে বলছেন, (Batliwala, 1993) যৌথ পরিবারের অস্তিত্ব প্রায় না থাকায় বর্তমানে পরিবার গুলিতে সন্তান খুব বেশি হলেও তিনটির বেশি না, সাধারণত একটি বা দুটি। সেখানে পরিবারের সমস্ত মনোযোগ সেই একটি বা দুটি সন্তানের ওপর গিয়ে পরে। তার বা তাদের প্রতিটি কাজ, কথা কোন কিছুই নজরদারির বাইরে যেতে পারে না। আবাসিক ছাত্রী হেমের কথায় "সরাসরি কিছু না বল্লেও আমার প্রতিটা কাজ প্রতি পদক্ষেপ মাপা হচ্ছে, লক্ষ করা হচ্ছে অলক্ষে, এই বোধটাই আমার মেজাজ খারাপ করার জন্য যথেষ্ট। বাড়িতে প্রায়শই এটা হয়।"[৪৮] যাদবপুরের আবাসিকা সুধার মতে –

> মা বাবাদের অদ্ভুত একটা অধিকার বোধ থাকে যেটার কোন সীমা নেই, ব্যক্তি স্বাধীনতা সেখানে ধোপে টেকে না। তাদের বক্তব্য আমরা তোমার মা বাবা আমাদের রাইট আছে তোমার সব বিষয়ে কথা করার, আমাদের অনুমোদন ছাড়া তুমি কোন কিছু করতে পারবে না, মাবাবা বলাটা ঠিক নয়, বাবার যুক্তিগুলো এই ধরনেরই হয়।[৪৯]

ব্যক্তির ওপর ব্যক্তির অধিকারের এক্তিয়ার কতদুর এটি একটি জটিল প্রশ্ন, বিশেষত পরিবারস্থ মানুষজনের। আবেগগত আকুতি ছাড়াও পরিবার লালন পালনের খরচ দেয় তাই কি অধিকারবোধ মাত্রা ছাড়ায়? বিশ্বভারতীর আবাসিক কুহু তার অভিজ্ঞতার কথা জানাচ্ছেন "ঘরে নিজের ঘরে কিছুক্ষণ দরজা বন্ধ করে থাকলে সারাবাড়ি তোলপাড় হয়ে যায়, প্রতিটি কাজের হিসাব তাদের চায়, কিছুই হয়তো করছি না, কিন্তু এই কিছু না করাটাও তাদের নজরের বাইরে করা যাবে না এগুলো ক্ষমতা প্রয়োগ ছাড়া আর কিছুই নয়।"[৫০] সীমাহীন অধিকারবোধের মধ্যে পরিবারের মানুষজনের হিতৈষণা ও শুভাকঙ্ক্ষাগুলো একটা পর্যায়ের পর নিয়ন্ত্রণের আকার ধারণ করে, ক্ষমতা প্রয়োগের বহিঃপ্রকাশ হয়ে দাঁড়ায়। পারিবারিক সম্পর্ক সংলগ্ন মূল্যবোধে এই বিষয়গুলোকে কখনই গুরুত্ব দেয় না। পারিবারিক সম্পর্কের মহিমা আর গৌরবের স্ফীতির ভিতরে আড়াল করা হয় এই নগ্ন সত্য। অন্যদিকে হস্টেলে প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি আবাসিকের ওপর সামষ্টিক ভাবে নিয়ম প্রযুক্ত হয় (যদিও ছেলে ও মেয়েদের হস্টেলের 'নিয়ম' আলাদা)। ধরা যাক, একটি হস্টেলে তিনশ জন ছাত্রী থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেখানে সবার জন্য একই নিয়ম বলবৎ করে। নিয়মগুলি

---

[৪৮] অংশগ্রহণকারী যা.বি ৯, হেম চন্দ, সাক্ষাৎকার, স্থান -শান্তিনিকেতন।

[৪৯] অংশগ্রহণকারী যা.বি ৯, সুধা মাল, সাক্ষাৎকার, স্থান- যাদবপুর।

[৫০] অংশগ্রহণকারী যা.বি ৯, কুহু মাহাতো, সাক্ষাৎকার, স্থান -শান্তিনিকেতন।

যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লিঙ্গ বৈষম্য পূর্ণ। তারপরও সেখানে ছাত্রীরা ব্যক্তির থেকেও সমষ্টির একজন হিসাবে বিবেচিত হয়। এখানে নিয়ম লঙ্ঘনে সবার জন্য একই শাস্তি। তাছাড়া কোনো ঘটনার প্রেক্ষিত ছাড়া বিশেষ একজন ছাত্রীর ওপর নজরদারি রাখা হয় না। হস্টেলের সাধারণ নিয়মগুলো মেনে চললে ছাত্রীদের দৈনন্দিন জীবনে খুব বেশি নাক গলায় না হস্টেল কর্তৃপক্ষ। হস্টেলে সব কিছুই সামষ্টিক। এখন হস্টেলে একসাথে অনেকজন থাকলেও যৌথ আদৌ বলা যাবে কিনা তা অন্য একটি বিতর্কের বিষয়। অধিকাংশ হস্টেলেই নিয়মগুলি একপাক্ষিক ভাবে নির্মিত ও আরোপিত। ছাত্রছাত্রীদের মতামত বা সুবিধা অসুবিধার কথা জানতে চাওয়া হয় না। মতামত যেহেতু জানতে চাওয়া হয় না, বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতার একটি রূপ হিসাবেই  চিহ্নিত করব। একমুখী প্রক্রিয়ায় এখানে ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়। ব্যক্তির ওপর প্রতিষ্ঠানের প্রভাব এবং ক্ষমতার একমুখীতা সম্পর্কে। Goffman (1961) এর টোটাল ইন্সটিটিউশনের ধারণা প্রনিধানযোগ্য। সার্বিক প্রতিষ্ঠান যা ব্যক্তির ওপর বা আবাসিকের ওপর যে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে যার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আবাসিকের ক্ষমতার একমুখী ক্রম তৈরি হয়। অন্যদিকে সুজি স্কট বলছেন নবনির্মিত প্রতিষ্ঠানের কথা যেখানে আবাসিক এবং প্রতিষ্ঠান পারস্পরিক আদনাপ্রদানে বদলে যায় মধ্যবর্তী সম্বন্ধ এবং আবাসিকদের মধ্যে নির্মিত হতে থাকে নবনির্মিত আত্ম (Scott, 2011)। প্রশ্নহীন আনুগত্য এবং অনুসরণের সার্বিক প্রতিষ্ঠানের ধারণা থেকে নবনির্মিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলে সেখানে গণতান্ত্রিক পরিসরের অবকাশ বৃদ্ধি পায়। বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় অধিনস্থ হস্টল নবনির্মিত প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত। যেখানে ছাত্রছাত্রীদের স্বর রয়েছে এবং তারা শান্তিপুর্ণ বিরোধিতা ও আন্দোলনের অধিকার পায়। যার ফলে প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটি সমঝোতার জায়গা রয়েছে। যেখানে ছাত্রছাত্রীদের দাবি সুবিধা অসুবিধা শোনা এবং নিয়ম বদলের অবকাশ রয়েছে। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠান নিয়মাবলী প্রশ্নহীন ভাবে চাপিয়ে দিতে পারে না ছাত্রদের ওপর। তবে প্রতিটি ক্যাম্পাস এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি আলাদা, ভিন্ন ভাবে পরিচালিত হয় ছাত্র এবং প্রতিষ্ঠানের আন্তঃসম্পর্ক। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রী হেম জানাচ্ছে তার অভিজ্ঞতার কথা "আমার এই পনের বছরের হস্টেল জীবনে কখনো আমি দেখিনি হস্টেলের নিয়ম তৈরীর ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের মতামত চাওয়া হয়েছে বা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কয়েকজন কর্তাব্যক্তি কিছু নিয়ম তৈরী করেন তারপর তা প্রয়োগ করা হয় ছাত্রীদের ওপর (মেয়েদের হস্টেলের ক্ষেত্রে)। এখানে ছাত্রীদের কোন ভুমিকা থাকে না"।[৫১] হস্টেলে কিছু নিয়ম সবার জন্য প্রয়োগ করা হয় যাতে নিয়মানুগ ভাবে প্রতিষ্ঠানটি চালনা করতে সুবিধা হয়। অন্যদিকে পরিবারের ব্যক্তিকে নজরে রাখার অবকাশ আছে তাই সেখানে ব্যক্তির ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করা যায়।

[৫১] অংশগ্রহণকারী বি. বি ৫, হেম চন্দ, সাক্ষাৎকার, স্থান-শান্তিনিকেতন।

**হস্টেল জীবনে প্রান্তিক ছাত্রীদের নবনির্মিত আত্ম এবং আত্ম আবিষ্কারের ইতিবৃত্ত**

সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেকেই অনুভব করেছেন যে তারা হস্টেলে ব্যক্তিগত পরিসর পান অনেক বেশি বাড়ির তুলনায়। অধিকাংশ বাড়িতেই ছেলেদের জন্য নিজস্ব ঘরের ব্যবস্থা করা হলেও মেয়েদের জন্য সে ব্যবস্থা থাকে না। আমাদের সমাজে বাড়ির ছেলেটি ষোল সতের বছরের হলে তাকে নিজের একটি ঘর দেওয়া হয়। কিন্তু মেয়েদের যে আলাদা ঘরের প্রয়োজন আছে একথা মনেই করে না পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। ধরে নেওয়া হয় তারা বড় হবে বা থাকবে মা, দিদি, পরিবারের বয়ঃজ্যেষ্ঠাদের সঙ্গে একই ঘরে, তাদের সাথেই ঘুমাবে। এবং সংসার সম্বন্ধে তালিম নেবে। এক্ষেত্রে পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা কোন ভূমিকা কোন প্রভাব ফেলে কিনা এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল, অস্বচ্ছল পরিবারটিও খুব কষ্ট করে হলেও বাড়ির ছেলেটির জন্য একটি ঘরের ব্যবস্থা করে। কিন্তু অনেক টাকা পয়সাওয়ালা পরিবার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বাড়ির মেয়েটির জন্য আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করে না। আসলে মেয়েটির নিজস্ব পরিসর প্রয়োজনীয়তার কথা ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না, যে একান্ত পরিসরের কথা বলছেন, ভার্জিনিয়া উলফ, যেখানে একজন নারী এক জন স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসাবে সময় যাপন করে এই পরিসর স্থানিক হতে পারে বা বিমূর্ত। একজন নারীর এই একান্ত পরিসরের আকাঙ্ক্ষা থাকে আজীবন। যা পিতৃতান্ত্রিক সমাজে মরীচিকার মত, এই পরিসরের চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন ভার্জিনিয়া উলফ (উলফ, গুহ, ২০০২) এই একান্ত পরিসরের আভাস মেয়েরা হটেলে পায়। যেখানে পরিবারের বাইরে 'নিজে' হয়ে ওঠার অবকাশ পায়। বিশ্বভারতীর আবাসিক গবেষক হেমের বক্তব্য উদ্ধৃত করি,

> ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি বাবার একটা আলাদা ঘর, দাদার একটা আলাদা ঘর, আলাদা পড়ার টেবিল এই দুই জায়গা যেন বিশেষ কিছু, সেখানে সবার প্রবেশাধিকার নেই, এখান থেকেই বোঝা যায় যে পরিবারে পুরুষ সদস্যদের গুরুত্ব কতটা, আর উল্টোদিকে বরারব ভাবা হয়েছে আমার পড়াশুনার জন্য আলাদা কোন জায়গা লাগবে না, এখানে সেখানে পড়তে বসতাম, নিজের রুম তো অনেক দূরের কথা নিজের কোন পড়ার টেবিল অবধি ছিল না[৫২]।

সমাজে প্রচলিত ধারণা মেয়েরা একা থাকতে পছন্দ করে না, তারা সব সময় মাসি পিসি পরিবৃত থেকে সাংসারিক কাজ আর গল্প নিয়ে মত্ত থাকতে পছন্দ করে। অন্যদিকে বড় হবার সাথে সাথে ছেলেদের তৈরী হওয়া নতুন জগতকে গুরুত্ব সহকারে দেখা হয় ও প্রাধান্য দেওয়া হয়। যাবতীয় মননশীলতার চর্চায় পুরুষের একচ্ছত্র অধিকারকে পরিবার এইভাবে স্বীকৃতি দেয়, এবং মেয়েরা সেখানে ব্রাত্য সেটা বারবার চিহ্নিত করে দেওয়া হয়। যদিও এখন পরিবার ব্যবস্থায় অনেক গঠন গত বদল এসেছে। নিউক্লিয়ার পরিবারে খুব কম সদস্য থাকায় বিষয়টিতে কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। এখানে পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থান ও সামাজিক

---

[৫২] অংশগ্রহণকারী বি. বি ৫, হেম চন্দ, সাক্ষাৎকার, স্থান-শান্তিনিকেতন।

নির্মাণ বিশেষ ভুমিকা নেয়। এক ছাত্রী জানাচ্ছেন বাড়ীতে তার নিজস্ব ঘর আছে কিন্তু সেখানে কিছুক্ষণ দরজা বন্ধ করে থাকলে বাড়ির লোকজন তোলপাড় হয়ে যায়। তার কথায় -

> বাড়ির আসল ব্যাপারটা হচ্ছে সবকিছু তাদের চোখের সামনে করতে হবে, দরজা বন্ধ করে আমি তো আর সুইসাইড করছি না এটা জানার পর ও তারা যখন উদ্বিগ্ন হয়, বারবার জিজ্ঞাসা করে ভিতরে কি করছি, বারবার দরজা খুলতে অনুরোধ করে এবং শেষ পর্যন্ত আদেশ করে, দরজা খুলতে বাধ্য করে, তখনই মনে হয় পরিবার আসলে মেয়েদের নিজস্ব সময় কাটানো বরদাস্ত করতে পারে না, কিন্তু উল্টোদিকে বাড়ির ছেলেরা নিজেদের মত নিজেদের রূমে থাকছে সেখানে কেউ নাক গলাচ্ছে না।[৫৩]

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে ছেলেদের প্রাইভেসি পরিবারে সুপ্রতিষ্ঠিত, স্বতঃসিদ্ধ ভাবে ধরে নেওয়া হয়েছে যে তাদের নিজস্ব পরিসর থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু একটি মেয়ের নিজের মত থাকতে চাওয়া সমাজের কাছে পরিবারের কাছে খুব দৃষ্টিকটূ এবং একই সঙ্গে কৌতুহলের। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক সুধা মাল ছাত্রী এই বিষয়ে বলছে-

> বাড়িতে যেটা হয়, ছেলেদের জন্য সব ব্যবস্থাপনা আছে, আর মেয়েদের থাকতে হবে ম্যানেজ করে, তর্কের খতিরে যদি ধরেও নি যে মায়ের একটা পড়ার টেবিল আছে, কিন্তু পরিবারের ডিমান্ড গুলো এমন ভাবে সাজানো সেখান থেকে প্রাইভেট সময় টুকু বের করা প্রায় অসম্ভব। ব্যক্তিগত জায়গা পেলেও ব্যক্তিগত সময় পায়না, ধরেও যদি নি, একজন মহিলার নিজস্ব রুম বা স্টাডিরুম আছে, পরিবারের চাহিদাগুলো মিটিয়ে সেখানে যাবার সময় কি তিনি আদৌ পান? বাড়ির গৃহিনীর মতই বাড়ির পাঠরতা মেয়েটির অবস্থাও তথৈবচ![৫৪]

মেয়েরা যখন হস্টেলে আসে প্রথমেই তাদের আপ্লুত করে নিজের জন্য বরাদ্দ এক ফালি জায়গা যেটা একান্ত নিজস্ব। নিজের বিছানা, নিজের টেবিল, নিজের আলমারী। এইগুলোর ওপর একচ্ছত্র অধিকার, এখানে সে পড়াশুনা করবে, ঘুমাবে, নিজের ইচ্ছামত গুছিয়ে রাখবে অথবা অগোছালো রাখবে। রুমমেট থাকলেও হস্টেলে নিজস্ব পরিসরে ব্যাঘাত আসে না। একসাথে বহুজন একই রুমে থাকলেও প্রত্যেকের জন্য এলাকা নির্দিষ্ট করা থাকে। প্রত্যেকে জানে পরস্পরের এক্তিয়ার কতদুর, সেখানে মেয়েরা অনেক বেশি নিজস্ব পরিসর পায়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রী টিনা শৈশব থেকেই বিভিন্ন হস্টেলে থেকে বড় হয়েছে। তার কথায়,

> শিশুকাল থেকেই হস্টলে থাকার ফলে নিজস্ব পরিসরে এমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেছি এখন বাড়ি গেলে বেশিদিন থাকতে পারি না, এখন এমন দাঁড়িয়েছে, হস্টেলটা নিজের জায়গা যেটা

---

[৫৩] অংশগ্রহণকারী বি. বি ৫, হেম চন্দ, সাক্ষাৎকার, স্থান-শান্তিনিকেতন।

[৫৪] অংশগ্রহণকারী যা.বি ১১, সুধা মাল, সাক্ষাৎকার, স্থান—যাদবপুর।

> কম্ফোর্টজোন! আর বাড়িটা ঘুরতে যাবার জায়গা, দুচারদিন পরে দমবন্ধ হয়ে আসে, তাছাড়া নির্দিষ্ট সময়মত খাওয়া, স্নান, ঘুমানো নিয়ে দিনরাত বাড়ির সঙ্গে খিটিমিটি লেগেই থাকে। তুমি এইসব নিয়ে প্রশ্ন করছো, এখন ভেবে দেখছি তাই মনে হচ্ছে এই সমস্যা গুলো হয় তার কারণ হস্টেলে নিজের জায়গা আর নিজের সময় নিজের ইচ্ছায় চলে, এই পারসোনাল স্পেসটা বাড়িতে পাই না, বা বলা ভাল সেটা বাধা পায় বলে অসুবিধা হয়, বিরক্ত লাগে। হস্টেলে ফিরে এলে মনে হয় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।[৫৫]

শান্তিনিকেতনে সন্তোষ পাঠশালার (বিশ্বভারতীর বাচ্চা মেয়েদের হস্টেল) স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সুধা জানাচ্ছে, "ছোটবেলা থেকে এত নিজের জন্য ফ্রি স্পেস পেয়েছি সত্যি নিজেকে ব্লেসড মনে হয়, মানছি হস্টেলে নানা ধরনের নিয়মকানুন আছে তারপর ও প্রচুর স্বাধীনতা। হস্টেলে এসে বাঁধভাঙা আনন্দ হল, ধীরে ধীরে বুঝতে পারছিলাম আমার সময়গুলো একান্তই আমার, ধরো ইচ্ছা হলে কয়েকটা গোল পাথর কুড়িয়ে তাতে রঙ করে টেবিলে সাজিয়ে রাখছি কেঊ কিছু বলছে না, আবার ধরো রাস্তায় সুদৃশ্য একটা গাছের ডাল কুড়িয়ে পেয়েছি সেটাই হয়তো খাটের পাশে সাজিয়ে রাখছি কেউ বকছে না, দুপুর বেলা হয়তো হস্টেলের উঠোনে ঘুরে বেড়াচ্ছি, দোলনায় দুলছি কেউ জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে না। ছোটদের ও নিজদের মত করে পারসোনাল স্পেসের দরকার হয়। এই যে পেয়ে অভ্যেস হয়ে গেছে তার ফলে বড় হয়ে যাবার পর বাড়িতে আর মানিয়ে নিতে পারি না।"[৫৬] পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোর মধ্যে পরিবার একটি মেয়ের জন্য স্থানিক ও মানসিক ভাবে যতটুকু জায়গা বরাদ্দ রাখে তার থেকে অনেক বেশি পরিসর মেয়েরা হস্টেলে পায়। তার ফলে তাদের ব্যক্তিত্বও গড়ে ওঠে বা ও বিকশিত হয় স্বেচ্ছায় ও সাবলীলভাবে।

পরিবার প্রতিষ্ঠানটি কখনোই একটি নারীকে শেখায় না কিভাবে নিজেকেও ভালোবাসতে হয়। শৈশব থেকেই তার শিক্ষানবিশী চলে পরিবারের পুরুষ সদস্যদের কিভাবে পরিষেবা দিতে হয়, কিভাবে সেবা করতে হয়, সংসার সামলানোর জন্য কিভবে উপযুক্ত হতে হয় ইত্যাদি। আর শেখানো হয় আত্মপীড়ন। পরিবারের জন্য ত্যাগ করাটা কতটা গৌরবের বিষয়, শেখানো হয় আত্মত্যাগ করে পরিবারের বাকীদের খুশি করতে পারার মধ্যেই একটি মেয়ের জীবনের সার্থকতা। নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে ভুলে যেতে পারে যে নারী, নিজের আনন্দের, স্বাচ্ছন্দ্যের কথা চিন্তা করে না সেই নারী পরিবারে প্রশংসিত হয়, কখনো আবার তাও হয় না কারণ ধরে নেওয়া হয় এটাই একটা মেয়ের স্বাভাবিক কাজ। এখানে সাপেক্ষতা পিতৃতন্ত্রের নির্ধারিত। সেখানে মেয়েরা কেবল কতকগুলো ভুমিকা পালন করে চলে, পরিষেবা দেয়। এই আবর্তের ভিতর ক্রমশ অর্থহীন হয়ে পরে তার নিজের অস্তিত্ব, পরিবার তাকে খুব যত্ন করে শেখায় 'তুমি আসলে কেউ না' এই

---

[৫৫] অংশগ্রহণকারী বি.বি ৪, টিনা দাস, সাক্ষাৎকার, স্থান—শান্তিনিকেতন।

[৫৬] অংশগ্রহণকারী যা.বি ১১, সুধা মাল, সাক্ষাৎকার, স্থান—যাদবপুর।

আত্মবিস্মৃতির মধ্যেই বিভিন্ন ভূমিকা পালন করতে করতে নারীর জীবন অতিবাহিত হয়ে যায়। নির্দিষ্ট সাপেক্ষতা বদলে গেলে আত্মবোধ বদলে যায়, পরিসর এবং বিদ্যমান ক্ষমতা বিন্যাসের মধ্যে ব্যক্তির নবনির্মিত আত্মবোধ গড়ে ওঠে প্রতিষ্ঠান এবং ক্ষমতা বিন্যাসের মধ্যে পারস্পরিকতায় নির্মিত হয় আত্মবোধ (Shreeya, 2018) এবং উল্লেখযোগ্য ভাবে এখানে বদলে যায় সংযুক্তির বোধ, সংযুক্তি বোধের বদলে ব্যক্তির আত্ম পরিচিতি বদলে যায় (Davis, 2011)। পড়াশুনা সূত্রে মেয়েরা যখন হস্টেলে আসে তখন তারা নিজের দিকে ফিরে তাকানোর সুযোগ পায়, অবসর পায়। পারিবারিক সাপেক্ষতা থেকে দুরত্ব থাকার ফলে নির্দিষ্ট কিছু ভুমিকার বাইরে নিজেকে ভাবতে পারে। সমবয়সী বা প্রায় সমবয়সীদের সঙ্গে থাকাটাও এখানে একটি বিশেষ ভুমিকা নেয়। নিজের ইচ্ছা পছন্দ সুবিধা অসুবিধা ভালো-লাগা, মন্দ-লাগাগুলো সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি হয়। তার ব্যক্তিত্বও গড়ে ওঠে সেই আদলে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিকা ছাত্রী নিশার মতে "হস্টেলে আমি যতটা নিজের, বাড়িতে আমি ততটা নিজের নই সেখানে আমি পরিবারের, পরিবার যেভাবে চায় সেভাবেই আমাকে উপস্থাপিত হতে হয়।"[৫৭] নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা পরিবারে রক্ষিত হয় না বলা চলে, হস্টেল সেখানে কিছুটা হলেও মুক্ত পরিসর। নিজেকে সর্বদা পীড়িতের ভুমিকায় আর তারা দেখতে চায় না। বেঁচে থাকার নিজস্ব ধরণে বিশ্বাসী হতে শেখে। সারা জীবন এই উপলব্ধি বজায় রাখতে পারে কেউ কেউ, আবার কেউ পারে না। তবে তারাও হস্টেল জীবনে বেঁচে থাকার তীব্রতা সারাজীবন বিস্মৃত হন না, বা যে কোন পরিস্থিতিকে হস্টেলের নিজস্ব বেঁচে থাকার সঙ্গে তুলনা করে দেখেন, হস্টেলে ভাল থাকার দিনগুলো তাদের তাড়িত করে সারাজীবন। পরিবার আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী একটি মেয়েকে যে ভাবে দেখে বা যেভাবে দেখতে চায়, যা কিছু আশা করে, যে ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় এই সমস্ত কিছু থেকে দূরে থেকে নারী আত্মআবিষ্কারের সুযোগ পায়। যদিও পরিবারের মধ্যে থেকেও নারী একই অনুভূতির শরিক হতে পারে। আবার মানসিকতা অনুসারে যে কোন পরিবেশ মানুষকে আলাদা ভাবে প্রভাবিত করে, তাই আবাসিক প্রতিটি নারী একই ভাবে উপলব্ধি করবে একথাও বলা যায় না।

তবে হস্টেলে আত্ম আবিষ্কারের সুযোগ আছে। নারীর যৌনবোধের সাবলীল বিকাশে হস্টেল জীবনের ভূমিকা রয়েছে। যৌনতা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা তৈরী হবার আগেই মেয়েরা শেখে যৌনতা লুকিয়ে রাখার বিষয়। এই বিষয়ে কথা বলতে নেই, কেউ বললে তা শুনতে নেই। এই বিষয়ে সামান্য ধারণাটুকু তৈরী হবার আগেই বিষয়টির নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে মেয়েরা সম্যক ধারণা পায়। সমাজ শেখায় মেয়েদের যৌনতা লজ্জার বিষয়, খানিকটা অপরাধেরও। এই নিয়ে কোন কৌতুহল বরদাস্ত করা হয় না। প্রচার করা হয় যে 'ভালো মেয়ে'দের এই বিষয়ে কৌতুহল থাকে না, তারা যৌনতা সম্পর্কে কথা বলে না, সর্বোপরি ভালো মেয়েদের যৌনতার কোন বহিঃপ্রকাশ থাকে না। যারা বলে বা চর্চা করে তারা সমাজ স্বীকৃত 'খারাপ মেয়ে'। অবদমিত যৌনতাকেই নারীর স্বাভাবিক যৌনতা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এবং এই সামাজিক

[৫৭] অংশগ্রহণকারী যা. বি ৭, নিশা দাস, সাক্ষাৎকার, স্থান-যাদবপুর।

নির্মাণটি মেয়েদের মেনে চলতে বাধ্য করা হয়। স্বাভাবিক এই প্রবৃত্তিটির বিকাশ সমাজ বন্ধ করে রাখে জোর করে, তৈরী করে নানান ট্যাবু। হস্টেলে সমবয়সীদের সঙ্গে মেয়েরা অনেক খোলাখুলি কথা বলতে পারে। অনেক অস্পষ্ট ধারণা দূর হয়। নিজের ইচ্ছা অনুভূতি অকপটে প্রকাশ করতে পারে। সরাসরি নিষেধজ্ঞা না থাকায় তারা এ বিষয়ে কথা বলতে দ্বিধা বোধ করে না। হস্টেলে তাদের যৌনবোধের স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগ পায়। অন্তত জীবনের একটি স্বাভাবিক অংশ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়। নারীর যৌনতার ওপর সমাজ নির্মিত নঞর্থক ধারণার বাইরে কিছুটা হলেও মুক্ত পরিসর হস্টেল। অবাধে যৌনতা চর্চা করার সুযোগ না থাকলেও হস্টেল মেয়েদের স্বতঃস্ফূর্ত যৌনবোধ গড়ে তোলা ক্ষেত্রে বিশেষ ভুমিকা নেয়। তবে উলটো একটি বিষয়ও লক্ষ করা যায়। হস্টেলের সবাই সমবয়সী বা প্রায় সমবয়সী। কারোরই যথাযথ বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান না থাকায় অনেক ভুল ধারণাও মেয়েদের মধ্যে তৈরী হয়। আমাদের সমাজ নরনারীর বিষমকামী তাছাড়া অন্য কোন যৌনসম্বন্ধকে স্বীকৃতি দেয় না। হস্টেলে অনেক সমকামী সম্পর্ক তৈরী হয়। সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারীরা অনেকেই জানিয়েছেন তারা হস্টেলে এই জাতীয় সম্পর্কের সূত্রপাত দেখেছে। হস্টেল যদিও এই জাতীয় সম্পর্কের পৃষ্ঠপোষকতা করে না। তবে একজন সমকামী নারী বাড়িতে থাকলে তাকে যে ধরণের মানসিক অত্যাচার ও বিদ্রূপের মধ্যে থাকতে হয়, হস্টেলে থাকলে এই অত্যাচারের হার তুলনামুলক ভাবে কম। হস্টেল কর্তৃপক্ষ অনেক সময় বিষয়টি জানতেও পারে না। হস্টেলের মেয়েদের যৌনতা সম্পর্কে নিন্দাসূচক সামাজিক নির্মাণগুলিই প্রমাণ যে নারীরা এখানে কিছুটা স্বাধীনতা পায়। হস্টেলে মেয়েরা পরিবারের তুলনায় অনেক বেশী মুক্ত পরিসর পায়। হস্টেলের মেয়ে এবং মেয়েদের হস্টেল সম্পর্কে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নির্মাণও ছড়িয়ে আছে বিস্তর।

**পরিবারের বাইরে হস্টেলের গণতান্ত্রিক পরিবেশ**

হস্টেলে ধর্ম, জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য একই নিয়ম। রুম দেবার ক্ষেত্রেও কোন বৈষম্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। হস্টেলে ছাত্রীদের মধ্যে ধর্ম জাতি ও বর্ণভিত্তিক কোন বিরূপ আচরণকে প্রশ্রয় দেয় না হস্টেল কর্তৃপক্ষ। সবার প্রতি সমান ব্যবহার করা হয় সাধারণত। দীর্ঘদিন হস্টেলবাসের পর ছাত্রীরাও ধীরে ধীরে ধর্ম জাতি বর্ণ ইত্যাদি সম্পর্কে কুসংস্কার অতিক্রম করতে পারে। একই সঙ্গে থাকা, খাওয়া, ঘুমানোতে কোন অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না। ভিন্নধর্ম বা জাতির আবাসিকার সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব তৈরী হয়। গবেষণায় অংশগ্রহণকারী জানাচ্ছেন তাদের পরিবারে ভিন্ন ধর্মের মানুষের যাতায়াত, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেওয়া হয়না এবং এগুলো করলে অভিভাবকরা বকবেন। হস্টেলে থাকছে তখন তারা ধর্ম জাতি বর্ণ নিয়ে কোনভাবেই চিন্তিত নয়। পরস্পরের সঙ্গে বন্ধুত্ব আড্ডা খাওয়া ঘুমানো সব কিছুতেই তারা সাবলীলও স্বতঃস্ফূর্ত। বিশ্বভারতীর এক আবাসিক ছাত্রী হেম জানাচ্ছেন -

> বাড়িতে থাকাকালীন মুসলিম বন্ধুর সাথে মেশা বারণ ছিল। বাইরে মিশলেও তাদের ঘরে যাওয়া, তাদের বাড়িতে কিছু খাওয়া বা তাদেরকে বাড়িতে আনা এই করতে দেওয়া হত না। এমনকি

> মুসলিম বাচ্চাকে টিউশন পড়ানো পর্যন্ত বারণ ছিল। কিন্তু হস্টেলে আসার পর কত মুসলিম বান্ধবী, একথালা থেকে খাই, এক বিছানায় ঘুমাই।[৫৮]

একই ভাবে মুসলিম মেয়েরাও অন্যধর্মের মেয়েদের সাথে সহজে মিশতে পারে। এখানে একটা সংস্কৃতি গত ক্ষমতার প্রভাব বা সংখ্যাগুরুর প্রভাব সূক্ষ্মভাবে ক্রিয়াশীল। হিন্দু মেয়েদের মুসলিমদের সাথে মেশার অর্থ হল ধর্মীয় উদারতা বা অসাম্প্রদায়িকতার পরিচয়। যেন তাদের সাথে মিশে তাদেরকে ধন্য করে দেওয়া, অন্যদিকে মুসলিম মেয়েদের হিন্দুদের সাথে মিশতে পারাটা যেন একরকমের অন্তর্ভুক্তি। কিন্তু উত্তরবঙ্গের বিশেষ করে দার্জিলিং কালিম্পং এর ছাত্রীরা যখন হস্টেলে থাকে, তখন তাদের পড়তে হয় নানা ব্যঙ্গ বিদ্রূপের সামনে। তাদের ডাকা হয় 'চিংকি', যাতে তারা খুবই অপমানিত বোধ করে। সারা ক্যাম্পাস জুড়েই যদিও তাদের জীবনযাপন, শরীরী গঠন নিয়ে হাসি মস্করা চলে। একই ভাবে হস্টেলেও তারা বিচ্ছিন্ন থাকে। অন্যান্য ছাত্রীদের সাথে তাদের যোগাযোগ খুবই কম, তারা মূলত নিজেদের মধ্যেই থাকে। অন্যান্য বাঙালীরা হস্টেলে এসে পরস্পর মিশে যায়, কিন্তু তারা বিচ্ছিন্নই থেকে যায়। পুর্বে বিশ্বভারতীর ছাত্রী ইউমী দর্জি বহু বছর হস্টেলে আছে, তার অভিজ্ঞতা "আমরা নিজেদের মধ্যেই থাকি, এখানকার বাঙালীদের সাথে খুব একটা মিশি না, তার একটা কারণ আমি আগে বাংলা জানতাম না, এখন শিখেছি খানিকটা, আর এখানকার মানুষজন আমাদের কে ভালো চোখে দেখে না, রেসিস্ট কমেন্ট করে যেটা আমি এবং আমরা পছন্দ করি না।"[৫৯] যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে থাকাকালে তার মতামত অবশ্য কিছুটা বদলে যায়। সে জানাচ্ছে সবার সাথে বন্ধুত্ব না হলেও তার কয়েকজন বাঙালী বন্ধু আছে, তার রুমমেট ও বাঙালী, তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক আছে। তবে তাকেও নিজের জাতিগত পরিচয় নিয়ে মৌখিক হেনস্তার স্বীকার হতে হয়েছে। হস্টেলে মেয়েরা তাদের ধর্ম গত ও জাতি গত পরিচয় ভুলে পরস্পরের সঙ্গে মিশলেও উত্তর বঙ্গের মানুষজনের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা চোখে পড়ার মত।

বহুদিন হস্টেলে থাকার ফলে একটা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নতা তৈরী হয়। তারপর পারিবারিক নিয়মকানুনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া সম্ভব হয় না। ছুটিতে কয়েক দিনের জন্য বাড়ি গেলে তাদের কি ধরনের অসুবিধা হয় তা বিশদে আগে আলোচনা করেছি। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে তারা নিজেদের জীবনে যদি পরিবার তৈরী করে তাহলে সেই পরিবারের প্রতি তাদের মনোভাব কেমন হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বিশ্বভারতীর আবাসিক ছাত্রী সুধা জানাচ্ছে,

> পরিবার বানাবো ভাবলেই ভয় লাগে আসলে। যা সব দেখছি চারদিকে। তবুও তো হস্টেলের সিনিয়র দিদিরা, যারা পাসআউট তারা অনেকেই বিয়ে করছে, বিয়ে না করে তো আর কেউ নেই। কিভাবে মানিয়ে নেব আমি জানি না, তবে খুব ভয়ানক কিছু হবে বলেই মনে হয়।

---

[৫৮] অংশগ্রহণকারী বি.বি ৫, হেম চন্দ, সাক্ষাৎকার, স্থান-শান্তিনিকেন।

[৫৯] অংশগ্রহণকারী যা.বি ১২, ইউমী দর্জি, সাক্ষাৎকার, স্থান-যাদবপুর।

> হস্টেলে নানা স্বাধীনতায় থাকে তারা সেই ভাবে নিজেরা অভ্যস্ত হয়ে যায়। আবার পরিবারে ফিরে যাওয়ার অর্থ হল আবার ভিন্ন শর্ত, ভিন্ন নিয়মতান্ত্রিকতার সঙ্গে অভ্যস্ত হওয়া, মানিয়ে নেওয়া। এটি মানসিক ভাবে খুবই জটিল আর সমস্যাজনক প্রক্রিয়া।[৬০]

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রী নিশার মতে, "বাড়িতে থেকেই যারা বড় হয় তারা বহু বছর ধরে পরিবারে মায়ের ভুমিকা দেখে আসছে। তারা যখন বিয়ে করে তখন তারা একটা জুতো থেকে আরেকটা জুতোয় সহজেই পা গলিয়ে দেয়, সবার ক্ষেত্রে বলছি না। কিন্তু হস্টেলের মেয়েরা যখন বিয়ে করে তখন মাঝখানে থাকে একটা দেয়াল, আত্মবিশ্বাসের, আত্ম আবিষ্কারের, স্বাতন্ত্র্যের দেয়াল।"[৬১] শহর, মফস্বল, গ্রামের ছাত্রীদের মধ্যে এই প্রভাব আলাদা ভাবে কাজ করে। শহরে মা, বা পরিবারের কাউকে অনুসরণ করা ছাড়াও আরো অনেক ধরণের প্রভাবক কাজ করে। মিডিয়া, সাংস্কৃতিক আবহাওয়া, ইত্যাদি। গ্রামে বা মফস্বলের মানুষ ও মিডিয়া প্রভাবিত। কিন্তু গ্রাম বা মফস্বলের তুলনায় শহরের মেয়েদের পরিবার ছাড়াও প্রভাবিত হওয়ার সুযোগ বেশী। নিশার বক্তব্য উদ্ধৃত করছি –

> ধরো আমি যে পরিবারে জন্মেছি, বড় হয়েছি সেই পরিবারের গঠন আমার পছন্দ না, অনেক খারাপ বৈশিষ্ট আমি তারমধ্যে দেখেছি তাই সেই পরিবার আমি আর গড়তে চাই না। কিন্তু এই খারাপ অভিজ্ঞতার ফলে আমি আর পরিবারই তৈরী করবো না তাতো নয়, পরিবার বানাব কিন্তু তার গঠন আলাদা হবে, খুব সমঝোতাপূর্ণ কারো সাথে যদি থাকি তাহলে তো কোন অসুবিধা নেই, সে ও ধরো হস্টেলে থেকে বড় হয়েছে আর জানে কোন আচরণগুলো করা যাবে আর কোন গুলো না তাহলেও অসুবিধা নেই। যে পরিবারের গঠন আর চেহারাটা আমরা চোখের সামনে দেখছি সত্যিকথা বলতে কি সেটা আমি ভুল করেও নিজের জীবনে চাইব না।[৬২]

বিবাহিতা ছাত্রী যারা হস্টেলে থেকে পড়াশুনা করে এমন দুজনের সাক্ষাৎকার নিয়েছি, তাদের মধ্যে একজন যাদবপুর এবং একজন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। একজন হিন্দু এবং অন্যজন মুসলিম। তাদের কাছে হস্টেল এক ভিন্ন অর্থবহন করে। টিনা দাস তফশিলি জাতি ভুক্ত, সে পি এইচ ডি করছে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে, জানাচ্ছে তার মাধ্যমিক পাশ করার পর নিজের স্কুলের শিক্ষকের সাথে বিয়ে হয়েছিল, নিজেরাই বিয়ে করেছিল। তারপর শ্বশুরবাড়ীর লোকজন তাকে পছন্দ করেনি প্রচণ্ড দুর্ব্যবহার করত ফলে তার স্বামী তাকে হস্টেলে রেখে পড়াশুনা করাচ্ছেন, সে শ্বশুর বাড়ি খুব কম যায়, স্বামী মাঝে মধ্যে এসে দেখা করে যান, ছুটিতে সে বাপের বাড়ি যায় অথবা স্বামীর ভাড়াবাড়িতে যায়। মেয়েটির শ্বশুরবাড়ি

[৬০] অংশগ্রহণকারী যা.বি ১১, সুধা মাল, সাক্ষাৎকার, স্থান-যাদবপুর।

[৬১] অংশগ্রহণকারী যা.বি ৭, নিশা দাস, সাক্ষাৎকার, স্থান-যাদবপুর।

[৬২] অংশগ্রহণকারী যা.বি ৭, নিশা দাস, সাক্ষাৎকার, স্থান-যাদবপুর।

শান্তিনিকেতনের খুব কাছাকাছি একটি গ্রামে, সেখান থেকে যাতায়াত করে ক্লাশ করা সম্ভব। ছাত্রীটির কথায়-

> খুবই অপমান করত তাই আমি ওখানে থাকতে চাইনি প্রচুর কাজ ও করাতো ইচ্ছা করে, তাই আমার বর আমাকে হস্টেলে রাখল, হস্টেল না এলে আমার পড়াশুনাটা আর হত না, শুধু পড়াশুনা নয়, এত অস্থির লাগত তখন, কোথায় গেলে থাকতে পারব বুঝে উঠতে পারছিলাম না, হস্টেলে এসে মানসিক শান্তি পেলাম।[৬৩]

মুসলিম ছাত্রীটি সাকিনার বিয়ে হয়েছে তিন বছর। তার আগেও সে হস্টেলে থাকত, বিয়ের পর ও হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে "বিয়ে ব্যাপারটা এত ঝামেলার, সঙ্গে পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়া খুব কঠিন। আমি আগেই বলে দিয়েছিলাম, পড়াশুনা করব আর সেটা হস্টেলে থেকেই করব। আর তার থেকেও সুবিধা হল আমাকে এই সুবাদে শ্বশুরবাড়িতে থাকতে হয় না।"[৬৪] স্বামীর সঙ্গে তার বনিবনা হয় না, তাই শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সঙ্গেও সুসম্পর্ক নেই। তার বক্তব্য উদ্ধৃত করছি

> হস্টেলে থাকাটা আপাতত আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, পড়াশুনা শেষ হয়ে গেলে কি হবে জানি না, বিয়ে হয়ে যাবার পর বাপের বাড়িতে থাকাটাও ভাল চোখে দেখে না সমাজের লোক। আমার উপর দিয়ে যে পরিমাণ ঝড় গেছে, মাঝে মধ্যে ভাবি হস্টেলে সীটটা না থাকলে সেই সব দিন গুলোতে কোথায় যেতাম! সব দিক থেকে যখন বিরক্ত, হতাশ হয়ে গেছি, চোখকান বুজে হস্টেলে চলে এসেছি, বর বা শ্বশুরবাড়ির লোক ঝগড়া করার জন্য এখানে এলে দেখা করিনি, হস্টেল না থাকলে কোথায় পেতাম এই আড়াল টুকু, মানুষজন কে উপেক্ষা করার শক্তি টুকু, তখন তো আমার বাপের বাড়ির লোকেরাও আমাকে দোষ দিত, বকত। হস্টেলে বন্ধুরা পাশে ছিল কেবল, তার থেকেও বড় কথা যাবার একটা নিজস্ব জায়গা আমার লাগত সেই সময়, যেটা হস্টেল আমাকে দিয়েছিল।[৬৫]

বিয়ে সংসার থেকে আত্মগোপন করার একটা জায়গা হিসাবে এই দুই নারীর কাছে হস্টেলের গুরুত্ব অপরিসীম।

যারা ছোটবেলা থেকে হস্টেলে থাকে তাদের ক্ষেত্রে হস্টেলে মানিয়ে নেওয়া তুলনামূলক সহজ। হস্টেল প্রথমে এসে সবার মানিয়ে নিতে অসুবিধা হয়। একসঙ্গে থাকার ফলে বিপরীত মানসিকতার মানুষের সঙ্গে সাবলীল ভাবে চলার ক্ষমতা তৈরি হয়। রুমমেটদের সাথে লাইট জ্বালানো, বাথরুম ব্যবহার করা ইত্যাদি নিয়ে নানা ধরনের সমস্যা তৈরী হয়। কিছুদিন থাকার পর সে সব সমস্যা চলে যায়, ছাত্রীরা ধীরে ধীরে মানিয়ে নিতে শেখে। পরিবার ছেড়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে অপরিচিত মানুষজনের সাথে মানিয়ে নেওয়া

[৬৩] অংশগ্রহণকারী যা.বি, টিনা দাস, সাক্ষাৎকার, স্থান – শান্তিনিকেতন।

[৬৪] অংশগ্রহণকারী যা.বি ৯, সাকিনা, সাক্ষাৎকার, স্থান- যাদবপুর।

[৬৫] অংশগ্রহণকারী যা. বি ৯, সাকিনা, সাক্ষাৎকার, স্থান- যাদবপুর।

সঙ্গে পড়াশুনা ঠিক রাখা সব মিলিয়ে যেকোন পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। শান্তিনিকেতনের পাঠভবনের মেয়েদের হস্টেলে দীর্ঘদিন দায়িত্বে থাকা দূর্গাদির মতে, "হস্টেলের মেয়েদের মধ্যে দেখেছি যেকোন পরিস্থিতিতে যুঝে নেবার মানসিকতা থাকে। যে কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে তারা পিছপা হয় না, কোন ঘটনা ঘটলে তাতক্ষনিক তার সমাধান করার ক্ষমতা তাদের থাকে।"[৬৬] সুধা তার অভিজ্ঞতার কথা বলছেন-

> বাবা মাকে অসম্মান না করেও যে তাদের মতের বিরোধিতা করা যায়, বা পৃথক মতামত পেশ করা যায় তা শিখেছি হস্টেলে, এখানে ভিন্ন মত ভিন্ন রুচি ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের সঙ্গে থাকতে হয়, চলতে হয় মতানৈক্য, মনোমালিন্য প্রায়শই হতে থাকে সেগুলো তো সামলে নি খুব ভদ্র ভাবে। বাড়িতে যেটা হয় অধিকার বোধে ভিত্তি করে অন্যের ওপর মতামত চাপিয়ে দেওয়া হয় কিন্তু হস্টেলে দুটো পৃথক মত পাশাপাশি থাকতে পারে, তাদের মধ্যে মত বিনিময় হয়, কিন্তু অন্যমত মানেই ঝামেলা ঝগড়া এটা চলে না, নিজে টিকে থাকার স্বার্থেই মানিয়ে নিতে শিখে নিতে হয়, যেটা হস্টেল ছাড়াও জীবনের সর্বত্রকাজে লাগে।[৬৭]

সবক্ষেত্রে বিষয়টি এতটাও সরলীকৃত করা যায় না। হস্টেলে অনেকে মানিয়ে নিতে না পেরে একা হয়ে যায়, এই যৌথ ধরণ-ধারণ বুঝে উঠতে পারে না। হস্টেল এমন এক সমষ্টিজীবন যেখানে প্রত্যেকে স্বতন্ত্র এবং একক। এখানে কেউ কেউ একা হয়ে যায়, অবসাদের শিকার হয়। পরিবারের সম্পর্কগুলো যেন শর্তহীন ভাবে তৈরী। সেখানে যে কারো সাথে খারাপ ব্যবহার যখন খুশি যে কেউ করে, সম্পর্ককে যথাযথ মূল্য আমরা দিই না, কিন্তু হস্টেলে অযথা খারাপ ব্যবহার করলে কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলবে না। এখানে এলে মানুষ শেখে নিজের সীমা অথবা এক্তিয়ার।

**প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক ছাত্রীদের আবাসজীবনের 'ভিন্ন' অভিজ্ঞতা**

আন্তঃস্তর বিন্যাসের ভিত্তিতে বদলে যায় মেয়েদের আবাসজীবনের অভিজ্ঞতা মাত্রা বদলায়। আদিবাসী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়, তফশীলি জাতি উপজাতির প্রান্তিক ছাত্রীরা যারা উচ্চশিক্ষার জন্য হস্টেলে থাকেন যাঁরা এই গবেষণার মূল লক্ষ্য তাদের হস্টেলজীবনে তাদের অভিজ্ঞতার বর্ণনা থেকে উঠে এসেছে তাদের বাস্তবতা, দৈনন্দিন বেঁচে থাকা। অন্যান্য সামাজিক স্তরের ছাত্রীদের আবাসজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তাদের অভিজ্ঞতা আর্থ সামাজিক পরিস্থিতি ও সামাজিক স্তরগুলির চেতনার ভিত্তিতে বদলে যায়। অভিজ্ঞতার ভিন্নতা তাদের ভিন্ন একটি বাস্তবতার শরিক করে তোলে। সাধারণ ছাত্রীরা হস্টেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে য়ে অভিজ্ঞতা পান তারা তার থেকে আলাদা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যান। আবাসজীবন তাদের ভিন্ন ভাবে প্রভাবিত করে। যাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে তাদের হস্টেলে থাকতে পছন্দ করার

---

[৬৬] পাঠভবনের হস্টেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত দূর্গা চক্রবর্তী।

[৬৭] অংশগ্রহণকারী যা. বি ১১, সুধা মাল, সাক্ষাৎকার, স্থান-যাদবপুর।

কারণগুলি অনেকাংশে পরিবারের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে জড়িত। হস্টেলগুলি সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত। এখানে থাকা খাওয়া সবকিছু বাবদ মাসে সাতশ টাকা দিতে হয় বাকী খরচ সরকার ভর্তুকি দেয়। পড়াশুনার সব রকম সুবিধাসহ হস্টেলে থাকায় আর্থিক সাশ্রয় হয়। বাড়ীতে ইলেকট্রিসিটি ছিল না কারো কারো। পড়াশুনা করার জন্য একটা ঘর নূন্যতম একফালি জায়গাও পাওয়া যায় না। ছাত্রীরা পারিবারকে দোষারোপ করছেন না। কারণ পরিবারে স্বাচ্ছল্য নেই, দিন গুজরান হয় কৃচ্ছসাধনে। সুতরাং হস্টেলে অন্তত নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে, পড়াশোনা করার সুযোগ তারা পায়। পরিবারগুলি চাষ, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। পারিবারিক আয়ের মূল উৎস চাষ ও ব্যবসা। কারো পরিবার নিজেদের জমিতে চাষ করে। বাকী পরিবারগুলি অন্যের জমিতে চাষ করে, মজুরী খেটে আয় করে, তিনটি পরিবার নিজেদের জমির সাথে অন্যের জমিতেও চাষ করে। বছরে দুবার ধান চাষ ছাড়াও সারা বছর নানা শস্য, সবজি ও চাষ হয়। অর্থাৎ সারা বছর বাড়িতে প্রচুর কাজ। বাড়ির প্রতিটি সদস্যের মত বাড়ির পাঠরতা মেয়েটিকেও কাজে যেতে হয়, স্কুল কলেজ যাওয়া হয় না, পড়ার সময় পাওয়া যায় না। পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা বেতন দিয়ে মাঠে মজুর নিয়োগ করার মত। কুহু জানাচ্ছেন,

> বাড়িতে থাকলে আসলে পড়াশুনা হত না বাড়িতে প্রচুর কাজ তো। আর এখানে কোন চাপ নেই। বাড়িতে সব কিছুই করতে হয় বলতে গেলে। যেরকম ধান পোঁতা কাটা নিড়ানো বাঁধা মাঠ থেকে আনা ধান ঝাড়া ধান সেদ্ধ, সেদ্ধ ধান রোদে দেওয়া, পড়াশুনার সময় পেতাম না, এখন হস্টেলে এসে পড়াশুনার সময় টুকু পাই।[৬৮]

হস্টেলে আসার পর ও ধান পোতা ও কাটার সময় সে ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়ে বাবা  মা কে কাজে সাহায্য করে। হস্টেলে আসার আগে তারা অনেক অসুবিধার মধ্যে পড়াশুনা করত। বাড়ির কেউই তাকে পড়াশুনার বিষয়ে উৎসাহিত করে নি। তাদের কাছে পড়াশুনাটা ছিল সম্পুর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। স্কুলে ফ্রীতে পড়াশুনা করা যায় তাই বাবামার কাছ থেকে টাকা নিতে হত না। আর বই পত্র জোগার করত স্কুল থেকে বা সিনিয়র দাদা দিদিদের কাছ থেকে। তবে তারা পরিবারের পরিস্থিতি বোঝে। পড়াশুনার দিকে নজর দেবার সময় বা মনোযোগ দেবার অবস্থা তাদের নয়। আবাসিকা ছাত্রী টিনা জানাচ্ছেন,

> বাড়িতে অনেক কষ্ট করে পড়াশুনা করেছি, রাতের দিকে কখনো ভোরের দিকে, যখন দেখেছি পরীক্ষা আরো তিন চার মাস আছে, না পড়লে তো আর উপায় নাই, সারাদিন কাজ করে রাতে ক্লান্তি আসত ঘুম আসত, তবুও পড়তাম। কখনো বাড়ীর লোকজনকে অনুরোধ করতাম এই একমাস পড়ি, কাজতো আছেই কাজ তো করবোই।[৬৯]

শুধু মাঠের কাজ নয় বাড়ির কাজ ও তারা করে। মা বাবা মাঠে চলে গেলে বাড়ির মেয়েটিকে বাড়ির কাজগুলো যেমন রান্না জল আনা, ঝাঁট দেওয়া ইত্যাদি করতে হয়। বাড়ির ছোট বোন বা ভাই এর দেখভাল

[৬৮] অংশগ্রহণকারী বি.বি ৬, কুহু মাহাতো, সাক্ষাৎকার, স্থান-শান্তিনিকেতন।

[৬৯] অংশগ্রহণকারী বি. বি ৪, টিনা দাস, সাক্ষাৎকার, স্থান—শান্তিনিকেতন।

করা। সারাদিনের মধ্যে বেশীর ভাগ সময় টুকু কাজ করে কাটাতে হয়। বাড়ির লোকজন সবসময় যে শুধু পড়াশুনায় অসহযোগীতা করেছে তা নয়, পরিস্থিতি টাই এমন, ইচ্ছে থাকলেও কিছু করার নেই। তারপর এই হস্টেলে আসার পর সাতশ  টাকা পরিবারই পাঠাত। সে আরো জানাচ্ছে, “বাড়ির বা মাঠের কোন কাজকে আমি অসম্মান করছি না, কিন্তু নিত্যদিনের এই কাজ আর দারিদ্র থেকে বেরোতে চাই তাই পড়াশুনাটা করা জরুরী আর তার জন্যে হস্টেলে থাকাটা খুব দরকার।”[৭০] নারীরকায়িক শ্রমের সঙ্গে হস্টেল এবং পরিবার– এই দুটি প্রতিষ্ঠান একটি বহুমাত্রিক সম্পর্কে যুক্ত। পরিবারের অর্থনৈতিক ভিন্নতা আনুসারে আবার তার মাত্রা বদলায়। অস্বচ্ছল ও দরিদ্র পরিবারে মেয়েদের সঙ্গে কায়িক শ্রমের যোগ সরাসরি। স্বচ্ছল ও ধনী পরিবারগুলিও অচ্ছেদ্য অঙ্গ হল পরিচারিকা, যারা দৈনন্দিন কাজে সাহয্য করেন। সেখানে পরিবারের নারী সদস্যদের সঙ্গে কায়িক শ্রমের যোগ কিছুটা অপ্রত্যক্ষ। অন্যদিকে হস্টেলে দৈনন্দিন জীবনের কিছু কাজ হস্টেলের কর্মীরা করেন, যেমন- ঘর ও বাথরুম পরিষ্কার করা, কিচেনের কর্মীরা রান্না করেন। আর বাকি নিজের কাজগুলো আবাসিকরা নিজে করেন। নিজের কাজ নিজে করা, ও পরিকল্পনা মাফিক সামলানোর অভ্যাস তৈরী হয় হস্টেলে। হস্টেলে স্বচ্ছল বা ধনী পরিবারের মেয়েরানিজের কাজ গুলো করে ও শেখে। আর অস্বচ্চল বা দরিদ্র পরিবারের মেয়েরাও নিজের কাজগুলো করে, যা পরিবারের কাজের তুলনায় পরিমানে অনেক কম এবং কম পরিশ্রমসাধ্য। পারিবারিক অর্থনৈতিক পরিস্থতি অনুযায়ী পরিবার ও হস্টেলে তুলনামুলক শ্রমে অংশগ্রহণের মাত্রা বদলে যায়।

হস্টলে থাকার কারণ হিসাবে বেণু আরো জানায়-

> আমার বাড়ীতে সবাই সাঁওতালিতে কথা বলে কিন্তু স্কুলে আমাকে বাংলায় পড়াশোনা করতে হয়েছে। আমি ক্লাশ সিক্সে একবার ফেল করে যাই, তখন এই সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজতে থাকি, আমার স্কুলটিচার হস্টেলে থাকার কথা বলেন। স্কুলের কাছাকাছি একটি বাঙালী হস্টেলে থাকতে শুরু করি। মূলত হস্টলেই আমি বাংলা বলতে ও সাবলীল ভাবে লিখতে শিখেছি। তারপর মাধ্যমিকের পর আমি এই আদিবাসী হস্টেলে এসেছি। ততদিনে বাংলা শিখে গেছি ভালভাবে।[৭১]

হস্টেল কিভাবে তার ভাষাশিক্ষায় ভুমিকা গ্রহণ করল এই প্রশ্ন করলে সে বলে

> ঐ হস্টেলে কেউ সাঁওতালি বলত না, সেখানে মাত্র তিন চার জন আদিবাসী ছাত্রী ছিল সেখানে সবাই বাংলায় কথা বলত। শুনে শিখতাম তাছাড়া যিনি হস্টেল ওয়ার্ডেন ছিলেন তারকাছে বাংলা শেখার জন্য টিউশনীও পড়তাম, তবে পড়ার থেকেও হস্টেলে থেকে মেয়েদের সাথে রুমমেটদের সাথে সারাদিন কথা বলে, শুনে, ওদের সাথে বাংলা খবর শুনে, টি ভি দেখে, বলতে গেলে হস্টেলের বাঙালী পরিবেশটাই আমাকে বাংলা শিখিয়েছে। কারণ উপায় তো নেই, অলচিকি স্কুল তো কিছুদিন

---

[৭০] অংশগ্রহণকারী বি.বি ৪, টিনা দাস, সাক্ষাৎকার, স্থান—শান্তিনিকেতন।

[৭১] অংশগ্রহণকারী বি. বি ৩, বেণু হাসদা, সাক্ষাৎকার, স্থান-শান্তিনিকেতন।

> আগে খুললো তাও ব্যাপক হারে নয়। অনেক আদিবাসী বাচ্চাকে এই জটিল ভাষা সমস্যায় পড়তে হয়, আমরা তো মাতৃভাষায় প্রাথমিক বা উচ্চশিক্ষা কোনটাই করার সুযোগ পাই না”[৭২]।

হস্টেলের ভাষিক পরিবেশ তাকে বাংলা শিখতে সাহায্য করেছিল। যদিও মাতৃভাষায় তারা কেন পড়াশোনা করতে পারবেন না যে কোন প্রকারে তাকে বাংলা শিখতেই হবে কেন এটি আবার ভিন্ন একটি বিতর্কের বিষয়। সে আরো জানায় বাড়ি থেকে কলেজ তার বেশী দূর নয়, মাঝখানে নদী তাই খুব সমস্যা হয় বর্ষাকালে বা পরীক্ষার সময়। হস্টেলে থাকার সুফল হিসাবে তারা জানাচ্ছে অনেক স্বাবলম্বী স্বনির্ভর হয়েছে। অন্যের সাথে মানিয়ে নেবার ক্ষমতার সাথে সাথে তারা হয়েছে পরিণত মনস্ক। বিশেষ একটি সম্প্রদায় ভুক্ত হওয়ায় সামাজিক গ্রহণ যোগ্যতার বিষয়ে তারা আগে সংকুচিত থেকেছে। হস্টেলে বহুদিন থাকার পর তারা এই ধরণের সংকোচ কাটিয়ে উঠেছে অনেকটা। সাবলীল ভাবে কথা বলতে পারে, তাদের শরীরী ভাষার মধ্যেও স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে। লজ্জা সংকোচ অনেকটা কেটে গেছে হস্টেলে থেকে। পপি হেমব্রমের কথায়,

> হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করি বলে পাড়ার লোক অনেক খারাপ কথাও বলে, এতদিন বাড়ির বাইরে আছে ওই মেয়ে কি আর ভালমেয়ে আছে! এই জাতীয় কথাও শুনতে হয়। কিন্তু কেন খারাপ, কি ধরণের খারাপ তারা কিছুই জানে না বা জানতেও চায় না। বাড়ীর বাইরে হস্টলে থাকি বলে আর তাদের বাড়ির মেয়েটি বা ছেলেটি হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করার সুযোগ পায় নি বলে, বা পড়াশোনাই করে না তাই ঈর্ষা করে আমাকে খারাপ মেয়ে বলে। যার আসলে কোন ভিত্তি প্রমাণ কিছুই নেই।[৭৩]

শুধু বাড়ি তো নয় পাড়াও একটি জটিল বিষয়। পরিবার শুধু পিতৃতান্ত্রিক নিয়মকে বলবত করে না। পাড়া এ ব্যাপারে বিশেষ ভুমিকা নেয়। পরিবার একদিকে যেমন নারীকে শৃঙ্খলিত করে তেমনি পাড়াও এমন একটি পরিসর যেখানে পরিবার স্বাধীনতা পেলেও সেই স্বাধীনতা ভোগ করতে দেয় না পাড়া। পাড়ার ক্লাব, পাড়ার মোড়ল ও মেয়েদের পিতৃতান্ত্রিক বাঁধনে বেঁধে রাখার প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করে। এই বিষয়টিতে আলোকপাত করেছেন মহুয়া মুখোপাধ্যায় তাঁর ‘Every day life in prison’ হস্টলের নিয়মানুবর্তীতাকে প্রশ্ন করা যেতে পারে একথা তাদের মনে হয় না তার কারণ তারা বাড়ীতে যে পরিবেশে থাকত বা যে ধরণের পরিষেবা পেত তার তুলনায় অনেক সুবিধায় ও স্বাচ্ছন্দে তারা হস্টলে থাকতে পারে। তাদের জীবনের প্রাথমিক সমস্যা গুলোর আশু সমাধান হয়েছে হস্টেলে এসে। হস্টেলের প্রতি তাদের কারোর কোন অভিযোগ বা ক্ষোভ নেই। বাড়িতে বিদ্যুৎ নেই, স্নানঘর, শৌচাগার নেই, পড়তে বসার জায়গাটুকুও নেই তার ফলে তারা হস্টেলে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্যে থাকে। বাড়িতে নিয়ম আছে, হস্টেলে সে তুলনায় নিয়ম কম আর যেটুকু নিয়ম আছে তার মধ্যেও তারা নিজেদের মত আনন্দে থাকতে পারে বাড়িতে

---

[৭২] অংশগ্রহণকারী বি. বি ৩, বেণু হাসদা, সাক্ষাৎকার, স্থান-শান্তিনিকেতন।

[৭৩] অংশগ্রহণকারী বি. বি ২, পপি হেমব্রম, সাক্ষাৎকার, স্থান-শান্তিনিকেতন।

সেই সুযোগটুকুও পায় না। যেখানে তাদের রাত নটার মধ্যে হস্টেলে ফিরতে বাধ্য করা হয় –এই বিষয়ে তাদের কিছু অসুবিধা হলেও তারা এ নিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে সময় বাড়ানোর দাবী জানায় না তার কারণ তারা বাড়ীতে আরো বন্দী অবস্থায় থাকত। রিনির কথায়, "বাইরে তেমন কোন কাজ আমাদের থাকে না, কি করবো বাইরে গিয়ে, তার চেয়ে হস্টেলে বসেই গল্প করি আড্ডা দি, এখানে তবুও নটা পর্যন্ত একা একা কোথাও যেতে পারি। বাড়িতে তো আরো বন্দী অবস্থায় থাকতাম, সেখানে তো একা কোথাও যাওয়াই বারণ ছিল।"[74] বেণুর কথায় "আমার বাড়ি তো প্রত্যন্ত গ্রামে সেখানে রাত্রি আটটা বেজে যাওয়া মানে গভীর রাত। সবাই ঘুমিয়ে যায়। হস্টেলে তবু তো নিজের ইচ্ছা মত অনেক রাত পর্যন্ত লাইট জ্বেলে পড়াশুনা করতে পারি। নটায় হস্টেল বন্ধ হয় তাতে আমাদের কোন অসুবিধা হয় না তার কারণ বাইরে আমরা কোথাও যাই না। কাজ ও থাকে না"[75] যে ইস্যু নিয়ে বর্তমানে শহরের হস্টেলগুলিতে পিঞ্জড়া তোড় আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে তাদের লড়াই করতে হচ্ছে, সেই একই বিষয়ে এই হস্টেলের ছাত্রীদের কোন বিশেষ ক্ষোভ বা প্রশ্ন নেই। তাদের মধ্যে প্রতিবাদ করার মানসিকতা নেই তাই তারা প্রতিবাদ করে না বিষয়টি এত সরলীকৃত করে দেখা যাবে না। শহর ও গ্রামের স্থানিক পটভূমি, সুযোগ সুবিধা বাস্তবতা ভিন্ন। তাই তাদের মধ্যেকার দাবীগুলিও ভিন্ন। শহরে পাব্লিক স্পেস ব্যবহার করার নানা আয়োজন থাকে, যেমন লাইব্রেরী, পার্ক, রেস্তোরা ইত্যাদি সেখানে সাধারণত ছাত্রছাত্রীরা যায়। তাই সেখানে ছেলে ও মেয়েদের এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, ন্যায্য দাবী ওঠে মেয়েদের অধিকার সম্বন্ধে। বিশ্বভারতীর হস্টেলে যারা থাকে তাদের কারো কারো বাড়ি মুলত কাছাকাছি গ্রামগুলিতে, এবং হস্টেলগুলি যেখানে অবস্থিত সেখানেও ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহার করার মত পাব্লিক রিসোর্স নেই। বা হস্টেলের ছাত্রীদের জীবনযাপনের মধ্যে বাইরে বেশি রাত পর্যন্ত কাজ করার অভ্যেস নেই বা কাজ ও তেমন নেই- একথা তারা সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন। বাড়িতে তারা নানা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে। বাড়ীর বাইরে যেতে পারে না নিজের ইচ্ছায়। বাবা অথবা দাদা সরাসরি না বললেও মাকে দিয়ে বলিয়ে দেন যে 'টাইট শর্ট টপ', 'ন্যারো জিন্স' পরা যাবে না। সালোয়ার কামিজ পরতে হবে। বাড়িতে সব ধর্মের, বর্ণের বন্ধুদের সাথে মেশার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা থাকে। ছেলেদের সাথে মেশা বারণ কারণ শেখানো হয়। প্রথমদিকে হস্টেলে এসে তাদের বাড়ি যেতে খুব ইচ্ছা করত। কিন্তু কিছুদিন কেটে যাবার পরই তারা বুঝতে পারে হস্টেলে তারা বেশি ভাল থাকে। সমবয়সীদের সাথে থাকার একটা আনন্দ তা উপভোগ করতে শুরু করে।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভুক্ত অংশগ্রহণকারীদের কথায় বাড়ীর তুলনায় হস্টেলে এসে তারা অনেক বেশি স্বনির্ভর, আত্মবিশ্বাসী হয়েছে বলে জানায়। নিজের সব কাজ এখন নিজে করতে পারে। সাকিনা দীর্ঘ সময় হস্টেলে থাকার পর বুঝতে পারে –

---

[74] অংশগ্রহণকারী বি.বি ১, রিনি মুর্মু, সাক্ষাৎকার, স্থান-শান্তিনিকেতন।

[75] অংশগ্রহণকারী বি. বি ৩, বেণু হাসদা, সাক্ষাৎকার, স্থান-শান্তিনিকেতন।

> আগে তো সব বিষয়ে নির্ভর করাটাই অভ্যাস ছিল। এখন মনে হয় শুধু যদি টাকা রোজগার করতে পারি তাহলেই কারো ওপর আর নির্ভর করতে হবে না। এখন একা কোন কাজ করতে বা কোথাও যেতে কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে অসুবিধা হয় না, আগে তো পরিস্থিতির কথা ভেবেই ভয় লাগত, মুখোমুখি যাওয়া তো অনেক দূরের ব্যাপার।[৭৬]

হস্টেল থেকে সে পেয়েছে মানসিক স্বনির্ভরতার পাঠ, এখন তার মনে হয় শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হতে পারলে তার স্বনির্ভরতা পূর্ণ হবে। সে জানায় তার এক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলে, উচ্চমাধ্যমিকের পর তার বিয়ে দেবার আয়োজন করেছিল বাড়ির লোকজন। সে আপত্তি জানিয়েছিল। বাবা মা জোর করলে সে বেশ কিছুদিন বাড়ি যাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং সে এই সংক্রান্ত ঝামেলা গুলো ফোনে হস্টেলে বসে করে। শেষ পর্যন্ত বিয়ে স্থগিত হয়ে যায়। সাকিনার কথা উদ্ধৃত করি –

> আমি বলছি না হস্টেলে এসে বিয়েটা বন্ধ করতে পেরেছি, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে আমি আর কোথায় যেতাম, আত্মীয় স্বজন কারো কাছে যাওয়া যেত না কারণ সবাই একই কথা বলছিল, সে মুহূর্তে হস্টেল ছিল আমার একটা স্বস্তিজনক আশ্রয়, কারণ এখানে কেউ আমাকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা বলে না, অন্তত আমার ব্যক্তিগত বিষয়ে, তাছাড়া বন্ধুরাও মানসিক ভাবে সাহস জুগিয়েছিল।[৭৭]

স্নাতক হবার পর তাকে বিয়ে করে নিতে হয়। তার উপলব্ধি সে হস্টেলে এসে অনেক স্বাধীনতা পেয়েছে। দৈনন্দিন প্রতিটি কাজে কেউ নাক গলায় না এখানে। বাড়িতে পোষাক একটা বিশেষ সমস্যা বলে তার মনে হয়। বিশেষ করে গরম কালে সে হস্টেলে থাকতে পছন্দ করে তার কারণ বাড়িতে থাকলে গরমের মধ্যেও প্রচুর পোষাক পরে থাকতে হয় যাতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে আসে। বাড়ীর পুরুষ সদস্যদের সামনে শুধু নয় নারী সদস্যদের সামনেও সংক্ষিপ্ত পোষাক বরদাস্ত করা হয় না। তার কথায় “আপাদমস্তক ঢাকা দেওয়া পোষাক পরাটাই নিয়ম। আর হস্টেলে পোষাক নিয়ে কেউ তেমন মাথা ঘামায় না। অন্তত হস্টেলের ভিতরে নিজের সুবিধামত বা ইচ্ছামত পোশাক পড়তে পারি”[৭৮] তবে বাইরে যাবার পোষাকের ক্ষেত্রে তার নিজের ইচ্ছা বা সুবিধা বহাল থাকে না। বোরখা সে পড়ে না কিন্তু সালোয়ার কামিজের সঙ্গে নেকাব, হিজাব পরাটা বাধ্যতামুলক। হস্টেলে থেকেও বাড়ির লোকের এই আদেশ সে অমান্য করতে পারে না। তার কারণ বাড়িতে জানতে পারলে নানা সমস্যায় পড়তে হবে। সামান্য বাইরে গেলেও সঙ্গে একজন ভাই বা দাদাকে পাঠানো হয়। আর নেকাব পড়তে হয়। হস্টেলে ধর্মীয় জীবন যাপনের সুব্যবস্থা থাকলেও কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তার মতে, এটা একটা দারুন সুবিধার ব্যাপার। সাকিনা জানায়,

---

[৭৬] অংশগ্রহণকারী যা.বি ৯, সাকিনা, সাক্ষাৎকার, স্থান- যাদবপুর।

[৭৭] অংশগ্রহণকারী যা.বি ৯, সাকিনা, সাক্ষাৎকার, স্থান- যাদবপুর।

[৭৮] অংশগ্রহণকারী যা.বি ৯, সাকিনা, সাক্ষাৎকার, স্থান- যাদবপুর।

পাঁচবেলা নামাজ পড়তে তার ভালো লাগে না। এখানে নিজের ইচ্ছা ও সময় মত নামাজ পড়ে। এনিয়ে কেউ কোনো কথা বলে না। হস্টেলে এসে সে 'অনেকবেশি নিজের মত' থাকতে পারে বলে জানায়। সে বিয়ের পর ও হস্টেলে থেকে পড়াশুনা করে। সে জানায় শ্বশুরবাড়ির তুলনায় হস্টেলে সে ভালো থাকে। ছুটিতে শ্বশুড়বাড়ী যায় এবং মাঝে মধ্যে স্বামী আসেন দেখা করতে। সে শ্বশুরবাড়ির সাথে মানিয়ে নিতে পারে না। তাছাড়া হস্টেলে পড়াশুনার পরিবেশ অনেক ভালো। এখন তো বাপের বাড়ি গেলেও পড়াশুনা হয় না, শ্বশুরবাড়ি গেলেও হয় না, একমাত্র এখানেই যতটুকু হয়।[৭৯]

পরিবার থেকে দূরে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষায় এসে যে পরিসর লাভ করে তা স্পেস হিসাবে যেমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তাদের কাছে। নিজেদের হস্টেলে নিজের জন্য কিছুটা জায়গা তাদের আন্দোলিত করে।প্রান্তিক ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষায় হস্টেল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসজীবনে লিঙ্গ বৈষম্য রয়েছে, তা সত্ত্বেও তারা বেশকিছু কারণে হস্টেলে নিজেদের সামনে নিয়ে যাবার রসদ সংগ্রহ করতে পারেন। পরিসর হিসাবে পরিবার থেকে হস্টেল ভিন্ন কিছু বৈশিষ্ট্য বহন করে যা প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে, এই অবস্থান তাদের প্রান্তিক অবস্থান থেকে কমতিগুলি কমাতে সাহায্য করে। তাদের বয়ান থেকে উঠে এসেছে অভিজ্ঞতা।

চিত্র- ৩২ প্রতিমা হস্টেল। ক্ষেত্রসমীক্ষাকালীন ছবি। নিজস্ব চিত্র।

[৭৯] অংশগ্রহণকারী যা.বি ৯, সাকিনা, সাক্ষাৎকার, স্থান- যাদবপুর।

চিত্র – ৩৩ আম্রপালি হস্টেল। ক্ষেত্রসমীক্ষাকালীন ছবি।

## মেয়েদের হস্টেল: বিকল্প সম্পর্ক নির্মাণের পীঠস্থান

রাষ্ট্র ও আইন রক্তসম্পর্কিত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ ছাড়া অন্য কোন সম্বন্ধের আইনানুগ স্বীকৃতি দেয় না। এর কেন্দ্রে নিহিত আছে পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটি সচল ও সুনিশ্চিত রাখার চেষ্টা। আইনানুগ সম্বন্ধগুলি যেন অচ্ছেদ্য এই জাতীয় একটি ভ্রম তৈরি করার চেষ্টা করা হয়। মানুষকে বিশেষ কতকগুলো সম্বন্ধের দিকে ঝুঁকে পড়তে বাধ্য করা হয়। বা প্রতিটি সম্বন্ধকে বৈবাহিক ও পারিবারিক তকমা দেবার প্রবণতা তৈরী করা হয়। কারণ এই দুইয়ের ওপর বহুকালের স্বীকৃতি আছে। এই দুই সম্বন্ধ যেন সার্থক এ জাতীয় ধারণা তৈরী করা হয়। মানুষের মধ্যেও তাই প্রবণতা তৈরী হয় সমস্ত সম্বন্ধকে এই দুই বৃহৎ ছাতার আওতাভুক্ত করার। নিবেদিতা মেনন পরিবার সম্বন্ধে বলেছেন- “Family is an institution with a legal identity, and the state recognizes as a family, only a specific set of people related in a specific way. It is not only the law that defines ‘family’-extra legally too, you are forced into being part of a family which is strictly defined in this narrow way.” (Menon, 2012, pp -5)

পারিবারিক সম্পর্কগুলো ছিন্ন করতেও নানা আইনি ঝক্কি পোহাতে হয়। অন্যদিকে এই আইনি স্বীকৃতি না থাকায় বাকী সম্পর্কগুলো ঢেউ এর মত আসে আর ফিরে যায়। বিষয়টি আপাতভাবে স্বাভাবিক বলে মনে হলেও মানুষের সম্পর্ক নির্মাণের প্রক্রিয়াটি সুনিপুণভাবে নির্ধারিত, নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। আইনানুগ স্বীকৃতি নেই তাই বাকী সম্বন্ধগুলো একটা সময়েরপর হারিয়ে যায়, অজান্তেই আমরা সেই সব সম্পর্ক নির্মাণের ক্ষেত্রে একটি সীমানা নির্ধারণ করে। এখানে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধের উত্তাপের পাশাপাশি ক্রিয়াশীল থাকে ধারাবাহিক ভাবে চলে আসা সম্পর্ক সম্বন্ধীয় সংস্কার। যা কিছু আমরা স্বতঃস্ফূর্ত মনে করি তা আসলে নিয়ন্ত্রিত হয় বহুকালবাহিত বদ্ধমূল ধারণার দ্বারা। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় আমরা চাইলেও বন্ধুদের সাথে ব্যাঙ্ক একাউন্ট করতে পারি না। একজন শিক্ষিতা অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী নারী ও ইচ্ছা থাকলেও পারে না বন্ধুদের জন্য খরচ করতে। ছেলেরা হয়তো কিছুটা পারে, কিন্তু মেয়েদের নিজের রোজগারের টাকার ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ থাকে না। নিজের বোন বা ভাইয়ের জন্য যতটা খরচ আমরা করতে পারি, বন্ধুদের জন্য করি না বা করতে পারি না, পরিবার করতে দেয় না। মানুষ দায়বদ্ধতা শেখে সামাজিক মূল্যবোধ থেকে। এটা মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে খুব অসহায় একটা অবস্থা। পরিবারের বাইরে মানসিক কোন সম্পর্ক কে এগিয়ে নিয়ে যাবার বিষয়ে সমাজ পৃষ্ঠপোষকতা করে না। অনেক সময় দেখা যায়, নিজের ভাই বোনের সঙ্গে মানসিক যোগাযোগ অনেক কম, বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়তো অনেক বেশি। তবু তাদের ত্যাগ করতে বাধ্য হই আমরা। বা সম্পর্ক গুলো একটা সীমার মধ্যে রাখি। এক্তিয়ারটা বাড়াই না। এখন প্রশ্ন, এগুলো আমরা খুব স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে করি নাকি সমাজ আমাদেরকে অলক্ষে বাধ্য করে। পারিবারিক সম্পর্ক সম্বন্ধে নিবেদিতা মেননের আরো একটি বক্তব্য উল্লেখ করি- "What is a family? a group of people who love and support one another over good and bad time? but just any group of people who do this are not recognized as a 'family'." (Menon, 2012, pp-5) পরিবারের মধ্যে মা বাবা, সন্তান, ভাই বোন আত্মীয় এই সম্পর্কগুলো আবেগ, নিরাপত্তাবোধ, সামাজিক পরিচিতি ইত্যাদি দ্বারা বেঁধে রাখা হয়। অন্যদিকে, হস্টেলে একত্রে দীর্ঘকাল বসবাসের ফলে নানা একাত্মতা তৈরী হয়। প্রতিটা দিন, প্রতিটামুহূর্ত প্রতিদিনের ভালো থাকা, মন্দ থাকার সঙ্গী, সব ধরনের পরিস্থিতি যাদের সঙ্গে রোজ কাটাতে হয়, ভাগ করে নিতে হয় আনন্দ বিষাদ অবসাদ, বড় হয়ে ওঠার যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বছরগুলো একসাথে কাটে। পারিবারিক সম্বন্ধের বাইরে অনেক গভীর সম্পর্ক তৈরী হয়। হস্টেল ছাড়ার পর এই সম্পর্কগুলো হারিয়ে যায় কিন্তু রক্তসম্পর্কিত আত্মীয়তাগুলি নানা মনোমালিন্য সত্ত্বেও থেকে যায়। সাংস্কৃতিক নির্মাণের দ্বারা সম্পর্কের এক্তিয়ার এবং স্থায়িত্বের ধারণা তৈরী হয়। পরিবার বিচ্ছিন্নতার ফলে বিকল্প সম্পর্কগুলো মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে হস্টেলে, বাড়ির সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্কগুলো ক্রমে আলগা হয়ে আসে কারণ মানুষ হস্টেলে এসে নিজের জীবনকে নতুন ভাবে চিনতে শেখে দেখতে শেখে, কিন্তু পরিবারের সঙ্গে আলগা সম্পর্ক গুলো হারিয়ে যায় না। সামাজিক অদৃশ্য সুতো দিয়ে

বাঁধা থাকে। সমাজের পৃষ্ঠপোষকতার জন্যই এই সম্বন্ধগুলো আজীবন থেকে যায়। সম্পর্ক যদি পারস্পরিক বেঁচে থাকার প্রাত্যহিকতায় তৈরী হয় তাহলে হস্টেলে যাদের সঙ্গে বছরের পর বছর একত্র বসবাস সেই সম্বন্ধগুলো ধীরে ধীরে লঘু হতে থাকে কেন। কারণ সংস্কারের দেওয়াল তৈরী হয় সামনে। আত্মীয় ও অনাত্মীয় সম্বন্ধীয় ধারণাটি তৈরী হয় পরিবার ব্যবস্থাকে সামনে রেখে। রাষ্ট্র আইন সেখানে স্বীকৃতির শীলমোহর দেয়। 'আপন' ও 'পর' ধারণাটিও তৈরী হয়েছে রক্তসম্পর্কিত সম্পর্কের হাত ধরে। এই সূত্র ধরে এগোলে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার ওপর প্রতিষ্ঠিত পরিবার প্রথাটির ভিত্তিতে পৌঁছানো যায়। এবং একটা বিষয় লক্ষ্য করার এই সামাজিক 'আপন' 'পর' ধারণাটি কখনোই কুলের বাইরে যায় না। এই ভাবেই নির্মিত হয়েছে মানুষের সম্পর্কের সামাজিক সংস্কার। আবার দেখা যায় ছেলেদের ক্ষেত্রে বন্ধুত্বের পরিসর যতটা বজায় থাকে শেষ পর্যন্ত মেয়েদের থাকে না, আমাদের আগের প্রজন্ম, বাবাদের যত বেশি বন্ধু সংসর্গ দেখা যায়, মায়েদের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। মেয়েদের কে অনেক বেশি সমাজ ও পরিবার অনুবর্তী করে রাখা হয়, গন্ডীর ভিতরে আরো ছোট ছোট গন্ডী আছে যার ভিতরে মেয়েদের নিজের জায়গা খুব সংকুচিত হয়ে আসে।

চিত্র – ৩৪ ক্ষেত্রসমীক্ষাকালীন ছবি, বড় পুকুর ডাঙা, নিজস্ব চিত্র।

বিশ্ববদ্যালয়ের নিয়ম সব হস্টেলের জন্যই প্রণীত হলেও কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বয়েজ হস্টেলে লাগু হয় না। মেয়েদের হস্টেলে লাগু হয় এবং কিছুক্ষেত্রে অতিরিক্ত ভাবে। বিশ্বভারতীর গবেষক ছাত্রী হেম চন্দ বলছেন,

> যেন ছেলেরা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আপন সন্তান আর মেয়েরা হচ্ছে সৎ সন্তান। হস্টেল মানে তো হস্টেল সেটা ছেলেদেরই হোক আর মেয়েদেরই হোক। ছেলেরা মানেনা নিয়ম আর সেটাই যেন

> অলিখিত নিয়ম যে ওরা মানবেনা নিয়ম। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে এতবেশি কড়াকড়ি সেটা আমার অস্বাভাবিক মনে হয়। আমাদের হস্টেলে হিটার রাখা বন্ধ হয়ে গেল। সব হিটার কেটে মাত্র একটা রাখা হল জল গরম করার জন্য। এদিকে ছেলেদের প্রত্যেকের রুমে হীটার। তারা ব্যবহার করে রান্না করে। এমনকি শীতকালে এমনিই জ্বালিয়ে রাখে রুম গরম করার জন্য এদিকে আমাদের হস্টেলে শুধু জল গরম করার পারমিশন। ছেলেদের হস্টেলে একটা প্রচলিত কথাই আছে 'আমরা তো হিটার জ্বালাই বিড়ি ধরানোর জন্য'। আর আমরা একটা হিটার নিয়ে আটটা রুমের মেয়ে জল গরম করতাম বা ম্যাগী বানাতাম।[৮০]

হস্টেলে রাতে ঢোকার একটা নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে মেয়েদের। ছেলেদের কোন নিয়ম নেই। বা বাইরের কেউ আসতে পারতে পারত না মেয়েদের হস্টেলে। ছাত্রীর মা এলে দিনের বেলায় এক ঘন্টা মত থাকতে পারত। অন্যদিকে ছেলেদের হস্টেলে অবারিত দ্বার। তাদের হস্টেলে আসা যাওয়ার কোন সময়ের ব্যাপার নেই। যে যখন খুশি আসে, যখন খুশি যায়। তাদের বাড়ির লোক এসে তাদের সঙ্গে থাকে হস্টেলে কয়েকদিন। একবার মেয়েরা যখন বোর্ডার হিসাবে বেরিয়ে আসে সেকেন্ড টাইম তারা আর হস্টেলে ফিরে যেতে পারে না, ঢুকতে দেয় না। কিন্তু ছেলেদের হস্টেলে অনেক প্রাক্তন ছাত্র আসে থাকে এমনকি অনেকে আছে যারা চাকরি পাবার পরেও কয়েকমাস হস্টেলেই থেকে যায় যতদিন না ঠিকঠাক রুম পাচ্ছে। মেয়েদের নো ডিউজ করানোর পর দিনই জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ি চলে যেতে হয় হস্টেল ছেড়ে দিয়ে। কোনো প্রোগ্রাম বা ট্যুর অ্যারেঞ্জ করার ক্ষেত্রে সব দায়িত্ব দেওয়া হয় ছেলেদের হাতে, যেন ভেবেই নেওয়া হয় যে ওরাই সব পারবে। আর মেয়েরা কিছু পারবে না। মেয়েরা শুধু যাবে। দায়িত্ব শুধু ছেলেদেরই থাকবে।

**পরিশেষ**

দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থানিক, আদর্শগত এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পুর্ণ ভিন্ন হওয়ায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের ক্যাম্পাসের এবং হস্টেলের অভিজ্ঞতা ভিন্ন ভাবে তৈরি হয়। বিশ্বভারতীতে হস্টেলে যে ভগ্নীত্ব তৈরি হয় তার চরিত্র যাদবপুরে ভিন্ন। যাদবপুর ক্যাম্পাসের সে প্রতিবাদী বৈশিষ্ট্য বিশ্বভারতীর থেকে আলাদা। তাই মেয়েরা যখন আসছে দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের ক্যাম্পাসের সঙ্গে এবং হস্টেলের সঙ্গে যে সম্বন্ধ তৈরি হচ্ছে তা ভিন্ন। বিশ্বভারতীতে হস্টেলে রাবীন্দ্রিক সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের আঁচ প্রান্তিক ছাত্রীরা বোধ করেন এবং নিজেদের সংস্কৃতি থেকে ক্রমে বাহ্যিক ভাবে বিচ্ছিন্ন হতে হতে মানসিক ভাবে বিচ্ছিন্নতার দিকে এগিয়ে যান। দুটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রান্তিকতাকে সাংস্কৃতিক ভাবে ভিন্ন ভাবে দেখে, সেখানে ছাত্রীরা নিজেদের আত্মপ্রকাশ করেন ভিন্ন ভাবে, যাদবপুরে ছাত্রীরা নিজেদের পরিচিতি এবং অধিকার বিষয়ে যতটা সরব বিশ্বভারতীতে অংশগ্রহণকারী ছাত্রীরা নিজেদের পরিচয় লুকিয়ে রাখতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। দুটি

---

[৮০] অংশগ্রহণকারী বি. বি ৫, হেম চন্দ, সাক্ষাৎকার, স্থান-শান্তিনিকেতন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসজীবনের অভিজ্ঞতা এবং ক্যাম্পাসের অভিজ্ঞতা ভিন্ন ভাবে নির্মিত হয়েছে অংশগ্রহণকারী ছাত্রীদের।

আবাসিক মেয়েদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক একটি স্বতন্ত্র মাত্রায় উঠে এসেছে সাক্ষাৎকারে। যেখানে তারা নিজেদের ক্ষমতা, সামর্থ্য, পারদর্শিতা পরস্পরের উন্নতির জন্য কাজে লাগায়। পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোয় মহিলাদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় পুরুষতন্ত্র দ্বারা। হস্টেলে সেই প্রভাব তুলনামূলক ভাবে কম। এখানে মেয়েদের মধ্যে শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্বন্ধ তৈরি হয়। শ্রীসদনের স্মৃতিকথায় যেকথা বারবার উঠে আসছে আবাসিকাদের মধ্যে সুমধুর সম্বন্ধ। 'আমাদের শান্তিনিকেতনের দিদিরা' গ্রন্থে যে দিদিদের কথা উল্লিখিত হয়েছে, আদতে বর্ণিত হয়েছে আবাসিকাদের মধ্যস্থ সুনিবিড় সৌহাদ্রপূর্ণ সম্বন্ধ। যেখানে পড়াশুনা সূত্রে তারা আজীবনের জন্য নির্মাণ করে নেয় সম্বন্ধ যা বহু বছর পরেও থাকে অমলিন। আদিবাসী এক ছাত্রী যেমন সাক্ষাৎকারে জানাচ্ছেন কিভাবে তিনি আবাসিকা দিদিদের কাছ থেকে শিখে নিয়েছেন বাংলা ভাষা, টিউশনি নেবার সামর্থ্য নেই কিন্তু সিনিয়র দিদিদের কাছ থেকে পড়াশুনা সে দেখে শুনে নিতে পারে। আবাসিকা নারীদের মধ্যে এই পারস্পরিকতার সম্বন্ধ আবাসজীবনের একটি সম্ভবনাকে উজ্জ্বল করে তোলে। মেধা তালিকা সূত্রে এবং সংরক্ষণ সূত্রে এই প্রান্তিক ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে পৌঁছেছেন। সাংবিধানিক অধিকার বলে তারা শিক্ষার অধিকার লাভ করেছেন কিন্তু পরিকাঠামোগত এবং বিদ্যমান ক্ষমতা সম্পর্কের অন্তস্থ বৈষম্যের সম্মুখীন তারা হন। প্রথম প্রজন্ম হিসাবে ছাত্রীরা যে সমস্যার সম্মুখীন হন এবং প্রান্তিক হিসাবে ছাত্রীরা যে সমস্যার সম্মুখীন হন তা একদিকে প্রান্তিক পুরুষের অভিজ্ঞতার থেকে ভিন্ন অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চবর্ণের ছাত্রীদের থেকে আলাদা এবং স্বতন্ত্র। পুর্ববর্তী ও বিদ্যমান সূত্র থেকে ধারাবাহিকতায় এই অধ্যায়ে দেখলাম যে প্রাপ্ত বাস্তবতা থেকে অর্জিত বাস্তবতার যে আশ্বাস 'উচ্চশিক্ষা'য় দেওয়া হয়– তার মধ্যবর্তী ব্যবধান এবং আশাভঙ্গ দুই এর মাধ্যমে নির্মিত হয় প্রান্তিক ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার যাত্রা এবং অভিজ্ঞতার বুনট। সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান, পরিসরগুলির সঙ্গে একজন প্রান্তিক ছাত্রীর সম্বন্ধ লিঙ্গগত এবং জাতিগত ক্ষমতা সম্পর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রান্তিক ছাত্রীর উচ্চশিক্ষায় অংশ নেওয়া সেই বিদ্যমান ক্ষমতা সম্পর্ককে আন্দোলিত করে এবং সম্পর্কের সমীকরণটির তৃতীয় মাত্রার জন্ম দেয়। নব নির্মিত আত্মবোধ যা বিদ্যমান ক্ষমতা সম্পর্ককে প্রশ্ন করে। আর্থ-সামাজিক, শ্রেণি-জাতিগত বাস্তবতা যে আত্ম পরিচিতি বোধ এবং সংযুক্তির বোধ তৈরি করে তার ভিত্তিতে নির্মিত হয় অভিজ্ঞতা। প্রান্তিক ছাত্রীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান তাদের অভিজ্ঞতা নির্মাণ করে এবং অভিজ্ঞতার স্বাতন্ত্র্য তৈরি করে যা তাদের সাক্ষাৎকারের ভাষায় প্রতিফলিত। যা অন্যান্য ছাত্র এবং ছাত্রীদের অভিজ্ঞতা থেকে আলাদা এবং স্বতন্ত্র। পরিবারে তারা লিঙ্গ বৈষম্য পেয়েছে, যেখানে পরিবারের পুরুষদের দ্বারা নির্যাতিত, অন্যদিকে তারা হস্টেল গণতান্ত্রিক পরিসর তারা পেয়েছে, সমর্থন পেয়েছে এবং সামনে এগিয়ে যাবার দিশা পেয়েছে হস্টেলে নিজেরা স্বশক্তিকরণ করতে পারছে, নবনির্মিত আত্ম বোধ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। পরিবার থেকে বাইরে এসে

হস্টেলে তারা নিজেদের আবিস্কার করেছে। পরিসর দুটি তাদের ভিন্ন আত্ম-পরিচয়ের সঙ্গে তাদের ভিন্ন ভাবে অন্বিত করার অবকাশ তৈরি করেছে। পরবর্তী অধ্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে তারা যে সমস্যা, প্রতিকূলতার সম্মুখীন হন তা সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে আলোচিত হল।

চিত্র – ৩৫ অংশগ্রহণকারীর বাসস্থান, বড়পুকুরডাঙা, বীরভূম, ক্ষেত্রসমীক্ষাকালীন পরিবার পরিদর্শনের ছবি, নিজস্ব চিত্র।

চিত্র – ৩৬ অংশগ্রহণকারীর গৃহস্থালি,বর্ধমান, ক্ষেত্রসমীক্ষাকালীন পরিবার পরিদর্শনের ছবি, নিজস্ব চিত্র।

# চতুর্থ অধ্যায়

## বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে প্রথম প্রজন্মের ছাত্রীদের ক্ষমতায়নের লড়াই, অভিজ্ঞতা ও প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য

# চতুর্থ অধ্যায়

# বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে প্রথম প্রজন্মের ছাত্রীদের প্রান্তিক অবস্থান, অভিজ্ঞতা ও প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য

"নগর বাহিরে রে ডোম্বি তোহারি কুড়িয়া"[১]

চর্যাপদ ।

চর্যাপদের কবি দশম শতকে লিখেছিলেন ডোম্বিনীর প্রান্তিকতার কথা। যেখানে ডোম্বিনীর কুঁড়ে ঘর নগরের বাইরে। 'নগর'-এর পরিসরে তার স্থান নেই। স্থানিক পরিসর গত দিক থেকে ডোম্বিনীর প্রান্তিকতার ছবি চর্যাপদে রয়েছে (দাশ, ১৯৯৭)। সামাজিক অন্যান্য পরিসরের মত জ্ঞানচর্চার জগত যা বহুদিন পর্যন্ত ছিল উচ্চবর্ণের আয়ত্তাধীন। ধীরে ধীরে সেই স্থানে সেই চর্চায় যখন এলেন নিম্নবর্গ এবং নিম্নবর্গের নারী। এই স্থানিক পরিসরের সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ গড়ে উঠল। একাত্ম হয়ে উঠল কি? অনাহুতের মত সে কি স্থান পেল এই পরিসরে অথবা তার 'প্রবেশ' হয়ে উঠল 'অনুপ্রবেশ'! এই অধ্যায়ে মূলত বিশ্লেষিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে লিঙ্গগত, জাতিগত, শ্রেণিগত, বর্ণগত বৈষম্য কিভাবে টিকে আছে এবং অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতা থেকে কিভাবে প্রতিফলিত হয় এই বাস্তবতা। বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে বৈষম্য বিরোধী সচেতনতার চর্চা ও প্রচার চলতে থাকলেও কাঠামোগত বদল না হলে উপরিতলের কোন বদলই দীর্ঘস্থায়ী হয়না ও মৌলিক কোনো পরিবর্তন হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে প্রান্তিক ও প্রথম প্রজন্মের ছাত্র ছাত্রীরা কি সমান ভাবে আদৃত হন? নাকি বৈষম্যের সম্মুখীণ হন? ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীদের ক্ষেত্রে সমস্যা গভীরতর। প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক ছাত্রীদের পরিবারের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে লড়াই করে পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়া – তার জীবনে প্রতিকূলতা ও সংগ্রামের একটি দিক বা মাত্রা। বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে তাদের দূর্ভোগ শেষ হয় না, বরং শিক্ষা ও স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে আরেকটি লড়াই শুরু হয়। চুনি কোটাল এবং রোহিত ভেমুলার আত্মহত্যা প্রতিষ্ঠানের যথাযথ সংবেদনশীলতা অভাবকে নগ্ন করে তুলেছিল। অনেক ক্ষেত্রে যারা প্রান্তিক পরিসর থেকে এসে উচ্চশিক্ষায় নিযুক্ত হয়েছেন তাদের সমস্যাগুলি চাপা পড়ে যায়। এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারীরা সাক্ষাৎকারে প্রান্তিক ছাত্রীরা জানাচ্ছেন তাদের সমস্যা, উপলব্ধি এবং অভিজ্ঞতার কথা। একজনের 'সমস্যা', ব্যক্তির 'লড়াই' সামাজিক বৃহত্তর সংগ্রামে পরিণত হচ্ছে না, নিজস্ব ভোগান্তি হয়ে থেকে যাচ্ছে। অংশগ্রহণকারীদের 'ব্যক্তিগত 'সমস্যা' গুলি সামাজিক এবং সার্বিক রাষ্ট্রিক কাঠামোর অন্তর্গত সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। এই অধ্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার পর প্রান্তিক ছাত্রীদের কি ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এবং তার পটভূমি ও ভিত্তি কি, সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে আলোচিত হল।

---

[১] চর্যাপদ, কাহ্নপাদের পদ, পুঁথি পৃষ্ঠা ১৬।

প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক ছাত্রীরা উচ্চশিক্ষা সূত্রে যে পরিসরগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে যুক্ত থাকেন এবং সে পরিসরগুলির সঙ্গে দৈনন্দিন সম্বন্ধ তাদের বাস্তবতাকে আকার দেয় ও তাদের অবস্থানের ভিত্তি নির্মাণ করে। পরিবার, বিশ্ববিদ্যালয়, হস্টেল এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ যোগ অন্যদিকে পরিবার, তার বিশেষ সম্প্রদায়, সংলগ্ন সমাজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হস্টেল, ভিন্ন একটি শহর, তার পরিবারের ভৌগোলিক এলাকা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত যাত্রাপথ— এই স্থানিক পরিসরের সঙ্গে তারা যুক্ত থাকে প্রাত্যহিক ভাবে। এই পরিসরগুলির কয়েকটি প্রচলিত অর্থে 'ব্যক্তিগত পরিসর' এবং অন্যগুলি 'বাহ্যিক পরিসর' যেমন যাত্রাপথ, ক্যাম্পাস ইত্যাদি। আবার এই পরিসরগুলির আবেদন বদলে যায় ব্যক্তির সঙ্গে তার সম্বন্ধের সমীকরণে। পিতৃতান্ত্রিক সংজ্ঞায় 'ব্যক্তিগত পরিসর' অন্বিত হয়ে থাকে লৈঙ্গিক ভূমিকার সঙ্গে এবং নারীর কাছ থেকে প্রত্যাশিত পরিষেবার ওপর। বাহ্যিক পরিসর প্রান্তিক ছাত্রীর উপস্থিতিকে কিভাবে দেখে এবং ছাত্রীটি তার সঙ্গে একাত্মতা বোধ করে কিনা তার ভিত্তিতে একটি সম্বন্ধ নির্মিত হয়। আলোচ্য দুটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত। বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে এবং পরিসর হিসাবে তাদের বৈশিষ্ট্য আলাদা। এই অধ্যায়ে মূল প্রশ্ন হল আর্থ-সামাজিক এবং জাতি এবং লিঙ্গগত অবস্থানের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কিভাবে ছাত্রীদের সম্বন্ধ বদলায় এবং ক্ষমতায়নের সূত্রপাত হয়? দ্বিতীয়ত, বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে প্রথম প্রজন্মের ছাত্রীদের 'খাপ' খাওয়াতে কি ধরনের 'সমস্যা' হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিকাঠামোর মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য কিভাবে টিকে আছে?

বিষয়টি আলোচনার জন্য কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমত, প্রান্তিক ছাত্রীর ক্ষমতায়নে উচ্চশিক্ষার সদর্থক ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা করা হয়, সামাজিক ক্ষমতার ধারণা এবং ব্যক্তির স্বশক্তিকরণের আলোচনার পাশপাশি শিক্ষা কিভাবে প্রান্তিক ছাত্রীদের স্বশক্তিকরণের প্রকরণ হয়ে উঠতে পারে উল্লিখিত হয়েছে। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে প্রথম প্রজন্মের ছাত্রীদের আত্মপরিচিতির সংকট, জাতি, শ্রেণি এবং লিঙ্গগত পরিচয় নিয়ে তাদের লজ্জা থেকে সাংবিধানিক অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বর্ণিত হয়েছে, পরবর্তীতে স্কুল এবং কলেজে প্রান্তিক ছাত্রীদের ড্রপ আউট হবার কারণ এবং এগুলি দিয়ে উচ্চশিক্ষায় প্রান্তিক ছাত্রীদের 'লড়াই' নির্মিত হয় আলোচিত হয়েছে এবং এই দীর্ঘ লড়াইএ তারা কিভাবে সমর্থনের নেটওয়ার্ক তৈরি করছে উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠছে তার উচ্চশিক্ষার সাফল্যে। এরপর আলোচিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে দ্বিমাত্রিক দৃষ্টিসংস্কার কিভাবে প্রান্তিক ছাত্রীদের আত্মবিশ্বাস, আত্ম-মর্যাদা এবং অবস্থানকে প্রভাবিত করে। পরবর্তী বিভাগে আলোচিত হয়েছে প্রান্তিক প্রথম প্রজন্মের ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার পরিসরে ভাষাগত সমস্যা, এক ভাষার অন্তস্থ প্রামাণ্যতা এবং আঞ্চলিকতা কিভাবে তাদের অভিজ্ঞতাকে প্রভাবিত করে, পরবর্তী বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে জাতি, জাতিহীনতা এবং বিচ্ছিন্নতা বিশ্লেষিত হয়েছে, এরপর উচ্চশিক্ষায় বর্জনের নৈঃশব্দ এবং নীরবতার অস্ত্র, প্রান্তিক ছাত্রীদের সঙ্গে আনুগত্য আর হীনমন্যতার রাজনীতি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। পরবর্তী বিভাগে প্রান্তিক ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক

মুলধনের অভাব কিভাবে তাদের উচ্চশিক্ষার অভিজ্ঞতায় ভূমিকা নেয় আলোচিত হয়েছে, এরপর ‘হস্টেল’ ও ‘আবাসিকা’দের সম্পর্কে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নির্মাণ ও ছাত্রীদের দৈনন্দিন বাস্তবতা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে, পূর্ববর্তী তৃতীয় অধ্যায়ে হস্টেলে এবং প্রান্তিক ছাত্রীদের আবাসজীবন তাদের নবনির্মিত আত্মবোধের আধার হিসাবে আলোচিত হয়েছে, এই অধ্যায়ে মেয়েদের আবাসজীবনের ভিন্ন একটি বাস্তবতা এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক নির্মাণ চিহ্নিত হয়েছে। শেষ অংশে কিভাবে প্রান্তিক ছাত্রীরা স্ব-প্রণোদিত এবং উচ্চশিক্ষার যাত্রায় ব্যক্তিগত সংগ্রামের মধ্যে ‘ভিতরের ক্ষমতা’ কে জাগিয় তোলে এবং স্বশক্তিকরণে সামিল হয় বিশ্লেষিত হয়েছে। এই কয়েকটি বিষয়ের ভিত্তিতে এই অধ্যায়ের মূল প্রশ্নে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

**প্রান্তিক ছাত্রীর ক্ষমতায়নে উচ্চশিক্ষার সদর্থক ভূমিকা**

ক্ষমতায়নের একটি নির্দিষ্ট লিঙ্গগত অর্থ রয়েছে যা বিভিন্ন ধরনের সামাজিক বিভাগের মধ্যে এবং সর্বত্র পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে ক্ষমতার সম্পর্ককে রূপান্তরিত করে। ক্ষমতায়ন তিনটি উপায়ে সামাজিক ক্ষমতার পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়, অর্থনৈতিক, প্রাকৃতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের উপর প্রবেশাধিকারের মাধ্যমে এবং সামাজিক বৈষম্যকে লাগু করার এবং নিয়ন্ত্রণ করার প্রচলিত নিদর্শনগুলির পরিবর্তন করে (যেমন লিঙ্গ বা বর্ণ) বিদ্যমান ক্ষমতার কাঠামোকে ন্যায্যতা দেয় এমন মতাদর্শগুলিকে চ্যালেঞ্জ করে এবং (যেমন পরিবার, রাষ্ট্র, বাজার, শিক্ষা এবং মিডিয়া) প্রতিষ্ঠান ও কাঠামো যেগুলি বিদ্যমান ক্ষমতা কাঠামো এবং সামাজিক অসাম্যকে শক্তিশালী ও বজায় রাখে সেগুলিকে রূপান্তরিত করে (Batiliwala, 1993, P -15)। এই বিষয়ে গবেষকরা ক্ষমতায়নের প্রশ্নটি তৈরি করেছেন পছন্দের কাঠামোর মধ্যে। কবীরের মতে, ক্ষমতায়ন হল সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মহিলারা কৌশলগত জীবন বেছে নেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করেন (Kabeer, 2001)। নারীর ক্ষমতায়ন মানে নারীদের কী বেছে নেওয়া উচিত তা নির্ধারণ করা নয়, বরং বেছে নেওয়ার ক্ষমতা বাড়ানো এবং সেই পছন্দের ফলাফল সর্বোচ্চ করে তোলার কথা বলা হয় (Kabeer, 1999)। গন্তব্যের পরিবর্তে প্রক্রিয়াটিকে গুরুত্ব এবং মনোযোগ দেওয়া হয় যাতে সেই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণগুলি সূক্ষ্মভাবে বোঝা যায় যেগুলি মহিলাদের পছন্দকে সীমাবদ্ধ করে এবং অন্যদিকে যে কারণগুলি ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় মহিলারা গ্রহণ করতে, পুনরুৎপাদন করতে, সংস্কার করতে বা প্রত্যাখ্যান করতে চান। কবীর ক্ষমতায়নের তিনটি আন্তঃসম্পর্কিত প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলেছেন-সম্পদ[২], কর্তৃত্ব[৩] এবং সাফল্য (ভাল থাকার ফলাফল)। ক্ষমতায়ন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে দুটি ধারণা রয়েছে কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা। বাটলিওয়ালার ক্ষমতায়ন যেভাবে তত্ত্বায়িত করেছেন, তিনি সামাজিক শক্তির পরিবর্তনের সূচক হিসাবে বিষয় দেখেছেন তিনটি

[২] বস্তুগত, মানব ও সামাজিক সম্পদে প্রবেশাধিকার।

[3] আলাপ-আলোচনা, নস্যাৎ করা ও প্রতিরোধ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া।

আন্তঃসম্পর্কিত প্রক্রিয়া-মতাদর্শকে চ্যালেঞ্জ করা; বস্তুগত, মানব ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ব্যবহারের ধরন পরিবর্তন; এবং প্রতিষ্ঠান ও কাঠামোর রূপান্তর—যেগুলির দ্বারা কিছুটা বুঝতে পারি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মতো যে কোনও সমষ্টিগত নির্মাণ প্রক্রিয়া (Batliwala, 1993)। যদি এই ধরনের গোষ্ঠীগুলিকে গ্রামীণ মহিলাদের জীবনে প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতায়ন করতে হয়, তবে তাদের রোল্যান্ডস যেভাবে (Rowlands, 1997) সংজ্ঞায়িত করেছেন, গ্রামীণ মহিলাদের জন্য এই তিন প্রকার ক্ষমতা বাড়ানোর প্রক্রিয়া চালু রাখতে সক্ষম হতে হবে।

ক। 'কিছুর প্রতি ক্ষমতা' হল নিজের জীবন সম্পর্কে নিজে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং সেগুলির উপর কাজ করার স্বাধিকার। এটি কবীর বর্ণিত কর্তৃত্বের ধারণাতেও বোঝা যায় যেখানের কর্তৃত্ব হল সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া এবং আলোচনা, তর্ক এবং প্রতিরোধের ইত্যাদিও এর দ্বারা অল্প বিস্তর চালিত হয়ে থাকে (Kabeer, 1999)। এই ধরনের কর্তৃত্ব বা 'ক্ষমতা' যে আধারের মাধ্যমে কাজ করে তা প্রায়শই ব্যবহারযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রণ, বস্তুগত, সামাজিক এবং মানবসম্পদের প্রতি অধিকার ও দাবী। এই ধরনের 'পাওয়ার টু' বা কর্তৃত্বের প্রক্রিয়াগুলির গুরুত্বপূর্ণ ফলাফলগুলি বস্তুগত, সামাজিক এবং মানবসম্পদ, যা ব্যক্তিতে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, আয়, স্বাস্থ্য বা সরকারী অধিকারের পেতে সহায়তা করে।

খ। 'ভিতরের ক্ষমতা' বলতে বোঝায় ব্যক্তির চেতনা, যেখানে মহিলারা কেবল সেই নিয়ম, কাঠামো এবং প্রতিষ্ঠানগুলিকে চিহ্নিত, প্রতিফলিত এবং বিশ্লেষণ করেন না যেগুলি তাদের সীমাবদ্ধ করে, নিপীড়ন করে, এবং প্রান্তিক করে, বরং এই ধরনের নিয়ম এবং কাঠামোগুলিকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য প্রয়োজনীয় আত্মসম্মান, আত্মবিশ্বাস এবং আত্ম-মূল্যবোধও অর্জন করেন। এই চেতনা গঠনের অংশ হিসাবে সম্প্রদায়ের নেতৃত্বও তৈরি হয়।

গ। 'পাওয়ার উইথ' বলতে বোঝায় একই ধরনের কাঠামো এবং পীড়ন ও প্রান্তিকতার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মহিলাদের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন ও ভাগ করে নেওয়ার প্রক্রিয়া এবং একত্রিত ভাবে প্রতিষ্ঠান, কাঠামো, নিয়ম পরিবর্তন এবং বস্তুগত, সামাজিক ও মানবসম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণের অসম ব্যবহার যোগ্যতার বিরুদ্ধে সম্মিলিত পদক্ষেপে জড়িত হওয়া।

আন্দ্রেয়া কর্নওয়ালের ভাষায় (Cornwall, 2016) ক্ষমতায়ন এমন কিছু নয় যা মহিলাদের প্রতি বা তাদের জন্য করা যায়। যখন মহিলারা তাদের 'ভিতরের শক্তি' চিনতে পারেন এবং অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে 'ক্ষমতা' প্রয়োগের জন্য একত্রিত ভাবে কাজ করেন, তখন তারা এজেন্ট হিসাবে কাজ করার 'ক্ষমতা' অর্জন করেন; যখন তারা অবিচার ও বৈষম্য মোকাবেলায় সম্মিলিতভাবে কাজ করেন, তখন এটি ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তনের 'শক্তি' হয়ে ওঠে। 'ভিতরের ক্ষমতা' কেবল আত্মবিশ্বাস এবং আত্ম-মূল্যবোধকেই বোঝায় না, বরং নিপীড়নমূলক কাঠামো এবং প্রতিষ্ঠানগুলিকে শনাক্ত ও চ্যালেঞ্জ করার

ক্ষমতাও বোঝায়। এটি একটি অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন, যার মাধ্যমে একজন আদর্শিক স্তরে সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটায় এবং সমাজে নারীদের কাজ করার সীমা ও সীমানা নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

উচ্চশিক্ষায় সুবিধাবঞ্চিত, পিছিয়ে পড়া বর্ণের শিক্ষার্থীদের জন্য 'ক্ষুদ্র আগ্রাসন' (microaggression) একটি দৈনন্দিন এবং সাধারণ অভিজ্ঞতা। মাইক্রোঅ্যাগ্রেশন চার ধরনের হয়ঃ ক্ষুদ্র অপমান যা মৌখিক এবং অমৌখিক আক্রমণ, যেমন নাম-তোলা, হুমকি, অবজ্ঞা; ক্ষুদ্র হেনস্থা বর্ণের উপর ভিত্তি করে নেতিবাচকতা এবং পদবী, ভাষা, মর্যাদা, লিঙ্গ, জাতি ইত্যাদির ভিত্তিতে হয়ে থাকে। ক্ষুদ্র অবৈধকরণ অন্যের অনুভূতির প্রতি অজ্ঞতা, অবজ্ঞা, নিজেদের বিশেষাধিকার এবং ক্রমবর্ধমান আক্রমণগুলি অস্বীকার করার মধ্যে নিহিত থাকে, যা মনস্তাত্ত্বিক, মনোসামাজিক এবং একাডেমিক আকার নেয় (Hall & Fields 2015; Huber & Solorzano, 2015; Belluigi & Thondhlana 2022)।

বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চশিক্ষা প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক ছাত্রীদের নিকট বাস্তবতা থেকে দূরবর্তী হলেও তারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাদের 'ভবিষ্যত' গড়ে তোলার অবকাশ পায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা তাদের সমস্যা, কমতিগুলি সমেত একটি সমান্তরাল পটভূমিতে দাঁড়ায় বাকিদের সঙ্গে, নিজেদের নির্মাণ করে নেবার অবকাশ পায়। সমাজ নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে তারা 'অর্জন' করে একটা ভিন্ন বাস্তবতা। তাদের সামনে বিশ্ববিদ্যালয় একটি সম্ভবনাময় ভবিষ্যতের দরজা খুলে দেয়। একদিকে সাংস্কৃতিক মূলধনের অভাবে তারা যে সমস্যার সম্মুখীন হয়ে এসেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, সিনিয়রদের কাছ থেকে পর্যাপ্ত সামনে এগিয়ে যাবার রসদ পায়। তাদের দিশাহীন এগিয়ে যাওয়া একটা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে তারা পিতৃতান্ত্রিক 'নিরাপদ', 'সংরক্ষিত' পরিসর থেকে বেরিয়ে বাইরের 'অপরিচিত' নতুন জায়গায় নিজেদের আবিষ্কার করে, শিক্ষামূলক উপকরণ, লাইব্রেরী, প্রয়োজনীয় তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে উপলব্ধ হয়। যার ফলে ডিগ্রীলাভের পাশাপাশি তারা নিজেদের সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে বিভিন্ন ভাবে। অংশগ্রহণকারীদের সাক্ষাৎকার থেকে উঠে আসে তাদের বাস্তবতা। দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করতে করতে যখন একটি মেয়ে শিক্ষার্থী পড়াশুনার চালিয়ে যাবার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যায় তখন তার অনুপ্রেরণা কি এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথম প্রজন্মের ছাত্রী, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক এবং আবাসিকা টিনা দাস বলেন –

> পরিবার আমাকে শ্বাস নেবার জায়গা দেয় নি। পারিবারিক ভায়োলেন্সের থেকে মনস্থির রাখার একটা জানলা আমার কাছে খোলা ছিল আর তা হল পড়াশুনা। বেঁচে থাকতে চাই এই বোধটুকুই আমাকে পড়াশুনাতে নিয়োজিত করেছে। আমার ভিতরে যে একটা নিজস্ব সত্ত্বা আছে যা সামাজিক, পারিবারিক সব জায়গায় অস্বীকৃত। সেই সত্ত্বার জেগে থাকার একটাই রাস্তা পড়াশুনা করা। বিশ্ববিদ্যালয় যাওয়া[4]।

---

[4] অংশগ্রহণকারী বি, বি ৪, টিনা দাস, সাক্ষাতকার, স্থান-শান্তিনিকেতন।

যাবতীয় প্রতিকুলতা সত্ত্বেও তিনি উচ্চশিক্ষায় এসে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়াকে বেছে নিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে তারা লাইব্রেরী, ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ পায়, ক্যাম্পাস জীবনের স্বাধীনতা পায়, সর্বোপরি হস্টেলে থাকতে পারে, সেখানে নিজের মত বেঁচে থাকার সুযোগ পায়। পরিবারে, সমাজে যখন নারীকে ব্যক্তিসত্ত্বা রক্ষা করতে ক্রমাগত লড়াই করতে হচ্ছে, এই গবেষক ছাত্রীটি পড়াশুনার মাধ্যমে নিজেকে খুঁজতে চেয়েছেন। অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেকে ভিন্ন আকাঙ্ক্ষায় এসেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে, নিজের লক্ষে শুরু হয় তাদের ভিন্ন ভিন্ন সংগ্রাম। আর্থিক ভাবে অস্বচ্ছল প্রথম প্রজন্মের ছাত্রীটির প্রান্তিকতা অনেক সময়ই সহপাঠীদের কাছে হাসি মস্করার বিষয়, বিবিধ তির্যক মন্তব্য, অবজ্ঞাসূচক কথাবার্তা ও তাচ্ছিল্যের নজর তাদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের নিত্য সঙ্গী। প্রথমত, তারা প্রত্যেকে নিজেদের জীবনের নানা সমস্যায় জর্জরিত তার ওপর তাদের প্রান্তিকতা নিয়ে দৈনন্দিনের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য তাদেরকে আরো অনেক বেশী ভঙ্গুর করে তোলে। তারা জানাচ্ছেন কিভাবে বেঁচে থাকার, পড়াশুনা চালিয়ে যাবার লড়াই কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে ওঠে। গবেষক সুধা মাল যিনি গবেষণা করছেন যাদবপুরে, তার কথায়-

> এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেয়ে আনন্দ পেয়েছিলাম খুব। আমাদের পরিবারে প্রথম কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করতে যাচ্ছে এই ভেবে ভাল লেগেছে খুব। বিশ্ববিদ্যালয়, ক্যাম্পাস, হস্টেল থেকে পেয়েছি অনেক স্নেহ, সাহায্য, বন্ধুত্ব, উপদেশ। কিন্তু সবসময়ই একটা বিষয় মন আর মাথা থেকে বের করতে পারি নি। যে আমি এখানে আউট সাইডার। আমার প্রতি একটা গেজ লক্ষ করেছি। প্রথমে ভাবতাম আমার অনাধুনিক পোষাকের জন্য, অথবা অনাধুনিক বডি ল্যাঙোয়েজের জন্য, কিসের জন্য বুঝে উঠতে পারতাম না। কিন্তু আমাকে বিসদৃশ ভাবা হচ্ছে এই বোধটা আমাকে পীড়িত করেছে সবসময়ই। অবজ্ঞা এমন একটা বিষয় যা বোঝা যায়। আর অনেক সময় কেউ কেউ তা স্পষ্ট ভাবে বুঝিয়েও দিয়েছে।[৫]

কিভাবে এই পরিস্থিতির সঙ্গে সমঝোতা করেন বা যুঝে চলেন এই প্রশ্নের প্রেক্ষিতে তিনি বললেন –

> উপায় আসলে আমার নেই। নিজেকে বুঝিয়েছি আমার রাস্তা সহজ নয়। আমাকে সহ্য করতে করতে যেতে হবে, থেমে যাওয়াটা কোনো সমাধান নয়। থেমে গিয়ে ফিরব কোথায়? তাই একটাই রাস্তা সামনে। জোর করেই আমাকে যেতে হবে সামনে। কখনও কখনও যে ভেঙ্গে পড়িনি তা তো নয়। অসহ্য লেগেছে। মনে হয়েছে পায়ের তলায় মাটি নেই। দাঁড়াব কোথায়?[৬]

এইসব অসহায় মুহুর্তে বন্ধু বা শিক্ষকদের পাশে পেয়েছেন কিনা জানতে চাইলে তিনি জানান দু একজন বন্ধু তার রয়েছে, তারা প্রয়োজনে পাশে থাকে। তাদের জীবনেও নানা সমস্যা রয়েছে ফলে তারা পরস্পরের পাশে থাকার চেষ্টা করে। শিক্ষকরাও সাহায্য করেন। তিনি সমস্যায় সাহায্য সহমর্মিতা পান।

---

[৫] অংশগ্রহণকারী যা, বি, ১১, সুধা মাল, সাক্ষাতকার, স্থান-যাদবপুর।

[৬] অংশগ্রহণকারী, যা, বি ১১, সুধা মাল, সাক্ষাতকার, স্থান-যাদবপুর।

এই বন্ধুসঙ্গ তার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের অভিজ্ঞতায় একটা সদর্থক প্রাপ্তি। কিন্তু এই ছবি যে সর্বত্র তা নয়। অংশগ্রহণকারীদের অনেকে নিজের দুর্বলতা, নিজের খামতি, নিজের অপারগতা, নিজের প্রান্তিকতা অন্যের কাছে বলতে ভয় পান, প্রকাশ করতে লজ্জা পান। অভিজ্ঞতায় তারা উপলব্ধি করেছেন যা কিছু সচেতনতার কথা, সাম্যের কথা, বৈষম্য বিরোধী কথা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে উচ্চারিত হয় তার অধিকাংশই ভাসমান, নেহাতই কথার কথা, কথাগুলো বিশ্বাসযোগ্য হলেও নির্ভর যোগ্য বা ভরসা যোগ্য নয়। তার ফলে নিজেদের জীবনে যখন তারা জেরবার হয়েছেন, জাতিগত, লিঙ্গগত হিংসার শিকার হয়েছেন, তা তারা নিঃশব্দে সহ্য করেছেন এবং আরো নিঃশব্দে বিশ্বাস হারিয়েছেন তথাকথিত বৈষম্যবিরোধী সচেতনতার ভাসমানতায়। এই দ্বৈরথ তাদের ক্লান্ত করেছে, কিন্তু একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় তাদের সামনে ভবিষ্যতের দরজা খুলে দিয়েছে। এই বিষয়ে সাক্ষাৎকার থেকে অংশগ্রহণকারীদের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হল বিশ্বভারতীর ছাত্রী কুহু মাহাতো বলছেন, "ইউনিভার্সিটি আসার পর আমি নিজেকে অনেক বেশি সমৃদ্ধ করতে পেরেছি, এই স্ট্রাগলটাই আসলে আমাকে আমার বাস্তবতা থেকে বেরিয়ে এসে নতুন কিছু করতে উৎসাহ জুগিয়েছে। অনেক কিছু করতে পারি চাইলেই, এটাই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে মনে হয়েছিল"[৭]। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিশা দাস বলছেন, "দিশাহীন হয়ে পড়েছিলাম, তারপর সিনিয়রদের সাহায্য নিয়ে এখন জানি কি করতে চাই, বাড়ীতে গাইড করার মত কেউ নেই, যা করতে হবে ইউনিভার্সিটির সাহায্য নিয়ে নিজেকেই করতে হবে, এছাড়া উপায় নেই"[৮]। বিশ্বভারতীর স্নাতকোত্তর স্তরের ছাত্রী বেণু হাসদা বলছেন, "ইউনিভার্সিটির হস্টেলে থাকি এইটা আমার জীবনটা বদলে দিয়েছে বলা যায়, ক্যাম্পাসেই থাকি, যখন খুশি লাইব্রেরী যাই, পড়াশুনা সংক্রান্ত যা কিছু দরকার সবই পাই এখানে"[৯]। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী পিউ দাস বলছেন, "স্কলারশীপ পেয়েছি, রিসার্চ করছি, উচ্চশিক্ষা সেদিক থেকে বলতে গেলে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। কিছুটা হলেও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হয়েছে বা সামনে হবে এরকম আশা তৈরি হয়েছে, উচ্চশিক্ষায় ইউনিভার্সিটি এসে আমি এখন আমার জীবনটা নতুন করে ভাবতে পারি"[১০]। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক হেম চন্দ বলছেন,

> নিজের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার, একটা জায়গা তৈরি হয়েছে, আগে পরিবারে আমার কথার কোনো গুরুত্ব ছিল না, এখনও যে আছে আমি তা বলছি না, কিন্তু আমার নিজের বিষয়ে আমি নিজে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নিই, পড়াশুনার ক্ষেত্রে হোক, বা বিয়ের বিষয়ে হোক, আমি কারোর চাপিয়ে দেওয়া মতামত গ্রাহ্য করি না আর, এই আত্মবিশ্বাস এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই তৈরি হয়েছে[১১]।

---

[৭] অংশগ্রহণকারী, বি বি ৬, কুহু মাহাতো, সাক্ষাতকার, স্থান -শান্তিনিকেতন।

[৮] অংশগ্রহণকারী যা, বি ৭, নিশা দাস, সাক্ষাতকার, স্থান-যাদবপুর।

[৯] অংশগ্রহণকারী বি, বি ৩, বেণু হাসদা, সাক্ষাতকার, স্থান-শান্তিনিকেতন।

[১০] অংশগ্রহণকারী যা, বি ৮, পিউ দাস, সাক্ষাতকার, স্থান-যাদবপুর।

[১১] অংশগ্রহণকারী, বি, বি ৫, হেম চন্দ, সাক্ষাতকার, স্থান-শান্তিনিকেতন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রান্তিক ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা একটি প্লাটফর্ম হিসাবে কাজ করে যেখান থেকে তারা তাদের কথা অনুযায়ী ‘ভবিষ্যৎ নির্মাণ’ করার অবকাশ পায়।

**প্রথম প্রজন্মের ছাত্রীদের আত্মপরিচিতির সংকট -- লজ্জা থেকে সাংবিধানিক অধিকার**

বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণকালে দুটি ভিন্ন চেতনা এই ছাত্রীদের মধ্যে পাশাপাশি নির্মিত হতে থাকে। শিক্ষাসূত্রে দূরে থাকলেও সোসাল মিডিয়ায় তারা নিজেরদের সম্প্রদায়ের মানুষজনের সঙ্গে যুক্ত। তারা তার এই ইউনিভার্সিটিতে পড়া উঁচু চোখে দেখেন এবং বাহবা দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠলাভ অন্য ছাত্রদের কাছে  যখন নেহাতই সাধারণ বিষয়, তারা এ নিয়ে গর্বিত বা উচ্ছসিত নয় তখন প্রান্তিক ছাত্রীদের কাছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পাওয়া ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। এই দুটো চেতনা জগত আলাদা। ইচ্ছা, সাফল্য, গর্ব, অহংকার ইত্যাদির নির্মাণ শ্রেণি ভেদে আলাদা ভাবে নির্মিত। আর্থ-সামাজিক অবস্থান ভেদে ছাত্রদের কাছে সাফল্য, লক্ষ্য ইত্যাদির মাপকাঠি আলাদা। ভিন্ন চেতনা জগতের ভিন্নতা এখানে প্রকট। সুযোগ, সুবিধা, পরিষেবা সব কিছুই ব্যক্তির নিজেদের সম্পর্কে ও নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি করে। পাশাপাশি দুইজন ভিন্ন অবস্থানের ছাত্র শ্রেনীকক্ষে বসলেই তারা অবস্থানগত ভাবে সমান হয়ে যায় না। কিছু বিষয় বস্তুগত ভাবে সমান করা যায়, কিছু চেতনার ভিন্ন নির্মাণ, ভিন্ন আকার সমান তলে আনা দুরূহ। কারণ  তাদের প্রত্যেকের চেতনার নির্মাণের পরিসর, প্রভাবক ভিন্ন। যে পরিস্থিতিতে তারা থাকে, যে প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে তারা যায়, তার মধ্যে নির্মিত হতে থাকে তাদের নিজস্বতার ধারণা। তবে এই চেতনার ভিন্নতার প্রবাহ চলতে থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও অন্য সহপাঠীদের সঙ্গে প্রথম প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের। একদিকে কেউ কেউ তারা নিজেদের পরিচয় লুকোয়। তাচ্ছিল্য হবার ভয়ে। নিজেদের চারপাশে ভিন্ন ধরনের অলীক বলয় বানিয়ে তোলে যা শেষ পর্যন্ত তাদের আত্মছাড়া করে তোলে। কেউ কেউ নিজের অবস্থান এবং পরিবার সম্পর্কে মিথ্যা পরিচিতি তৈরী করে। যাবতীয় সংগ্রাম ও পরিস্থিতির সঙ্গে এইভাবে তারা সমঝোতা করতে চায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের চর্চা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা নেয়। গবেষক সুধা মাল জানাচ্ছেন কিভাবে সে ধীরে ধীরে বুঝতে পেরেছে তার জাতিগত পরিচয়, শ্রেণি অবস্থান লজ্জার নয়, অধিকারের সঙ্গে সম্পর্কিত। সে এখন যুক্তি দিয়ে বুঝতে পারে তার প্রতি সামাজিক ব্যবহার কেন বৈষম্যমূলক। পড়াশোনা করে, অভিজ্ঞতা থেকে সে জেনেছে একজন ব্যক্তির অবস্থান, আত্ম-পরিচিতি কিভাবে সমাজে নির্মিত হয়, উচ্চশিক্ষার পরিসরে জাতিগত পরিচয় ভিত্তিক রাজনীতিটা সে জানে। হেম চন্দ শিক্ষাজীবনের শুরুতে নিজের প্রান্তিকতাকে নিজের দূর্বলতা হিসাবে দেখত তারপর সে জেনেছে সংরক্ষণ কেন প্রয়োজন, আম্বেদকর পড়েছে সিলেবাসে। এখন সে নিজের অবস্থান সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী।

অন্যদিকে যারা নিজেদের কথা অকপটে বলে তারা কিভাবে সংকটে পড়েন জানাচ্ছেন সাক্ষাৎকারে। নিজের অনগ্রসর পরিচয় নিয়ে ‘স্বাভাবিকতা’ বজায় রাখা অনেকের পক্ষেই অসম্ভব হয়ে

দাঁড়িয়েছে। প্রথমত তারা নিজেদের অবস্থান নিয়ে চুপ থাকে। অনগ্রসর পরিচয় জানার পর তাদের প্রতি বাকীদের ব্যবহার বদলে যায়, এড়িয়ে চলে বা দয়াপরবশ হয়ে ওঠে। তাদের অনগ্রসর পরিচয় নিয়ে বন্ধুমহলে আলাপ আলোচনা হয় নিরন্তর, যা তাদের ক্ষতবিক্ষত করে তোলে। মানুষজনের 'বাঁকা নজর' তারা দেখেছে। তাদের স্বাভাবিক বন্ধুত্ব, স্বাভাবিক উপস্থিতি ক্রমশ হারিয়ে যায়। পড়াশুনা ভাল করলে 'ওভার অ্যাচিভার' হিসাবে ব্যঙ্গের সম্মুখীন হতে হয়েছে হেমকে। আর পড়াশোনা না পারলে দেখা যায় সমালোচনা যেন এটাই প্রত্যাশিত ছিল। অন্যের চোখে তাদের একটা 'স্ট্যান্ডার্ড' সেট হয়ে যায়। পোশাক দেখে, হেয়ার স্টাইল দেখে, চালচলন দেখেই তারা স্থির করে নেয় এর দ্বারা কি সম্ভব আর কি সম্ভব না। এই টানাপোড়েনের মধ্যে চলা তাদের জন্য দুস্কর হয়ে পড়ে। সাক্ষাৎকার থেকে দেখা যাচ্ছে, যে ক্যাম্পাসে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা পড়তে যাচ্ছে, এই পরিসর গুলি তাদের প্রশ্নহীন ভাবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। সেই পরিসর তাদের সহজ ভাবে গ্রহণ করে না। এই আত্ম-পরিচিতির সমস্যায় তারা হীনমন্যতার স্বীকার। অ্যাকাডেমিয়ার দুনিয়ার তারা 'কেউ একজন' হয়ে ওঠা তাদের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। ক্যাম্পাসের এলিটিজমের সঙ্গে তাদের মানিয়ে নেওয়া ভিন্ন সংকটের জন্ম দেয়। প্রথমত, অংশগ্রহণকারী ছাত্রীরা 'মেয়ে' হিসাবে প্রান্তিক লিঙ্গ। পরিবার, সমাজ সর্বত্র পিতৃতান্ত্রিক নজরদারির মধ্যে থাকতে হয়। অর্থনৈতিক ভাবে স্বচ্ছল নয় নিজেরা, পরিবার তাদের মূলধন ছেলে এবং মেয়েদের সমান ভাবে বিনিয়োগ করে না। স্থানিক ভাবে গ্রাম বা মফস্বল থেকে আসে এই ছাত্রীরা। রাজধানী এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত নয়। একা তাদের পক্ষে যাতায়াত করা সমস্যাজনক হয়ে ওঠে অনেক সময়। ভাষাগত সমস্যা তাদের থাকে যেহেতু ইংলিশ মিডিয়ামে পড়েনি। পারিবারিক হিংসার কারণে মানসিক ভাবে ভয়ানক ভাবে ক্ষতি করেছে তাদের। সাক্ষাৎকার থেকে দেখা যাচ্ছে, ব্যক্তিগত জীবনে সমস্যা গুলি একটার পর একটা সমস্যার জন্ম দিয়েছে। এই বহুবিধ সমস্যা তাদের মধ্যে গভীর আত্ম সংকট এবং আত্ম পরিচিতির সমস্যা তৈরি করেছে। উচ্চশিক্ষা পরিসরে 'সংগ্রাম'টাই তাদের পরিচিতি হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসরে অংশগ্রহণকারীরা আত্ম-পরিচিতির সমস্যায় রয়েছেন বলে জানাচ্ছেন।

সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে 'প্রথম প্রজন্ম' সম্পর্কে সামাজিক নির্মাণ হল, প্রথম প্রজন্মের ছাত্রছাত্রী এই পরিচয় নিয়ে কথা বলা খুব লজ্জার, কাউকে প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী কিনা জানতে চাওয়া মানে তাকে 'অপমান করা'। নিজে প্রথম প্রজন্মের ছাত্র একথা লুকিয়ে রাখতে পারলে বেশিরভাগ ছাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। নিজের অতীত তারা মুছে ফেলতে চায় কারণ সমাজের কাছে তা লজ্জার। প্রতিনিয়ত তাদের রয়েছে নিজেকে মুছে ফেল অন্য কেউ হয়ে ওঠার দায়, যা সমাজের চোখে উঁচু। এ বিষয় নিয়ে নীরব থাকতে চায়, কেউ কেউ মিথ্যে বলেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার প্রথম বছর গুলিতে। সামাজিক অবস্থান বজায় রেখে চলার একটা খেলা তাদের চালিয়ে যেতে হয়েছে। একজন ছাত্র বা ছাত্রীর প্রকৃত অবস্থান সহ তাদের গ্রহণ করতে কেউ রাজি নয়। সমাজ যা চায় তার নির্মিত কিছু মানদণ্ডে নিজেকে ছাঁচে

ফেলার একটা চাপ তাদের থাকে। অন্যথায় বাতিলের দলে চলে যাবে। কাউকে এই প্রশ্ন সরাসরি জিজ্ঞাসা করা যাচ্ছিল না যে সে প্রথম প্রজন্মের ছাত্রী কিনা। তাতে তার অপমানিত বোধ করার আশঙ্কা থেকে যায়। অন্যদিকে নমুনা সংগ্রহের জন্য যখন একজন প্রফেসরকে অনুরোধ করি যে তিনি এমন কাউকে জানেন কিনা যে প্রথম প্রজন্মের ছাত্রী। তিনি বললেন,

> দেখো এই ভাবে তো এইসব জিজ্ঞাসা করা যায় না। সেটা 'অফেন্সিভ'। তবে আমার একজন ছাত্রী আছে যাকে 'দেখে মনে হয়' সে প্রথম প্রজন্ম হতে পারে। আর তার সাথে আমার সেই রকম ভাল সম্পর্ক আছে যাতে আমি তাকে এই 'সিক্রেট' প্রশ্ন করতে পারি। আসলে এইভাবে তো কাউকে জিজ্ঞাসা করা উচিত না। কি ভাববে। খারাপ লাগবে[১২]।

অন্য একজন বললেন আমরা সেভাবে কোনোদিন এই নিয়ে ভাবিনি। গর্বের সঙ্গে বললেন তাঁরা কাউকে 'আলাদা চোখে' দেখেন না। সবাইকে সমান দেখেন তাই জানেন না কে 'প্রথম প্রজন্মের ছাত্রী'। প্রথম প্রজন্মদের নানা 'বার্তি' প্রয়োজন এবং যত্ন দরকার হয়, সহযোগিতা দরকার হয়। সেটিও এই 'আলাদা চোখে' না দেখার ফলে বাকীদের অজানা থেকে যায়। এই ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে 'অনভিজাত' ইম্যাচিঅর, 'আনস্মর্টেবল' ইত্যাদি বিশেষণ জুড়ে যায় এবং তারা 'বাড়িয়ে বলে' নিজেদের বাবা মা দের পড়াশুনার কথা। প্রথম প্রজন্মের ছাত্রী সেকথা কেউ কেউ লুকিয়ে রাখে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাকীদের কাছে 'স্টেটাস' এর জন্য তাচ্ছিল্য হবার ভয়ে। বিশ্ববিদ্যালয় যদি পরিসরটাই না দেয় যেখানে একটা জটিলায়িত অক্ষিকাঁচ বা ক্রিটিকাল লেন্স তৈরি করে এগিয়ে যাওয়া উচিত, সেখানে তারা আত্ম-বিশ্বাসী হবার সুযোগটাই পাচ্ছে না। এখানে সামাজিক অবস্থান হয় লুকিয়ে রাখছে অথবা চুপ থাকছে।

দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রান্তিকতা এবং জাতিগত পরিচয় নিয়ে ভিন্ন অবস্থানে থাকেন অংশগ্রহণকারীরা। একদিকে লজ্জা এবং একদিকে সাংবিধানিক অধিকার– এই দুই টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে তারা যান। নিজের আর্থ-সামাজিক অবস্থান এবং জাতিগত পরিচয় নিয়ে কথা বলতে অস্বস্তি বোধ করেন অনেকেই, কারণ বাকীদের কাছে নিজে হীন প্রতিপন্ন হবার এবং অন্যের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের মুখে পরার আশঙ্কা থেকে যায়। এমন কি শিক্ষকরাও অনেকে ছাত্রছাত্রীদের 'প্রথম প্রজন্ম' কিনা জিগ্যেস করতে ইতস্তত বোধ করেন কারণ তাতে ছাত্রছাত্রীরা আহত হবেন বলে মনে করেন। অন্যদিকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের আর্থ-সামাজিক অবস্থান, এবং জাতিগত পরিচয়কে নিজের শক্তি এবং এগিয়ে যাবার পাথেয় এবং একটি আত্ম-পরিচিতির রাজনীতির অংশ বলে মনে করেন ছাত্রছাত্রীরা। বিশ্ববিদ্যালয় পরিসর তাদের সেই পরিসর দিয়েছে। সুধা তার জাতিগত পরিচয়ের জন্য যে বৈষম্যের সম্মুখীন হয়েছে তাকে সে বিচ্ছিন্ন বা একক বলে মনে করে না, তার লিঙ্গগত পরিচয় এবং শ্রেণিগত পরিচয় সম্মিলিত ভাবে নির্মিত। রিনি, বেণুর জাতিগত আত্ম-পরিচিতির রাজনীতি বিষয়ে সচেতনতা নেই। তারা পড়াশোনা করে চাকরি পেতে

[১২] সাক্ষাৎকার, অধ্যাপক, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন।

চায় বা রোজগারের একটা সংস্থান করে সুন্দর ভাবে বাঁচতে চায়। নিশা, কেয়া পড়াশোনা সূত্রে জেনেছে কিভাবে আত্ম-পরিচিতির প্রতিটি বিষয় আন্তঃসম্পর্কিত। সে জানে কিভাবে পড়াশোনা করে 'সাফল্য' আসে, কিভাবে সামাজিক 'সম্মান', 'মর্যাদা' নির্মিত হয়, তাই তারা আপোষ করে নি, তারা জানে একদিন তার প্রত্যাশিত জীবন যাপন করতে পারবে। তারা প্রশ্ন করেছে বিদ্যমান ক্ষমতা সম্পর্ককে, বিয়ে, পরিবার, লৈঙ্গিক ভূমিকা ইত্যদিকে তারা নতুন ভাবে দেখতে শিখেছে। নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ তারা নিজেদের ইচ্ছা এবং পছন্দ অনুযায়ী নেবার চেষ্টা করে। তবে অংশগ্রহণকারীদের কয়েকজন নিজেদের জাতিগত, লিঙ্গগত, শ্রেণিগত পরিচয় দূর্বলতা হিসাবে জানে, এবং তার ভিত্তিতে তাদের নিজের সম্পর্কে ধারনা, 'আত্ম-মর্যাদা' নির্মিত হয়েছে এবং তারা জীবনের গুরুত্বপুর্ণ সিদ্ধান্ত গুলি নেয়। জাতিগত অবস্থান বিষয়ে দুটি পরিস্থিতি সাক্ষাৎকার থেকে উঠে আসছে। যারা নিজেদের কথা অকপটে বলে বা বিদ্যমান ক্ষমতা সম্পর্ককে প্রশ্ন করে তাদের অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়, নিজের অনগ্রসর পরিচয় নিয়ে স্বাভাবিকতা বজায় রাখা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশে প্রায় অসম্ভব। প্রথমত যারা নিজেদের নিয়ে চুপ থাকে। সব দিক থেকেই তারা প্রশ্নবিদ্ধ। নিজের পরিচয় প্রকাশ করা এবং না করা দুইয়ের মধ্যেই তাদের সমস্যা হয়। নিজেদের প্রতিনিয়ত প্রমাণ করা, এই নিরন্তর 'হয়ে ওঠা' র আত্মঘাতী পদ্ধতিকে আমরা বলছি 'উন্নতি'। অ্যাকাডেমিক জগতের অভিজাত আবহাওয়া এই ছাত্রীদের জন্য খানিকটা অস্বস্তিকর এবং তারা 'মিসফিট'। মনস্তাত্ত্বিক ভাবে তাদের চালিয়ে যেতে হয় গ্রহণযোগ্যতার লড়াই। বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে তাদের 'স্ট্রাগল' মূলত এই গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠার লড়াই। পোশাকে, বডি ল্যাঙ্গোয়েজে, ভাষায়, উচ্চারণে, ফেসিয়াল এক্সপ্রেশনে, সবদিক থেকে 'মিসফিট' অবস্থান থেকে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার লড়াই। বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে তাদের উপস্থিতি 'অপর' হিসাবে প্রতিভাত হয়। নিজেকে বদলে ফেলতে হবে, এই একটা চাপ তাদের থাকে। এক ধরনের এলিট গেজ বা অভিজাত দৃষ্টিংস্কার তাদের তাড়া করে ফেরে। যে দৃষ্টির সামনে তারা নিজেদের 'কম' হিসাবে, 'অপর' হিসাবে দেখে, ভাষিক ভাবে না হলেও যে দৃষ্টি তাদের অবস্থান বুঝিয়ে দেয়। এই গেজের সামনে তাদের নিজেদের সম্পর্কে একটি ধারণা নির্মিত হতে থাকে।

**শিক্ষাক্ষেত্রে ছেড়ে যাওয়া এবং শিক্ষাবর্ষে বিরতি নেবার কারণ**

যে ছাত্রীরা উচ্চশিক্ষায় এসে পৌঁছয় তারা একদিকে নিজেদের স্কুল কলেজে সবথেকে ভাল ছাত্রছাত্রী ছিল, অন্যদিকে ড্রপআউট হবার যা কিছু কারণ তারা পেরিয়ে এসেছে। সাফল্য বা এগিয়ে যাওয়া তাদের কাছে খুব আরামদায়ক কিছু নয়, প্রতিনিয়ত প্রতিটি পদক্ষেপে তাদেরকে নিজেদের প্রমাণ করতে হয়। নানা দক্ষতা যা অনেক সময় ধরে বাকিরা শানিয়েছে তা তাদের খুব কম সময়ে অর্জন করে পারদর্শিতা দেখাতে হয়। এই যাত্রা পথ খুব সুখকর নয়। তাই তাদের স্ট্রেস আর অ্যাংজাইটি নিত্যসঙ্গী হয়ে যায়। সময় লাগে তাদের একটি অবস্থানে পৌঁছতে। সময় লাগে তাদের নিজেদের নির্মাণ করতে। এই নির্মাণ খুব ধৈর্যের

কাজ আর প্রতিনিয়ত খুব সতর্ক থাকতে হয়। প্রথম প্রজন্মের ছাত্রী যারা উচ্চশিক্ষায় এসেছে তারা সেই স্বল্প সংখ্যক ছাত্রী যারা ড্রপ আউট নয়।

যে যে ফ্যাক্টরগুলো প্রান্তিক মেয়েদের ড্রপআউট হবার প্রধান কারণ সেইগুলো তারা অতিক্রম করে এসেছে। ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে তারা এসে পৌছেছে উচ্চশিক্ষায়। এই ডিঙ্গিয়ে যাবার গল্পগুলো খুব সুখকর নয়। এই যারা প্রথম প্রজন্মের ছাত্রী উচ্চশিক্ষায় এসেছে তাদের যাত্রা পথ সমস্যাসঙ্কুল। এই ফ্যাক্টরগুলো শুধু এক একটা সমস্যা শুধু নয়, চেতনে বা অবচেতনে পেরিয়ে যেতে চাইছে বা যাচ্ছে শ্রেণি, কাস্ট ইত্যাদির বেড়া। উচ্চশিক্ষা সেখানে হয়ে উঠছে তাদের অবস্থান থেকে ভিন্ন অবস্থানে যাবার বা লাফ দেবার একটা হাতিয়ার। আর তাদের এই যাত্রাপথ শ্রেণি পেরিয়ে, জাতি পেরিয়ে, লিঙ্গবৈষম্য পেরিয়ে। এই যাত্রাপথে তাদেরকে আঘাত করে সামাজিক, অর্থনৈতিক বৈষম্য। মেয়েদের ক্ষেত্রে এই যাত্রাপথ অপেক্ষাকৃত জটিল। তাদের লড়াই করতে হয় পিতৃতন্ত্রের সঙ্গে যার জাল বিস্তার করা আছে পরিবারে, সমাজে, পাড়ায়, ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে, ক্যারিকুলামে, পাবলিক স্পেসে, হস্টেলে। এইসব পেরিয়ে নিরুদ্দিষ্টের দিকে একটি দীর্ঘ যাত্রা। এই যাত্রাপথটা মূলত একটা ‘ফিট ইন’ করার বা খাপ খাইয়ে নেবার, যেটা কোথাও পৌঁছয় না, আর এই ‘স্ট্রাগল’কে যেভাবে মহিমান্বিত করা হয়, সেটাও একদিক থেকে সামাজিক অর্থনৈতিক বৈষম্যকেই মান্যতা দেয়। মেয়েরা যখন উচ্চ শিক্ষায় আসছে তাদের যাতায়াতের সমস্যা আর হেনস্থার কথা জানাচ্ছেন তারা সাক্ষাৎকারে। পরিবার থেকে যে মেয়েটি সাহায্য পায় না, সেই মেয়েটি যখন নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় তখন তার সংগ্রাম পরিবারের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে। শিক্ষায় বিরতির কারণ হিসাবে তাঁরা যে কয়েকটি কারণ পুনরাবৃত্ত ভাবে জানাচ্ছেন, সেগুলি হল – তথ্যের অভাব, পরিকল্পনার অভাব, তত্ত্বাবধানের অভাব, পারিবারিক সমস্যা, পারিবারিক হিংসা, বিয়ে, অবসাদ ইত্যাদি। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৩ জন কোনো বিরতি নেন নি, বাকী ৯ জন তাদের শিক্ষার যাত্রাপথে কখনো না কখনো বিরতি নিয়েছেন। শ্রেণিগত, লিঙ্গগত, জাতিগত সামাজিক অবস্থানের জন্য তাদের উচ্চশিক্ষার যাত্রাপথ মসৃণ ছিল না। এই কারণগুলি মূলত অসংখ্য প্রান্তিক ছাত্রীর পড়াশোনা ছেড়ে চলে যাবার কারণ, আর এই কারণ গুলি অতিক্রম করে অথবা কারণগুলি সঙ্গে নিয়ে যারা এগিয়ে যাচ্ছেন তারা শেষ পর্যন্ত উচ্চশিক্ষায় এসে পৌঁছতে পারছে। শিক্ষাবর্ষের নানা সময় তারা বিরতি নিয়েছে, ছেড়ে চলে গেছে আবার ফিরে এসেছে, একটা সময়ের পর সমাজ, পরিবার, বাহ্যিক পরিসর ইত্যাদির সঙ্গে লড়াই করতে না পেরে তারা আপোষ করেছে। আবার ফিরে এসেছে, শিক্ষাসূত্রে প্রাপ্ত নবনির্মিত আত্মবোধ তাদের ভিন্ন পরিসরে, ভিন্ন ক্ষমতা কাঠামোয় বেখাপ বানিয়ে তুলেছে, সেখানে যারা মানিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়েছে পুনরায় ফিরেছে পড়াশোনায়। পড়াশোনার মাধ্যমে ক্ষমতায়নে যারা আস্থা রেখেছে তারাই মূলত শেষ পর্যন্ত উচ্চশিক্ষায় এবং গবেষণায় টকে আছে। সুধা মাল দুবছর বিরতি নিয়েছে তার শিক্ষাজীবনে, পারিবারিক হিংসা এবং অবসাদ তাকে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে, কিন্তু সে ফিরে এসেছে পুনরায়,

সে পড়াশোনার মধ্যে, গবেষণার মধ্যে নিজের সত্ত্বাকে প্রতিফলিত দেখতে পায়। টিনা বিয়ে হয়ে যাবার ফলে ১ বছর বিরতি নিয়েছে। বিয়ের নিয়ে সে ঝামেলার মধ্য দিয়ে গেছে এবং পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারে নি। বেণু, হেম, নিশা, কেয়া মূলত উপযুক্ত তথ্যের অভাবে, পরিকল্পনার অভাবে শিক্ষাবর্ষে বিরতি নিয়েছে। উচ্চশিক্ষা তাদের অর্থকরী কনো দিশা অদ্যপি দেখাতে পারে নি কিন্তু তাদের মধ্যে ক্ষমতায়নের বীজ বুনে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত সেই প্রান্তিক ছাত্রীরা উচ্চশিক্ষায় টিকে থাকছে যারা মানসিক ভাবে দৃঢ। রিসোর্স, সুবিধা, পরিষেবা পাবার পরও উচ্চশিক্ষা পরিসরে মানসিক সুস্বাস্থ্য এবং দৃঢ়তা ছাড়া চালিয়ে যাওয়া সমস্যা, উপলব্ধি করেছে সুধা, হেম।

**বিশ্ববিদ্যালয়ে সহায়ক গোষ্ঠী তৈরি**

বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সহায়ক গোষ্ঠী প্রান্তিক ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার যাত্রায় বিশেষ ভূমিকা নেয়। উত্তর পূর্বের ছাত্ররা, সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে নিজেদের দল গঠন করার কথা জানাচ্ছেন অংশগ্রহণকারীরা। ইউমী দর্জি দার্জিলিং থেকে কলকাতায় এসেছে উচ্চশিক্ষার জন্য সে তাদের গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত। সমস্যায় এবং প্রয়োজনে সে তাদের জানাতে পারে এবং তারা সারাবছর নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করে। রিনি, পপি, বেণু বিশ্বভারতীতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সাংস্কৃতিক দলের সঙ্গে যুক্ত। তারা সারাবছর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। তবে বেণু জানায় প্রতিবন্ধীতার জন্য সে অনুষ্ঠানগুলিতে যেতে পারে না সেখানে গিয়ে তার একা বোধ হয়। ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় বাহা উৎসবে তারা আমাকে নিয়ে গেছিল। শান্তিনিকেতনে খেজুরডাঙায় বাহা উৎসব পালিত হয়েছিল শাল গাছে নতুন পাতা গজানো উপলক্ষ্যে। সেখানে তারা নাচ, গানের মাধ্যমে নিজেদের পোশাকে, নিজেদের সাজসজ্জায় এবং নিজেদের বাদ্য যন্ত্রের মাধ্যমে নিজেদের সংস্কৃতি উদযাপন করছিল। পপি, রিনি সেখানে যোগ দেয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের ভিন্ন ভূমিকায় সেখানে দেখা গেছিল।

**উচ্চশিক্ষায় প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক ছাত্রীদের ভাষাগত সমস্যা, এক ভাষার অন্তস্থ প্রামাণ্যতা এবং আঞ্চলিকতা**

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মূলত ইংরেজীর মাধ্যমে পড়াশুনা হয়, প্রাথমিক শিক্ষা থেকে যে ধারাবাহিকতায় এই উচ্চশিক্ষা পরিসর দক্ষতা দাবী করে সেখানে প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক ছাত্রীরা পিছিয়ে থাকে ভাষাগত কারণে। অংশগ্রহণকারীদের প্রাথমিক শিক্ষা স্থানীয় ভাষায় সরকারি স্কুলে, প্রাইভেট স্কুলের ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা কেনার মত আর্থিক ক্ষমতা তাদের ছিল না। গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেকেই সরকারী প্রথামিক এবং উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে এস টি ছাত্রীরা নিজেদের মাতৃভাষায় পড়াশোনা করতে পারেন নি, অলচিকি বা নেপালী ভাষায় তারা পড়তে পারেন নি,বাকীরা প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষায় পড়াশুনা করেছেন। তারপর সংরক্ষণের মাধ্যমে তারা যখন উচ্চশিক্ষায় এসে পৌঁছেছেন, ভাষা নিয়ে তারা সমস্যায় পড়েছেন প্রত্যেকেই। উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্র মূলত

ইংরেজি ভাষায় পরিচালিত হয় বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে, আলোচ্য দুটি বিশ্ববিদ্যালয় ও তার বাইরে নয়। শিক্ষা উপকরণ, থেকে পরীক্ষা সবই ইংরেজিতে। শ্রেণিকক্ষে পড়াশুনা লেকচারও ইংরেজিতে সম্পন্ন হয়। যথার্থ ইংরেজি না জানার জন্য তারা শ্রেণিকক্ষে পাঠ্য বিষয় বুঝতে পারেন না পুরোপুরি। আংশিক ভাবে অনুধাবন করেন। প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক ছাত্রীদের সাক্ষাৎকার থেকে উঠে আসা বক্তব্যগুলিতে দেখা যাচ্ছে তাদের ভাষা সমস্যা তাদের উচ্চশিক্ষার অভিজ্ঞতাকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক সুধা মাল বলছেন, "যখন তুমি এইরকম একটা জায়গায় রিসার্চ করছো। সেটার ক্ষেত্রে যে খুব ভাল ইংরেজীতে কথা বলতে পারে তারা গুরুত্ব পায়, অলিখিত ভাবেই পায়।[১৩] যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকজন ছাত্রী পিউ দাস বলছেন,

> যাদের বাবা মা ইউ কে থেকে পি এইচ ডি করে এসেছে আর আমার বাবা সেখানে একটা সামান্য একটা চাকরি করে, ইকোনমিক দিকটাও বলো যা শিক্ষাগত দিকটাও বলো, যারা প্রথম প্রজন্মের ছাত্রছাত্রী তাদের হিউজ সমস্যা। আমাদের আগে তো কেউ নেই যে আমাদের বলে দেবে যে, তুই এটার পর এটা কর বা এটার পর এই এই সম্ভবনা আছে এটা এটা করতে পারবি। টিচারদের প্রেফারেন্সও আমার মনে হয় যে ইংরেজি ভাল বলতে পারে তার দিকে মানে অনেকটা বেশি। সেদিকে কাঁটাটা একটু বেশি হেলে থাকে। যদি দাঁড়ি পাল্লায় মাপো তাহলে দেখা যাবে তাদের দিকে মনোযোগের পাল্লাটা হেলানো। যে ভাল ইংরেজি বলতে পারে, যারা প্রথম প্রজন্ম তাদের কাছে ঐ অপ্সনটাই নেই যে তারা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়বে। তাই না? এখন খড়গপুরের যা সিনারিও সেটা আলাদা পা ফেললেই তুমি কুড়ি থেকে বাইশটা স্কুল পেয়ে যাবে। সরকারি হোক বা ইংলিশ মিডিয়াম। কিন্তু আমরা যে টাইম থেকে বিলং করছি ১৯৯৪ সাল বা আমার দিদির ১৯৮৮-র দিকে জন্ম তো ঐ জায়গায় দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র একটি মনে হয় কেন্দ্রিয় বিদ্যালয়ই ছিল খড়গপুরে, একটি বা দুটি স্কুল। আর আমার বাবা মা রা এইটা ভেবে ভয় পেত যে বাচ্চাকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে দেব এদিকে আমরা তো কিছু জানি না। আমরা ওকে গাইড করব কি করে। আমি যখন নিজে বাবা মার সাথে কথা বলি বা আপষোশ করি যে আজ আমি খুব ভাল ফ্লুয়েন্ট ইংলিশ বলতে পারলে কত আত্মবিশ্বাসী হতে পারতাম বা কত কি করার সুযোগ আসত, শুধু আপষোশ করি না অনেক সময় দোষারোপ ও করি যে, কেন ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ালে না ? এখন বড় হয়েছি এখন বুঝতে পারি যে উনাদের কাছে আর অপ্সন ছিল না তখন। কারণ একটা ইংলিশ মিডিয়ামে বাচ্চাকে পাঠাবে ওখানে একটা পি টি এ হবে সেখানে গিয়ে আমার বাবা মা তো কথা বলতে পারবে না"।[১৪]

---

[১৩] অংশগ্রহণকারী যা, বি ১১, সুধা মাল, সাক্ষাতকার, স্থান - যাদবপুর।

[১৪] অংশগ্রহণকারী, যা, বি ৮, পিউ দাস, সাক্ষাতকার, স্থান – যাদবপুর।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক নিশা দাস বলছেন,

> অক্সফোর্ড থেকে এসে কেউ ঝরঝরিয়ে ইংলিশ বলছে তার সব কথা আমি বুঝে যাব! সে আমি পারতাম না। কারণ আমি ঐ ইংরেজী শুনে অভ্যস্ত নই। না আমার মা বলে, না আমার বাবা বলে, বা আমি মফস্বলে থেকে আমি যে ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি না সেই প্রফেসরগুলো বলে। আমার আগের কলেজের বা ইউনিভার্সিটির প্রফেসররা যে ইংরেজি বলে সেগুলো খুবই পরিস্কার। মানে বাঙ্গালির যেমন ইংরেজি হয়। আমি ঐ ইংরেজিটা শুনে অভ্যস্ত। আমি এখন যেখানে পড়ি সেখানে অক্সফর্ড বা ইউকের ইংরেজিটা বলছে।[১৫]

আবার নিশার অভিজ্ঞতায় অনেক প্রফেসর আছেন, সেইসব ছাত্র ছাত্রী যারা বাংলায় লেখে ইংরেজি বুঝতে পারে না তাদের জন্য আলাদা করে পুরোপুরি সবটা বাংলায় না বললেও মাঝেমধ্যে সংক্ষিপ্তসার করে দেন। বা সপ্তাহে একদিন তাদের আলাদা করে ক্লাশ নেন। নিশার অভিজ্ঞতায় একজন অধ্যাপক আছেন তিনি সাউথ ইন্ডিয়ান, তিনি নিজের চেষ্টায় বাংলা শিখে এখানে তাদের বোঝান যারা বাংলায় লেখে। তিনি সেই কোঅপারেশনটা দেখিয়েছেন। ব্যক্তিগত  উদ্যোগ নিয়ে কেউ কেউ পিছিয়ে পরা ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করেন। কিন্তু নিশার অভিজ্ঞতায় রয়েছে, ক্লাশে যদি একজন যদি থাকে ইংরেজি জানে না তাহলে সে পাত্তা পাবে না। কিন্তু যদি বেশ কয়েকজন থাকে তাহলে তাদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়। নিশার কথায় “এখানে যেমন কোয়ালিটেটিভ কাজ করতে গেলে খুব ভাল  ইংরেজি দক্ষতার প্রয়োজন হয় কিন্তু আমি দেখেছি যে জিওগ্রাফি পড়ার জন্য খুব একটা দারুন ভাষার নলেজ লাগে না। জেনারেল রাইট আপেও তুমি পাশ করতে পারবে, ভাল নাম্বার পেয়ে যাবে অসুবিধা নেই।[১৬] যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী কেয়া দাসের কথায় –

> আমি ইংরেজি আশি শতাংশ কেউ বললে বুঝতে পারি। কিন্তু আমি যেভাবে বাংলা বলতে পারি সেভাবে আমি ইংরেজি বলতে পারি না। ইউ এস বা আমেরিকার ইংরেজিতে বললে আমি বুঝতে পারি না অনেকসময় কিন্তু ভারতীয়রা যেভাবে ইংরেজি বলে তাতে আমি বুঝতে পারি। স্পোকেনটা আমি পারি না। লিখতে পারি আমি। বিশ্ববিদ্যালয়ে যা হবে সব ইংরেজিতে। পরীক্ষা সবই ইংরেজিতে। এখন আমি উইমেন্স স্টাডিজটা আমি বাংলায় লিখি।[১৭]

এই ছাত্রীদের শৈশবে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের অভাব ছিল এলাকায় এবং তারা এত টাকা দিয়ে ভর্তি হতে পারেন নি। সরকারি স্কুলে বাংলা মিডিয়ামে পড়েছেন। শ্রেণিকক্ষে, ক্যাম্পাসে তাদের ভাষা বৈষম্যের অভিজ্ঞতা তারা বলেছেন। হেম চন্দ বলছেন,

---

[১৫] অংশগ্রহণকারী, যা, বি, ৭, নিশা দাস, সাক্ষাতকার, স্থান – যাদবপুর।

[১৬] অংশগ্রহণকারী, যা, বি, ৭, নিশা দাস, সাক্ষাতকার, স্থান – যাদবপুর।

[১৭] অংশগ্রহণকারী, যা, বি ১০, কেয়া দাস, সাক্ষাতকার, স্থান –যাদবপুর।

ক্লাশে যখন কেউ ইংরেজিতে প্রশ্ন করত বা কিছু বলত সেটা কে সবাই খুব ভাল চোখে দেখত। কিন্তু যখন কেউ বাংলাতে কিছু বলত সেটা যেন ততটা গুরুত্ব পেত না। স্যারেরা সবার প্রশ্নকেই গুরুত্ব দিত। কিন্তু ক্লাশের বাকিরা মনে করত এটা অতটাও গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। আমাদের মনে হত যে আমাদের প্রশ্নগুলো বাকিদের কাছে তেমন গ্রহণযোগ্যতা পায় না। ক্লাশের বাইরে আমাদের একটা পরিচিত দাদা এখানে পিএইচডি করেছে। সেই দাদাকেও আমি বলছিলাম যে আমাদের কথার মধ্যে একটা মুর্শিদাবাদী টান আছে। কথার এই টানের জন্য লোকজন হাসাহাসি করত। আমি তাদের মত কথা বলতে পারি না বলে তারা আমাকে নিয়ে অনেক মজা করত। আমি তাদের মত করে বাংলা বলার চেষ্টা করতাম। কিন্তু বাংলাটা বলতে অসুবিধা হত এখনও হয়তো বাংলাটা আমি ঠিকভাবে বলতে পারিনা। আমার এই আঞ্চলিকতার জন্য অনেক হাসাহাসি হয়েছে অনেক জায়গায়। আমি যখন কিছু বলতাম তখন তারা হেসে বলত যে যেটা বলছ সেটা ভুল। আমাকে সংশোধন করে দিত। মাঝখানে মাঝখানে ধরিয়ে ধরিয়ে দিত যে এটা ভুল ওটা ভুল। এই ধারণাটা আমার অনেকদিন পর্যন্ত ছিল। ডিপার্টমেন্টে যখন কথা বলতাম কথাগুলো আমার ভিতরে ভিতরে বানাতে হত। নিজের ইচ্ছায় বললে তোমাকে বানাতে হবেনা কিন্তু যখনই তুমি সচেতন ভাবে বলছ তোমাকে ভিতরে ভিতরে বানাতে হবে। আরো কয়েকজন দাদার সঙ্গে কথা হল সেখানে জানতে পারলাম এটা শুধু আমার সঙ্গে নয় এটা তাদের ব্যাচেও হয়েছিল। সে সুন্দরবন থেকে উঠে এসেছে তার ভাষায় আলাদা টান ছিল। গ্রাম্য বাংলার ছাপ ছিল। ঐ দাদা আমাকে অনেক পজিটিভ থিংকিং করতে শিখিয়েছে। যে আঞ্চলিক বাংলার কি মূল্য আছে। আদর্শ ভাষা কি এইসব”[১৮]।

টিনা দাস এ বিষয়ে বিশদে বলেছেন, “ইংরেজিতে কথা বললে আলাদা একটা মর্যাদার স্তর দেওয়া হয় তাকে। মানুষই আলাদা একটা জায়গা তৈরি করে দেবে। এমনি সব জায়গাতেই হয়। শুধু কলেজ ইউনিভার্সিটি কেন সব জায়গায়। হায়ার এডুকেশনের জায়গাতে স্যার ম্যাডামরা করে না কিন্তু যারা পড়তে আসে তারা অটোমেটিক্যালি এটা করে। আবার গ্রামীণ এলাকাতেও যদি তুমি চলে আসো তুমি যদি ইংরেজিতে কথা বলো তোমাকে লোকে কিনা কি ভাববে! ফোনেই ইংরেজিতে ভাল করে কথা বলো তোমাকে একটা আলাদা জায়গা দিয়ে দেবে। মানুষের মাথাতে ঢুকে গেছে ইংরেজি মানে হাই কালচার, হাই এডুকেটেড, অনেক শিক্ষিত। তুমি যখন ইংরেজিতে কথা বলবে তোমার ভিতরে কতটা গভীরতা আছে কেউ দেখবে না। কথাতেই মাত হয়ে যাবে। মাতৃভাষার গুরুত্ব তৈরি করা হয় নি। স্বাধীনতা পরবর্তী কালে কাস্ট নিয়ে অনেক মুভমেন্ট হয়েছে কিন্তু ভাষা নিয়ে, আঞ্চলিকতা নিয়ে সেভাবে কোনো মুভমেন্ট হয়নি। তামিলদের কিন্তু হয়েছে সেখানে রাজনীতি ও হয়েছে আর মুভমেন্ট ও হয়েছে

---

[১৮] অংশগ্রহণকারী যা, বি ১০, কেয়া দাস, সাক্ষাতকার, স্থান–যাদবপুর।

ভাষা ইস্যুকে কেন্দ্র করে তাদের ক্ষমতায় এসেছে রাজনৈতিক দল। অন্য রাজ্যে গিয়ে ভাষা নিয়ে কোনো সমস্যা হল না। নিজের রাজ্য নিজের রাজ্যের ক্যাপিটালে গিয়ে আমি সমস্যা ফেস করলাম। মফস্বল বা গ্রামের লোকেদের সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করে রাজধানীর লোকজন”[১৯]। হেম চন্দ বলছেন,

> ক্লাশের বাকিদের থেকে ক্লাশ নোট দেওয়া নেওয়া খুব কম হয়। এবার ধরো  তাদের সাথে বেশী মিশিনি এবার নিজের সমস্যার কথা তুমি তাকে বলবে কি করে। সেই সমস্যা শেয়ার করার জায়গা তৈরি হয় না। ফরমালিটি যেটা সেটা হয় শুধু। তার বাইরে আলোচনা করা সেটা হয়ে ওঠে না। একজন অভিজাত মেয়ে আমার গাইডের কাছেই কাজ করে। গাইড তাকে বলেছে হেম এত ভাল করতে পারছে তুমি কি করছো। তাতে সে রীতিমত অপমানিত বোধ করল! বন্ধুদের গ্রুপে সে মন্তব্য করেছে। হেম ইংরেজি জানে না তাহলে কি ভাবে করল। তার ধারণাতে ছিল না যে আমি কিছু করতে পারি। এখন সবার মধ্যে একটা ধারণা তৈরি হয়ে গেছে যে আমি পড়াশুনা করি আর আমি সেটা পারি। কারণ আমি যখন প্রেজেন্টেশনগুলো করতাম মুখের ওপর ফ্যাকাল্টিগুলো বলে দিত যে তোমার প্রেজেন্টেশন আমাদের খুব ভাল লেগেছে। সবাই আমাকে অভিনন্দন জানাল। এই গুলোর পরে যখন ঘটনা আর আমার মধ্যে থাকল না ছড়িয়ে গেল তখন তারাই আমাকে মেপে কথা বলে এখন, ভেবে মেসেজ করে। তারাই এখন আমার কাছে অনেক কিছু জানতে চায়[২০]।

এই বৈষম্য গুলো তাদের অবসাদের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তবে কোনো কোনো শিক্ষক তাদের সমস্যা বুঝছেন, তাদের সাথে ভাল ভাবে কথা বলছেন। সুধার মতে, “এখন যাদের ‘ভাল’ বলা হচ্ছে,এটা তো স্বাভাবিক হওয়া উচিত। সেটা তখনই হবে যখন সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। মার্জিনালিটি শক্তি হিসাবে ব্যবহার করতে হবে, ইনফিরিওরিটি হিসাবে নয়। প্রান্তিক ছাত্রীদের আলাদা কোন সাহারা নেই। নিজে নিজে সে পথ তৈরি করছে। সেই স্বনির্মিত পথে বিপদ প্রতি মুহুর্তে। তারা যদি একবার সংকটে পড়ে তারা একেবারে শেষ হয়ে যাবে। ঊঠে আর কোনদিন দাঁড়াতে পারবে না। তাদের কাছে কিছুই পরে থাকবে না। এরা নিজেরা নিজেদের সম্পদ। এরা নিজেরাই নিজেদের টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। নিজেকেই নিজে ঠিক করতে হয়েছে কি করব কি করব না। একবার যদি সমস্যা হয় সে হারিয়ে যাবে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই বৈষম্যগুলো হয় বছরের পর বছর। বাউন্ডারিটা তৈরি হয়েছে। অদৃশ্য একটা দেয়াল আছে। কিন্তু কেউ দেখেও দেখছে না”[২১]। নিশার কথায়,

> তোমাকে কেউ বাধা দেবে না। কিন্তু ওখানে গিয়ে বসতে তোমার নিজেরই বাঁধবে। তুমি নিজেই ইনসিকিওর ফিল করবে যে তুমি এখানে বিলং করো না। এখন অন্যেরা জায়গা দেবে তারপর

---

[১৯] অংশগ্রহণকারী, বি, বি ৪, টিনা দাস, সাক্ষাতকার, স্থান-শান্তিনিকেতন।

[২০] অংশগ্রহণকারী বি, বি ৫, হেম চন্দ, সাক্ষাতকার, স্থান-শান্তিনিকেতন।

[২১] অংশগ্রহণকারী যা, বি, সুধা মাল, সাক্ষাতকার, স্থান-যাদবপুর।

> তুমি আসবে নাকি তুমি নিজে জায়গা অকুপাই করবে সেটা তোমার নিজের ব্যাপার। আমরা হয়তো হতে দিয়েছি। ওরা যেমন আমাদের আলাদা করেছে আমরাও আলাদা হতে দিয়েছি। আমরাও আলাদা হয়ে গেছি। আমরাও চাইলেই তো পারতাম যে আমরা ওদের টেবিলের মাঝখানে গিয়ে বসে যাব। ওটা ওদের কেন টেবিল হবে। আমাদের অধিকার আছে বসার। কিন্তু আমরা তা তো করিনি। আমরা ও সরে এসেছি ওদের ইগনোরেন্স পেয়ে। আমি ওদের মাঝে বসে সিকিওর ফিল করি না কম্পোর্টেবল ফিল করিনা ওদের মাঝে বসে তারা হয়তো আমাকে দেখে হাসবে তাই আমি সরে আসছি। হয়তো আমি আমার মত করে বাংলায় নোট করছি সেটা দেখে হাসবে[২২]।

বিশ্বভারতীর ছাত্রী রিনি মুর্মু জানাচ্ছেন তার ইংলিশ জানলে ভাল হত। তার আর্মিতে যাবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ইংরেজি না জানার জন্য সে যেতে পারেনি। সেখানে হিন্দী আর ইংলিশ লাগবে, এদিকে রিনি দুটোই জানেন না। তার মা বাড়ির কাজ করেন, চাষে সাহায্য করেন। তার দিদি পুরুলিয়াতে থাকে। গ্রাজুয়েশন পর্যন্ত পড়েছে, তারপর সেলাই শেখে। রিনি জানায়, "আমি এম ফিল করব তারপর পি এইচ ডি করব। তারপর আমি প্রফেসর হতে চাই। এটাই আমার এম। আমাদের বিভাগের টিচাররা খুব সাহায্য করে। আমি আমাদের কালচার নিয়ে কাজ করতে চাই। আমাদের যে সাঁওতালি কালচারে বারো মাসে তেরোটা পার্বণ হয় সেটা নিয়ে আমি এম এ তে করছি ডিসার্টেসন। আমার কোন অসুবিধা হয় না। তবে আমরা ট্রাইবালরা মিশি নিজেদের মধ্যে। অন্যরা মেশে  না আমরাও মিশি না। আমাদের এখানে নিজেদের একটা কমিউনিটি আছে সাঁওতাল দের। নানা অনুষ্ঠান হয়। ইউনিভার্সিটি আর ভিলেজ যুক্ত হয়ে অনুষ্টান হয়[২৩]। ইংরেজি সম্পর্কিত যে কৌলিন্য এবং ভেদাভেদ করা হয় সে বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেকেরই অভিজ্ঞতা রয়েছে। তারা প্রত্যেকেই একভাবে ভাষা বৈষম্যের স্বীকার হয়েছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ইউমী দর্জি বলছেন,

> যখন প্রথম এলাম প্রথম ক্লাশ করতে আমাদের বিভাগীয় প্রধান ক্লাশ নিচ্ছিলেন। প্রথম ক্লাশে ইন্ট্রোডাকশন করতে বললেন সবাইকে। সবাই ইংরেজিতে কথা বলছে। আমি ইংরেজি কিছুই জানি না তখন এতটা কমজোর যে আমি কি বলব ভেবেই আমার ভয় লাগছে। সবাই যে ইন্ট্রোডাকশন দিচ্ছে সেগুলো খাতায় লিখে রাখছিলাম আমি নাম গুলো জায়গা গুলো চেঞ্জ করে আমি বললাম। তার ভিতরেও ভুল বলে ফেলেছিলাম। এত টেনশনে ছিলাম। ভুলটা কেমন ছিল? ওয়াজের জায়গায় ইজ বলে ফেলেছিলাম। সবাই হাসছিল। তারপর নিজেই একটু পর বুঝলাম যে ভুল বলছি।  তার পর দেখলাম যে এখানে সারভাইভ করা সমস্যা হয়ে যাবে। তারপর বাচ্চাদের

---

[২২] অংশগ্রহণকারী যা, বি ৭, নিশা দাস, সাক্ষাতকার, স্থান–যাদবপুর।

[২৩] অংশগ্রহণকারী বি, বি ১, রিনি মুর্মু, সাক্ষাতকার, স্থান-শান্তিনিকেতন।

> গ্রামার বই পড়তে শুরু করলাম। ক্লাশ সেভেন থেকে গ্রামার বই পড়তে শুরু করলাম। স্পোকেন ইংলিশের একটা কোর্স করলাম এখানে। তারপর এখন ঠিক আছে। তারপর টীচার রাও বারবার বলত ক্লাশে যে তোমার ইংরেজি খুব খারাপ। তোমার ইংরেজি লেভেল বাড়াও। আলাদা করে ডেকেও বলত আর ক্লাশেও বলত। আমাদের খারাপ লাগত না কারণ এরকম বেশ কয়েকজন ছিলাম। সবাই হাসত আমরাও হাসতাম। আসলে ব্যাপারটা তো সত্যি যে আমার ইংরেজি খুবই পুওর ছিল। তারপর এখন স্টেবল। ক্লাশে অধিকাংশ জিনিসপত্র বুঝতেই পারতাম না। টিচার যখন পাঁচটা লাইন বলতেন আমার একটা লাইন লেখা হত, আমি কোনদিন লিখতে পারতাম না ক্লাশনোট। তখন অন্যদের কাছে চাইতাম সেখানেও লোকজনের একটা তাচ্ছিল্য ছিল। তার ভিতরেও প্রচুর স্পেলিং মিসটেক। অন্যদের কাছ থেকে ক্লাশনোট নিয়ে মুখস্থ করতাম। না হলে ব্যাক পেয়ে যাব তো। স্পোকেন ইংলিশের ক্লাশটাতে কিছুটা উপকার হয়েছিল বাকি গ্রামার আমি নিজেই ইম্প্রুভ করেছি। সিনিয়র দাদারা টীচাররা নিউজ পেপার পড়তে বলত। নতুন ওয়ার্ড গুলো লিখে রাখতাম। রিভিশন করতাম। এইভাবে হয়েছে এখন। এই প্রসেসটা অনেকদিন চালাতে হয়েছে[২৪]।

ভাষা শুধু নয়, উচ্চারণ, প্রামাণ্য ভাষার ব্যবহার ইত্যদিও ক্ষমতা সম্পর্ক নির্মাণ করে। পি এইচ ডি গবেষক সুধা মাল জানাচ্ছেন,

> শান্তিনিকেতনে যখন পড়তে গেলাম। চুপ করে থাকতাম। কারণ আমার ভাষায় বীরভূমের আঞ্চলিক টান। একই জেলায় হলেও শান্তিনিকেতনে এক প্রামাণ্য বাংলার চর্চা হয়। সেখানে গিয়ে আমার কথা শুনে সবাই হাসত। তাই চুপ করে থাকতাম। সেই চুপ করে থাকা অভ্যাস হয়ে গেল। সবাই ভাবল আমি ওই রকমই। তারপর ধীরে ধীরে আমি শিখলাম প্রমাণ্য বাংলা বলতে এবং লিখতে। তারপর যখন যাদবপুরে গবেষণা করতে গেলাম সবাই বলল আহারে কি সুন্দর বাংলা কিন্তু মজার কথা হল এখন ইংরেজি জানি না ভাল ভাবে। এমফিল করলাম বাংলায়। যাবতীয় পরীক্ষায় ইংরেজিতে যারা লিখত তাদের সমান বা তাদের থেকেও বেশী নাম্বার পেলাম। তখন সবাই বুঝল যে না ইংরেজি জানে না কিন্তু পড়াশুনাটা ভাল করতে পারে। তারপর শুরু হল ইংরেজি নিয়ে যুদ্ধ। সেই আধা খ্যাচড়া অবস্থায় এখন আছি। তবে আশা রাখি হয়ে যাবে কিছুদিন পরে।[২৫]

নিশা দাস বলছেন, “আমি এখন ইচ্ছা করেই আমার ভাষাগুলো বলি। যে ভাষার জন্য আমার আইডেন্টিটি বঞ্চনার স্বীকার হয়ে যাচ্ছে যেখানে আমার আইডেন্টিটি সাপ্রেশড হয়ে যাচ্ছে সেখানে আমি আরো বেশি

---

[২৪] অংশগ্রহণকারী যা, বি ১২, ইউমী দর্জি, সাক্ষাতকার, স্থান–যাদবপুর।

[২৫] অংশগ্রহণকারী যা, বি ১১, সুধা মাল, সাক্ষাতকার, স্থান -যাদবপুর।

করে বলব আমার কথা। তাতে যার যা মনে হয় হোক। কি দোষ করল সেই ভাষা। এই গুলো আমার ক্লিয়ার হত না কিন্তু বিভাগে আমাদের ম্যাম এগুলো পড়িয়েছে কাস্ট, ভাষা আর কালচার নিয়ে তখন আমি সব বুঝতে পেরেছি। এখন  আমি এসব নিয়ে দুঃখ পাই না। কারণ যুক্তি তর্ক করতে পারি। এই রিডিং গুলোর কিছু কিছু ছোটদের পড়ানো উচিত। আমরা পড়াশোনা করেই ধীরে ধীরে পজিটিভ হচ্ছি। এখন আমি অপমানিত হই না।”[২৬]

ইংরেজির সঙ্গে অন্য ভাষার তুলনা এবং বৈষম্য শুধু নয়, একই ভাষার ভিতরে উচ্চারণ, শব্দব্যবহার ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এক ধরণের ভেদাভেদ করা হয়। আঞ্চলিক ভাষা-রাজধানীর প্রমান্য ভাষা নিয়ে একটা বৈষম্য। হস্টেলে, ক্যাম্পাসে ভিন্ন ভাষা নিয়ে স্বাস্থ্যকর আলাপ আলোচনার বিষয়টিও সাক্ষাৎকার থেকে উঠে এসেছে। সুধা মাল জানিয়েছেন তাদের অভিজ্ঞতা “এই যে পনের কুড়ি বছর নিজেকে নিয়োজিত রাখা এডুকেশন সিস্টেমের মধ্যে, একদিকে সময় চেঞ্জ হচ্ছে, আমরা চেঞ্জ হচ্ছি, আমাদের সোসাইটি বদলে যাচ্ছে, প্রতিষ্ঠান বদল করছি এই সার্বিক পরিবর্তনের মধ্যে নিজেকে খুঁজে বের করা আর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া খুব সহজ নয়। অন্তত মেয়েদের জন্য। শান্তিনিকেতনে গিয়ে দেখলাম নানা জায়গা থেকে লোক আসে, দেশের নানা রাজ্য থেকে। এমন কি ভিন্ন দেশ থেকে। হস্টেলের মধ্যেও দেখলাম নানা জায়গার নানা কালচারের লোক একসাথে থাকতে শুরু করলাম। আমাদের লাইফ স্টাইল চেঞ্জ হয়েছে এর ফলে। আবার একটা দিক হল ভাষার একটা পরিবর্তন হয়েছে। নতুন শব্দ ভাণ্ডারের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছি। আমরা সবাই আলাদা আলাদা ডাইলেক্ট নিয়ে এসেছি হস্টেলে। সবার ভাষা এক খাবার প্রায় এক হলেও সুক্ষ্ম কিছু পার্থক্য তো ছিলই সবার মধ্যে। সেই গুলো জানার বোঝার চেষ্টা করছি শিখছি। নতুন শব্দ, নতুন উচ্চারণ শিখছি। হয়তো মজার ছলেই। হাসছি তাই নিয়ে কিন্তু কেউ কাউকে অপমান করছি না। কিন্তু একটা মিশে যাবার ব্যাপার তৈরি হচ্ছে। কোন এলাকার মুদ্রাদোষগুলো চিহ্নিত করছি এবং শিখছি[২৭]।

হেম চন্দ বলছেন, বীরভূমের ভাষা বলতে যেটা লোকে বলে সেটা আমার কোনদিনই ছিল না। কারণ আমি সিউড়ীতে থেকেছি আমি শিশু মন্দিরে পড়তাম। তারফলে একটা স্ট্যান্ডার্ড উচ্চারণ আমার বরাবরই ছিল। তার ফলে সেই সমস্যাটা আমার হয় নি কোনদিন। আমার এক জুনিয়রের এই সমস্যাটা হয়েছে। সে এসেছে জলপাইগুড়ী থেকে। সে যখন তাদের মত করে এখানে কথা বলত তাই নিয়ে লোকে হাসত তাই সে নিজের উচ্চারণ বদলে নিয়েছে ধীরে ধীরে। কেউ কেউ আছে যারা বদলায় না। নিজের মত করেই বলে। এই খোরাকটা আমাকে হতে হয় নি। কিন্তু আমি দেখেছি অন্যের এই অসুবিধা গুলো[২৮]।

---

[২৬] অংশগ্রহণকারী যা, বি ১১, সুধা মাল, সাক্ষাতকার, স্থান -যাদবপুর।

[২৭] অংশগ্রহণকারী যা, বি ১১, সুধা মাল, সাক্ষাতকার, স্থান -যাদবপুর।

[২৮] অংশগ্রহণকারী বি, বি ৫, হেম চন্দ, সাক্ষাতকার, স্থান-শান্তিনিকেতন।

দেখা যাচ্ছে এই প্রান্তিক ছাত্রীরা ইউনিভার্সিটিতে একভাবে কথা বলে বাড়িতে অন্যভাবে কথা বলে। ভাষা, উচ্চারণ, উপস্থাপন দুটি ক্ষেত্রে ভিন্ন।

শুধুমাত্র মৌখিক ভাষা নয় এই ছাত্রীরা শারীরিক ভাষার ক্ষেত্রেও সমস্যায় পড়ে। সেমিনার, ক্লাসরুম সর্বত্রই তারা নিজেদের উপস্থাপনা ও শরীরী ভাষা নিয়ে সংকুচিত, সন্ত্রস্ত থাকে। সাক্ষাৎকার থেকে জানা যাচ্ছে, প্রথম সারির বেঞ্চে প্রধানত তারা বসে না। আত্ম বিশ্বাসের অভাব তাদের রয়েছে এবং মুখোমুখি চাক্ষুস করাকে তারা কিছুটা ভয় পায়। নিজেদের সম্বন্ধে নিচু ধারণা, হীনমন্যতা এক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল। ‘যথাযথ’ শরীরী ভাষার অভাবের জন্য তাদের এক ধরনের সংকোচ বোধ থাকে। সঙ্গে যুক্ত হয় পোশাক আশাক ও উপস্থাপনার সমস্যা। সুধার মনে হয় অ্যাকাডেমিক হতে গেলে বিশেষ কিছু ম্যানারিজম তাদেরকে রপ্ত করে নিতেই হয়। বিশেষ পোষাক, দামী পোশাক, যথাযথ বডি ল্যাঙ্গোয়েজ, জুতো ইত্যাদি। অভিজ্ঞতায় তারা দেখেছে তাদের বডি ল্যাঙ্গোয়েজ, ভাষা ব্যবহার অনেকের কাছে হাস্যকর হয়ে উঠেছে। সুধা জানায়, কিভাবে আচরণ করলে ‘অ্যাকাডেমিক’এর মত দেখাবে সে বুঝতে পারে না। তারা গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেও সেটা লোকজনের কাছে গুরুত্বপুর্ণ মনে হয় না। কে কোন ক্ষমতার অবস্থান থেকে কথা বলছে তার ভিত্তিতে নির্মিত হয় কথার গুরুত্ব। হেমের মনে হয় সেই ভাব ভঙ্গি রপ্ত করাটা খুব জরুরি হয়ে ওঠে। রিনি, পপি, সুধা এ বিষয়ে তাদের সমস্যা ও অস্বস্তির কথা জানিয়েছেন।

**বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে জাতি, জাতিহীনতা এবং বিচ্ছিন্নতার রাজনীতি**

সংরক্ষণ ছাড়াও মেধার ভিত্তিতে ‘জেনারেল’ হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছেন প্রান্তিক ছাত্রীরা, এখানে জেনারেল ক্যাটেগরির সমার্থক জাতিহীনতা থাকছে না, অন্যদিকে জেনারেল হিসাবে আসা প্রান্তিক ছাত্রীরা জাতিগত হিংসা থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না, ‘সংরক্ষিত’ আসনে আসা ছাত্রছাত্রীদের মতই তারা একই ভাবে জাতিভিত্তিক বৈষম্যের সম্মুখে পড়ছেন। সুতরাং এখানে জাতিভিত্তিক বিভেদের সঙ্গে সংরক্ষিত আসনের আশু সম্পর্ক থাকছে না, এই বৈষম্যের বীজ আরো গভীরে। সতীশ দেশপান্ডে (২০১৬) জেনারেল ক্যাটাগরির এই নিজেদের কাস্টলেস বা জাতিমুক্ত হিসাবে দেখার দৃষ্টিকে সমালোচনা করছেন। প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক ছাত্রীরা সংরক্ষিত আসনে বা জেনারেল আসনে আসার ওপর নির্ভর করছে না তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা। অন্যদিকে জাতিভিত্তিক পরিচিতির থেকে বেরিয়ে নিজেদের ছাত্র এবং গবেষক এই পরিচিতিগুলি গ্রহণে আগ্রহী এই ছাত্রীরা। বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরকে যথার্থ গণতান্ত্রিক করে তোলার জন্য পরিচিতি ভিত্তিক রাজনীতির প্রয়োজনীতা তারা স্বীকার করছেন কিন্তু এই জাতিভিত্তিক পরিচিতি ছাড়িয়ে তারা একাডেমিক পরিচয়ে নিরপেক্ষ ভাবে পরিচিত হতে চান এবং স্বীকৃতি চান।

সোশাল মিডিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের প্রোফাইল রয়েছে, ফেসবুক, হোয়াটসআপ, ইন্সটাগ্রামে প্রোফাইল আছে ও মেইল আইডি আছে। কয়েকটি সোশাল মিডিয়া গুলিতে ডিপার্টমেন্টের ক্লাশমেটদের গ্রুপ রয়েছে। অংশগ্রহণকারীরা সেগুলিতে মোটামুটি নিশ্চুপ। কারণ সবাই ইংরেজিতে এখানে লেখে এবং কথা

বলে। এই ছাত্রীরা বাংলা টাইপ করলে বাকিদের তাচ্ছিল্য ঝরে পড়ে, অনেক ক্ষেত্রে উত্তর পাওয়া যায় না বলে তারা জানাচ্ছেন। কেয়ার কথায় "পড়াশোনা ছাড়া তারা গ্রুপে যে বিষয় গুলি নিয়ে কথা বলে সেই বিষয়গুলো আমাদের আওতার বাইরে। ওখানে আমি অংশ নিতে পারি না। শহরের দামী রেস্তোরা, বার অথবা অভিজাত ব্র্যান্ড দোকান এইসব নিয়ে গ্রুপে কথা হয়। সেখানে নিজের অক্ষমতার কথা, নিজের না পারা, না জানার কথা তাদের বলা যায়না"[২৯] সেখানে সে ব্রাত্য। গ্রুপগুলিতে তাদের উপস্থিতি থাকে কিন্তু তাদের কোনো স্বর থাকে না। নিশার অভিজ্ঞতায় রয়েছে কিভাবে এম ফিল শুরু হয়ে শেষ হয়ে যাবার পরো ক্লাশমেট দের সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে ওঠে না। তার অভিজ্ঞতায় রয়েছে একটি মেরুকরণের চিত্র। তার কথায়, "হোয়াটস আপে একটা গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে। সেখানে এম ফিল হবার পর সবাই সবাইকে যখন কনগ্রাজুলেশন জানাচ্ছিল সেখানেও সেই বৈষম্যটা চোখে পড়ছিল। কে কাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে সেখানেও দেখলাম পক্ষপাত। আমাদের গ্রুপ আমাদের নিজেদের মধ্যে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। ওরা নিজেদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। তাতে তারাই রেসপন্স করছে। এই বৈষম্যটা চরম লেভেলে আছে। এবং আমি কথা বলে জানতে পেরেছি যে আমার যে সিনিয়র দাদা যে আগে এখানে পড়ত সে এখন কলেজে পড়ায় উনিও এটা ফেস করেছিলেন উনাদের সময়কালেও"[৩০]। ক্লাশে এবং সোসাল মিডিয়াতে ও প্রান্তিক ছাত্রছাত্রী এবং অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটা চর্চাগত পার্থক্য রয়েছে। ক্লাশেও ভেদাভেদ আছে, সোসাল মিডিয়াতে গ্রুপে ও একই ভেদাভেদ আছে। নিশা জানাচ্ছে যে ক্লাশ কখন হবে না হবে এই তথ্য সবাইকে জানানোর জন্য একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করা হয়েছিল। যেখানে 'আমরা - ওরা' বিভাজন দেখা যায়। "তখন দেখেছি আমাদের ম্যাসেজে আমরাই উত্তর দি। ওদের ম্যাসেজে ওরা উত্তর দেয়। এবারে ওদের যখন দরকার থাকে তখন ওরা আমাদের কোন মেসেজ দেখে কিন্তু উত্তর দেয় না। ওদেরো লাভ আছে যেখানে সেইসব কিছুতে ওরা রেসপন্স করে। কিন্তু আমাদের যদি কোন সমস্যা হয় তাহলে সেখানে ওরা উত্তর দেয় না। ওদের সমস্যায় আমরা উত্তর দিলে সেটাও ভাল ভাবে দেখে না। আমরা তো ডিভিশন করি না। কেউ যদি অবজার্ভ করে তাহলে স্পষ্ট দেখা যাবে যে এই ডিভিশনটা আছে। চোখে এটা পড়বেই। ওদের ল্যাঙ্গোয়েজ সব সময়ই ইংরেজিতে থাকে। তারা অন্যে কে কি বুঝল তাই নিয়ে ওদের কিছু যায় আসে না। বরং আমরা ভাল বুঝি না এটা ওরা এনজয় করত"[৩১]। এখানে 'আমরা-ওরা'র একটা স্পষ্ট বিভাজন ছাত্রীটির কথায় উঠে আসছে।

জাতি, শ্রেণিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে ক্লাশে বা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে গ্রুপ তৈরি হবার কথা উঠে আসছে সাক্ষাতকার থেকে। প্রান্তিক ছাত্রীদের বন্ধু পাওয়ার সমস্যা হয়। তাদের জীবনযাপন আলাদা, চর্চা আলাদা এবং অর্থনৈতিক সংকটের ফলে তারা সংকুচিত থাকে, শহরে এসে রেস্তোঁরা সিনেমা ইত্যাদিতে

---

[২৯] অংশগ্রহণকারী বি, বি ১০, কেয়া দাস, সাক্ষাতকার, স্থান -যাদবপুর।

[৩০] অংশগ্রহণকারী বি, বি, নিশা দাস, সাক্ষাতকার, স্থান -যাদবপুর।

[৩১] অংশগ্রহণকারী বি, বি ৭, নিশা দাস, সাক্ষাতকার, স্থান -যাদবপুর।

তারা যায় না তারফলে সহপাঠী বন্ধুদের সঙ্গে তাদের সময় কাটানোর পরিসর কমে আসে। সম্মিলিত ভাবে পরস্পরের উপভোগ করার পরিসর সংকুচিত হয়ে যায়। ক্লাশের মধ্যেও গ্রুপ তৈরি হয় সমকক্ষদের মধ্যে। সুধা জানাচ্ছেন, "আমার ব্যাচের যাদের ওয়ে অফ লিভিং খুব মডার্নাইজ যারা বারে যায়, যারা সিগারেট খায় যারা আধুনিক জামা কাপড় পড়ে, তাদের একটা গ্রুপিং থাকে আর আমরা যারা ধরো ফার্স্ট জেনারেশন লার্ণার তাদের কিন্তু অন্য একটা গ্রুপিং হল। তারা আলাদা জায়গায় বসছে আমরা আলাদা জায়গায় বসছি। অল অফ আ সার্ডেন দেখে হয়তো বোঝা যাচ্ছ না, একই ক্যান্টিনে হয়তো এদিকে বা ওদিকে বসে আছি কিন্তু যদি মানে এরকম সিচুয়েশন হয় যে তার কাছে অপ্সন থাকে যে অন্য টেবিলে বসার যাদের খুব এলিটিয়ান ব্যাকগ্রাউন্ড আছে বা যাদের ওয়ে অফ লিভিং যাদের খুব ভাল সে অপর টেবিলটাতে বসেই খাওয়া পছন্দ করবে। আমার সাথে বসে খাবার তুলনায়"[৩২] নিশা দাস লক্ষ্য করেছেন শিক্ষকদের মধ্যে পক্ষপাত, তিনি বলছেন,

> টিচারদের তুমি যদি এই পক্ষপাতের বিষয়টা বলো সে তো শুনবেই না। কিন্তু এই প্রেফারেন্সের ব্যাপারটা অবশ্যই আছে। ডিসক্রিমিনেশন থাকে কিন্তু অনেকসময় সেটা চোখে দেখা যায় না। সাইলেন্টলি এক্সক্লুশন হয়। শুধু টিচার নয় স্টুডেন্ট কমিউনিটির মধ্যেও তুমি ডিসক্রিমিনেটেড হবে। তার কারণ তোমার ইংরেজি এত ভাল না, তোমার নিজেকে উপস্থাপন ভাল না, বা তোমার ফিনান্সিয়াল স্ট্রেন্থ বাকিদের তুলনায় নগণ্য। আমার ক্লাশমেটদের কেউ কেউ একদিনে গিয়ে পার্কস্ট্রীটে গিয়ে পাঁচ হাজার টাকার মদ খেয়ে আসতে পারে এদিকে আমি ভাবি আমি রুমভাড়া দেব কি করে আর আমার সারা মাস চলে যাবে পাঁচ হাজার টাকায়। আমার আমি ঐ লাইফ স্টাইলটাই গিয়ে নিজেকে পুট করতে পারব না। কারণ আমার ফিনান্সিয়াল স্ট্রেন্থটা সেই রকম নেই। এই গুলো তো অবশ্যই ম্যাটার করে আমরা যারা ফার্স্ট জেনারেশন লার্নার তাদের ক্ষেত্রে[৩৩]।

কেয়া দাস ও ক্লাশে গ্রুপ তৈরি আর বন্ধুত্ব তৈরির ক্ষেত্রে একটা মেরুকরণ লক্ষ্য করেছে। সে জানায় "আমরা যারা একই রকম মানে যারা অতটা 'হাইপ্রোফাইল' না তারা নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্ব করে সন্তুষ্ট থাকি আর কি। তবে দুটো গ্রুপ আছে। উচ্চবিত্তদের সঙ্গে মিশতে আমি পারবও না। ক্লাশে সবার সাথেই মিশি, সবাই একসাথে কাজ করা পড়াশুনা করা সবাই করে, কিন্তু ক্লোজ কারা কারা সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে নিজেদের মধ্যে একটা ভাগ অটোমেটিক্যালি হয়ে যাচ্ছে। নিজেদের স্ট্যান্ডার্ডের লোকজনের সঙ্গেই মিশছে সবাই, বা ক্লাশের বাইরে সময় কাটানো, অন্য কাজ করা সেগুলো করছে। উচ্চবিত্ত আমার কেউ ক্লোজ ফ্রেন্ড নেই। হাই হেলো বা কাজের কথা সেরকম, তবে বাজারে যাব বা ঘুরতে যাব সেগুলো

[৩২] অংশগ্রহণকারী যা. বি ১১, সুধা মাল, সাক্ষাতকার, স্থান-যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

[৩৩] অংশগ্রহণকারী যা. বি ৭, নিশা দাস, সাক্ষাতকার, স্থান-যাদবপুর বিশ্ববিদ্যায়।

ওদের সাথে হয়না। আমার মত ব্যাক গ্রাউন্ডের যারা তারাই আমার ক্লোজ বন্ধু। এরা আমাদের মতই। টাকা পয়সার ব্যাপারে। আড্ডা দেওয়া চায়ের দোকানে বসে থাকা এই গুলো এদের সঙ্গেই হয়।”[৩৪] নিশা দাস ননেট ফেলোশিপ পাচ্ছেন। তিনি জানাচ্ছেন তার একটা গবেষণার কাজ ঠিক করা আছে। তবে ফেলোশিপ না পেলে পিএইচডি করাটা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। জে আর এফ না পেলে করবে না বলে সে জানায়, সে আপাতত চাকরির জন্য ভাবছে না। মুর্শিদাবাদের কথ্যভাষার ছাপ তার কথায় রয়েছে, সে বলে

> ছোটবেলা থেকেই আমাদের মধ্যে একটা আঞ্চলিকতার টান আছে। তাদের ব্যাচে আঠেরজন ভর্তি হয় এমফিলে। তার মধ্যে ষোলজন থাকে বাকি দুজন চলে গেছিল ছেড়ে। কিছুদিন পরে এই ষোলজনের মধ্যে অটোমেটিক্যালি একটা ভাগ হইয়ে গেল যারা একটু ‘হায়ার কালচার’ আছে যারা একটু  ‘মডার্ণ কলচার’ আছে তারা একটু একদিকে হয়ে গেল। নিজেদের একটা গ্রুপ তৈরি করল। কেউ কাউকে কিছু বলেনি। কিন্তু নিজেরা সেপারেট হয়ে গেল। যারা একটু গ্রাম থেকে এসেছে তারা আলাদা হয়ে গেল। আমরা তাদের মধ্যে। কেউ কারোর সাথে খারাপ ব্যবহার নয় কিন্তু খুব স্বাভাবিক পথেই যেন সবাই নিজেদের গ্রুপ করে নিল। নর্মাল একটা প্রসেস যেন। ক্যান্টিনে তারা আলাদা টেবিলে বসত। ক্লাশে তারা একসাথে বসত। তারা নিজেদের মধ্যে ইংরেজিতে কথা বলছে। নানা বিষয়ে কথা বলছে যেগুলো হয়তো আমরা জানিইনা। সেখানে আমরা মিশতে পারছিনা সেখানে আমাদের অসুবিধা হচ্ছে তারফলে আমরা আলাদা হয়ে যাচ্ছি। আলাদাভাবে বসছে।[৩৫]

প্রথম প্রজন্মের ছাত্র, প্রথম প্রজন্মের ছাত্রী, বাকী ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মী সবার মধ্যে কাঠামোগত একটি ক্ষমতা সম্পর্ক ক্রিয়াশীল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঙ্ক্ষিত গণতান্ত্রিক পরিসরে পারস্পরিক ব্যবহার এবং সম্বন্ধ বিদ্যমান ক্ষমতা সম্পর্ক দ্বারা পরিচালিত হয় যার ফলে প্রান্তিক ছাত্রীরা বৈষম্যমূলক আচরনের সম্মুখীন হয়। সমাজের সর্বস্তর থেকে যাবতীয় বৈষম্য নির্মূল করার লক্ষ্যে সচেতনতা লক্ষ্যণীয়, লক্ষ্য সব ধরনের বৈষম্য দূর করে একটি শিক্ষা ক্ষেত্রের কথাচিন্তা করা যা সমতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এই সাম্যের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো সর্বাধিক গুরুত্ব পায় সেগুলো মূলত শ্রেণিসাম্য, বর্ণসাম্য, জাতিগত সাম্য, যৌনসাম্য। সমাজে সবাই যখন সাম্য নিয়ে কথা বলছে, সাম্য নিয়ে যথেষ্ট সচেতন, নানা পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে, বৈষম্য বিরোধী জ্ঞানচর্চা চলছে অথচ বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে বৈষম্যের ঘটনা কমছে না। এই বৈপরীত্য যখন ঘটে তখন স্বাভাবিক ভাবেই একটি প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে যে তাহলে সমস্যার মূল কি। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সাম্যের আদর্শ মৌখিক ভাবে চর্চিত হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রামগঞ্জ থেকে পড়তে

[৩৪] অংশগ্রহণকারী যা. বি ১০, কেয়া দাস, সাক্ষাতকার, স্থান-যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

[৩৫] অংশগ্রহণকারী যা. বি ৭, নিশা দাস, সাক্ষাতকার, স্থান-যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

আসা ছেলেটি বা মেয়েটি হীনমন্যতার শিকার হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশে সব ধরনের সাম্য চর্চিত হলে সমাজের নীচু তলার ছাত্রছাত্রীরা অবহেলার পাত্র হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় জীবন যাপন করত না। যারা ভরসা করে উঠতে পারে না এই সাম্যের পরিসরকে।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে বন্ধু পাওয়ার সমস্যার পাশাপাশি তারা নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে যেহেতু হীনমন্যতার মধ্যে থাকে, তারা বন্ধুদের বাড়িতে নিয়ে যেতে সংকোচ বোধ করে। টিনা দাস নিয়ে গেছে তার বাড়িতে বন্ধুদের, তিনি বলছেন "আমি সবাইকে নিয়ে গেছি আমার ভাঙাচোরা ঘর, বাথরুম নেই, কিছু নেই। কিন্তু সবাইকে নিয়ে গেছি। থেকেছি, মজা করেছি। এটা কেউ ন্যাচারাল হিসাবে মেনে নেয়। কেউ এটা লুকিয়ে রাখে। সোসাইটি কিভাবে নেবে এই জন্য লুকায়"[৩৬]। সমাজে গ্রহণযোগ্য হবার জন্য অনেকে আত্ম-পরিচয় লুকিয়ে রাখে। সুধা বলছেন, "এখন ডিগ্রী পেয়েছি এখন আমার কাস্টটা উহ্য হয়ে গেল। কিন্তু যতদিন আমার ডিগ্রি ছিলনা ততদিন আমি মাল ছিলাম আমার কাস্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সামাজিক অবস্থান পাবার জন্য ডিগ্রী দরকার। আমি যদি যাদবপুরে না পড়তাম আমাকে কতজন পাত্তা দিত! আজকে এলাকায় গিয়ে সম্মান পাই কারণ আমি যাদবপুরে পড়েছি বলে"[৩৭]

প্রথম প্রজন্মের অন্তর্মূখী ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মত বিশ্ববিদ্যালয় কাঠামো ও পাঠক্রম তৈরী হয় মূলত বহির্মূখী ব্যক্তি এবং ছাত্রছাত্রীদের কথা ভেবে। সে ক্ষেত্রে অন্তর্মূখী ছাত্রছাত্রীদেরন অবস্থান সংকটজনক। দুনিয়া জুড়ে ধীরে ধীরে বহির্মূখীদের আধিপত্য বাড়ছে। 'বলিয়ে কইয়ে' না হলে তার কন্ঠস্বর চেপে রাখা হয় যে কোনো ভাবে। সংবেদনশীলতার জায়গায়, কে কতটা দৌড়তে পারে তার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় সাফল্যের নিশানা। মানবী বিদ্যা যেহেতু সব স্বর উঠে আসার, সাম্যের কথা বলে বিশেষত চাপা পড়ে যাওয়া স্বর উঠে আসার কথা বলে, সেখানে নতুন পাঠক্রম ও কাঠামোর কথা চিন্তা করা আবশ্যক বলে মনে হয় অন্তত সমস্ত স্বর উঠে আসার পরিসর তৈরী হওয়া দরকার।

নতুন শহর, নতুন সামজ বিন্যাসে বিচ্ছিন্নতা বোধের সমস্যা প্রথম প্রজন্মের ছাত্রীদের একটি বিশেষ সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। শহর এবং গ্রামের মানুষ জনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের আদল ভিন্ন। শহরে একটা অপরিচিতির স্বাভাবিকতা বা অ্যাননিমিটি থাকে যেটা গ্রাম বা মফস্বলে থাকে না। প্রান্তিক ছাত্রীরা শহরে এসে সমঝোতার সমস্যায় পড়েন। গবেষক সুধা জানাচ্ছেন "মেট্রোপলিটন আর নন মেট্রোপলিটনে থাকার মধ্যে যে পার্থক্য আছে সেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। কারো বাবা দুধ বেচে কারো জমিজমা রয়েছে, গরু ছাগল রয়েছে। মানে এগ্রিকালচারাল বেসড ওদের আর্নিং হয়। তাদের পক্ষে শহরে,

[৩৬] অংশগ্রহণকারী যা. বি, টিনা দাস, সাক্ষাতকার, স্থান-যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

[৩৭] অংশগ্রহণকারী যা. বি, সুধা মাল, সাক্ষাতকার, স্থান-যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

শহরের ক্যাম্পাসে মানিয়ে নেওয়া অসুবিধাজনক হয়ে ওঠে।"[৩৮] নিশা জানাচ্ছেন শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতা তাদের ক্লাশের ছাত্রদের একটা বড় অংশ এসেছিল নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে। বড়লোক গরীবলোক এই ডিভিশনটা তাদের মধ্যে ছিল না। কিন্তু কে পঞ্চায়েত এলাকা থেকে আর কে শহর থেকে এই ডিভিশনটা ছিল। সেভাবে কেউ কিছু না বললেও এড়িয়ে যাবার একটা ব্যাপার অনেকের মধ্যে ছিল। কে কতটা ভাল পরিবার থেকে বীলং করে সেরকম একটা দেখনদারী ব্যাপার প্রাথমিকভাবে ছিল। কিন্তু মাস্টার্সে গিয়ে এই ভেদাভেদ সে কমতে দেখেছে। দেখলাম সেটা কমতে শুরু করেছে। শহরে এক ধরণের বিচ্ছিন্নতার বোধ তাদের মধ্যে তৈরি হয়, বেণুর কথায়, "গ্রামে থেকেছি গ্রামে বড় হয়েছি। ইউনিভার্সিটিতে এসে দেখলাম প্রথম এত বড় বিল্ডীং। সবাই আমাদের থেকে আলাদা এখানে। এটা একটা ফিলিংস হয়েছিল। বাড়ি থেকে প্রথম বাইরে আসা। বাড়ির সঙ্গে যে অ্যাটাচমেন্টটা ছিল সেটা ধীরে ধীরে বদলে গেল। আলগা হয়ে গেল।"[৩৯]

পুং-দৃষ্টিসংস্কার বা মেল গেজ অন্যদিকে অভিজাত দৃষ্টিসংস্কার - এই দুই দৃষ্টিসংস্কারের সম্মুখে একজন প্রান্তিক ছাত্রীকে পড়তে হয় উচ্চশিক্ষা পরিসরে। একজন প্রান্তিক ছাত্রীর প্রতি উচ্চবর্গের পুরুষ ও নিম্নবর্গের পুরুষ যে গেজ বা দৃষ্টি ধারন করে তারও আন্তঃস্তর ভিত্তিক আলোচনা সম্ভব। উচ্চশিক্ষা পরিসরে দলিত ছাত্রীরা যে দৃষ্টিসংস্কারের সম্মুখীন হয় তার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে শ্রেণি, জাতি, লিঙ্গ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার বিন্যাস। মেল গেজের সঙ্গে তার জাতি ও শ্রেণিগত অবস্থান দৃষ্ট হয়। উচ্চবর্ণ এবং উচ্চবর্গ তাদের যে দৃষ্টিতে দেখে এই দৃষ্টিসংস্কারকে অভিজাত দৃষ্টিসংস্কার বা এলিট গেজ বলা যায়। উচ্চ বর্গের পুরুষ ও উচ্চবর্গের নারীদের এলিট গেজের সম্মুখীন হয় এই দলিত ছাত্রীরা। এই দুই ধরনের গেজের সঙ্গে যুঝতে হয় তাদের যা তাদের আত্ম সম্পর্কে একটি সংকুচিত ধারনা নির্মাণ করে। অংশগ্রহণকারীরা জানাচ্ছেন কিভাবে তাদের মনোবল, আত্মবিশ্বাস প্রভাবিত হয়েছে এই দ্বিমাত্রিক দৃষ্টিসংস্কারের দ্বারা। সামাজিক স্তর বিভাজনের মধ্যে নিম্নবর্গের নারী উচ্চশিক্ষা সূত্রে নিজের 'সীমানা' ডিঙ্গিয়ে এসে পড়ে ভিন্ন সীমানায়। এই যাত্রায় তার প্রথম বাধা নিম্নবর্গের পুরুষ। এবং সেই 'সীমানা' ডিঙ্গিয়ে আসার পর উচ্চবর্গের পুরুষ এবং উচ্চবর্গের নারীরা অভিজাত দৃষ্টিসংস্কারের সামনে পরে। উচ্চশিক্ষা পরিসর কাঠামোগত ভাবে উচ্চবর্গের পুরুষের জন্য নির্মিত। সেইখানে তাকে জায়গা করে নিতে সমাজ নির্ধারিত সীমার সঙ্গে তাকে লড়াই করতে হয়। গণতান্ত্রিক পরিমন্ডলের মধ্যেও তাকে 'বিজাতীয়' একটি পরিস্থিতিতে নিজের জায়গা তৈরির জন্য লড়াই করে যেতে হয়। সেখানে এই সীমানার রাজনীতি ক্রিয়াশীল। প্রতিটি সামাজিক স্তর এবং পরিসরের নিজস্ব চরিত্র অনুসারে সে বাধার সম্মুখীন হয়।

[৩৮] অংশগ্রহণকারী যা. বি, সুধা মাল, সাক্ষাতকার, স্থান-যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

[৩৯] অংশগ্রহণকারী বি, বি, বেণু হাসদা, সাক্ষাতকার, শান্তিনিকেতন।

**বর্জনের নৈঃশব্দ এবং নীরবতা এবং আনুগত্যের রাজনীতি**

বৈষম্যের একটি নীরব দিক রয়েছে যেখানে একজনকে তার জাতি, শ্রেণিগত অবস্থানের নিরিখে বাদ দেওয়া। নিশা দাস অনুভব করেছেন বর্জনের নৈঃশব্দ, তিনি বলছেন, "এই এলিট বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে তোমাকে কেউ কিছু বলবেনা। কিন্তু নীরবে বুঝিয়ে দেবে যে তোমার অবস্থানটা কি। এখানে কোন ছাত্ররা গুরুত্ব পাবে আর কারা পাবে না তা খুব স্পষ্ট ভাবে দেখতে পাবে কিন্তু কাউকে কিছু বলতে পারব না। চুপচাপ সবকিছু চলতে থাকবে। তুমি নিজেই বুঝতে পারবে যে তোমার প্রেফারেন্সটা কতটা কম আর অন্যদিকে যারা খুব পলিশড তাদের গুরুত্ব কতটা বেশি। তুমি কাউকে কোনো এভিডেন্স দিতে পারবে না যে এটা হচ্ছে তোমার সঙ্গে বা তুমি ফিল করছো। সবাই পলিটিক্যালি খুব কারেক্ট থাকবে সবসময়। আমি এটা ফিল করেছি আমার সেন্টারে। কিন্তু আমার কাছে কোনো এভিডেন্স নেই। ডিসক্রিমিনেটেড হিসাবে কোনো তথ্যপ্রমাণ আমি দিতে পারবনা।" প্রতিবন্ধী ছাত্রী বেণুর বন্ধু পাওয়া এবং সামাজিক ভাবে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়েছে, সে একাকী হয়ে যাবার কথা বলেছে, কিভাবে লিঙ্গ, জাতি এবং শ্রেণি পরিচয় একজন ব্যক্তিতে দলছুট করে বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে তার কথা থেকে উঠে এসেছে। তার কথায়, "আমাদের যে এস টি কমিউনিটি আছে ইউনিভার্সিটিতে সেখানে আমি মেম্বার ছিলাম না কিন্তু আমি দু এক বার গেছি অনুষ্ঠানে। পিকনিকের সময় গেছি আর নবীনবরনে গেছি, আম্রকুঞ্জের কাছাকাছি হলে যাই না হলে যাইনা। কে নিয়া যাবে, একটা পিছুটান। তাদের বিরক্ত লাগবে কিনা। এমনি ইউনিভার্সিটির নানা অনুষ্ঠানে যেতাম না এইজন্য। পরনির্ভর। আমি মাঝে মাঝে কাঁদতাম হস্টেলে বসে বসে। আমার বান্ধবীদের সবার তাড়াতাড়ি হাঁটা চলার জীবন আমি তো অনেক স্লো। অনুষ্ঠানের সময় খারাপ লাগত খুব।" বেণুর নিজেকে অন্তর্ভুক্ত মনে হয় নি অনেক ক্ষেত্রে ব্রাত্য মনে হয়েছে।

প্রান্তিক মেয়েরা গবেষণায় এসে বিচিত্র ভোগান্তির মধ্যে পড়েন, সহায়তা ছাড়া যখন পড়াশোনা করছেন, গবেষণার কাজে ফিল্ডওয়ার্কে বিপদে পড়ার সম্ভবনা অনেক বেশী। রিসার্চে যারা আসে তাদের বারবার বলা হয় বা তারা নিজেরাও ভাবে যে ফিল্ড ওয়ার্ক কিভাবে করবে। তারা এমন কিছু বিষয়ে কাজ করতে চায় যাতে ফিল্ড ওয়ার্ক না থাকে। বা এমন জায়গায় ক্ষেত্রসমীক্ষা থাকে যেখান থেকে কাজ করা সুবিধা আর কাছাকাছি। এই ভাবে তারা নিজেদের গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। এই ভাবে তারা নিজেদেরকে কমিয়ে আনে সমাজের চাহিদা অনুসারে, পরিবারের চাহিদা অনুসারে। তাদের উচ্চশিক্ষার 'উন্নতি', 'সমৃদ্ধি' তাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং বাইরে মধ্যে হীণমন্যতা তৈরি করে এবং বিদ্যমান ক্ষমতা সম্পর্ককে আন্দোলিত করে। প্রথম প্রজন্মের মেয়েরা সামাজিক বৈষম্য জেন্ডার বৈষম্য সব রকম সামাজিক অসুখ নিজে বহন করে ধারন করে এগিয়ে যায়। এই এগিয়ে যাওয়া কিসের ভিত্তিতে কোথায় তার উত্তর স্পষ্ট নয়। তাদের 'ভিতরের ক্ষমতা' নিয়ে তারা এগিয়ে যায়। সুধা জানায়, সে কিভাবে একা হয়ে পড়েছিল। যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে বলে কেউ মনে করে তখন সামাজিক বিদ্যমান ক্ষমতা

সম্পর্ক দিয়ে তাকে আক্রমণ করার চেষ্টা করে। চরিত্র হনন করার চেষ্টা, হেনস্থা করার চেষ্টা, অপ্রীতিকর কথাবার্তা রটানো ইত্যাদি সে দেখেছে। সুধা নিজেকে আক্রমন থেকে বাঁচানোর জন্য সাময়িক ভাবে ভেঙে পড়েছে, আপোষ করার কথা ভেবেছে, কিন্তু পরবর্তীতে সে নিজেকে সামলে নিয়ে এগিয়ে গেছে এবং লড়াই করে গেছে নিজের আত্ম সম্মান, আত্মমর্যাদা এবং স্বাধীনতার জন্য। হেম সামাজিক ভাবে হেনস্থার শিকার হয়েছে, সোশাল মিডিয়ায় তাকে ট্রোল করা হয়েছে। সে পুলিশে জানিয়েছে, কিন্তু মানসিক ভাবে সে বহু সময় ক্লান্ত হয়েছে, সে ভেবেছে হয়তো আর পারবে না, আত্ম বিশ্বাস ভেঙে গেছে, কিন্তু হেমও পুনরায় নিজেকে নির্মাণ করে এগিয়ে গেছে।

কে কোন মানসিক নির্যাতনের ইতিহাস নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছে বাইরে থেকে জানা সম্ভব হয় না। তাই এই ছাত্রছাত্রীরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছে বিশেষত মেয়েরা, তারা নানাদিক থেকে জর্জরিত। সমাজে সুস্থ জ্ঞান চর্চা আর সুন্দর জীবন নির্মাণ যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে তাদের মানসিক অসুবিধার কথা জানতে চাওয়া হোক। তার সুরাহা করার ব্যবস্থা করা হোক। তা না হলে তারা হারিয়ে যাবে। মানসিক অসুবিধা গুলো সমাজের সঙ্গে ইনডিভিজুয়ালের সম্পর্কের ফল। তাই এইদিক টা দেখতে হবে। প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক মেয়ে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসে তাদের সঙ্গে পরিবার ও সমাজের, বিশ্ববিদ্যালয়ের যে দ্বান্দিক সম্পর্ক অন্তত ভারতীয় সমাজ কাঠামোর মধ্যে তাতে এদের মানসিক ভাবে বিপ্রর্যস্ত হওয়া খুব স্বাভাবিক। তাদের প্রতি পদে যে বাধা আর সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তার প্রভাব তাদের ওপর পড়ে।

**উচ্চশিক্ষা পরিমণ্ডলের 'এলিটিজম', প্রথম প্রজন্মের ছাত্রীদের সমঝোতার সংকট এবং মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যা**

সহপাঠী এবং শিক্ষকদের কাছ থেকে নিত্যনৈমিত্তিক ক্ষুদ্র আগ্রাসী ব্যবহার প্রান্তিক ছাত্রীদের মানসিক ভাবে প্রভাবিত করে। তাদের মনে করিয়ে দেওয়া হয় তারা বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে মিসফিট, ব্রাত্য। 'অনভিজাত চেহারা আর ফ্যাকাশে মুখের' ছাত্রছাত্রীদের শ্রেণি অবস্থান তাদের বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে করে তোলে বেখাপ। নিশা দাস বুঝতে পারে সমস্যার ভিত্তি, সে বিশদে জানায়, যারা শহরের ইউনিভার্সিটি থেকে আসছে তারা আসলে বুঝতে পারে না প্রথম প্রজন্মদের আসলে কি অসুবিধা। তাদের প্রতি কি ধরনের ব্যবহার হওয়া উচিত। কতটা সহানুভূতি থাকা উচিত। আমার যে ইংরেজি লিখতে সমস্যা সেটা আমার টীচার যদি কখনও ফেস করে থাকে বা আমার বলতে সমস্যা সেটা যদি জানে তাহলে সেই ইস্যুটা সমাধান করার জন্য কি সমাধান আছে তার পথ সে বলে দিতে পারে। আমি নিজেকে ডিসক্রিমিনেটেড ফিল করি আমি ইংরেজি বলতে পারি না বলে। আর যারা বিদেশ থেকে পড়াশুনা করেছেন তারা বুঝতে পারেন না যে আমাদের কি অসুবিধে বা কি সমস্যা বা সেই সমস্যা আমাদেরকে কতটা ভঙ্গুর করে তোলে। নিজেরা একটা এলিটিস্ট পজিশনে আছে তাই বুঝতেই পারে না সমস্যাটা কোথায়। আমাদের

বিভাগে অনেকে আছে টীচার যাদের বাবা-মা কোনো কলেজের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের হেড ছিলেন। তাদের বাচ্চারা অক্সফোর্ডে পড়তে গেছে। ডিসক্রিমিনেশন আছে সেটা আন্ডার কারেন্টের মত কাজ করে, কিন্তু সেটা তুমি দেখতে পাবে না, কিন্তু যা হবার সেটা তলায় তলায় হয়ে যাবে। ক্লাশমেটরাও তাদের সাথেই বন্ধুত্ব করে যাদের সঙ্গে তাদের জীবন যাপন মেলে। আমার ওয়ে অব লিভিং এর সাথে যাদের মিলবে তাদের সঙ্গেই চলাফেরা করবে। যাতে একই জায়গায় দাঁড়াতে পারে তার ক্লাশে আমিই একমাত্র ফিমেল ফার্স্ট জেনারেশন লার্নার”।[৪০]

বিচ্ছিন্নতার কথা বলছেন বারবার কেয়া দাস, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী নিশা জানাচ্ছেন, “টীচারদের সাথেও কোনো সম্পর্ক থাকে না এই ক্যাম্পাসে। আগের প্রতিষ্ঠানে টীচারদের সঙ্গে একটা শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল। তারা স্নেহ করতেন। খোজ খবর নিতেন। কিন্তু এখানে ক্লাশের বাইরে তোমাকে কেউ চেনে না। সবাই খুব প্রফেশনাল। এখানে সেই শ্রদ্ধার জায়গা তৈরি হয় নি। টীচারস ডে তে আমরা ক্লাশ করেছি কোনো উল্লেখ ছাড়াই যে আজকে টীচারস ডে। খুবই কর্পোরেট মাইন্ড সেট বলতে পারো। তুমি এসেছ পড়তে আর আমি এসেছি টাকার বিনিময়ে তোমাকে পড়াতে। ব্যাস এর বাইরে আর কিছু থাকবে না। তার বাইরে কোন হিউম্যান রিলেশনশিপ তৈরি হবে না। একেকদিন বাড়ি এসে আমি কাঁদতাম। আমি কি ভাবে অ্যাডজাস্ট করব সেই কথা ভেবে আমি কাঁদতাম”[৪১] নিশা দাস একটা এন জিও র সাথে যুক্ত। সে বস্তিতে পড়াতে যায় আর নিজের কাজের জন্য ডেটা কালেক্ট করে। সুধা মাল শান্তিনিকেতন থেকে আসে কলকাতায়, ভর্তি হয় সেখানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। এসে বুঝতে পারে ইংরেজি জানা আর না জানাদের মধ্যে একটা ভাগ আছে শুধু নয় এই বিভাজন আছে পোশাক নিয়ে, বাহ্যিক উপস্থাপন নিয়ে। সেখানে তাকে লড়াই করতে হয়েছে। সেখানে গিয়ে সে সম্মুখীন হয়েছে নানা সমস্যার। কিন্তু তার আত্মবিশ্বাসের জায়গা তৈরি হয়েছিল,

> তবে পড়াশুনায় ভাল ছিলাম তাই কেউ কিছু বলতে পারতনা। বাংলায় লিখতাম কিন্তু বাংলায় লিখলে ও ইংরেজিতে যারা লিখত তাদের টেক্কা দেবার ক্ষমতা আমার ছিল। এবং সেটা ভাল চোখে দেখত না ক্লাশমেটদের অনেকেই। বাংলায় লেখে, গ্রাম্য এপিয়ারেন্স কিন্তু নাম্বারে তাদের সমান বা তাদের থেকে অনেক বেশি। সেটা ঔদ্ধত্ব হিসাবে দেখত অনেকেই। পিছিয়ে থাকা লোকেদের আত্মবিশ্বাস ভাল চোখে দেখেনা বিদ্যমান ক্ষমতা সম্পর্ক। ক্লাশের গ্রুপ তৈরি হতেও সে দেখেছে, কয়েকজন ছিল এলিট। তারা নিজেদের গ্রুপ বানিয়েছিল। তারা নিজেদের মধ্যেই থাকত। ঘুরত। খেত। সব জায়গায় যেত। ক্লাশে একসাথে বসত। আর বাংলা ভাষায় যারা পড়ত তাদের থেকে তারা যেন আলাদা। আর তাদের দিকে ছিল নীচু নজর। এবার তাদের মধ্যে কেউ

[৪০] অংশগ্রহণকারী যা বি, নিশা দাস, সাক্ষাতকার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

[৪১] অংশগ্রহণকারী যা বি, নিশা দাস, সাক্ষাতকার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

ভাল রেজাল্ট করলে বাকিরা সেটা পছন্দ করত না। তারপর যখন দেখা গেল পড়াশুনায় ভাল তখন তারা গুরুত্ব দিতে শুরু করল কেউ কেউ। তবে একটা তাচ্ছিল্যের ব্যাপার ছিল।[৪২]

গবেষক ছাত্রী টিনা দাস গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন পরিস্থিতি – তিনি বিস্তারিত ভাবে বলছেন, "যারা প্রভাবশালী তাদের নির্মিত জ্ঞানের গ্রহণযোগ্যতা অনেক। কিন্তু প্রথম প্রজন্মদের নির্মিত জ্ঞানের প্রতি লোকজনের বিশেষ সুনজর নেই। বিশ্বভারতীতে চান্স পাওয়াটাই আমাদের মত পরিরবারের পক্ষে টাফ ছিল। তখনকার আদর্শ আজকের দুটো কিন্তু আলাদা। যখনই পাঠভবনে পড়ছিনা তাহলে হঠাত করে শান্তিনিকেতনের আদর্শ কিকরে ইমপ্লিমেন্ট হয়ে যাবে তার মধ্যে কিভাবে। একটা কারণে কেউ সুইসাইড করে না, দেখবে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে যারা সুইসাইড করে তারা মূলত প্রথম প্রজন্মের ছাত্রছাত্রী। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশে মান্যতা দিচ্ছেনা সেই মানসিক সমস্যা, আপার ক্লাশের হাতে অনেক অপ্সন আছে। একটা নাহলে আরেকটায় তারা যায় কিন্তু এই ছেলেমেয়েগুলোর একটাই অপ্সন। সেটা চলে গেলে তারা বাঁচবে কি নিয়ে। না তাকে সোসাইটি মানছে না তাকে ইউনিভার্সিটি মানছে। ইনার ওয়ার্ল্ড আউটার ওয়ার্ল্ড দুইদিক থেকে ভিক্টিমাঈজ হচ্ছে সে। নিজেদের কে নিংড়ে নিয়ে পড়শুনাটা করছে, প্রথম প্রজন্মের সবথেকে বেশি সমস্যা তো ইনার ওয়ার্ল্ডে। সেটাই আউটার ওয়ার্ল্ডে প্রতিফলিত হচ্ছে। সে মানাতে পারছে না বলেই কিন্তু সে নানা দিক থেকে অস্থির হয়ে পড়ছে, আমি মানাতে পারছিনা সেটা আমার চোখে ধরা পড়ছে, বিহেভিয়ারে ধরা পড়ছে, চেহারায় ধরা পড়ছে, রেজাল্টে ধরা পরছে, ভেতরে ভেতরে পুড়ছে, মেন্টাল হেলথের সমস্যা হচ্ছে। ডিপ্রেশনে ভুগছে। সেলফ ডেসট্রাক্টীভ হয়ে যাচ্ছে। তাদের পরিবারগুলো তাই নিয়ে ভুগছে। শিক্ষা পেয়ে তারা মইয়ে উঠে যাচ্ছে কিন্তু নামবার আর পথ নেই"[৪৩]। একটা বিচ্ছিন্নতার বোধ কাজ করে তাদের শিক্ষাজীবন জুড়ে। এই এত কিছুর সঙ্গে নিত্যনৈমিত্তিক সমঝোতা আর লড়াই করতে করতে অনেক সময় তারা হয়ে পড়ে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। প্রতিনিয়ত নিজেদেরকে প্রমাণ করার দায় প্রতিনিয়ত একটা গেজ এর সামনে পড়া এবং সেটা সহ্য করা যথেষ্ট সমস্যাজনক। মানসিক সমস্যা যারা প্রথম প্রজন্মের ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষায় আসে তারা মূলত সব থেকে ভাল ছাত্র ছিল স্কুল কলেজে। তার ফলে তাদের নিজেদের ও পরিবারের প্রত্যাশা থাকে তাদের নিয়ে অনেক। এবং নিজেদের সেলফএস্টিম বাড়তে থাকে ও কনফিডেন্স বাড়তে থাকে। তারপর বেটার অপরচুনিটির জন্য তারা যখন অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যায় তখন নিজেদের কমতি গুলো দেখতে পায় এবং তারা ধীরে ধীরে হীনমন্য হয়ে পড়ে। পার্সোনাল হিস্ট্রী এই প্রথম প্রজন্মের ছাত্রীদের। যা সে নিজেকে ছাড়া কাউকে বলে নি। ওঠাপড়া, ট্রমা সব তাকে নিজের সঙ্গে বয়ে নিয়ে যেতে হয়। মাঝেমধ্যেই তার ওপর আসে আক্রমণ, ভেঙে সে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। আবার নিজের টুকরো গুলো কুড়িয়ে জোড়াতালি দিয়ে হাঁটতে শুরু

[৪২] অংশগ্রহণকারী যা বি, সুধা মাল, সাক্ষাতকার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

[৪৩] অংশগ্রহণকারী যা বি, টিনা দাস, সাক্ষাতকার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

করে। সামনে আবার যেকোনো আক্রমণ অপেক্ষা কারণেই তা বলা যায় না। এবং বারবার আসবে সেকথা ধরে নেওয়াই দস্তুর। যত সামনে সে এগিয়ে যাবে ততই তার প্রতি আক্রমণ আর আঘাত বাড়তে থাকবে। সে একটা ট্রমা কাটিয়ে ওঠার আগেই আরো অনেক আক্রমণ এসে পড়বে যা তার চিন্তা চেতনা নির্মাণ মনন সবকিছু বদলে দেবে। সে সেখান থেকে হয় শক্তি সংগ্রহ করবে আর না হয় ভেঙ্গে যাবে আবার। আবার এগিয়ে যাবে। তাতে তার গতি কমে যায় যে ক্ষমতা নিয়ে সে এগিয়ে যেতে পারত সে তা আর পারে না। তাকে আবার নিজেকে নির্মাণ করতে হয়। এই নির্মাণ আর পূনর্নির্মাণ চলতে থাকে। এই পদ্ধতি যে যন্ত্রণাদায়ক তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এতে অনেকেই হারিয়ে যায় আর কেউ কেউ সহ্যের শেষ সীমা ব্যবহার করে এগিয়ে যেতে চায়। এই যাত্রাপথে তাদের ক্ষতি আর ক্ষয়ের পরিমাণ প্রচুর। প্রতি পদে পদে সমস্যার সামনে তাদের পড়তে হয়। নানা মানসিক ওঠাপড়া দেখা দেয়। মানসিক ভাবে ভেঙে পড়ার ইতিহাস আছে এদের প্রত্যেকের। অস্থিরতা, অবসাদ - এই ফেজগুলোর মধ্য দিয়ে তারা গেছে। তারা দোলাচলে ভোগে। আত্ম পরিচয় হীনতা, নানান প্রতিকুলতায় তারা নিজেদের মানসিক স্থৈর্য ঠিক রাখতে পারে না। এই যাবতীয় ফ্যাক্টরস তাকে জর্জরিত করে রাখে। সেই সমস্যার ভিতর আপাদমস্তক ডুবে থেকে বাইরে দেখানো যে সে কোনো সমস্যার মধ্যেই নেই এই লড়াই তাদের অনেকে ভালো ভাবে সামলে উঠতে পারে, অনেকে পারে না। প্রতিনিয়ত সামলে উঠে সমান গতিতে এগিয়ে যেতে পারে না। তার ফলে তাদের দাগিয়ে দেওয়া হয় স্লো লার্ণার অথবা শ্লো রিসার্চার হিসাবে। আরো একটা বিষয় লক্ষ করেছি সেটা হল প্রান্তিক ছাত্ররা পেশাদারিত্ব বোঝার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়ে। এই কারণে তারা তিরস্কৃত হয়, বিরক্তির পাত্র হয়। এই ধরনের ‘প্রফেশনাল’ পরিবেশে তারা কোনোদিন বড় হয় নি তাই বুঝতে পারে না কি করা উচিত আর কি করা উচিত নয়। ‘ফরমাল’ আচরণ কি জিনিস তাদের বুঝতে অনেক সময় লেগে যায়। পরিকল্পনার অভাব, পরামর্শের অভাবে তারা বিরতি নেয়, লক্ষ্যহীন পথে চালিত হয়। এই সমস্যা বেণু যেমন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে তেমনি পপি, রিনিও জানে তাদের অ্যাকাডেমিক বৃদ্ধি কিভাবে ধীরগতি হয়েছে। ইউমী বিশদে জানায় কিভাবে সে তার পরিপূর্ণ কর্মক্ষমতা কাজে লাগাতে পারে নি শুধুমাত্র পরিকল্পনার অভাবে।

উচ্চশিক্ষায় দীর্ঘ সময় কাটানোর পর নিজের জনজাতির সঙ্গে মিসফিট হয়ে যায় আবার অন্যদিকেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসরেও তারা মিসফিট। প্রতিনিয়ত গ্রহণযোগ্যতার লড়াই। প্রান্তিক ছাত্রীদের প্রতিকূলতা আসলে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠার লড়াই, পোশাকে, বডি ল্যাঙ্গোয়েজে, ভাষায়, উচ্চারণে, চালচলনে, কথা বার্তায়, তারা যেন এই পরিসরে ‘অপর’। তাদের নিজেকে আমূল বদলে ফেলতে হবে, এই জাতীয় একটি চাপের সম্মুখীন হয় তারা বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে। এইভাবে বেখাপ হয়ে যাবার সমস্যার কথা জানাচ্ছেন অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেকে।

## সাংস্কৃতিক আধিপত্য, 'উচ্চ' সংস্কৃতি 'নীচু' সংস্কৃতি

বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে ছাত্রছাত্রীদের 'উচ্চ' এবং 'নীচু' সংস্কৃতির একটি দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। প্রান্তিক ছাত্রীরা নিজেদের যে সংস্কৃতি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন এবং ধীরে ধীরে তা ত্যাগ করে ভিন্ন সংস্কৃতিতে নিজেকে অভ্যস্ত করে তোলেন। বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রছাত্রী এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীরা এই আগ্রাসনের সম্মুখীন হয়েছেন। প্রভাবশালী পক্ষ নিজেদের সংস্কৃতি অন্যের ওপর আরোপ করে হিসাবে তাদের অভিজ্ঞতায় রয়েছে। অন্যের সংস্কৃতিকে হেয় করার একটা প্রবনতা তারা লক্ষ্য করেছেন। বিশ্বভারতীর বিদ্যালয় পাঠভবনের শিক্ষক তড়িৎ রায় চৌধুরী মতে সাংস্কৃতিক আধিপত্য শান্তিনিকেতনে একটি বড় ভূমিকা নেয় যা রবীন্দ্রনাথের দর্শনের পরিপন্থী। বলা হচ্ছে 'যত্য বিশ্বে ভবত্যেক নীড়ম' অর্থাৎ যেখানে সারা বিশ্ব একজায়গায় মিলিত হয়েছে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এখানে এলে রাবীন্দ্রিক সংস্কৃতিতে জারিত হওয়া ছাড়া আর কোনো রাস্তা কারো হাতে খোলা থাকেনা। এইখানে একদিকে বিদ্যমান ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবার তাড়না অন্যদিকে নিজের সংস্কৃতি বাদ দিয়ে রাবীন্দ্রিক হয়ে ওঠার পার্শ্বচাপ। প্রভাবশালী সংস্কৃতি গ্রহণ না করে একদল 'আউটসাইডার' হয়ে থেকে যায় আরেকদল নিজেদেরকে ঐ সংস্কৃতিতে জারিত করে। স্বাভাবিক ভাবেই রাবীন্দ্রিক সংস্কৃতিতে দীক্ষিত করার চেষ্টা করা হয়, বারবার বলা হয় এখানে পড়ছো মানে যেখানে যাবে সেখানে তোমার সাথে থাকবে 'এক টুকরো শান্তিনিকেতন' পৃথিবীর যে প্রান্তেই যেখানেই থাকো না কেনো। এখন এই কথাটার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন সাংস্কৃতিক আগ্রাসন দেখেছে গবেষক সুধা। যে আগ্রাসন খালি চোখে দৃশ্যমান নয়।

সুধার কথায়, বিশ্বভারতীতে পুনরাবৃত্ত বলা হয়, কোনো ছাত্র ভর্তি হবার পর থেকেই যে এখানে পড়তে এসেছ, সবসময় তোমার মধ্যে থাকবে 'এক টুকরো শান্তিনিকেতন' যেখানে যাবে, দুনিয়ার যে প্রান্তেই থাকো না কেন, যে কাজই করো না কেন তোমার মধ্যে সবসময় থাকবে একটা শান্তিনিকেতনের ছাপ। যাতে বোঝা যায় তোমার শিক্ষা দীক্ষা, রুচি, পছন্দ জীবনদর্শন। যাতে তোমাকে আর পাঁচজনের থেকে আলাদা করে চেনা যায়। রবীন্দ্র দীক্ষা যেন তোমার হৃদয়ে থাকে সবসময়। বহু বছর শান্তিনিকেতনে থাকার পর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই বোধ চেপে বসে, বা বিশ্ববিদ্যালয় চায় তা ভিতরে প্রথিত হোক। এই বিষয়টিকে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন হিসাবেও দেখা যায়। এখানে ছাত্রছাত্রীরা নানা সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল থেকে আসে। এখানে এসে সবকিছু ঝেড়ে ফেলে হয়ে ওঠে রাবীন্দ্রিক। এবং তাদের কে শেখানো হয় এই রুচি তাদের সারাজীবন বহন করে যেতে হবে কারণ অন্যান্য সংস্কৃতির তুলনায় এই সংস্কৃতি হল উঁচু, কুলীন, সেরা, অনুসরণীয়। ছাত্র ছাত্রীরা এখানে এসে বাড়ির যা কিছু সব কিছুকে ভুল জানতে শেখে, তাদের সংস্কৃতি ভুল বাবা মার দেওয়া শিক্ষা ভুল, এখানে এসে যেন তারা সব কিছুর 'ঠিক' এবং 'উচ্চ পাঠ' নিতে শুরু করে। এই সাংস্কৃতিক উচ্চ নীচের বোধের পাশাপাশি তারা উচ্চ সংস্কৃতির পাঠ নিতে শুরু করে। প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক ছাত্রীদের কাছ থেকে অনুকরণ চাওয়া হয়। তাদের নিজস্বতা নয়, প্রতিষ্ঠিত আদব

কায়দা অনুকরণ করে গ্রহণযোগ্যতা তৈরির পরিসর তৈরি হয়। নিজে এবং নিজের শিকড় ভুলে যাও ক্ষমতাশালীদের অনুকরণ করো। সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই বিষয়টি আরো বেশি প্রযোজ্য। একটি প্রান্তিক ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় শেখায় কিভাবে নিজেকে ভুলে যেতে হবে। এবং এলিট ক্লাশকে অনুকরণ করতে হবে। হেমের কথায়, 'ফরগেট ইয়োরসেলফ এন্ড ইমিটেট আস'-এই নিয়মে চলে 'আলোকপ্রাপ্তি'র কার্যপ্রণালী। এখানে মূল বিষয় হল সাংস্কৃতিক আধিপত্য। কে কার ওপর কিভাবে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে কত ভাবে তার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে যাবতীয় নির্মাণ। পুরোটাই ক্ষমতার কারুকার্য। যদি অনুকরণ না করো ও আনুগত্য স্বীকার না করো টিকে থাকতে পারবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক পরিসরের আদর্শিক অবস্থান এই সাংস্কৃতিক আধিপত্যের পরিপন্থী। প্রান্তিক ছাত্রীরা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি উপস্থাপন করবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের নিজস্বতা গ্রহনযোগ্য হবে এবং তারা উদযাপিত হবেন এবং নিজেদেরকে শুধুমাত্র 'খাপ খাওয়াতে' সংগ্রাম করবেন না, নিজেদের প্রস্ফুটিত করার সুযোগ পাবেন।

পপি হেমব্রম জানাচ্ছেন তার উপলব্ধির কথা "প্রথমে হস্টেলে এসে সমস্যা হত। কিন্তু এখন আর কিছু মনে হয় না। বিশ্বভারতীতে পড়ার ইচ্ছা ছিল। সেই ইচ্ছা পূরণ হবার জন্য ভাল লাগে। বেশী কোথাও যাই না। ক্লাশে যাই আর আসি। অনুষ্ঠানেও খুব কম যাই। ডিপার্টমেন্টের অনুষ্ঠানগুলোতে যাই। সবাই সব কিছু জানে নাচ জানে গান জানে আমি তো এতকিছু জানিনা। স্টেজে উঠে কত কিছু করে। যারা পার্টিসিপেট করে স্যার ম্যামরা তাদের বেশী গুরুত্ব দেয়। আমি সাঁওতালি নাচ পারি। সবাই একসাথে যেটা করে। কিন্তু স্টেজে উঠে একা একা আমি নাচতে পারব না"।[৪৪] টিনা দাস যেভাবে দেখেন তার বিশ্ববিদ্যালয়ে যাপিত জীবন –

> ডিসক্রিমিনেশন বলতে হীনমন্যতা ছিল ঐ দিক থেকে কালচারাল দিকগুলো আমি জানিনা বা শহর থেকে যারা এসেছে তারা অনেক দিক থেকে এডভান্স। এখানকার স্টাফদের ছেলেমেয়েদের বেশি গুরুত্ব দেওয়া হত। তার প্রতি আলাদা স্নেহ স্যারদের ছিল। প্রফেসরদের ছেলেমেয়েদের একটা আলাদা স্নেহের জায়গা। কিন্তু ঐ একটা জায়গা যেটা দিয়ে সবকিছু ছাপিয়ে যাওয়া যায় সেটা হল ভাল রেজাল্ট। এখানে যারা প্রফেসরদের ছেলেমেয়ে তাদের প্রমাণ করার কোন দায় নেই। কিন্তু যারা বাইরে থেকে এসেছে তাদেরকে নিজেদের প্রমাণ করতে হয়। গ্রাম থেকে বা বাইরে থেকে এলে তাকে নিজেকে প্রমাণ করতে হয়। আমি সামথিং সেটা প্রমাণ করতে হয়। যে যত ভাল কাজ করতে পারবে সেটাই গবেষণায় ম্যাটার করে। অন্যকিছু ম্যাটার করেনা।

[৪৪] অংশগ্রহণকারী বি, বি, পপি হেমব্রম, সাক্ষাতকার, শান্তিনিকেতন।

ব্যাকগ্রাউন্ড ম্যাটার করেনা। এখানে সবাই স্কলারশিপ পেয়ে গবেষণা করছে সেদিক থেকে দেখতে গেলে সবার আর্নিং এখানে সমান। সেই কয়েক বছরের জন্য অন্তত।[৪৫]

রিনির মনে দাগ কেটেছে বিশেষ ঘটনা – "একটা ঘটনা আমার খুব খারাপ লেগেছিল। সাঁওতালি নাচ হচ্ছিল। সেখানে কিছুজন দাঁড়িয়েছিল আপার কাস্ট। তারা তাচ্ছিল্য করে বলছিল নানা কথা। দেখে কিভাবে নাচছে ওরা কিসব। এইসব বলছিল। বাংলাদেশ ভবনে ঘটনাটা ঘটেছিল। তখনই আমরা বলছিলাম এগুলো কেন বলছে এগুলো তো ভাল না। আবার আমাদের সামনে বলছে। যেন আমরা শুনে কিছুই বুঝতে পারব না। ওরা বলছিল এটা কি কোনো নাচ? এটা কোনদিন নাচ হতে পারে না।"।[৪৬] সুধা যেভাবে দেখেন 'উচ্চ ও নীচু' সংস্কৃতির দ্বন্দ্বকে – "ফুটবলটা ছিল গরীবের খেলা। ক্রিকেট ছিল বড়লোকের। গানবাজনা খেলাধুলা তারাই করে যাদের পয়সা আছে। কিছু কেন্দ্র ছাড়া যাত্রাগান, লোটো, কবিগান এইসব দেখে তারা বড় হয়েছে যারা প্রথম প্রজন্ম। কিন্তু ইউনিভার্সিটির তো এগুলো নিয়ে কোনো কাজ নেই। বিশ্ববিদ্যালয় সেসব নিয়ে কথা বলে না। সেগুলো অনেকের কাছে হাসির ব্যাপার। শিল্পীর গুরুত্ব সেখানে নেই। তাদের মান্যতা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে তো নেই  গুরুত্ব সেই ফর্মগুলোর।"[৪৭] হেম চন্দ জানায় জানায়, "এইসব ক্রিয়েটিভিটি যা প্রথম প্রজন্ম তাদের সঙ্গে নিয়ে আসে সেগুলো বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করে না। সেগুলো হাসির বিষয় তাদের কাছে, এলিট কালচার তারা কেন জানেনা এই অভিযোগে তাদেরকে হেয় করা হয়। প্রথম প্রজন্মের শিল্প জানেনা বলার আগে তাদের নিজস্ব ক্রিয়েটিভিটিকে জায়গা দেওয়া হোক। 'হাই' কালচার, 'লো' কালচার। ফোক কালচার লেজুর হিসাবে জোড়া হয়। তারা শুধু প্রতিনিধিত্ব করে যারা তাদের গ্রহণ ও করে সেখানেও। শান্তিনিকেতনের এলিট সোসাইটির সঙ্গে পরিচিত হলাম। কিভাবে সাজতে হয়, কিভাবে হাসতে হয়, কিভাবে হাঁটতে হয় কিভাবে বডি ল্যাঙ্গোয়েজ ম্যানেজ করতে হয় সবই কিন্তু এখানে আলাদা। রাবীন্দ্রিক হবার প্রোটোকলগুলো দেখলাম আর শিখলাম। আমি সেই সাজ পোষাক করিনি। আমি নিজের মত থাকতাম। এক শ্রেণির লোক এটা করে রেখেছে যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের সম্পত্তি। আমরা তার ধারক বাহক। কিন্তু তার বাইরেও রবীন্দ্রনাথ নিয়ে অনেকে নিজেদের মত করে চর্চা করছে। সাজ পোশাকের আমি ওভাবে রাবিন্দ্রীক হতে চাই নি"।[৪৮]  ইউমী দর্জি দার্জিলিং থেকে সমতলে পড়তে এসেছেন, একটা হীন দৃষ্টি সংস্কার তাকে তাড়া করে ফেরে বলে তিনি মনে করেন। লোকজন তাদের 'চিংকি' বলে ডাকে। দার্জিলিং থেকে আসা আদিবাসীদের বাস্তবতা আলাদা সমতলের আদিবাসীদের তুলনায়। তিনি বলছেন, 'আমি যখন উত্তরবঙ্গে পড়তাম তখন বাংলা শিখেছি। স্কুল কলেজের অভিজ্ঞতা ভাল। এখানে সমস্যা হয় নি। কিন্তু কলকাতায় গিয়ে সমস্যা হত। ট্রাইবাল

[৪৫] অংশগ্রহণকারী বি, বি, টিনা দাস, সাক্ষাতকার, শান্তিনিকেতন।

[৪৬] অংশগ্রহণকারী বি, বি, রিনি মুর্মু, সাক্ষাতকার, শান্তিনিকেতন।

[৪৭] অংশগ্রহণকারী যা বি, নিশা দাস, সাক্ষাতকার, স্থান-যাদবপুর।

[৪৮] অংশগ্রহণকারী যা বি, নিশা দাস, সাক্ষাতকার, স্থান-যাদবপুর।

সার্টিফিকেট দিয়ে চান্স পেয়েছি বলে লোকের কি সব বলত। একটা লুক ডাউন ব্যাপার ছিল। তার আগে আমার বোধ ছিল না যে আমি ট্রাইব বা কি আত্ম পরিচিতির সংকট বিষয়ে বলছেন রিনি, কিভাবে তিনি নিজের এবং পিছিয়ে রাখা ছাত্র ছাত্রীদের আত্ম পরিচিতির সংকট প্রকট হতে দেখেছেন।

**প্রান্তিক ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক মুলধনের অভাব**

এই ছাত্রীদের প্রথামিক সমস্যা তাদের সার্বিক ভাবে মূলধনের অভাব। আর্থিক নয় শুধু, সাংস্কৃতিক মূলধনের অভাব তাদের রয়েছে। যাদবপুরের ছাত্রী নিশা দাস জানায় তার ব্যক্তিগত সংগ্রামের কথা “ফার্স্ট জেনারেশন লার্নার হিসাবে নিজেকে দেখি যখনই আমি কোথাও কিছু কোর্স করছি বা পড়ছি আমি এর পরে কি আছে জানি না, এর পরে কি করব আমি জানি না। আমার বাবা মা বিশ্ববিদ্যালয়ে যায় নি তারা কোনো কিছু জানেও না এ বিষয়ে। টুয়েলেভর পরে সবাই জানে ব্যাচেলর ডিগ্রী হয় তাই সেটা পড়েছি। আমার দিদি ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে এম এ করেছে তাই সেটা জানতাম যে এম এ হয়। রেগুলারে ইউনইভার্সিটিতে পড়লে তার যে কি মানে গুরুত্ব আর ডিসটেন্সে পড়ার যা গুরুত্ব সেটাও আমার বাড়ির লোকজন জানত না। আমি যখন পদক্ষেপ নিলাম যে আমাকে রেগুলারে পড়তে হবে তখন আমার বাড়ীর লোকজন বুঝল। আর ডিগ্রী তো শুধু নয় একটা ক্যাম্পাস লাইফ একটা রোজ ইউনিভার্সিটি যাওয়া ক্লাশ রুম এক্সপেরিয়েন্স এগুলোর তো একটা আলাদা গুরুত্ব আছে। এই ব্যাপারগুলো আমার মা বাবা জানবে না কারণ তারা কেউই কখনই কলেজে যায় নি”[৪৯]। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী পিউ দাস বাকী ক্লাশমেটদের সঙ্গে নিজের দূরত্বটা দেখেছেন এবং নিজের অবস্থান বিশ্লেষণ করেছেন,

> আমার এম ফিলের সময়ও দেখেছি আমার যারা ক্লাশমেট তাদের বাবা মা কেউ ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসর। তাদের বাবার পি এইচ ডি হচ্ছে ইউ কের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তোও সেই ক্ষেত্রে আমিও সেটা ফিল করি। আমি আমার বাবাকেও বলি আমি যাদের সাথে পড়ছি তাদের বাবারা জি আর ই ক্র্যাক করেছে পি এইচ ডি করেছে ইউ কে থেকে তাদের বাচ্চারা আমাদের সঙ্গে পড়ছে আর তুমি ভাবো ক্লাশ টেন পাশ করে সেই অনুযায়ী তুমি চাকরি করছো, এইখান থেকে গিয়ে আমি আবার ওদের সাথে পড়ছি। আমাদের পার্থক্যটা যে কত বেশি সেটা বোঝা যায় ক্লাশে বসলে। আমাকে কতটা এনার্জি দিতে হয়েছে এই জায়গাটায় যাবার জন্য।[৫০]

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এম ফিলের ছাত্রী সাকিনার বাস্তবটা আরো অনেকটা ভিন্ন। বাড়িতে সে বি এড করার জন্য টাকা চেয়েছিল কিন্তু এতগুলো টাকা দেওয়া বাবার পক্ষে সম্ভবও ছিল না। তারপর সে এম ফিলে ভর্তি হয়। এম ফিলটা কি সেটা তার বাড়িতে জানে না আইডিয়া ছিল না। আশেপাশে কেউ এম

---

[৪৯] অংশগ্রহণকারী যা বি, নিশা দাস, সাক্ষাতকার, স্থান-যাদবপুর।

[৫০] অংশগ্রহণকারী যা বি, পিউ দাস, সাক্ষাতকার, স্থান-যাদবপুর।

ফিল করে নি। এম ফিল তো দূরের কথা আশেপাশে কেউ রেগুলারে এম এ ও করে নি তার। যখন সে পরীক্ষা দিতে গেছিল তখন তার বাড়ি থেকে জানত না। ইন্টারভিউ দিতে গেছে সেদিনও জানে না। তারপর রেজাল্ট বেরোবার পর সে জানিয়ে ছিল সে চান্স পেয়েছে। কি চান্স পেয়েছি সেটাও ভাল করে খুব একটা বোঝে নি তার পরিবার। যাদবপুরের মত একটা লিবারেল পরিবেশ পাওয়া অনেক ভাগ্যের ব্যাপার মনে হয় তার কাছে। সাকিনা বলে "ওখানে যাওয়া পড়াশুনা করা আমার তো ভীষণই ভাল লাগে, বন্ধু হয়েছে সব আমাদের ডীপার্টমেন্টে বা বাইরেও কিছু হয়েছে। আমি এডজাস্ট করে নিতে পেরেছি অসুবিধা হয় নি। এর ভিতরে আমি একটা চাকরি পেয়েছি কলেজে।"[51]

একাধারে প্রান্তিক ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার অভিজ্ঞতায় 'সমস্যা'র মধ্যে পড়ে অন্যদিকে তাদের সমৃদ্ধির অভিজ্ঞতা হয়। সাক্ষাৎকারের বিভিন্ন পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে তারা বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা বলছে যেগুলি আপাত ভাবে স্ববিরোধী। কখনো তারা পরিবার থেকে বেরিয়ে কিভাবে স্বাধীনতা পেয়েছে, নিজের জীবন চিনতে পেরেছে কিভাবে মুক্ত জীবনের স্বাদ পেয়েছে কিভাবে উচ্চশিক্ষার নতুন জগৎ, নতুন শহর তাদের উচ্ছ্বসিত করেছে। অন্যদিকে সাক্ষাৎকার থেকে উঠে আসে কিভাবে তারা সমস্যায়, প্রতিকূলতায় প্রতিনিয়ত জর্জরিত হয়েছে, দীর্ঘ সময় সমস্যায় থাকায় কিভাবে তারা অবসাদ, অস্থিরতার শিকার হয়েছে। পরিবারে, সমাজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, ক্যাম্পাসে, হস্টেলে বিভিন্ন সমস্যা, বৈষম্যের সম্মুখীন হয়েছে, কিভাবে অর্থনৈতিক, মানসিক সমস্যা প্রতিনিয়ত তাদের তাড়া করে ফিরেছে। তাই সাক্ষাৎকারগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তারা ক্রমাগত পুনরাবৃত্ত ভাবে কথা বলছে এবং স্ববিরোধী কথা বলছে। মিশ্র অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তারা নবনির্মিত আত্মবোধের কাছাকাছি গেছে। প্রতিনিয়ত প্রতিকুলতা এবং পাশাপাশি ক্ষমতায়ন ক্রমাগত তাদের নতুন জীবনের দিকে, নতুন ক্ষমতা সম্পর্কের দিকে নিয়ে গেছে। নিজে সিদ্ধান্ত নেওয়া, নিজের জীবনের গতিপথ নিজে ঠিক করা, অন্যের আরোপিত ক্ষমতা বিস্তারের প্রতিরোধ করা, নিজের জীবনে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা-এই গুলি তারা অনুশীলন করতে শিখেছে যদিও তারা বারবার ব্যক্ত করেছে নানাবিধ সংগ্রাম তাদের করতে হয়েছে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে। শিক্ষাজীবনের শুরু থেকে এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় যারা হাল ছাড়ে নি তারা মূলত উচ্চশিক্ষায় এসে পৌঁছেছে এবং সামনে এগিয়ে যাবার কথা ভাবতে পারছে। এই ক্রমাগত ভেঙে পড়া এবং গড়ে নেওয়ার ধারাবাহিকতায় তাদের অভিজ্ঞতা নির্মিত। নিশা দাস মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিকে ভাল রেজাল্ট করার পর ভিন রাজ্যে পরীক্ষা দেয় দিল্লীতে। ঘটনাচক্রে সেখানে চান্স পায়। ভর্তির লেটার এসেছিল তার বাড়িতে। তারপর সে জানায় "সেখানে বাড়ির বাইরে এতদূরে থাকতে পারব কি পারব না সেই ভেবে আমি আর যাই নি ভয়ে। র‍্যাগিং এর ভয়ে। আর দিল্লীর মত বড় শহর। খরচও অনেক বেশি তাই আমি আর যাই নি। নানারকম গুজব থাকে গ্রামে গঞ্জে। সত্য মিথ্যা কেউ জানে না। কিন্তু গল্প প্রচলিত আছে যে ভোরে উঠিয়ে দেবে ঘুমাতে

---

[51] অংশগ্রহণকারী যা বি, সাকিনা, সাক্ষাতকার, স্থান-যাদবপুর।

দেবে না। না উঠলে ঠান্ডা জল দিয়ে দেবে। কারেন্ট শক দিয়ে দেবে। এইসব আজে বাজে বিষয় নিজেরাই কল্পনা করে নেয় আবার খবরের কাগজের একটা দুটো ঘটনা দেখে বা শোনে র‍্যাগিং এর তার ফলে এই সব তারা ভয় পায় আমিও পেয়েছি। আমার মাও ভাবল যে বাইরে কোনোদিন থাকিনি তাই কি করে থাকবে। শেষ বেলায় কাঁদতে লাগলাম যাব না বলে। তারপর এম এ পড়ার আগে সে দেখল তার কোনো কানেকশন নেই কলকাতার সঙ্গে। সেখানে কখন ফর্ম বেরোই কিছুই সে জানতে পারে না। এখন কি করবে সে বুঝে উঠতে পারছিল না। সে ফর্ম তোলার চেষ্টা করেছিল। তারপর সে টিউশন টীচারের পরামর্শে ও সহযোগীতায় যাদবপুরে এম ফিল করতে শুরু করে। তারপর সে সিদ্ধান্ত নেয় একটা কিছু কাজ তাকে করতে হবে। সে বলে,

> আমি যেহেতু আমার মাকে দেখেছি বিড়ি বাঁধতে সেটা আমাকে খুব কষ্ট দিত। যেহেতু কিছু করতে পারতাম না। আমাকে একটা সুযোগ দিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় একটা প্লাটফর্ম দিল কিছু কথা বলার এই নিয়ে। সেই কথা গুলো তুলে ধরার। বিড়ি শিল্পের মত একটা কাজ যেখানে শ্রমিকদের অবস্থা খুব শোচনীয় এবং মালিক পক্ষ খুব ভাল ভাবে একটা শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। এবং মালিকরা নিজেদের জায়গাটাকে ঠিক রেখেছে কিন্তু শ্রমিকরা দিনের পর দিন বিড়ি রোল করার পরেও এই অবস্থা থেকে বেরোতে পারছে না। ফলে এই জিনিসটা আমাকে খুব ভাবিয়ে তুলেছিল সেটা আমি ফ্রেম করার চেষ্টা করেছিলাম। এইটা আমি এপ্রোচ করেছিলাম সেখানে। আমার মা একজন বিড়িশ্রমিক। সেটা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল ইন্টারভিউতে সেটার আমি উত্তর দিয়েছিলাম। আমার এমফিলের ফার্স্ট কাজ আমি আমার অঞ্চলকে আমার মাকে ডেডিকেট করেছি তার জন্য আমি এই টপিকটা চুজ করেছি।[৫২]

নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তারা অনেক ক্ষেত্রে রিসার্চের বিষয় বেছে নিয়েছে। কোন বিষয়গুলিতে কাজ করা দরকার বা ভিন্ন একটা পার্সপেক্টিভ দরকার বা নিজেদের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করা দরকার এ বিষয়ে তারা তাগিদ অনুভব করেছে। প্রান্তিক ছাত্রীদের নিজেদের জীবন অভিজ্ঞতা তাদের রিসার্চের ক্ষেত্রে বিষয় নির্বাচনে অনেক ক্ষেত্রে চালিত করেছে।

বিশ্বভারতীর ছাত্রী পপি হেমব্রমের বাবা কলকাতা পুলিশ। তালতলা বড়বাজার-এ পোস্টিং। মা গৃহবধূ। বাড়ির কিছু জমি আছে। লোক দিয়ে চাষ হয়। তার দাদা কিছু করে না। কাজের চেষ্টা করছে। বাড়িতে বাবা রোজগার করে। বাকি কেউ করে না। পপি এস টি স্কলারশিপ পায়। শান্তিনিকেতনে সে সতের বছর বয়সে এসেছে। মাসে দুবার বাড়ি যায় সে। বছরে চার পাঁচ মাস বাড়িতে থাকে। এস টি দের জন্য স্টাইপেন্ড সেটা সে পায়। বছরে দশ হাজার। মাসে হস্টেলে বারো শো টাকা লাগে ফিজ। হস্টেলে থাকার জন্য ফিজ লাগে না কারণ এস টি ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ফ্রী। জেনারেল ওবিসি দের মাসে পাঁচশ

---

[৫২] অংশগ্রহণকারী যা বি, নিশা দাস, সাক্ষাতকার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

টাকা করে লাগে। মাসে দু হাজার টাকা করে দেয় তার বাড়ি থেকটা খাবারের টাকা ছাড়া বাকীটা হাত খরচ। আর বাড়ি থেকে আনে সে টিফিনের জন্য খাবার দাবার। বই খাতা কেনার জন্য আলাদা টাকা দেয় তাকে তার বাবা। এখন সে কম্পিউটার কোর্স শিখছে। ওখানে একবছরের কোর্স সাড়ে সাত হাজার টাকা লাগে। তার বাবা তাকে পরে কিনে দেবে বলেছে। কুহু মাহাতো শান্তিনিকেতনে ফিজিক্যাল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে পড়ে। সে ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলা করে। সে জানায়,

> ছোটবেলা থেকে জানতাম না এখানে বিশ্ববিদ্যালয় আছে এরকম। আমাকে একটা কাকু বলেছিল যে এখানে খেলাধুলার ডিপার্টমেন্টটা ভাল। আমি যেহেতু খেলতাম ছোটবেলা থেকেই তাই এখানে পরীক্ষা দিলাম আরা চান্স পেয়ে গেলাম পরীক্ষা ভাল হয়েছিল বলে। ছোটবেলা থেকেই আমার প্লেয়ার হবার ইচ্ছা ছিল। স্কুলে মেম যা শেখাতেন। আলাদা করে ট্রেনিং আমার ছিল না বা নিই নি। আমার কাছে খেলার সরঞ্জাম ছিল না। আমি মূলত অ্যাথলেটিক্স করি একশ মিটার দুইশ মিটার। স্কুল থেকেই যা ট্রেনিং হয়েছে। এখানে এসে স্যার আমাদের প্রাক্টিস করায়। এখন পড়াশুনাটাকে ফোকাশ করতে চাই। দুটোই একসাথে চালাচ্ছি, যতটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারা যায়। বি এ পাশ করে গেছি। এখন বি পি এড করছি।[৫৩]

হস্টেলে সে আছে চার বছর। বিশ্বভারতীর ছাত্রী বেণু হাসদার বাড়ি সিয়ান। পিয়ারসন পল্লীতে মাসির বাড়ি। বাড়িতে থাকা কালে সিয়ানে প্রাইমারি পড়েছে সে। তারপর পড়াশূনার জন্য সে বাইরে বাইরে থাকে। নগরীর আদিবাসী হস্টেলে তাকে রাখা হয়েছিল। সেখানে ফাইভ থেকে টেন পর্যন্ত সে থেকে পড়াশোনা করেছে। মাধ্যমিক দিয়ে ২০০৯ সালে বেরিয়ে তারপর বোলপুর। শ্রীনন্দা হাঈস্কুলে পড়েছে সে উচ্চমাধ্যমিক। তারপর বিশ্বভারতীতে বাংলা ডিপার্টমেন্টে। তারপর বিএড সে জানায়, "বি এড করতে ওখানে ৫৫ হাজার টাকা লাগল। আমি একবার নেট দিয়েছিলাম। প্রশ্নগুলো দেখে কিছুই বুঝতে পারছিনা। তারপর আর আমি ওদিকে যাইনি। পরীক্ষা দিতে গেলে অনেক বই লাগে এত আমি কিনতে পারবনা। এখন একটা ব্যাঙ্কের পরীক্ষা দেব এবার। আমার বয়স ২৭। ৪র্থ এপ্রিল ১৯৯২ সালে জন্ম। কাস্ট সার্টিফিকেট হয়েছে সেভেন এইটে পড়ার সময়। আর প্রতিবন্ধী সার্টিফকেটটা প্রাইমারীতে পড়ার সময় হয়েছে। ৬০% প্রতিবন্ধী। রাজ্যসরকার থেকে এই সার্টিফিকেট দিয়েছে। কাস্ট আর প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট অনুযায়ী সে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ পেয়েছে।

**'হস্টেল' ও 'আবাসিকা'দের সম্পর্কে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নির্মাণ ও ছাত্রীদের দৈনন্দিন বাস্তবতা**

প্রতিটি সামাজিক স্তরের দৈনন্দিন জীবন আর অভিজ্ঞতার জগতের ভিত্তিতে তাদের চেতনা ও প্রশিক্ষণের নিজস্ব ধরণ তৈরি হয়। প্রান্তিক ছাত্রীরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য আসেন তাদের প্রথমেই যে সমস্যাটা হয় তা হল, তাদের শিক্ষণ প্রক্রিয়া ভিন্ন, তাই প্রথাগত শিক্ষায় তারা ধীরগতি হয়ে পরে, অথবা

---

[৫৩] অংশগ্রহণকারী বি, বি, কুহু মাহাতো, সাক্ষাতকার, শান্তিনিকেতন।

পিছিয়ে পরে। প্রান্তিক ছাত্রীদের শিক্ষা প্রমাণ্য মানদণ্ডের কাছে বিভিন্ন কমতি এবং ঘাটতি নিয়ে চলতে থাকে যার ফলাফল উচ্চশিক্ষায় প্রতিফলিত হয়। এই কমতির সূত্রগুলি ধরে এগোলে দেখা যায় শিক্ষন প্রক্রিয়ার সঙ্গে তাদের দূরত্ব। একজন প্রান্তিক ছাত্রী পাঠক্রম, পাঠপদ্ধতি, পাঠ্যসূচীর সঙ্গে একাত্মতা বোধ করে না অনেক ক্ষেত্রেই। একাত্মতা বোধ না করার বিষয়টিও তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। তবে এই বিচ্ছিন্নতার ফলাফল তারা তাদের শিক্ষাজীবন জুড়ে বহন করে চলে। প্রান্তিক ছাত্রীরা পরিচিত দৈনন্দিনের ছাপ পাঠক্রমে দেখে না, দেখে না তাদের জীবন থেকে উঠে আসা দর্শন, উপলব্ধি, তাদের নিকট বাস্তব অনুভব করে না শ্রেণিকক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। এক ধরনের বিচ্ছিন্নতার বোধ তাদের সমগ্র শিক্ষাজীবন জুড়ে জড়িত থাকে। প্রান্তিক ছাত্রীদের শিক্ষণ পদ্ধতি ভিন্ন, পাঠক্রম, পাঠ্যসূচী এবং পাঠন পদ্ধতি ইত্যাদিতে বিষয়ে একটি বিচ্ছিন্নতা প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক ছাত্রীরা যার সম্মুখীন হয়, একটি বিস্তৃত পাঠের অবকাশ সেখানে রয়েছে। এই অধ্যায়ে মূলত প্রান্তিক ছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয় এবং আবাসজীবনের অভিজ্ঞতার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

একদিকে যেমন আবাসিক ছাত্রীদের ব্যক্তিত্ব নির্মাণে হস্টেলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তেমনি সমাজ মেয়েদের হস্টেলকে দেখে বিশেষ চোখে। মেয়েদের হস্টেল সম্বন্ধে তৈরী হয় নানা ধ্যান ধারণা প্রসূত সামাজিক সাংস্কৃতিক নির্মাণ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী মাত্রেই দ্রষ্টব্য। তার প্রতিটি কথা, হাঁটাচলা, শরীর, শরীরের ভাষা, প্রতিটি কাজকর্ম পরিলক্ষিত হয় আর পরিমাপ করা হয় পুঙ্খানুপঙ্খভাবে। এই দৃষ্টিসংস্কার নারীকে প্রভাবিত করে মনস্তাত্ত্বিক ভাবে যা তার নিজের সম্পর্কে ধারণা বদলে দেয়। নিজেকে সে যেভাবে দেখে এবং উপস্থাপিত করে তা প্রভাবিত হয়। একধরনের অদৃশ্য চাপ সে অনুভব করে। যার ফলে তার নিজের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ বদলে যায়, নিজের দেহ সম্পর্কে এবং নিজের অস্তিত্ববোধ সম্বন্ধে একটি ধারনা নির্মিত হয় যা তার আত্মবোধকে প্রভাবিত করে। অন্যদিকে নারীদের সম্পর্কে সামাজিক স্থির এবং বদ্ধমূল ধারণার অনুক্রমে নির্মিত হতে থাকে তাদের সম্পর্কিত পরবর্তী স্তরের ধারণা। একটি লিঙ্গ সম্পর্কিত ধারণার নির্মাণ হতে থাকে (সেনগুপ্ত, ১৯৯৪) সেখানে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মেয়েদের হস্টেল এমন একটি জায়গা যেখানে অসংখ্য তরুণী ও যুবতী একত্রে বসবাস করেন। সুতরাং সেই পরিসরের প্রতি আর সেই নারীদের প্রতি যে সমাজের বিশেষ নজর, বিশেষ মূল্যায়ন থাকবে এবং তা প্রতিনিয়ত চর্চিত ও নির্মিত হতে থাকবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পরিবারের মানুষজনের কাছে হস্টেল ও হস্টেলের মেয়েদের সম্বন্ধে ধারণা বিশেষ ধরনের। সাক্ষাৎকার থেকে উঠে এসেছে যে পরিবারে অভিভাবকরা মনে করেন পড়াশুনার উদ্দেশ্যে পাঠানো হলেও হস্টেলে এসে মেয়েরা ‘বেয়াড়া, বেতরিবত হয়, সহবত ভোলে, জেদি, বদরাগী’ হতে শুরু করে। নিজের সিদ্ধান্ত নেয় নিজে, পরিবারের বাইরে থাকার ফলে ও আত্মসচেতনতার জন্য তারা পরিবারের নিয়ম মানতে চায় না, অথবা যৌক্তিকতা খোঁজে অথবা নিজের মতামত বেশি গুরুত্ব দিতে শুরু করে। ছাত্রীটির ওপর পরিবারের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণে ফাটল ধরে।

পরিবারের আদেশ, নির্দেশ ইত্যাদির আবেদন লঘু হতে শুরু করে, গুরুত্ব পায় নিজের মত, নিজের সিদ্ধান্ত। নিজের ইচ্ছেমত পোশাক পরে, নিজের ইচ্ছে মত বাহ্যিক পরিসরে যাতয়াত করে, যেমন ঘুরতে যাওয়া, হলে সিনেমা দেখতে যাওয়া। তাদের সেলফ এক্সপ্রেশন বা আত্ম উপস্থাপন যা, পরিবারের ইচ্ছা ও রুচি অনুযায়ী ছিল এখন নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী হয়ে গেছে। সমাজ 'হস্টেলে থাকা মেয়েদের' সম্বন্ধে তৈরি করে বিচিত্র মূল্যায়ন। তাদের সম্বন্ধে গড়ে উঠতে থাকে নানা গল্প, রসিকতা। পরিবারের দৈনন্দিন নজরদারির আওতা থেকে বেড়িয়ে হস্টেলে আসার পর তারা পরে বৃহত্তর সামাজিক নজরদারির আওতার ভিতরে। 'বাড়ির মেয়ে' এই তকমাটি শরীর থেকে খসা মাত্র তাদের ওপর এসে পরে 'ভালো মেয়ে', 'খারাপ মেয়ে' ইত্যাদি সম্বন্ধীয় মূল্যায়ন। পরিবার, অন্দরমহল ইত্যাদিকে নারীর উপযুক্ত স্থান হিসাবে বিবেচনা করার সুপ্রাচীন ধারণা অবলুপ্ত নয়। পরিবারের অভিভাবকদের বা বলা ভাল পুরুষ অভিভাবকদের প্রত্যক্ষ নজরদারির আওতা থেকে বেড়িয়ে যাওয়াটা সমাজ ভাল চোখে দেখে না। মেয়েদের পুরুষ বন্ধু নিয়ে, ঘনিষ্ঠতা এবং যৌনতা বিষয়ে পরিবারের নিয়ন্ত্রণ আর্থ-সামাজিক অবস্থান ভেদে বদলায়। পুরুষ অভিভাবকদের রক্ষার গন্ডির মধ্যে থাকাটাই মনে করা হয় শুদ্ধতম সুরক্ষিত স্থান। সাধারণ ভাবে মনে করা হয়, স্বাধীনতা পেলে নারীরা কেবল তার অপব্যবহারই করে। যে কোন রকম নারী স্বাধীনতাই যেহেতু পুরুষতন্ত্রের কাছে স্বস্তিজনক নয় তাই নূন্যতম স্বাধীনতার চর্চাও অপব্যবহার হিসাবে বিবেচিত হয়। সেক্ষেত্রে যুক্তি হিসাবে নানা প্রশ্ন হাজির করা হয়, যে নারীরা আজও স্বাধীনতা গ্রহণ করতে, ধারন করতে এবং ব্যবহার করতে আদৌ প্রস্তুত কি? প্রচলিত ধারণা এই যে নারী স্বাধীনতা পেয়ে যথার্থভাবে চর্চা করতে পারে না, স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে। এখন প্রশ্ন, স্বাধীনতার যথার্থ ব্যবহার বলতে আসলে কি বোঝানো হয়। পুরুষতন্ত্র নারী স্বাধীনতা ও তার যথার্থ ব্যবহারের কি ধরনের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে। তা আদৌ যুক্তিযুক্ত কিনা। স্বাধীনতা কোন পর্যায়ে গেলে স্বেচ্ছাচারে পরিণত হয় বলে মনে করা হয় ইত্যাদি প্রশ্নগুলি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। নারীর স্ব-ইচ্ছা যেখানে প্রশ্নবিদ্ধ সেখানে 'স্বেচ্ছাচার' শব্দটি যে কেবল নঞর্থক ও নিন্দাবাচক শব্দ তাতে কোন সন্দেহ নেই। হস্টেলে থাকা মেয়েদের সম্বন্ধে নানা অশ্লীল, নেতিবাচক বিশেষণ প্রযুক্ত হয়। অর্থাৎ সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে বাড়িতে বড় হওয়া ও হস্টেলে বড় হওয়া মেয়েদের মধ্যে স্পষ্ট বিভাজন করা হয়। হস্টেলে থাকা মেয়েরা নানা বেয়াড়া স্বভাবের অধিকারী হবে এটা স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নেওয়া হয়। পরিবারের রক্ষকদের প্রত্যক্ষ আওতার বাইরে দীর্ঘজীবন বসবাস এই বিষয়টি পুরুষতন্ত্রের কাছে খুবই ভীতির ও কৌতুহলপ্রদ। এবং তা থেকে তৈরী হয় নানা ধরনের বিদ্রূপ, রসিকতা। আপাতদৃষ্টিতে যা কিছু ব্যঙ্গ, নিছক হাসিমজার উপাদান বলে মনে হয়, এইসব অতিতুচ্ছ মন্তব্য, চটুল কথা থেকেই ধীরে ধীরে নির্মিত হতে থাকে একটি বৃহৎ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নির্মাণ।

মেয়েদের হস্টেলে এবং হস্টেলের বাসিন্দাদের অবজেক্টিফাই করার এবং হেনস্থা করার ঘটনা প্রায়শই ঘটে, এবং অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতায় রয়েছে। মেয়েদের হস্টেলের কাছাকাছি এলাকায় বেশ একটা চাপা গুঞ্জন চলতে থাকে। পাশাপাশি জনবসতি, দোকানপাঠগুলোর একটা বিশেষ নজর হস্টেলের দিকে থাকে অবিরত। হস্টেলের সামনের রাস্তাটি বিশেষ রাস্তা হিসাবে চিহ্নিত হয়। যাবতীয় খিস্তি খেউর চলতে থাকে এই রাস্তায়। লক্ষ্য হস্টেলে থাকা মেয়েরা। এই রাস্তা দিয়ে যাবার সময় অভব্য ছেলেরা নানা ধরনের কু এবং সু মন্তব্য করবে এটা যেন সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়েছে। বিশ্বভারতী ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সাক্ষাতকার নিয়ে দেখা গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিশেষ ধরনের বিনোদনের উপাদান মেয়েদের হস্টেল গুলো। বিশেষ কোন উপলক্ষে বা উপলক্ষ ছাড়া আনন্দ প্রকাশ করতে মধ্যরাতে তারা হাজির হয় মেয়েদের হস্টেলের বন্ধ দরজার সামনে। চিৎকার করে, গান গায়, বিশেষ কোন নারীর নাম ধরে প্রেম প্রস্তাব দেয় ডিজায়ার, প্রেম ইত্যাদি। বিষয়টি যদিও এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। নানা অকথ্য গালিগালাজ, অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ, যৌনগন্ধী স্থুল রসিকতা, কোন আবাসিকার চরিত্র বিশ্লেষণ তারা হস্টেলের সামনে করে। একসঙ্গে এতজন মেয়ের একত্রবাস তাদের কাছে অত্যন্ত রহস্যজনক যাতে তারা খুবই কৌতুহল বোধ করে। বিশ্বভারতীতে নিজের আবাসজীবনের অভিজ্ঞতায় দেখেছি বিভিন্ন উৎসবের আগের রাতে ছেলেরা ছাত্রীদের হস্টেলের সামনে এসে চিৎকার করে গান গায়, নানা অশ্লীল শব্দ দিয়ে রবীন্দ্রসংগীতের প্যারোডি করে গায়, নিজেদের হস্টেল থেকে থালা, গ্লাস ইত্যাদি এনে গানের সাথে বাজায়। কোন কোন ব্যর্থ প্রেমিক প্রেয়সীর প্রত্যাখ্যানের জবাব স্বরূপ অশ্লীল গালিগালাজ করে। বন্ধুরা তাতে তাল মেলায়। তার সঙ্গে চলে সংশ্লিষ্ট নারীটির শারীরিক গঠন ও নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুচারু বিশ্লেষণ। এ সমস্ত যখন চলে তখন ছাত্রীনিবাসের দায়িত্বপ্রাপ্ত আদেশ করেন রাস্তার সামনের ঘরগুলির আলো বন্ধ করে দিতে যাতে ছেলেরা মেয়েদের দেখতে না পায়, কারণ দেখতে পেলে তাদের হল্লা আরো বাড়ে। এছাড়াও আরও নির্দেশ থাকে মেয়েরা যেন টুঁ শব্দটিও না করে। কেউ ছেলেদের এইসব আচরণের প্রতিবাদ করলে সেই মেয়েটিকে চিহ্নিত করা হয় খারাপ মেয়ে হিসাবে কারণ সে ছেলেদের অসভ্যতায় তাল মিলিয়েছে। হস্টেলের বাইরে ছেলেরা অভদ্র আচরণ করবে তা যেন সাবলীল ব্যাপার। আর তার পাল্টা উত্তর দিলে মেয়েটির চরিত্রদোষ খোঁজা হয়। আশ্চর্যের বিষয়, ছেলেদের নিয়ন্ত্রনের কশেহত্রে কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নেয় না। রাতে যারা গার্লস হস্টেল গার্ড দেয় তারাও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। ছাত্রীদের হস্টলের সামনে এই সব আচরণ বয়সোচিত চাঞ্চল্য হিসাবে ধরে নিয়ে স্নেহের চোখে দেখা হয়? যাদবপুরের গার্লস হস্টেলের অংশগ্রহণকারীরা জানাচ্ছে তাদের হস্টেলের সামনে প্রায়শই ছেলেরা মধ্যরাতে চিৎকার করতে আসে। দোলের দিন তারা দুপুরে তারা গার্লস হস্টেলের সামনে এসে রং খেলে, তখন কয়েক ঘন্টার জন্য গার্লস হস্টেলের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। মেয়েদের বাইরে বেরোতে দেওয়া হয় না। কয়েক ঘন্টার জন্য তারা বন্দী। যাদের উৎপাতে বন্দি তাদের নিয়ন্ত্রণের কোন

চেষ্টা করা হয় না। এই সূত্রধরে এগোলে শেষ পর্যন্ত সেই সমাজ মানসিকতায় পৌঁছনো যায় যেখানে আক্রান্তকে নিরাপত্তার নামে বন্দী করা হয় আর আক্রমণকারী বীরদর্পে প্রকাশ্যে ঘোরে। হস্টেলে নেশা - গার্লস হস্টেলের কাছাকাছি দোকান থাকলে লোকের সেখানে কৌতুহল থাকে মেয়েরা সেখান থেকে কি কেনে। তারা সিগারেট ইত্যাদি কেনে কিনা এই বিষয়েই মূলত মানুষজনের আগ্রহ। শহরাঞ্চলে মেয়েদের ধুমপান গ্রহণযোগ্যতা পেলেও মফস্বল বা গ্রামের দিকে বিষয়টি যারপরনাই কৌতুহলের ও নিন্দার। একবার হস্টেলের পাশের দোকানে আপাত নিরীহ কোন কারণে লাইটার কিনতে গিয়ে দেখেছিলাম ছাত্রদের কৌতুহলী চোখ ধেয়ে এসেছিল তৎক্ষনাৎ। অনেকের ধারনা হস্টলের মেয়েরা লুকিয়ে নেশা করে। মদ খায়, বিড়ি খায়। মেয়েদের নেশা করার স্বাধীনতা পাওয়া উচিত কিনা সে বিতর্কে আপাতত না গিয়েও বলা যায় ছেলেদের নেশা করা সম্পর্কে সমাজের তেমন কোন বাঁকা নজর চোখে পরে না যেটা মেয়েদের ক্ষেত্রে পরে। মেয়েদের হস্টলে মদ খাবার কথা শুধু গল্প আকারে নয়, সমাজে তা ছড়িয়ে পড়ে কেচ্ছার অবয়বে। এবং তার সাথে জড়িত মেয়েদের সম্পর্কে জুড়ে দেওয়া হয় নৈতিক অধঃপতনজনিত মূল্যায়ন। ভার্জিনিটি—এছাড়াও হস্টেলে থাকা মেয়েদের সম্বন্ধে আরো একটা ধারণা প্রচলিত আছে তা হল তারা কুমারী বা অক্ষতযোনী নয়। এটি পরিবারের রক্ষকদের নজরদারির বাইরে পাওয়া স্বাধীনতার সর্বোচ্চ অপব্যবহার হিসাবে মনে করে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। পুরুষতন্ত্রের স্থির বিশ্বাস স্বাধীনতা আর কুমারীত্বের সহাবস্থান অসম্ভব। গার্লস হস্টেল গুলোকে সমকামীতার মুক্তাঞ্চল হিসাবে ধরা হয়। হস্টেলে অনেক সমকামী মেয়ে থাকে এবং তাদের যৌনবোধের মধ্যে অস্বাভাবিকতার কিছুই নেই। কিন্তু চারপাশের লোকজনের চোখ চকচক করে ওঠে নিষিদ্ধ এক কৌতুহলে। তারা মূলত জানতে চায় মেয়েরা স্রেফ মজার জন্য পরস্পরের সঙ্গে বিকৃত যৌনতায় লিপ্ত থাকে কিনা। নারীকে শরীর ছাড়াও মন, মগজ যুক্ত প্রাণী ভাবার অভ্যাস সমাজের সর্বস্তরে তৈরি হয় নি। সুতরাং মেয়েদের হস্টেল মানে তাদের কাছে শুধু একসঙ্গে অনেকগুলো নারী শরীর। পরিবারের বাইরে, অভিভাবকের এক্তিয়ারের বাইরে মেয়েরা এখানে বন্ধ দরজার ভিতর কি করে এ নিয়ে প্রচুর গল্প তৈরী হয়। হস্টেলকে 'হারেম' বলে ডাকার রেওয়াজ বহুদিনের এবং তার মালিকানা নিয়ে নানা কুরুচিকর মন্তব্য যত্রতত্র ভেসে বেড়ায়। হারেম এবং অন্দরমহল এই দুটি পরিসরই অত্যন্ত সুরক্ষিত আর নিয়মের অধীন। বাইরের পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এই জায়গাগুলি মূলত মেয়েদের ব্যক্তিগত পরিসর হিসাবে বর্ণিত হয় ইতিহাসে, সাহিত্যে কিন্তু এখানে মেয়েদের নিজস্ব কোন স্বর কোনদিনই দিনই গ্রাহ্য করা হত না। বাইরের পরিসর বা 'পাব্লিক স্পেস' যেমন তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল, অন্যদিকে মেয়েদের জন্য নির্মিত তথাকথিত 'প্রাইভেট স্পেস' হলেও পরিসরটি কঠোর ভাবে পুরুষ নিয়ন্ত্রিত। এখানে মুলত মেয়েরা বন্দী। এখানে মেয়েরা শৃঙ্খলিত, তাদের মন, মনন, যৌনতাকে সুকঠিন ভাবে বেঁধে রাখা হয়। পুরুষতান্ত্রিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হারেম বা অন্দরমহল কে মেয়েদের ব্যক্তিগত পরিসর হিসাবে প্রচার করলেও এখানে মেয়েদের নিজস্ব কোন জায়গা থাকে না,

তাদের কোন মত গৃহীত হয় না, ইচ্ছাও প্রাধান্য পায় না। মেয়েদের বন্দিত্বের এই পরিসর নিয়ে পুরুষদের মধ্যে রসিকতা থাকবে তা বলা বাহুল্য। এক জায়গায় অনেক নারীর বাসস্থান মাত্রেই হারেমের উপমা পুরুষের এবং সমাজের মনে আসে। বিশ্বভারতীতে কিছু গার্লস হস্টেলগুলো মূলত একটি এলাকাতেই। পরপর শ্রীসদন, বিড়লা, গোয়েংকা, আনন্দসদন, প্রতিমা, দশচক্র। এই এলাকাকে ছাত্ররা 'মালগাড়ী' বলে ডাকে। প্রতিটি হস্টেল যেন মালগাড়ীর এক একটা কামরা, আর সেখানে মূলত 'মাল'দের বসবাস (বিশ্বাস, ২০০৯)। আবার অনেকে অঞ্চলটিকে বলেন 'প্রমিলা রাজ্য' অর্থাৎ পুরুষ বর্জিত মেয়েদের একচ্ছত্র অধিকারের অঞ্চল। আর হস্টেলের সামনের রাস্তাটির নাম 'দুঃখহরণ রোড', বিশ্ববিদ্যালয়ের তাবৎ ছাত্রদের দুঃখলাঘব করার উপায় যেন এই রাস্তার পাশে মজুদ আছে। এছাড়াও গার্লস হস্টেলের সুপারদের নিয়েও নানা কথা শোনা যায়, তাদের বলা হত 'গণশাশুড়ি'। আরো একটি তাৎপর্যপুর্ণ বিষয়, বিশ্বভারতীতে গার্লস হস্টেলের দায়িত্বে যাঁরা থাকেন তাঁরা প্রত্যকেই অবিবাহিতা অথবা বিবাহ বিচ্ছিন্না। এই বিশেষ পদগুলি সামলানোর জন্য পরিবার বিচ্ছিন্ন বা পরিবারের সঙ্গে ততখানি যুক্ত নয় এমন নারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। হস্টেল সম্পর্কে সমাজে প্রচলিত নানা কথা এখানে অবতারণার কারণ হল এগুলি থেকেই বোঝা যায় হস্টেল সম্বন্ধীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নির্মাণ।

**প্রান্তিক ছাত্রীরা স্ব- প্রণোদিত ব্যক্তিগত সংগ্রাম ও 'ভিতরের ক্ষমতা' কে জাগিয়ে তো তোলার আখ্যান**

অংশগ্রহণকারী প্রান্তিক ছাত্রীরা বিবিধ প্রতিকুলতার মধ্যে উচ্চশিক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন নিজেদেরকে নিজেরা প্রাণোদিত করে। সংকট এবং প্রতিকুলতার মধ্যে চালিকা শক্তি হিসাবে ক্রিয়াশীল থাকে তাদের নিজেদের অদম্য ইচ্ছা এবং এগিয়ে যাবার স্পৃহা। উচ্চশিক্ষাসুত্রে গতিশীলতা বৃদ্ধি, রিসোর্স প্রাপ্তি এবং সামাজিক সমৃদ্ধি তাদের অন্দর থেকে ক্ষমতাশালী করে তোলে। সামাজিক ভাবে বা ব্যক্তিগত জীবনে চ্যালেঞ্জ গ্রহণে এবং বিরুদ্ধ স্বর হয়ে উঠতে পারে তারা সহজে। স্বক্ষমতায়নের একটি সম্ভবনা তৈরি হয় উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে। নিশা দাস এখন জানে আত্ম বিশ্বাস কিভাবে গড়ে ওঠে, সে বলে যায় কিভাবে এতদিন পর্যন্ত সে নিজেকে সিধা রেখেছে, ভেঙে যেতে দেয় নি। কিভাবে সে নিজেকে সামনের দিকে চালিত করেছে। সে বলে,

> পড়াশুনা করার পর একটা শক্তি তৈরি হয়, প্রথমে মনে হয় আমি কিছু জানি না এরা সব জানে আমাকে পড়তেই হবে মন দিয়ে। এটা একটা মোটিভেশনটা নিজের প্রতি নিজের সেটা সব কিছু থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। প্রথম সেমেস্টারে আমার ভাল রেজাল্ট হয় নি। কিন্তু তার পর থেকে আমি বুঝে গেছি কিভাবে কাজ করতে হবে তারপর থেকে রেজাল্ট ভাল হয় আমার। ভারবাল হয়তো কিছু হচ্ছে না কিন্তু সাইলেন্টলি করে যাচ্ছে দূরত্ব। চুপচাপ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। প্রতিবাদ করতে গেলে হারিয়ে যাবার ভয় কাজ করে। নিজের এডুকেশন দিয়ে নিজের রুজি রোজগার যাদের খুঁজতে হয়, তারা চুপচাপ সহ্য করে। তবে স্বপ্নটা ভঙ্গ হয়ে যায়। ছোটবেলা থেকে গাছটা

> অনেক যত্ন করে বড় করে স্ট্রাগল করে করে যাচ্ছ তুমি। হায়ার এডুকেশনে এসে স্বপ্ন ভঙ্গ হয়। আমি নিজের জায়গায় ঠিক আছি। খুঁজতে খুঁজতে যতদূর যাওয়া যায় আমি যাব। পড়াশুনার মধ্যে থাকতে চাই[৫৪]।

বাইরে যখন প্রতিকূলতা, অবলম্বনহীনতা তখন তারা নিজের ভিতরে শক্তি সঞ্চয় করে নীরবে। শ্রীলথা বাটলিওয়ালা যাকে বলছেন 'পাওয়ার ফ্রম উইদিন' নিজেই নিজেকে উদবোধিত করে এগিয়ে যাবার শক্তি তারা নিজেদের মধ্যে অংকুরিত করেছে। যারা প্রথম প্রজন্মের ছাত্রছাত্রী উচ্চ শিক্ষায় এসেছে তারা কি ধরনের সুবিধা ও সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন একদিক থেকে সরকারি নানা রকম প্রকল্প পলিশি তৈরি হচ্ছে যার ফলে এগিয়ে যাচ্ছেন। একদিক থেকে সুবিধা কিছু তারা করে দিচ্ছে অন্যদিক থেকে বিভিন্ন ভাবে এই যে সামাজিক পরিকাঠামো তার মধ্যে নানা রকম প্রতিকুলতা ফেস করছে, শুধু বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশে নয় বা ক্যাম্পাসে নয়, ধীরে ধীরে পরিবার সমাজ তার সঙ্গেও একটা দ্বন্দ্ব তৈরি হচ্ছে ধারনাগত দিক থেকে বাস্তব জগতে চলতে গিয়ে। এডুকেশন তাদেরকে একদিকে যেমন এগিয়ে দিচ্ছে তেমনি উচ্চ শিক্ষিত হলে সে তার নিজের কমিউনিটির থেকে ধীরে ধীরে একটা দূরত্ব তৈরি হয় বা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে এক একজন ইন্ডিভিজুয়ালের রাস্তা ও সংগ্রাম আলাদা আলাদা। প্রত্যেকজন এই পদ্ধতিটার মধ্যে কিভাবে যুঝছে এবং এগিয়ে যাচ্ছে সেই যাত্রাপথটাই আমি দেখতে চাইছি এই গবেষণায়। কিভাবে তারা সেগুলোর সম্মুখীন হচ্ছে বা ফেস করছে। একদিকে এমন এই ইন্ডিভিজুয়াল সোসাইটিকে বদলে দিচ্ছে অন্যদিক সোসাইটি ইন্ডিভিজুয়ালকে বদলে দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিটার মধ্যে একজন প্রান্তিক ছাত্রী নিজেকে কিভাবে স্থির করছে সেটা তার অবস্থান নির্মাণ করে। রিনি মুর্মু যেমন বলে শৈশব থেকে তার পড়াশোনায় ঐকান্তিক আগ্রহের কথা,

> আমি ছোট থেকে অনেক পড়তাম। বাড়িতে পড়াশুনা ভালবাসতাম। আমি চাইতাম আমি অনেক বড় হব। আমি সবসময় চাইতাম যে হাইস্কুল যাব। সবাই যেত। আমিও চাইতাম আমিও ওখানে যাব। হাইস্কুল জিনিসটা কেমন আমাকে দেখতে হবে। তারপর স্কুলের পর ইচ্ছা হল ইউনিভার্সিটি কেমন সেটা দেখব। এখানে যখন চান্স পেলাম তখন আমার খুব ভাল লেগেছিল। আমি যখন চান্স পেয়াম তখন সমস্যাও হয়েছিল। এখানে তো সবকিছুরই চার্জ বেশি। এখানে ভর্তির চার্জ এখানে হস্টেলের চার্জ মাসে মাসে দিতে হবে। এই জন্য সেটা কি করে দিবে বাড়িতে। ভাই আছে বাড়িতে। দুই দিদি আছে বাড়িতে। কি করে সবার পড়াশুনা চালাবে সেটাই ভাবতাম। বাবা বলত তুই চিন্তা করিসনা আমি সব ঠিক দিয়ে দেব।[৫৫]

[৫৪] অংশগ্রহণকারী যা বি ৭, নিশা দাস, সাক্ষাতকার, স্থান-যাদবপুর।

[৫৫] অংশগ্রহণকারী বি বি ১, রিনি মুর্মু, সাক্ষাতকার, স্থান-শান্তিনিকেতন।

একদিকে যেমন সে আপ্লুত হয়েছে পড়াশোনার সুযোগ পেয়ে তেমনি সে চিন্তায় পড়েছে কিভাবে টাকা জোগাড় হবে এই বিষয়ে। প্রত্যেকের মধ্যে এই দোলাচল কাজ করেছে। পড়াশোনা তারা শুধু ডিগ্রী পাবার জন্য করে নি। তারা ভিতর থেকে জেগে উঠেছে পড়াশোনার হাত ধরে, আবাসিকা, ছাত্র গবেষক এই নতুন নতুন ভূমিকায় তারা আত্ম আবিষ্কার করেছে, পেয়েছে অজানা এক জগতেঢ় সঙ্গে পরিচিত হবার স্বাদ। তাই সংকটে যখন তাদের অন্তরাত্মা দুমড়ে মুচড়ে গেছে তখন তারা পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করেছে নিজের ভিতর থেকে, পুনরায় আত্ম বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে, পুনরায় নিজেদের গড়ে নিয়ে এগিয়ে গেছে সামনে। বেণু  হাসদার ৬০% প্রতিবন্ধীতা। সে শৈশব থেকে পড়াশোনায় আগ্রহী। পড়াশোনা করতে পারার আগ্রহে আর ত স্কলারশিপ পেয়ে নিজের পড়ার খরচ নিজে চালাতে পারার কথা বালার সময় তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তার ভাল লাগে শৈশবের কথা বলতে, ইচ্ছাপূরণের কথা বলতে,  সে বলে যায় তার একান্ত নিজস্ব গল্প “আমার ছোটবেলা থেকেই ইচ্ছা ছিল এ আমি স্কুলে যাব পড়ব। কিন্তু আমার মা বলত না তুই স্কুলে যাবি লোকজন তোকে ফেলে দিয়ে চলে যাবে, মারবে, পড়ে যাবি হাত পা ভেঙ্গে যাবে। তুই স্কুলে টিকতে পারবিনা, কিন্তু আমি বলতাম না আমি যাব। আমি প্রতিবন্ধী বলেই ওদের আমার বিয়ে দেবার তাড়া নেই তাই আমি স্কুলে গেছি, না হলে বাড়িতে বসে থাকতে হয়, আর স্কুলে গেলে টাকাও পাচ্ছিলাম স্কলারশিপের তাই আমি স্কুলে গেছি আর পড়াশুনা চালিয়ে গেছি”[৫৬] সে জানায় তার বান্ধবীদের সহযোগীতার কথা। কিভাবে তারা তাকে হটেল থেকে ডিপার্টমেন্টে যেতে আসতে, আরো বাকী কাজে সাহয্য করেছে। আমার বান্ধবীরা খুব ভাল ছিল। তারা তাকে ধরে ধরে নিয়ে যেত, ব্যাগ নিয়ে যেত, জল এনে দিত, অনেক সাহায্য করেছে তাই সে পড়াশুনা করতে পেরেছে বলে মনে করে এবং সে কৃতজ্ঞ। প্রতিবন্ধীতা নিয়ে তার অবসাদ আছে, সে আক্ষেপ করে, “আমি আসলে বাতিলের দলে পড়াশুনা করলেও কারো কিছু যাই আসে না, না করলেও কারো কিছু যাই আসে না। ঘরে সবাই নিজের নিজের মত কাজ করে দিনমজুরের কাজ কেউ রাজমিস্ত্রীর কাজ। আমি একা বাড়ীতে থাকার থেকে স্কুলে থাকা ভাল। তারপর তো হস্টেলে চলে গেলাম সেখানে নতুন জীবন শুরু হল”[৫৭] পরামর্শহীনতা তাকে আজ কোথাও পৌঁছে দিতে পারে নি, সে এই বিষয়গুলি বুঝতে পারে, ঘরে বসে থাকতে চায় নি, বাইরের জগতটা দেখতে চেয়েছে তাই সে পড়াশোনা করেছে, কিন্তু পরিকল্পনা তার ছিল না। অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেকেই স্ব শক্তিতে উদ্বোধিত। এই স্বশক্তি তাদের শুধুমাত্র উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে এগিয়ে দেয় নি, জীবনের বাকী ক্ষেত্র গুলিতে তাদের করে তুলেছে সক্ষম এবং পারদর্শী। সামাজিক ক্ষেত্রে, শিক্ষাক্ষেত্রে এবং মানসিক ভাবেও তারা শক্তিশালী ভূমিকায় নিজেদের উপনীত করার আশ্বাস পেয়েছে যাতে নিজেদের জীবন সমর্যাদায়, সসম্মানে যাপন করতে পারে। সুধা মাল উচ্চশিক্ষাকেই নিজের ক্ষমতায়নের মাধ্যম হিসাবে দেখেছেন।

---

[৫৬] অংশগ্রহণকারী বি বি ৩, বেণু হাসদা, সাক্ষাতকার, স্থান-শান্তিনিকেতন।

[৫৭] অংশগ্রহণকারী বি বি ৩, বেণু হাসদা, সাক্ষাতকার, স্থান-শান্তিনিকেতন।

হেম চন্দ গবেষণার পড়াশোনার মধ্যেই জেনেছে উচ্চশিক্ষা কিভাবে নবনির্মিত আত্মের প্রতিষ্টায় এবং স্বাধীন জীবন যাপনে সহায়ক হতে পারে। বেণু হাসদা তার প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আনন্দময় জীবনের স্বাদ পেয়েছে উচ্চশিক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে যুক্ত হবার সুবাদে। যাদবপুর এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশগ্রহণকারী ছাত্রীরা উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণার মাধ্যমে নিজেদের 'উন্নতি' এবং স্বাধীন জীবন খোঁজার চেষ্টা করছেন। তারা উচ্চশিক্ষার মধ্যে নিজেদের 'ভিতরের শক্তি'কে জাগিয়ে তুলেছেন।

সামাজিক ক্ষেত্রে বা উচ্চশিক্ষায় গ্রহণযোগ্যতার পদ্ধতির মধ্যে যে ক্ষমতার সম্পর্ক আছে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। অংশগ্রহণকারীরা প্রত্যেকেই যে সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তা মূলত এই 'হয়ে ওঠার লড়াই' নিজেদেরকে একটা ভিন্ন ছাঁচে গড়ে তোলার লড়াই। তার সংস্কৃতি তার নিজস্বতা তার সব কিছু ভুল। গ্রহণযোগ্য নয়। সেসব হাসির বিদ্রুপের বিষয়। সেই সব পরিত্যাগ করতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। মুছে ফেলা গেলে সফল হবার রাস্তা খুব দ্রুত পরিস্কার হয়ে যাবে। এই নিরন্তর 'হয়ে ওঠা' র আত্মঘাতী পদ্ধতিকে আমরা বলি উন্নতি। সাকিনা তার নিজের পড়াশোনার খরচ চালাতে, শিক্ষা উপকরণ, যাতায়াতের ভাড়া, নিজের টিউশনের ফিজ জোগাড় করতে বরাবর টিউশন পড়িয়ে এসেছে। সকালে টিউশন পড়িয়ে নিজে কলেজে যেত, কলেজ থেকে ফিরে আবার সন্ধ্যায় টিউশন পড়িয়েছে। সে বর্ণনা দেয় তার বাস্তবতা, "আমাদের পিয়ারা বাগান আছে সেই কিছু নিয়ে শশা মুড়ি নিয়ে আমি পড়াতে চলে যেতাম। সাতটার আগে। আমি পড়াতাম ছোটদের। আমি পড়াতাম ফোর ফাইভ এই এদের। বেশী বড়দের না। সকালে ছিল দুজন স্টুডেন্ট আর বিকেলে ছিল প্রায় পাঁচজন মত। সাতটার পরে। কলেজ থেকে ফিরে। বাবার পক্ষে আমার সব খরচা একা চালানো সম্ভব ছিল না আর প্রতিদিন বাবাকে পয়সা দাও পয়সা দাও করতেও কেমন একটা লাগত। ঐ জন্য টিউশনটা চালিয়ে যেতে হত। এখান থেকে অটোতে তারপর ডায়মন্ড হারবার ট্রেনে তারপর সেখানে নেমে আবার বাসে পঁচিশ মিনিট। প্রপার ডায়মন্ড হারবারে নয় তো ওটা। সরিষায়। শিয়ালদা থেকে আরো মেয়েরা আসত ওরা তো অনেকদূর থেকে আসত। ওরা যদি পারে তাহলে আমি কেন পারব না। তখন আর কিছু মনে হত না । বাড়ি ফিরতে সাতটা হয়ে যেত। ট্রেনের জন্য ওয়েট করতে হত। এসে টিউশন করতাম।"[৫৮] এখন যখন সে দিশা দেখতে পায় না, কখন সে স্থায়ী রোজগার করতে পারবে, কিভাবে নিজের জীবনে এগিয়ে যাবে তখন তার পূর্বের অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা ভেবে কষ্ট হয়, চোখ ঝাপসা হয়ে আসে, গলা ভারী হয়ে যায়। তার মনে হয় তাহলে কি আমি মরীচিকার পিছনে আজীবন ছুটলাম। এই ছাত্রীদের অনেককেই পড়াশোনার পাশাপশি কাজ করতে হয় পড়াশোনা চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। টিউশন পড়ানো, এডিটিং, টাইপিং, ইত্যাদি তারা করে থাকে। পিউ দাস কলকাতায় থেকে পড়াশোনা করার জন্য অনেক পরিশ্রম করে পড়াশোনার পাশাপশি। সে বলছে, "মাসিক যে খরচ সেটা আমরা নিজেরা রোজগার করি টিউশন করি।

[৫৮] অংশগ্রহণকারী যা বি ৯, সাকিনা, সাক্ষাতকার, স্থান-যাদবপুর।

ট্রানশ্লেসন করি। কেবল অফিসে কাজ করতাম পড়ার সময় বিকেলের দিক থেকে রাত অব্ধি। ওখান থেকে পড়াই দু একজন। বাড়ি থেকে যে টাকাটা দেয় তার জন্য বাবা মাকে অনেক সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। ধার করে। বিভিন্ন উপায়ে দেয়। বাবাদের কথা হচ্ছে আমরা খেতে পাই আর না পাই আমাদের মেয়ে যেন পড়তে পারে। আগে আমাদের দিকটা দেখে। ধার করে দেয় তারপর যখন ফসল ওঠে তখন শোধ করে দেয়। পড়ার জন্য প্রতি মাসে টাকা লাগে। আর এদিকে ফসল বছরে একবার ওঠে। ম্যানেজ করাটা খুব চাপ হয়ে যায়। ফসলের দাম নেই। বিশেষ করে শ্রাবণ মাসে আমাদের ধার করতে হয়। তখন ফসল থাকে না। স্কুলে গিয়ে তারপর একে একে জানলাম যে পর পর কি কি হয়। বি এ এম এ এই গুলো। নিজের যা ইচ্ছা হয়েছে করে নিয়েছি"।[59] এঁরা একদিকে নিজের পড়াশুনা চালিয়েছে অন্যদিকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বাবা মাকে দেখতে হবে সেই চিন্তা আছে তাদের । এই দুটোকে একসঙ্গে চালানো এঁদের জন্য খুবই চাপের ব্যাপার। যদিও এদের বাবা মা এদের কে সাহস যোগায় । তাই এদের টাকা খুব ভেবে খরচ করতে হয়। হস্টেলে না থাকতে পেলে এদের খুব সমস্যাহত কেন না মেসের ভাড়া এদের পক্ষে দেওয়া সম্ভবনা। পিউ আরও বলে, "আমাদের রেশম চাষ হয়। এখন দাম অনেক কমে গেছে। তার ফলে লাভ নেই। ক্লাশে টীচাররা এলাকার বিশেষ ক্ষমতাবান দের ছেলেমেয়েদের তোল্লাই দেয়। ফেবারিটিজম থাকে। ওটা ন্যাচারাল আমার কাছে। আমি নিরপেক্ষ থাকতে চাই। অস্বাভাবিক লাগছে না। আমি এটা ধরে নিয়ে এগিয়ে যেতে চাই"।[৬০] সে প্রাথমিক পর্যায়ের সাক্ষাতকারে ক্ষোভ উগরে দিলেও পরবর্তী সাক্ষাতকারগুলিতে দেখা যায় সে তার বাস্তবতাকে মেনে নিয়েছে, সে মেনে নিয়েছে তাকে সংগ্রাম করে এগিয়ে যেতে হবে, বাকীদের থেকে জীবন তার কঠিন এ কথা সে মেনে নিয়েছে। কাজ পড়াশোনা সে পাশাপাশি করে এবং যে কথা বারাবার বলে গ্রাউন্ডেড না থাকলে তার পক্ষে এগিয়ে যাওয়া মুসকিল হবে।

বারুইপুর সীতাকুন্ডতে সাকিনার বাড়ি। সে এখানে সীতাকুন্ড বিদ্যায়তনে পড়েছে। প্রাইমারী স্কুলে পড়েছে। সরকারি হাইস্কুল। গ্রাজুয়েজন বারুইপুর কলেজ। তাদের নিজেদের পেয়ারা বাগান আছে। ধানের জমি আছে। ডায়মন্ডহারবার উইমেন্স ইউনিভার্সীটিতে সে এম এ করেছে। সে জানায়,

> এখানে তো হস্টেল নেই। আমি বাড়িতে বলেছিলাম যে মেসভাড়া করে দিতে। কিন্তু বাড়িতে এরকম পরিস্থিতি নেই যে আমাকে বাড়িভাড়া করে দেবে। মাসে মাসে নগদ টাকা দেবার ঐ ভাবে পরিস্থিতি নেই। যাতায়াত করতে খুব অসুবিধা হত। খুব সকালে বেরোতে হত আর ফিরতে সাড়ে সাতটা আটটা বেজে যেত। আবার পরের দিন ছুটে ছুটে যাওয়া। বাড়ীতে বলেছিলাম থাকার কথা তো মা বলব কোথাও ওসব থাকার নেই। বাড়িতে থেকেই যা করার করো। বাড়ির

---

[৫৯] অংশগ্রহণকারী যা বি ৮, পিউ দাস, সাক্ষাতকার, স্থান-যাদবপুর

[৬০] অংশগ্রহণকারী যা বি ৮, পিউ দাস, সাক্ষাতকার, স্থান-যাদবপুর

বাইরে থেকে কিছু করতে হবে না। তা না হলে পড়াশুনা ছেড়েই দাও। আমি সকালে উঠতাম। উঠে খেয়ে নিয়ে টিউশন পড়াতে যেতাম। মা টিফিন তৈরী করতে পারত না।[৬১]

তারপর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সে এম ফিল করছে এবং হস্টেলে থাকছে। নিশা এসেছেন সামসের গঞ্জ ব্লক থেকে সে জানায় এটা সবথেকে পিছিয়ে পড়া জায়গা, মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান মিউনিসিপালিটি। প্রথমে তার মা তাকে ইংলিশ মিডিয়ামে ভর্তি করেছিল। সেখানে তিনবছর সে পড়েছে। তারপর তাদের পরিবারে ফিনানশিয়াল কিছু সমস্যা দেখা দিল তখন তাকে আবার সেখান থেকে ছাড়িয়ে প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি করা হয়। ফাইভ থেকে টেন পর্যন্ত ধুলিয়ান মিউনিসিপালিটি স্কুলে সে পড়েছে। সেখান থেকে সে মাধ্যমিক পাশ করে। কাঞ্চনতলা জে বি ইন্সটিটিউশন নাম। সেখানেই উচ্চমাধ্যমিক পড়েছে সে। মাধ্যমিকে ৮০% মার্কস সে পেয়েছিল। তারপর পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে সে জানায় "আমি সায়েন্স নেব বলে সয়েন্সের ফর্ম ফিলাপ করে নিয়েছিলাম। দুই তিন মাস ক্লাশ করেছিলাম। এখানে একটা সমস্যা হয় এখানে লোকজন মনে করে সয়েনশ  নিলে অনেক পড়তে হয় এবং অনেক টিউশন নিতে হয়। আর এখানে টিউশন টীচার তেমন পাওয়া যায় না। তাই আমি চেঞ্জ করে নিয়ে আবার আর্টসে ভর্তি হলাম ভয়ে। অনেক দূরে পড়তে যেতে হবে অনেক টাকা খরচার ব্যাপার আছে পড়তে হবে আন সায়েন্স আর আমি ভাবলাম যে আমি ও এত ঝামেলা করতে পারব না। সুতরাং বাদ দিলাম। এত কিছুর মধ্যে আমিও নিয়ে নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পারলাম না যে আমি সায়েন্স পড়ব তখন আমি চেঞ্জ করে নিলাম। বাড়ির ফিনানশিয়াল অবস্থার কথা ভেবে আমি আর্টস নিলাম। ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে আর্টস নিয়েছিলাম। আমার মাথার ওপরে কেউ ছিল না যে আমাকে সাপোর্ট করবে বা বলবে আমার কি করা উচিত।"[৬২] খরচের জন্য সে বিজ্ঞান পড়তে পারে নি। প্রান্তিক ছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয় এবং সমাজ, পরিবারে প্রতিনিয়ত নিজেদের খাপ খাওয়াতে হয়। পিউ দাস নিজের জীবনের নানারকম ইনসিকিওরিটি নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। এম ফিল এর পর পিএইচ ডিচ করতে চায় সে। তার মা তার আত্মীয় পরিজনের বিরুদ্ধে গিয়ে পড়াশুনা করাচ্ছেন। তিনি সবসময় উৎসাহ দিয়েছেন। তাকে বলেছেন "আমাকে বলেছে এগিয়ে যা আমি আছি পিছনে। হয়তো অতটা বোঝেন না জানেন না কিন্তু সাহস দিয়েছে সবসময়। আমার কথা শুনে এখন জানে এম ফিল কি, পি এইচ ডি কি জিনিস। আমার বাবার সাথে কথা বলে কোনদিন বুঝতে পারবে না যে এডুকেশন বেশি নয়।"[৬৩] পিউ দাস মনে করে তার ওপর একটা চাপ আছে এগসাম্পেল সেট করার, যে একটা মেয়েকে পড়াশুনা করাতে চাইলে সে করতে পারে এবং সফল হতে পারে। সে মনে করে তাকে প্রমান করতে হবে তার আত্মীয় পরিজনের কাছে যে বাচ্চাকে সুযোগ দিলে একটা মেয়েও পারে। কিন্তু এটা একটা বড় প্রেসার তার কাছে। সে আরো জানায়, সে যথেষ্ট

---

[৬১] অংশগ্রহণকারী যা বি ৯, সাকিনা, সাক্ষাতকার, স্থান-যাদবপুর।

[৬২] অংশগ্রহণকারী যা বি ৭, নিশা দাস, সাক্ষাতকার, স্থান-যাদবপুর।

[৬৩] অংশগ্রহণকারী যা বি ৮, পিউ দাস, সাক্ষাতকার, স্থান-যাদবপুর।

স্ট্রেসের মধ্য দিয়ে যায়, তাকে রীতিমত কাউন্সেলিং করাতে হয়েছিল তার সময় আমার অবস্থা এমন হয়েছিল কলকাতায় গিয়ে, সে কোথাও নিজেকে দাঁড় করাতে পারছিল না। তারপর তার কোনো বন্ধু হচ্ছিল না। কঠিন সময় সে পার করেছে, তবু হাল ছাড়ে নি।

বিশ্বভারতীর এম এর ছাত্রী কুহু মাহাতো বাংলা মিডিয়ামের স্টুডেন্ট ছিল, সে তারপরে কোনো রকমে পাশ করে করে উঠে এখানে পড়তে এসেছে। উচ্চমাধ্যমিকে ভাল রেজাল্ট করে এখানে এসে সে দেখে আলাদা একটা জগত। সেই জগতে সে লক্ষ্য করে তার অস্তিত্ব একদম সবার নীচে। তারজন্য অবস্থান্টা চ্যালেঞ্জিং ছিল। এখন তার এটা ভাল লাগে ভেবে যে এগুলো সে পেরিয়ে এসেছে। তার জেদ ছিল প্রচন্ড যে করতেই হবে। তখন সে প্রাক্টিসে প্রচুর অনেক টাইম দিত। এখন এতটা দেয় না। তার মনে হয় নিজেকে চ্যালেঞ্জ করে নিজেকে ইমপ্রুভ করার মধ্যে একটা আনন্দ আছে। সে বলে,

> কোন জায়গা থেকে নিজেকে টেনে নিয়ে কোন জায়গায় এসেছি এটা ভাবলে ভাল লাগে। যে কোনো সাফারিং দেখে আমাদের মনে হয় সেখানে শুধু কষ্টই হয়েছে কিন্তু নিজেকে দুমড়ে মুচড়ে নির্মাণ করার মধ্যে একটা আনন্দ আছে। শেষ হবার পর আনন্দ আছে। যতই কষ্ট হোক ফল ভাল হয়েছে ব্যাস আর কিছু মনে হয়না। এখন পজিটিভলি মনে পড়ে। এরপর আমি চাকরি করব। আমাকে প্রতিষ্ঠিত হতেই হবে। নাহলে পরিবারের অবস্থা যা তা। কিছুদিন চাকরি করার পর আবার যদি ইচ্ছা হয় তাহলে ফিরব কিংবা ফিরব না উচ্চ শিক্ষায়।”[৬৪]

তার বাড়ি থেকে একটা পজিটিভ সাপোর্ট ছিল নাহলে এতদূর আসতে পারত না বলে সে মনে করে। বিশেষ করে মা আর বন্ধুদের কাছেও সাপোর্ট পেয়েছে। কোনো কোনো টীচাররাও সাপোর্টিভ ছিল। নোটস দিয়ে, সময় দিয়ে, ফিনানশিয়ালি সমস্যা হলেও তাকে সাহায্য করত। ফ্রী তে টিউশন পড়িয়েছে তাকে একজন। জীবনের অনেক ওঠাপড়া সে দেখেছে, তাই সে পরিশ্রমে বিশ্বাস করে এবং সদর্থক ভাবে সামনে এগিয়ে যেতে চায়।

এখন এই নানাবিধ সমস্যা থেকে সমাধানের রাস্তা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে বা কোনো সহৃদয় শিক্ষকের পক্ষে একক প্রচেষ্টায় সমাধান করা বা তৈরী করা সম্ভব হয়তো নয়। কারণ এই সমস্যাগুলির শিকড় সামগ্রিক সমাজ ব্যবস্থার ভিতরে নিহিত। বিশ্ববিদ্যালয় এখানে একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র যা বৃহত্তর সামাজিক সমস্যাগুলো অনিবার্য ভাবেই নিজের ভিতর ধারণ কর। কিছু সচেতন সহৃদয় শিক্ষক অনেকক্ষেত্রেই নিজেরদের সাধ্যমত চেষ্টা করে চলেন প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক ছাত্র ছাত্রীদের নানাভাবে এগিয়ে দেবার, পাশে থাকার। এইজন্য তাদেরকে ও নানা সময় হেনস্থার মধ্যে পড়তে হয়। তারপরও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, শিক্ষাক্ষেত্র চাইলে সহমর্মিতা দিয়ে কিছুটা কম বৈষম্যমূলক একটি স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে যেখানে সামাজিক আর্থিক পারিবারিক সবদিক থেকে স্পৃষ্ট প্রথম প্রজন্মের ছাত্রীরা

---

[৬৪] অংশগ্রহণকারী বি বি ৬, কুহু মাহাতো, সাক্ষাতকার, স্থান-শান্তিনিকেতন।

কিছুটা শ্বাস নেবার জায়গা পাবে, এবং নিজের পড়াশুনা, গবেষণা চালিয়ে যেতে পারে। এইভাবে বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক স্পেস মেয়েদের হস্টেল নিয়ে আন্দোলন দানা বাঁধছে ভারত জুড়েই। পশ্চিমবঙ্গে তার ছাপ এসে পড়ছে কিছুক্ষেত্রে। তার ফলে প্রাতিষ্ঠানিক বা সামাজিক সব স্পেসগুলোতেই কিছু কিছু বদল আসছে ধীরে ধীরে। বদল একসাথে আসছে কিনা বোঝা যাচ্ছেনা কিন্তু একটা আলোড়ন তৈরি হয়েছে। সেই আলোড়ন একটা বদলের সূচনা করতে পারে বা রূপান্তরের সূত্রধর হতে পারে। আবাসজীবন, বিশ্ববিদ্যালয়, পাব্লিক স্পেসএ শ্রেণি, বর্ণ, জাতি ও লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে যে আওয়াজ উঠেছে, সচেতনতা তৈরি হয়েছে যার ফলশ্রুতি হিসাবে আন্দোলন তৈরি হয়েছে। শিক্ষাসূত্রে রূপান্তরের ধারাবাহিকতায় এই আন্দোলনের গুরুত্ব রয়েছে।

**পরিশেষ**

প্রান্তিক ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক রূপান্তরের কথা যখন বলা হয়, **'শূন্যের দিকে একটি মই'** বা ল্যাডার টু নো হোয়ের উপমাটি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। সামাজিক স্তরগুলির যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং সেগুলি যে কাঠামোর অন্তর্গত তার ভিতরে প্রান্তিক ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা একটি কাঠামোগত বৈষম্যকে তুলে ধরে। আর্থ-সামাজিক ক্ষমতা কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তিগত পরিসরে তন্তুবিন্যাস আন্দোলিত হলেও বৃহত্তর পরিবর্তন হয় না। প্রান্তিক ছাত্রীদের ব্যক্তিজীবনে বদল আসে। এই লাইফ হিস্ট্রী রিসার্চে তাদের দৈনন্দিন শিক্ষাজীবনের অভিজ্ঞতা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাদের ব্যক্তিজীবনে বদলগুলি চিহ্নিত করার জন্য। যেমন, বেণু হাসদা সারাজীবন পড়াশোনা করে এখন বুঝতে পারে না তার ভবিষ্যৎ কি। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তার আসে নি, বরং তার জমানো টাকা ডিগ্রী অর্জন করতে গিয়ে শেষ হয়েছে, তাহলে সে এখন কি করবে? আবার ডিগ্রী থাকলেই যে তারা পেয়ে যাবে চাকরি তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। গবেষক ছাত্রী সুধা জানাচ্ছেন, শিক্ষা পেয়ে তারা মই য়ে উঠে যাচ্ছে কিন্তু নামবার আর পথ নেই। প্রথম প্রজন্ম আর তাদের চাকরি এই নিয়ে কোন সমীক্ষা হলে দেখা যাবে তাদের আশাভঙ্গের প্রকৃত অবস্থা। জীবনের অর্ধেক সময় তারা শিক্ষার পিছনে ছুটছে করে আর বাকি অর্ধেক তারা হাহুতাশ করে কাটাচ্ছে। জীবনের একটা বিশাল অংশ তারা পড়াশোনার জন্য ব্যয় করে তারপর ক্রমে জানতে পারে তারা কোথাও পৌঁছচ্ছে না। ততদিনে তারা পারিবারিক জীবিকা থেকে বিচ্যুত হয়েছে, নিজেদের সম্প্রদায় তাদের বাতিল করেছে। বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা পড়াশুনা করেছে। সেখানে 'সফল' হবার মত কিছু করে উঠতে পারে নি। অবসাদে কাটছে তাদের বাকী জীবন। ছোটোখাটো কাজ মাধ্যমিক পাশ করেও করতে পারতিস তার জন্য তো এম এ করার দরকার ছিল না - এই জাতীয় মন্তব্য শোনে টিনা। পড়াশোনা সূত্রে তারা যখন একটা সামাজিক অবস্থান পায়, নবনির্মিত আত্মবোধ তৈরি হয়, সেই আত্ম-পরিচিতি এবং অবস্থানের আধার হিসাবে তারা উপযুক্ত পরিসর যখন পাচ্ছেন না তখন পিছন ফিরে দেখলে তারা আশাব্যঞ্জক কিছুই দেখছে না। সামাজিক ভাবে বেকারত্বের যে ধারণা, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেছে যারা তাদের

সঙ্গে সম্পর্কিত। যারা পড়াশোনার মধ্যে ঢোকেন নি ভিন্ন কাজে যুক্ত আছেন তাদের ‘বেকার’ বলা হয় না। যারা পড়াশুনা করে বসে আছে তারাই বেকার সমাজের চোখে, শিক্ষিত বেকার। এই বেকারদের একটা বড় অংশ ফার্স্ট জেনারেশন লার্নার, প্রান্তিক ছাত্রছাত্রী।

শিক্ষার ইচ্ছায়, উচ্চশিক্ষা থেকে উপলব্ধ বার্তি পরিষেবার জন্য এবং সামাজিক সুবিধার আশায় প্রান্তিক ছাত্রীরা উচ্চশিক্ষায় সময়, সীমিত রিসোর্স ব্যয় করে এবং ‘স্ট্রাগল’ করে, তারপর যখন প্রত্যাশিত বিষয়গুলির অপ্রাপ্তি ঘটে, যখন তারা পিছন ফিরে তাকায় তাদের মনে হয় তারা মরীচিকার পিছনে ছুটেছে। সেই সময়, সেই রিসোর্স তারা অন্য কোথাও বিনিয়োগ করলে আজ তারা রোজগার করে নিজেকে এবং পরিবারকে বাঁচাতে পারত। যে উৎসাহ নিয়ে, স্বপ্ন নিয়ে তারা এসেছিল, তারপর ‘স্ট্রাগল’ করে তাদের আশা ভঙ্গ হয়েছে এবং রোজগারের সমস্যা হওয়ায় তারা অনেকে হতাশ। ‘শূন্যের দিকে একটি মই’ বেয়ে তারা শিক্ষার হাত ধরে যে উচ্চতায় এসে পৌঁছেছে তার কোনো ভিত্তি তারা আজ দেখতে পাচ্ছেন না। সামাজিক অবস্থান, অর্থনৈতিক অবস্থান এবং সাংস্কৃতিক মুলধন, ক্ষমতালাভ ইত্যাদি যদি এই উচ্চশিক্ষালাভের শেষ বিন্দু হয় সেগুলিও তারা অনেকেই অর্জন করতে পারছেন না। বহুসময় ব্যায় করে তারা নিজেদের অবস্থান নিয়ে সন্দিহান। এই অধায়ের মূল যুক্তি পরম্পরা হল, প্রথমত, সংরক্ষণের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা পরিসরে প্রান্তিক ছাত্রীদের দৃশ্যমানতা বৃদ্ধি তাদের ফলপ্রসূ অংশগ্রহণ এবং সক্রিয়তাকে স্বীকৃতি দেয় না। মধ্যবর্তী ব্যবধানের ধ্রুবকগুলি হল যে নঞর্থক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন তারা হন। দ্বিতীয়ত, বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে প্রান্তিক ছাত্রীর প্রান্তিকতার চরিত্র বহুমাত্রিক। শ্রেণিগত, লিঙ্গগত, জাতিগত, ভৌগোলিক – এই প্রান্তিকতাগুলি একক ভাবে যে প্রভাব তৈরি করে, দুটি বা সবগুলি একত্রিত ভাবে ভিন্ন প্রভাব তৈরি করে। প্রত্যেক প্রান্তিক ছাত্রীর অভিজ্ঞতা তাই ভিন্ন। লাইফ হিস্ট্রি রিসার্চ থেকে এই ব্যক্তি অভিজ্ঞতার স্বাতন্ত্র্য উঠে আসে। তৃতীয়ত, যে জাতিগত পরিচিতি নিয়ে তারা আসছে বিশ্ববিদ্যালয়ে, সেই আত্ম-পরিচিতি থেকে তাদের বেরোতে চায়। জাতিগত পরিচিতির থেকে তারা ছাত্র এবং গবেষক হিসাবে নিজেদের পরিচিতিকে গ্রহণে এবং উপস্থাপনে আগ্রহী।

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রীদের তাদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার 'ক্ষমতা' রয়েছে। তারা তাদের পরিবারের সদস্যদের সমর্থন সহ অথবা ছাড়াই উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে। তারা তাদের পরিবারের প্রথম প্রজন্ম যারা হস্টেলে থেকে এবং বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রান্তিক শিক্ষার্থী হিসাবে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে তারপরও তারা জীবনে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার কর্তৃত্ব প্রদর্শন করেছে। তারা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কঠিন জীবনযাপন করেছে এবং তার মধ্যে আলোচনা, তর্ক, বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিরোধ দেখিয়েছে। সংরক্ষণ উচ্চশিক্ষায় তাদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করেছে যাতে তারা তাদের স্বপ্নগুলো অর্জন করতে পারে তবে তাদের কারোর যাত্রাপথ সহজ ছিল না। তারা তাদের সমবয়সী সহপাঠীদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের

ক্ষুদ্র আগ্রাসী আচরণের (microaggrassion) মুখোমুখি হয়েছে এবং এই সবকিছুর মধ্যেও ক্রমে তারা নিজেদের দক্ষতা তৈরি করেছে, সমৃদ্ধ করেছে এবং তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রসারিত করেছে। কিন্তু এখন ও এর ফলে/দ্বারা অর্থনৈতিক অবস্থা ও আয়ের উন্নতি হয়নি।

যাই হোক, তারা আত্মসম্মান, আত্মবিশ্বাস এবং আত্ম-মর্যাদা অর্জন করেছে কারণ তারা নিজেদের পুনরায় উদ্ভাবন করেছে, পুনর্নির্মাণ করেছে। এবং নিজেদের ক্ষমতায়নের জন্য সংগ্রামে হাল ছাড়তে চায় নি। তারা পরিবার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামোর মধ্যে বিদ্যমান সামাজিক নিয়ম এবং লিঙ্গগত শ্রেণিবিন্যাস নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে যা তাদেরকে বহু ক্ষেত্রে  সীমায়িত করেছে, তাদের উপর অত্যাচার নেমে এসেছে এবং তাদের প্রান্তিক করেছে। তারা আধিপত্যবাদী সংস্কৃতির চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে এবং তাদের তথাকথিত 'নিকৃষ্ট' এবং 'নিম্ন' সংস্কৃতি ও ভাষার জন্য লড়াই করার অধিকার প্রয়োগ করেছে। তারা উপলব্ধি করে যে, তারা একজন ছাত্র ও গবেষক হিসাবে তাদের পরিচয়কে অগ্রাধিকার দিতে চায়, এবং তাদের 'বর্ণ' পরিচয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায়, সেক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বর্ণহীন' উচ্চবর্ণের সদস্যরা প্রান্তিক শিক্ষার্থীদের এই লড়াই এর পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। উচ্চবর্ণের শিক্ষার্থীরা তাদের বিভিন্ন উপায়ে মনে করিয়ে দিয়েছে যে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'অনুপযুক্ত' এবং বিভিন্ন বিষয়ে 'অভাব' রয়েছে তাদের, এর ফলে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের 'অপর' হিসাবে বিবেচনা করার এবং বিচ্ছিন্ন করে দেখার প্রবণতা বহাল থেকেছে।

এইভাবে, তাদের মধ্যে 'অন্তর্গত শক্তি' বিদ্যমান কাঠামো এবং নিয়মগুলি সনাক্ত করতে এবং প্রতিফলিত করতে সহায়তা করেছে যার ফলে তারা ক্ষমতায়নের কঠিন পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের ব্যক্তিগত চেতনা বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। তবে, তারা যা করতে পারেনি তা হল বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাঠামো পরিবর্তনের জন্য সম্মিলিত পদক্ষেপে জড়িত হওয়ার জন্য, সে বিষয়ে সক্ষম হওয়ার জন্য অন্যান্য মহিলাদের সাথে সংযোগ স্থাপন ও ভাগ করে নেওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে, এবং 'ক্ষমতার সাথে' প্রক্রিয়াকে সক্ষম করে তুলতে। এইভাবে, যদিও তারা পৃথক পৃথক যুদ্ধে সামিল হয়েছে এবং ব্যক্তিগত জীবনে বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তাদের 'ভিতরের শক্তিকে' স্বীকৃতি দিয়েছে, তারা অন্য মহিলাদের সাথে অন্যায় ও বৈষম্য মোকাবেলায় 'শক্তি' প্রয়োগ করতে এখনও সামিল হতে পারে নি, মূলত যে প্রক্রিয়াটির মধ্যে রয়েছে ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তনের 'শক্তি'। তাদের লড়াইগুলি ব্যক্তিগত লড়াই হিসাবে রয়ে গেছে এবং তাদের সামাজিক অবস্থানে দুর্বলতা ও অনিশ্চয়তা এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূলধনের অভাব তাদের কাঠামোগত পরিবর্তনের জন্য লড়াই করতে সক্ষম করে তুলতে পারে নি। কিন্তু তারা তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে মিশ্রিত হয়ে সমর্থন পেয়েছে যা উত্তর-পূর্বের উপজাতি সম্প্রদায় বা সাঁওতাল সম্প্রদায়  ইত্যাদি। যদিও কোনো বড় ধরনের গোষ্ঠী গড়ে ওঠেনি, কিন্তু জরুরি এবং জরুরি

পরিস্থিতিতে তাদের তাৎক্ষণিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে আর ও স্থায়ী পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করতে হলে আরও অনেক কিছুর সম্মিলন দরকার

চিত্র –৩৭ পিঞ্জড়া তোড় অন্দোলনের গ্রাফিতি, এম ফিল গবেষণা কালে সংগৃহীত, দিল্লী জে এন ইউ ক্যাম্পাস, সাল – ২০১৬, নিজস্ব চিত্র।

চিত্র – ৩৮ ছাত্রীনিবাস, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। ক্ষেত্রসমীক্ষাকালীন ছবি, নিজস্ব চিত্র।

চিত্র –৩৯ গ্রাফিতি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ক্ষেত্রসমীক্ষাকালীন ছবি, নিজস্ব চিত্র।

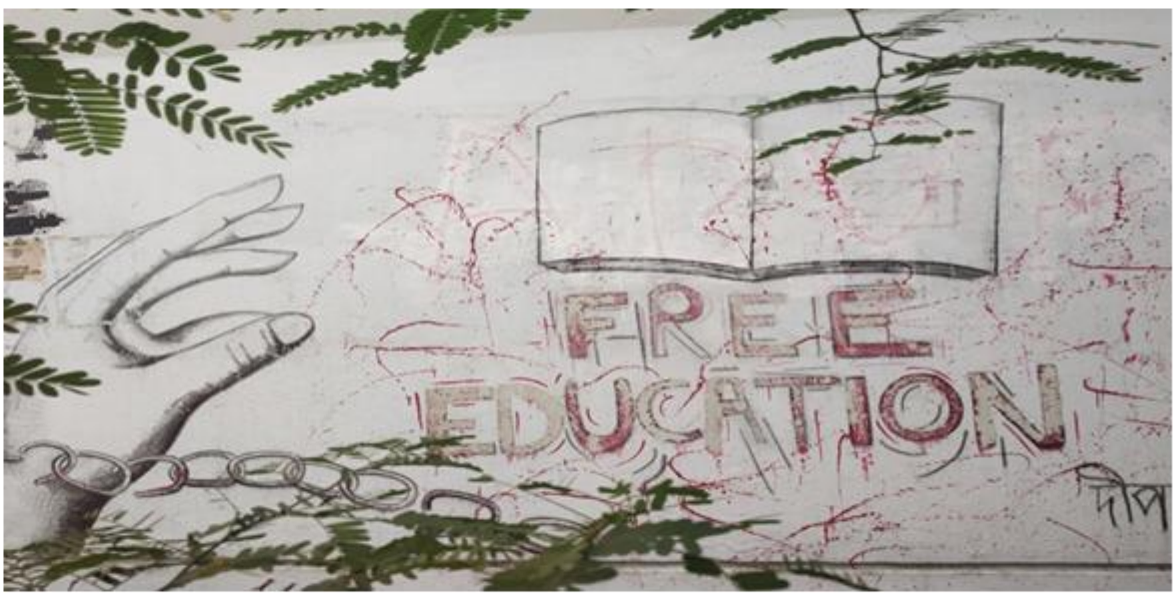


চিত্র - ৪০ Free Education. গ্রাফিতি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। ক্ষেত্রসমীক্ষাকালীন ছবি, ২০২২, নিজস্ব চিত্র।

চিত্র – ৪১ গ্রাফিতি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর, ক্ষেত্রসমীক্ষাকালীন গৃহীত (২০২২), নিজস্ব চিত্র।

## পঞ্চম অধ্যায়

# হস্টেলজীবন কেন্দ্রিক বাংলা কথা-সাহিত্যে আবাসিক ছাত্রীর উপস্থাপন : একটি আন্তঃ স্তরবিন্যাস ভিত্তিক পাঠ

## পঞ্চম অধ্যায়

## হস্টেলজীবন কেন্দ্রিক বাংলা কথা- সাহিত্যে আবাসিক ছাত্রীর উপস্থাপন: একটি আন্তঃ স্তরবিন্যাস ভিত্তিক পাঠ

> সেই নারী এমন সব নারী তোমরা জেনো, এই ছাত্রীআবাসের প্রস্তরসমূহ। এদের সমস্ত সহ্য বজ্র, অস্থিগুলি দিয়ে গড়ে উঠেছে এমন আবাস। সেই গোপন ও নির্যাতিত পঠন থেকে ধীরে ধীরে কোনও একদিন সমস্ত পিতা গ্রাম থেকে নগরের অভিমুখে পাড়ি দিল সন্তানের হাত ধরে। উচ্চশিক্ষা স্বপ্নবুকে করে। সে সন্তান শুধুই পুত্র রইল না। কন্যা এল। কন্যাদের হাতধরে পিতারা এল আবাসের দরজায়। নিয়ম কানুন ঠাসা ছাত্রী আবাস। অনুশাসনের কড়াপাকে বাঁধা, তবু সেইসব নারীদের থেকে বড় সহজ নয় এই প্রক্রিয়া। ... চাঁদের গায়ে চাঁদ[১]

আর্থ-সামাজিক এবং জাতিগত অবস্থান একদিকে যেমন ব্যক্তির অভিজ্ঞতা নির্মাণ করে, একই ভাবে স্মৃতিকথার বয়ান বদলে যায় লেখকের আর্থ সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে। সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মানুষের লগ্নতা, সংযুক্তি বিষয়ে সাহিত্য গড়ে ওঠে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে। ব্যক্তির সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধের ভিন্নতা, স্মৃতির উপাদানে নির্মিত হতে থাকে একটি ধারা যেখানে ব্যক্তির পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটিও ক্রমে একটি সত্তা লাভ করে। যেমন আমরা কারাসাহিত্য দেখেছি। তেমনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উঠে এসেছে সাহিত্যে বহুলভাবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের যাপন প্রক্রিয়াটিই যখন মুখ্য হয়ে ওঠে তখন সৃষ্ট সাহিত্যগুলি একটি বিশেষ মাত্রা পায় অথবা গোত্র পায়। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তার সঙ্গে সমাজের বিচিত্র অবস্থানের ছাত্রছাত্রীদের সম্বন্ধের বৈচিত্র্য, সামাজিক সূক্ষ্ম বিন্যাসকে কিভাবে আন্দোলিত করে তার প্রতিফলন বহন করে এই গোত্র। এই গবেষণা সন্দর্ভের আলোচনার সঙ্গে সাজুয্য রেখে মূলত এই অধ্যায়ে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের অংশগ্রহণ ও তার অত্যাবশ্যক অঙ্গ, সহ-প্রতিষ্ঠান হস্টেল কেন্দ্রিক কথাসাহিত্যের আন্তঃস্তরবিন্যাস ভিত্তিক বিশ্লেষণ পরিকল্পনা করা হয়েছে। লেখক সত্তার নির্মাণ এবং প্রতিষ্ঠা একটি আর্থ-সামাজিক নির্মাণ যেখানে সাংস্কৃতিক মূলধন বিশেষ ভূমিকা নেয়। প্রান্তিক নারীর সেই জায়গায় আসতে না পারার ক্ষেত্রে একটি সামাজিক পটভূমি ক্রিয়াশীল। উচ্চবর্ণের নারীরা লিখছেন শিক্ষাজীবন সূত্রে আবাসজীবনের স্মৃতিকথা, উচ্চবর্ণের নারী লিখছেন নিম্নবর্ণের কথা, সামাজিক আন্তঃস্তরের কথা, কিন্তু নিম্নবর্ণের নারীর নিজেদের কথা নিজেরা লেখা ততখানি সহজ ছিল কি? শিক্ষাজীবন থেকে উদ্ভূত নবনির্মিত আত্মবোধ তারা তাদের বাস্তবতায় কোথাও রাখতে পারছেন না, তাদের অর্জিত আত্মবোধের আধার হয়ে উঠছে না তাদের নিকট বাস্তব, তাই আবাসজীবনের স্মৃতি পুনরুদ্ধার এবং পুনরায় আস্বাদনের সুযোগ পাচ্ছে না। স্মৃতিকথা বা আত্মজীবনী রচিত হচ্ছে না। বাস্তবে যেমন তারা বিয়ে অথবা পরিবারে বেখাপ ভাবেই ঢুকে যেতে বাধ্য

[১] মজুমদার, তিলোত্তমা. (২০০৩). "চাঁদের গায়ে চাঁদ". ষষ্ঠ মুদ্রণ জুলাই ২০১৫. আনন্দ পাবলিশার্স. কলকাতা. পৃ-২৭

হচ্ছেন, সেখানে লেখক সত্তা উদযাপনের সেই সুযোগ থাকছে না। অন্যদিকে উচ্চশিক্ষা পরিসরের বহুমাত্রিক বৈষম্যের মধ্যে তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ স্মৃতিও খুব বেশি সুখকরও ছিল না। এবং তা উল্লেখযোগ্য ভাবে উঠে আসছে না সাহিত্যে। উচ্চবর্ণের স্মৃতিকথা তৈরি হচ্ছে বহুল পরিমাণে। উচ্চবর্ণের লেখায় নিম্নবর্ণের নারীর কথা প্রতিফলিত হচ্ছে সংরক্ষণের হাত ধরে, ততদিনে প্রান্তিক ছাত্রীরা এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে ও হস্টেলে। প্রান্তিক নারী অভিজ্ঞতা তাদের কথায়, তাদের ভাষায় আসছে না, এখানে পরিলক্ষিত হচ্ছে একটা ব্যবধান, একটি নৈঃশব্দ। বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে যেখানে প্রান্তিক ছাত্রীরা নিজেদের প্রান্তিকতার কথা প্রকাশ করতে লজ্জা পাচ্ছেন সেখানে প্রান্তিকতার অভিজ্ঞতা লেখা এবং সেই রচনার প্রতিষ্ঠা পাওয়া অনেক দূরবর্তী। এখানেও ক্রিয়াশীল থাকে মূলধন এবং সাংস্কৃতিক মূলধনের প্রশ্ন। উচ্চশিক্ষা পরিসরে পরিকাঠামোগত রূপান্তর না হলে নবনির্মিত আত্ম বোধে সম্পৃক্ত হয়ে নিয়ে চলা তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। একদিকে দেখা যাচ্ছে প্রান্তিক স্বরের নৈঃশব্দ অন্যদিকে ভিন্ন পরিসরে প্রতিফলন এবং উপস্থাপন। এই অধ্যায়ের মূল প্রশ্ন হল স্ত্রীশিক্ষার সূচনা কালে উচ্চবর্ণ নারীর আবাসজীবনের স্মৃতিকথা এবং সমসাময়িক হস্টেল জীবনকেন্দ্রিক সাহিত্যে প্রতিফলিত নারীর আত্মবোধের আন্তঃস্তরবিন্যাস ভিত্তিক পাঠ কিভাবে ভিন্ন?

সামাজিক ভাবে যে প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন পরিষেবা দেয় অথবা বৃহত্তর ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে ব্যবস্থাকে সচল রাখে যেমন, হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয়, আদালত ইত্যাদি। এই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে যুক্ত থাকে আরো কিছু সহযোগী প্রতিষ্ঠান যারা একভাবে স্বতন্ত্র হলেও মূল প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য, উদ্দেশ্যের সঙ্গে গভীর ভাবে যুক্ত। এই পারস্পরিকতা তাদের একটি ব্যবস্থার অন্তর্গত করে তোলে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, আদালত, জেল, আইনজীবিদের দপ্তর, আদালত চত্বর, থানা এইসবগুলি একটি ব্যবস্থা ভুক্ত পরিসর এবং প্রতিটি জায়গা পরস্পর সম্পর্কিত। প্রতিষ্ঠান হিসাবে, পরিসর হিসাবে তারা স্বতন্ত্র এবং সংযুক্ত। এই সামগ্রিক প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্রের সঙ্গে সমাজস্থ মানুষ যারা বিভিন্ন লিঙ্গ, জাতি, বর্ণ, ধর্ম, শ্রেণি, বয়স বিচিত্র অবস্থানের অথবা বিচিত্র আত্মপরিচয় কে আঁকড়ে ধরে সামাজিক পরিচিতি এবং আত্ম পরিচিতি তৈরি করেছেন, তাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধ একটি জটিলায়িত সমীকরণ তৈরি করে। এই বিষয়গুলি যখন সাহিত্যে উঠে আসে ধারাবাহিকভাবে তখন সামাজিক চলমানতার একটি ছবি ক্রমে স্পষ্ট হয়। উচ্চশিক্ষা প্রক্রিয়াটিকে সচল রাখার জন্য কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে হস্টেল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও পরিসর হিসাবে এটি স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় এবং হস্টেলে সামাজিক বহুস্তর থেকে ছাত্রাছাত্রীরা আসেন এবং বেশ কয়েকবছর পরস্পর সম্পর্কিত থেকে অবস্থান করেন। এই দৈনন্দিন পারস্পরিকতা নির্মাণ করে একটি আন্তঃসম্পর্ক।বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি ভূমিকার কথা বলা হয়, জ্ঞান নির্মাণের পাশাপাশি, এই আন্তঃসম্পর্ক সমাজ নির্মাণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। মানুষের চেতনায় প্রতিষ্ঠানের প্রভাব (Foucault, 1975) মানুষের সঙ্গে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক, ব্যক্তির আত্মপরিচয় নির্মাণে প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা (Goffman, 1961) তত্ত্বায়িত করেছেন সমাজবিজ্ঞানীরা।

বিশ্ববিদ্যালয় তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও একভাবে বিভিন্ন অবস্থানের ছাত্রছাত্রীদের ভিন্ন ভাবে আকার দেয়। আর এখানে ক্রিয়াশীল থাকে আর্থ-সামাজিক অনুঘটক, যেগুলি এই আকার দানের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। সামাজিক অবস্থান, শ্রেণি, লিঙ্গ, জাতি, বর্ণ, ধর্ম, বয়স অনুসারে বদলে যায় এই পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং অভিজ্ঞতার চরিত্র। এই অধ্যায়ে মূলত বাংলা সাহিত্যে কিভাবে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিসর উঠে আসছে, সামাজিক আন্তঃস্তরবিন্যাস কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এবং সর্বোপরি, এই উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান, পরিসর এবং ছাত্রছাত্রীদের পারস্পরিকতার গল্প কিভাবে কথা সাহিত্যে স্বতন্ত্র একটি গোত্রের জন্ম দিয়ে চলেছে ক্রমে তার একটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আবাসজীবন কেন্দ্রিক কথা-সাহিত্য; একটি স্বতন্ত্র গোত্র প্রস্তাব, আবাসজীবন কেন্দ্রিক কথা-সাহিত্যে নারীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও নিজস্ব পরিসর, বাংলা কথা-সাহিত্যে নারীদের উচ্চশিক্ষা ও আবাসজীবনের উপস্থাপন, শান্তিনিকেতনে নারীশিক্ষার প্রাক্কালে আবাসিক নারীদের স্মৃতিকথা, শিক্ষাসূত্রে 'আবাসিক' নারীর শিক্ষাজীবনের সমান্তরালে ব্যক্তিজীবনের আখ্যান, নারীর আবাসজীবন কেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাস – সামাজিক স্তরভিত্তিক ক্ষমতা কাঠামোর প্রতিফলন – এই কয়েকটি বিভাগে বিষয়টি ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে।

**আবাসজীবন কেন্দ্রিক কথা-সাহিত্য : একটি স্বতন্ত্র গোত্র প্রস্তাব**

আবাসজীবনকে কেন্দ্র করে বাংলা কথা সাহিত্যে একটি গোত্র ক্রমে স্পষ্টভাবে ঘনিয়ে উঠছে। সামাজিক চলমানতার ছবি সাহিত্যে প্রতিফলিত হয় তার যাবতীয় বৈশিষ্ট্য, সীমাবদ্ধতা সমেত। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন সামাজিক স্তর ও অবস্থানের নারীর প্রবেশ, সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং তার চিত্র প্রতিফলনের সূত্রে কথাসাহিত্যে যে গোত্র তৈরি হয়ে ওঠার লক্ষণগুলি স্পষ্ট হয়ে আসছে তার একটি রূপরেখা ক্রমে দৃশ্যমান। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় পল্লবিত হয়ে উঠেছে আবাসজীবন। উচ্চশিক্ষা সূত্রে 'আবাসিক' নারীরা একদিকে যেমন নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা, নিজেদের শিক্ষাজীবনের যাপিত জীবনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মানসজীবন প্রবাহকে বিধৃত করছেন স্মৃতিকথায়। যেখানে বিশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও হস্টেলের সূত্র উল্লেখ, সাল-সময় সমেত যে স্মৃতিকথা রচিত হয়েছে তাতে প্রতিষ্ঠানগুলির বিশেষত্ব সহ ছাত্রীদের ব্যক্তি অভিজ্ঞতা যা তার নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী নিজস্ব এবং স্বতন্ত্র তার একটি খতিয়ান থেকে যাচ্ছে। 'উচ্চশিক্ষিত', 'আবাসিক' নারীর স্মৃতিকথা একদিকে কথা সাহিত্যের একটি শাখার বিস্তার হিসাবে যেমন গড়ে উঠছে, তেমনি সামাজিক প্রভাবক হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষার একটি দিক তার ইতিহাস সহ উঠে আসছে। কোন সামাজিক অবস্থান থেকে 'উচ্চশিক্ষিত' ও 'আবাসিক' নারীটি তার উচ্চশিক্ষা ও আবাসজীবনের কথা বর্ণনা করছেন তার ভিত্তিতে তার অভিজ্ঞতার পাশাপাশি ন্যারেটিভটিও নির্মিত হয় বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য সমেত। এদিক থেকে স্মৃতিকথাগুলি একটি বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার। পূর্ববর্তী চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে যখন ছাত্রীদের সাক্ষাৎকার থেকে তাদের নিজস্ব ন্যারেটিভের স্বাতন্ত্র্যের বিষয় আলোচনা করেছি সেখানেও দেখা যাচ্ছে বয়ানের বিশেষত্ব, বৈশিষ্ট্য বদলে যাচ্ছে তাদের সামাজিক অবস্থান

অনুযায়ী। এইখানে আন্তঃস্তর বিন্যাস ভিত্তিক আলোচনা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। তাদের সাক্ষাৎকারগুলি যেভাবে আন্তঃস্তরবিন্যাসের অক্ষিকাঁচ দিয়ে দেখার সূত্রে বেরিয়ে এসেছে তাদের অভিজ্ঞতার মৌলিকত্ব তেমনি এই স্মৃতিকথাগুলিও ইন্টারসেকশনালিটির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে স্বতন্ত্র। অসংখ্য গল্প, উপন্যাস লেখা হয়েছে এবং হয়ে চলেছে মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয় ও আবাসজীবনকে কেন্দ্র করে। যেখানে কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসাবে এক-দুই জনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব থাকলেও শেষ অবধি আবাসজীবনের পরিসরটিই একটি সত্তা নিয়ে হাজির হয় পাঠকের সামনে। স্বল্প পরিসরের জন্য দুটি নির্বাচিত উপন্যাস এখানে আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও আত্মজীবনীর মধ্যে শিক্ষাজীবনের আলোচনায় দেখা যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় জীবন ও আবাসজীবন উল্লেখযোগ্য হিসাবে জায়গা করে নিয়েছে। নারীর শিক্ষাজীবন বিশেষত সামাজিকভাবে ভিন্ন অবস্থানের নারীর শিক্ষাজীবনের ইতিবৃত্তের গুরুত্ব একদিকে সাহিত্য হিসাবে যেমন রয়েছে তেমনি একটি সমাজ রূপান্তরের সাক্ষ্য হিসাবেও রয়েছে। কথা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় এইভাবে নারীর উচ্চশিক্ষাজীবন ও আবাসজীবন নিজস্ব মাত্রা নিয়ে ক্রমাগত লিপিবদ্ধ হয়ে চলেছে যা সাহিত্যমূল্যের পাশাপাশি একটি সামাজিক রূপান্তরের দিক নির্দেশ করে। একটি আলাদা বর্গ বা সংরূপ নির্মাণের বিস্তারে কথা সাহিত্যের এই শাখা ক্রমে নির্দিষ্ট যুক্তিবিন্যাসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং একটি গোত্র হিসাবে নির্মিত হয়ে উঠছে। উদ্দেশ্যমূলকভাবেই বর্গ ও গোত্র প্রস্তাবিত হলে আলোচনার সঙ্গে প্রাসঙ্গিকতাও দীর্ঘায়িত হয়, যা সামাজিক সাম্যের দিক থেকে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে (চট্টোপাধ্যায়, ২০০৯) অন্যান্য স্বরের নীচে কিছু স্বর যাতে চাপা পড়ে না যায় এবং বহুস্বরের উপস্থিতি নিশ্চিত করা উদ্দেশ্যমূলক ভাবে গোত্রের আলোচনা এবং স্বতন্ত্র গোত্র প্রস্তাবের ক্ষেত্রে এই যুক্তি পেশ করা যায়।

আবাসিক প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে, আবাসজীবন ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধ এবং আবাসজীবনের অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে যে সুপ্রচুর লেখা বিচিত্র সংরূপে তৈরি হয়েছে সেগুলি একত্রে একটি গোত্র হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। আবাসজীবন কেন্দ্রিক সাহিত্য স্বতন্ত্র গোত্র হিসাবে নির্মিতির পটভূমি বাংলা সাহিত্যে ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে। ইংরেজী ভাষায় এই দিকটি উল্লেখযোগ্য ভাবে সমৃদ্ধ। টম ব্রাউনের 'স্কুল ডেজ', চার্লস ডিকেন্সের 'ডেভিড কপারফিল্ড' জে কে রাউলিং এর হ্যারী পটার সিরিজের কিয়দংশ এই সূত্রে উল্লেখ করা যায়। বাংলায় বিক্ষিপ্তভাবে প্রচুর লেখার হদিশ পাওয়া যাচ্ছে যেগুলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তথা আবাসজীবনকে কেন্দ্র করে রচিত। শিক্ষালাভের জন্য নিজের এলাকা থেকে রাজ্যের মধ্যে বা বাইরে স্থানান্তরিত হয়ে সমবয়সীদের সঙ্গে পরিবার বিযুক্ত ভাবে একক জীবন যাপন বাংলা সাহিত্যে উঠে এসেছে বারবার। কারা জীবনকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্যগুলি রচিত হয়েছে সেগুলি 'কারাসাহিত্য' হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। কারাজীবনকে কেন্দ্র করে রচিত উপন্যাসগুলি কারা উপন্যাস হিসাবে সাহিত্য সংরূপের আলোচনায় চিহ্নিত ও বর্ণিত হয়ে থাকে (রায়, ২০১০)। ঠিক সেভাবে যদি হস্টেলকেন্দ্রিক সাহিত্যকে সংজ্ঞায়িত করা যায় তাহলে বলা যায় - আবাসজীবনের অন্তরালের ঘটনা, হস্টেলের নিয়মকানুন, শাসনপ্রণালী,

কার্যপ্রণালী, আবাসিক ছাত্রছাত্রী, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত কর্মীবৃন্দ - এক কথায় হস্টেলের অভ্যন্তরের ঘটনাবলী নিয়ে লেখা সাহিত্যকে আবাসজীবন কেন্দ্রিক সাহিত্য বলা যায়।

পরিবারস্থ জীবনযাপন এবং হস্টেল জীবনের একটি প্রধান পার্থক্য, এখানে পরিবার কাঠামোটি অনুপস্থিত। নানা পরিবার থেকে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে আসা পৃথক বৈশিষ্ট্য সমন্বিত বহু চরিত্রের একটি সমন্বয় ঘটে এখানে। যারা সবার মধ্যে নিশ্চিহ্নভাবে মিশে যেতে পারে না, আকাঙ্ক্ষায়, প্রবণতায় ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে তারা পরস্পরের থেকে আলাদা, পড়াশুনার সুত্রে হস্টেলে একত্রিত হয়। এই বিচিত্র সমাবেশে মানবের প্রকৃতি রহস্যভেদে আগ্রহশীল ব্যক্তি তাঁর কৌতুহল নিবৃত্তির বিচিত্র ও প্রচুর উপাদান একত্রে সংগৃহীত দেখতে পান। পড়াশুনার অবসরে কোন আবাসিক হস্টেলের জীবনের উপলব্ধি, অভিজ্ঞতা, নানা ঘটনা, দৈনন্দিনের নানা ছবি যখন সাহিত্যে ফুটিয়ে তোলেন তখন তা আবাসজীবন কেন্দ্রিক সাহিত্য হিসাবে বিবেচনা করা যায়। প্রথমত, পুরুষের উচ্চশিক্ষার সমান্তরালে তাদের নাগরিক আবাসজীবনের ছবি আমরা দেখতে পাই সাহিত্যের আনাচে কানাচে। যেমন, শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' (১৯১৭), রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প 'সমাপ্তি' (১৩০০ বঙ্গাব্দে 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত), 'চোখের বালি' (১৯০৩) উপন্যাসে (অন্যতম চরিত্র বিহারী থাকত মেসে), সমরেশ মজুমদারের 'কালবেলা'(১৯৮২), বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের 'অপরাজিত' (১৩৩৮ বঙ্গাব্দ) (কাজল থাকত মেসে), তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়ের 'ধাত্রীদেবতা'(১৯৩৯) (কেন্দ্রীয় চরিত্র শিবনাথ মেসে থাকত), বোমকেশের গোয়েন্দা গল্পের অজিতের সঙ্গে বোমকেশের দেখা হয়েছিল মেস বাড়িতে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'ঘূণপোকা' (১৯৫৯) উপন্যাসের নায়ক শ্যাম হস্টেলে থাকত। নকশাল আন্দোলনের সময়কালীন উপন্যাসে আবাসজীবন উঠে এসেছে বারবার। পুরুষের মেসবাড়ি জীবন নিয়ে অসংখ্য লেখা হয়েছে। যেমন, শিবরাম চক্রবর্তীর রম্য রচনা 'অদ্বিতীয় পুরস্কার' (অখন্ড), 'ইঁদুরদের দূর করো'। অখিল নিয়োগীর 'বাবুই বাসা বোর্ডিং' (স্বপনবুড়ো, ২০১৮), মনোরঞ্জন ঘোষের 'পরিবর্তন', শারদ নির্মুখোশ 'মেস হোস্টেল ঘটিত – এ বাঙালী জীবন' ('সুপ্রকাশ প্রকাশনী') তে পুরুষের বাসজীবন বর্ণিত হয়েছে, স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর 'আমাদের সেই শহর' (চক্রবর্তী, ২০১৯), 'গোয়েন্দা গণ্ডালু'র চার গোয়েন্দা হস্টেলের বন্ধু, সেই সূত্রে কিছু হস্টেল জীবনের কথা এসেছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সাহসিকা', শ্রী নবীন বড়ুয়ার লেখা অসমিয়া সাহিত্য 'কটন কলেজ' (১৯৬৫) বাংলায় অনুবাদ করেছেন বাসুদেব দাস, দেবাশিষ তফাদারের 'সরাইঘাট একটি প্রেম কাহিনী', 'অমিতাভ এম বিবি এস' আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশ পায়।

সমান্তরালে সাহিত্যে মেয়েদের আবাসজীবন সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় উল্লেখ থেকে কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে উঠে আসছে সাহিত্যে। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'আমি রাই কিশোরী'-তে ওয়ার্কিং ওম্যান হস্টেলের কথা বর্ণিত। বোলান গঙ্গোপাধ্যায়ের 'লেডিসহস্টেল'-এর কথা উল্লেখ করা যায়। নারীর উচ্চশিক্ষার সমান্তরালে মেয়েদের বাড়ির বাইরে থেকে পড়াশুনা করার সামাজিক চিত্রটি ধীরে ধীরে সাহিত্যে, সিনেমায় জায়গা করে নিতে দেখা যাচ্ছে। ক্রমে নারীর আবাসজীবন সাহিত্যে উঠে আসছে কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হিসাবে। অহনা বিশ্বাসের স্মৃতিকথা 'মেয়েদের হস্টেল জীবন– অন্দরের কথামালা'

(২০০৯), ঋতা বসুর স্মৃতিকথা ‘শ্রীসদনের শ্রীমতীরা’ (২০১৬) এছাড়াও উপন্যাস লেখা হচ্ছে মেয়েদের আবাসজীবনকে কেন্দ্রে রেখেই। যেমন, তিলোত্তমা মজুমদারের ‘চাঁদের গায়ে চাঁদ (২০০৩)’, অহনা বিশ্বাসের ‘আরশী নগরে তাঁবু’ (২০০০)। শান্তিনিকেতনের আবাসজীবন সাহিত্যে বর্ণিত হয়েছে ধারাবাহিকভাবে, বানী নিয়োগী লিখেছেন “শ্রীসদনের কথা”, রানী চন্দের শান্তিনিকেতনের স্মৃতিচারণায়, অমিতা সেনের লেখায় শান্তিনিকেতনের আবাসজীবন উঠে এসেছে। শান্তিনিকেতনে নারী শিক্ষা এবং মেয়েদের হস্টেল নির্মাণের পাশপাশি একটি ধারাবাহিক স্মৃতিকথার ধারা নির্মিত হয়েছে, আবাসিক ছাত্রীরা যাঁরা শান্তিনিকেতনে দীর্ঘ বছর পড়াশুনা করেছেন, থেকেছেন হস্টেলে তাঁদের স্মৃতিচারণার একটি ধারা রবীন্দ্রসমকাল থেকে শুরু হয়ে বর্তমানে সেই ধারা বহমান। বিশ্বভারতীতে আবাসিকাদের স্মৃতিকথার মধ্যে আবাসিকাদের আর্থ–সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী বদলে যায় তাদের স্মৃতির বয়ান। এই ধারাবাহিক বদলটি একটি ভিন্ন বাস্তবতার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার যুগে যে নারীরা শিক্ষাগ্রহণ করেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই উচ্চবিত্ত, উচ্চবর্ণের পরিবারের নারী, বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠাকালের কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত সদস্যদের পরিবারের মেয়েরা মূলত আবাসিকা হিসাবে শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। তাঁদের স্মৃতিকথার বয়ান তাদের আর্থ–সামাজিক কৌলিন্যের সাক্ষ্য বহন করে। তাঁদের কাছে আবাসজীবন পরিবারের বাইরে একটি নিজস্ব পরিসর হিসাবে এসেছে, যেখানে তাঁরা শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে এসে প্রতিনিয়ত মুগ্ধ হচ্ছেন। তাঁদের অভিজ্ঞতার ঝুলিতে প্রতিনিয়ত যুক্ত হয়েছে নতুন আনন্দের সমাহার, রক্ষণশীল পরিবারের বাইরে এসে তাঁরা জগত এবং জীবনকে দেখছেন নতুন ভাবে, নিজেদের আবিষ্কার করেছেন ভিন্ন সাপেক্ষতায়। যার ছাপ প্রথম যুগের আবাসিকাদের স্মৃতিকথাগুলিতে রয়েছে। অন্যদিকে, বিশ্বভারতীতে নিম্নবর্গের নারীদের উচ্চশিক্ষায় অংশ নিতে অপেক্ষা করতে হয়েছে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সাংবিধানিক সংরক্ষণ এবং বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ওঠা অবধি। তার বহু পরবর্তীকাল থেকে আবাসিকাদের স্মৃতিকথায় পাওয়া যাচ্ছে ভিন্ন এক বয়ান যেখানে হীনমন্যতা, অপ্রাপ্তি, বৈষম্যের গল্প উঠে আসছে, কোন ভিন্ন পরিসর থেকে এসে তাঁরা শান্তিনিকেতনে এসে পাচ্ছেন ভিন্ন এক বাস্তবতা। এই ধারাবাহিক বদলটি নারীবাদী আন্তঃস্তর বিন্যাস ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে আলোচিত হয়েছে।

সাহিত্যে ছেলেদের ও মেয়েদের আবাসজীবনের উপস্থাপনের রাজনীতি আলাদা। ছেলেদের আবাসজীবন আর মেয়েদের আবাসজীবন সম্বন্ধীয় উপস্থাপন প্রচলিত প্রতিষ্ঠিত লৈঙ্গিক ভূমিকা এবং বিদ্যমান ক্ষমতা সম্পর্কের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে নির্মিত হয়েছে এবং এই বিষয়ে সামাজিক সাংস্কৃতিক নির্মাণটিও তার বাইরে নয়। তার ফলে সাহিত্যেও তার ছাপ দেখা যাচ্ছে। সাহিত্যে আবাসজীবন উপস্থাপনের এই রূপান্তর উচ্চশিক্ষার ইতিহাসের সমান্তরালে ও সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই নির্মিত হয়ে চলেছে। সাংবিধানিক সংরক্ষণ এবং লিঙ্গ–জাতি বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন শিক্ষা ও সামাজিক স্তরে যে রূপান্তরের সূচনা করেছে বর্তমানে আমরা তার প্রতিফলন নারীদের আবাসজীবন কেন্দ্রিক সাহিত্যের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। লিঙ্গবৈষম্য ও অন্যান্য বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন একদিকে

বিশ্ববিদ্যালয় ও ক্যাম্পাস জীবনকে যেমন বদলে দিয়েছে তেমনি সাহিত্যে উপস্থাপনের ক্ষেত্রেও পড়েছে তার ছাপ। বাংলা সাহিত্যে ধারাবাহিকভাবে ছেলেদের হস্টেল ও মেয়েদের হস্টেলের উপস্থাপন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ছেলেদের আবাসজীবন সমাদৃত তাদের লৈঙ্গিক সামাজিক সাংস্কৃতিক নির্মাণের সঙ্গে সম্পর্কিত। অন্যদিকে মেয়েদের সামাজিক ভূমিকার প্রত্যাশার সঙ্গে অন্বিত তাদের আবাসজীবনের উপস্থাপনা। মেয়েদের লেখার ভিতর দিয়ে মেয়েদের বাস্তবতার কথার সাহিত্যমূল্যের সঙ্গে সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে। ভার্জিনিয়া উলফ মেয়েদের অভিজ্ঞতা তার নিজের ভাষায় বর্ণনার বিশেষত্ব চিহ্নিত করেছিলেন। পশ্চিমবাংলায় আবাসজীবন বড়জোর দুইশত বছরের। বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ ইতিহাসের সঙ্গে সাজুয্য রেখে দেখলে দেখা যাবে যে, উনিশ শতকের মাঝের দিকে ছেলেদের আবাসজীবন শুরু হয়েছে আগে। তারপর নারীশিক্ষার টালমাটাল সময় পেরিয়ে মেয়েদের আবাসজীবন শুরু হতে সময় লেগেছে আরো অনেক দিন। বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ আর তার হাত ধরে হস্টেল নির্মাণ এবং ছেলেমেয়েদের বাড়ি ছেড়ে অন্যজায়গায় শিক্ষালাভের জন্য গিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে থাকা। তখন থেকেই আবাসজীবন পরিবারের বাইরে একটা পরিসর নির্মিত হতে শুরু করল। ছেলেদের আরো নানা সূত্রে বাড়ির বাইরে গিয়ে দীর্ঘদিন বসবাসের বিষয় রয়েছে। ব্যবসার সূত্রেই  হোক বা ভাগ্য অন্বেষণের জন্যই হোক। দীর্ঘ বছর মেয়েরা একক ভাবে পরিবারের বাইরে গিয়ে অন্য অনেক মেয়েদের সঙ্গে থাকতে শুরু করল পড়াশুনা করতে শুরু করল। তাদের জন্য আবসজীবন হয়ে উঠল ধীরে ধীরে অন্য এক পরিসর। বিশ্ববিদ্যালয় কে কেন্দ্র করে সার্বিক ভাবে আবাসজীবন ও বিশেষত মেয়েদের জন্য আবাসজীবন সমাজে নির্মিত হতে থাকল ও একটি সামাজিক রূপান্তর ক্রমাগত ঘটতে থাকল যা এখনও চলমান। এই চলমানতা, এই রূপান্তর সাহিত্যে ধরা পড়েছে সাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিকে, উপস্থাপিত হয়েছে সেই সব সাহিত্যে ছেলেদের ও মেয়েদের আবাসজীবনের ভিন্নতা, মেয়েদের আবসজীবন।

**আবাসজীবন কেন্দ্রিক কথা-সাহিত্যে নারীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও নিজস্ব পরিসর**

প্রচলিত সাহিত্য সার্বিক ভাবে পিতৃতান্ত্রিক সংস্কার প্রসূত। তথাকথিত সাহিত্যে চিত্রিত নারী চরিত্রগুলি পুরুষতন্ত্রের কাঠামোজাত। বেশীরভাগ পুরুষের লেখনীতে তারা চিত্রিত, পুরুষের অভিজ্ঞতা ও ইচ্ছার দ্বারা তারা সজ্জিত এবং চালিত। নারীর নিজস্ব বাস্তবতার ছাপ সেখানে নেই। নারীর নিজস্ব স্বরও সেখানে অনুপস্থিত। এখানেও ক্রিয়াশীল ক্ষমতার রাজনীতি। ভার্জিনিয়া উলফ লিখছেন, "আমাদের সভ্যতার দরকার এমন এক সুরে লেখা যেখানে আছে লিঙ্গ বৈষম্য নিয়ে সম্পূর্ণ ঔদাসিন্য। যা ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ থেকে মুক্ত। যেখানে আছে শুধু বাস্তব দুনিয়ার সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের সম্পর্ক।" (উলফ, গুহ, ২০০০, পৃ -৯)সাহিত্যে নারীর বাস্তবতা যথার্থ ভাবে উঠে আসে না। নারীকে সেখানে যথার্থ ভাবে চিত্রিত করা হয় না। সেই সাহিত্যে ক্রমাগত ভাবে নারী বিকৃত ভাবে উপস্থাপিত হতে থাকে। সেখানে কেবলমাত্র চিত্রিত হয় "একটি লিঙ্গের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি অন্যটির দারিদ্র্য ও নিরাপত্তার অভাবের কথা" (উলফ, গুহ, ২০০০, পৃ -৯)। ভার্জিনিয়া উলফ উপলব্ধি করছেন পুরুষ সাহিত্যিকরা নারী চরিত্র চিত্রায়ণে কি ধরণের মানসিকতার মধ্যে থাকেন। তিনি বর্ণনা দিচ্ছেন কিভাবে

একজন পুরুষ লেখক লিখেছেন তাঁর সুবিশাল বই-“নারী জাতির মানসিক, নৈতিক ও শারীরিক নিকৃষ্টতা” এবং তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে যে কোন এক ভাবাবেগের শিকার হয়ে এমন ভাবে কাগজেকলমে তিনি খোঁচা দিচ্ছেন যেন লিখতে লিখতে কোন বিষাক্ত পোকা মারছেন” (উলফ, গুহ, ২০০০, পৃ -৩৫)। সাহিত্যকে পুরুষতন্ত্রের একচ্ছত্র থাবা থেকে বের করে আনতে হলে এবং নারীর অস্তিত্বও বাস্তবতার সঙ্গে অন্বিত করতে হলে জরুরী সাহিত্যে নারীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রতিফলন। আমাদের সমাজব্যবস্থা নারীকে লেখিকা হবার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ দেয় না। স্থানিক এবং মননগত। প্রাইভেট স্পেস তারা কতটুকু পায়। সমাজে সংসারে নারী যেমন ব্যবহৃত তেমনি সাহিত্যের জগতে মননের চর্চার মধ্যেও নারী ব্যবহৃত। বিষয় এবং বিষয়ীর মধ্যে ক্ষমতার সম্পর্ক বিদ্যমান। ভার্জিনিয়া উলফ প্রচলিত সাহিত্যের গূঢ় সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন- প্রচলিত সাহিত্যে “এত শতাব্দী ধরে নারীরা এক অপূর্ব যাদু আয়নার কাজ করেছে যাতে পুরুষরা নিজেদের চেহারা দ্বিগুন ভাবে প্রতিফলিত দেখেছে”। (উলফ, গুহ, ২০০০, পৃ-৩৯) সাহিত্য বিশেষ একধরনের নারী চরিত্র নির্মাণ করে যাদের সঙ্গে বাস্তবের কোন যোগ নেই, তা কেবলই পুরুষ লেখকের কল্পনা বিলাসিতা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি পঙক্তি ‘অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা’, পুরুষ লেখকের লেখায় নারীর বাস্তব অস্তিত্ব অস্বীকৃত হচ্ছে। সাহিত্যে নারী ব্যবহৃত হয় উপকরণ হিসাবে, তার অস্তিত্ব সার্বিক ভাবে প্রতিফলিত হয় না। “ঐতিহাসিক কে প্রথমে আর কবিকে পড়লে সত্যিই এক কিম্ভুত প্রাণী বেড়িয়ে আসে, যেন ঈগলের ডানা লাগানো একটা পোকা; জীবন ও সৌন্দর্য্যের আত্মা যেন রান্নাঘরে চর্বি টুকরো করছে। কিন্তু কল্পনায় এই বিকট প্রাণীগুলো যতই মনোরঞ্জক হোক না কেন বাস্তবে তাদের কোনো অস্তিত্বই নেই। তাকে জীবন্ত করে তোলার জন্য যা দরকার তা হলো তাকে একই সঙ্গে কাব্যিক ও গদ্যবত করে দেখা (উলফ, গুহ, ২০০০, পৃ -৪৭) ।

সাহিত্যে যে নারীরা চিত্রিত হয় তারা কল্পিত। সাহিত্যের এই সংস্কার থেকে বেরিয়ে এলে বাস্তবের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে একজন নারীর বাস্তব অস্তিত্ব প্রতিফলিত হয়। নারী লেখিকা মাত্রেই তার অধিকারী হবে তা বলা যায় না। সাহিত্যের আমুল সংস্কারের বদলে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা নিতে পারে নারীর স্মৃতিকথা ও আত্মজীবনী। কারণ সেখানে উঠে আসে নারীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও একান্ত নিজস্ব জীবনের প্রতিবিম্ব। নারীর নিজস্ব স্বরের সন্ধান এখানে মেলে। সমালোচনা করা হয় এইভাবে যে, মেয়েদের মধ্যে তেমন লেখক হবার প্রভিতা নেই। সাহিত্য জগতে নারীর স্বল্প প্রতিনিধিত্ব নারীর মননগত অক্ষমতার ফল নয়, সামাজিক কাঠামো ও সাংস্কৃতিক নির্মাণ এক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে জড়িত। “যে সব মেয়েদের কর্মজীবন শুরু হত তারা খেলাঘর ছাড়ারও আগে, যাদের বাপ মাতাদের এই জীবনে বাধ্য করত আর আইনও প্রথা তাদের এই গন্ডীতে আটকে রাখত, তাদের মধ্যে এই প্রতিভা জন্মাবে কি করে?” (উলফ, গুহ, ২০০০, পৃ -৫১) মেয়েদের পড়াশুনা করা বা বাড়ির বাইরে এসে হস্টেলে থেকে পড়াশুনা করার ইতিহাসটাও বন্ধুর। বাড়িতে নূন্যতম পড়ার আলাদা ঘরটুকুও তারা পেত না। হস্টেল সেখানে অনেক পরিষেবা যুক্ত জায়গা। আগের অধ্যায়ে তা আলোচনা করেছি। তেমনি লেখিকা হিসাবে গড়ে ওঠার ধারাবাহিকতাটিও সমান ভাবে প্রতিকুল।

নারীর আত্ম সচেতনতার জন্য যে পরিসর দরকার সেটাও তারা পায় নি নিজের মত। হস্টেল তাদের কাছে নিজস্ব পরিসর সেখানে এসে তারা আত্মআবিষ্কার জাত উপলব্ধি তারা লিখছে সাহিত্যে। নারীর নিজস্ব স্বরের খোঁজ পেতে হলে স্মৃতিকথা ও আত্মজীবনীর গুরুত্ব অপরিসীম। লেখার ব্যপারে মননশীলতার চর্চায় মেয়েদের উৎসাহিত করা হয় না।

> একটা আলাদা ঘর, যতই তা বিশ্রী হোক না কেন পারিবারিক দাবি ও অত্যাচার থেকে খানিকটা রেহাই দিত, কিন্তু মেয়েদের এই টুকু স্বস্তিও পাওনা ছিল না। এই ভয়ংকর বাস্তব অসুবিধাগুলোর চেয়েও সাংঘাতিক ছিল বিমূর্ত সমস্যাগুলো। কীটস, ফ্লবের না অন্যান্য প্রতিভাবান পুরুষেরা যেটা পারেন নি তা হল পৃথিবীর উদাসীনতা। কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে সেটা ছিল বিরোধিতা। পৃথিবী তাকে বলত না যে 'যদি চাও তো লেখো আমার তাতে কিছু যায় আসে না'। পৃথিবী অট্টহাস্য করে বলত, 'লিখবে? লিখে তোমার লাভটা কি হবে শুনি?' বইয়ের তাকের খালি জায়গাগুলো দেখে মনে হলো। (উলফ, গুহ, ২০০০, পৃ-৫৫)

তারপর যখন 'শিক্ষিত', ও 'আবাসিক' মেয়েরা পেল নিজেকে প্রকাশের ভাষা এবং নিজের শর্তে 'ব্যক্তিগত পরিসর' লেখা হতে থাকল অজস্র স্মৃতিকথা। আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথায় নারীর ভিতরের কথা প্রকাশিত হয়, উপলব্ধ অনুভূতি প্রকাশিত হয়। সাহিত্যের নারীবাদী গবেষণার ক্ষেত্রে মেয়েদের আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথার গুরুত্ব অপরিসীম। আর্থ–সামাজিক অবস্থান ভেদে কিভাবে উচ্চশিক্ষার অভিজ্ঞতা কিভাবে বদলে যায় ছাত্রীদের, কিভাবে তাদের ন্যারেটিভ বদলে যায় এবং বিদ্যমান ক্ষমতা সম্পর্ক কিভাবে তাদের শিক্ষাজীবনকে প্রভাবিত করে এই প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করেছি পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে বিশেষত তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ে। এই অধ্যায়ে সাহিত্যে উপস্থাপনের মধ্যে একই প্রশ্নের অন্বেষণ করার চেষ্টা করেছি। সাহিত্যে উচ্চশিক্ষিত এবং আবাসিক নারীদের প্রসঙ্গে সামাজিক সাংস্কৃতিক নির্মাণের ছাপটিও দেখার চেষ্টা করেছি। মূলত সামাজিক ক্ষমতা কাঠামো কিভাবে বিভিন্ন অবস্থানের নারীর উচ্চশিক্ষাকে প্রভাবিত করে এই বিষয়টি যেমন খোঁজার চেষ্টা করেছি পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে, এই অধ্যায়ে বিশ্লেষিত হয়েছে আন্তঃস্তর বিন্যাসের ভিত্তিতে বাংলা সাহিত্যে তার প্রতিফলন। নারীবাদী সাহিত্য সমালোচনা পদ্ধতিতে এবং ইন্টারসেকশনালিটির (Nash, 2008) লেন্স থেকে আলোচনা করা হয়েছে (Walker, 1990)।

যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শহুরে মধ্যবিত্ত অঞ্চলে উচ্চবর্ণের আধিপত্য রয়েছে, তাই প্রভাবশালী বর্ণের পরিচয়কে পদ্ধতিগতভাবে খুব কমই প্রশ্ন করা হয়েছে। ভারতে নারীবিদ্যা চর্চার মুলধারার বিশ্লেষণে এবং তাদের অনুশীলনে এবং বিশ্লেষণের একটি বিভাগ হিসাবে লিঙ্গের অদৃশ্যতা, বিচ্যুতি এবং প্রান্তিককরণ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। **১৯৯১** এর দশকের দলিত নারীবাদীরা সমালোচনা করেন নারীবাদী অনুশাসন, পাঠ্যক্রমের রীতি এবং ব্রাহ্মণ্য শক্তি ও সুযোগ-সুবিধার জোটকে। রেগে (২০০৬) যুক্তি দেন যে কীভাবে উচ্চবর্ণের নারীবাদীরা মনে করেন বর্ণ কেবল দলিত মহিলাদের উদ্বেগের বিষয় এবং তারা বর্ণ ও লিঙ্গ নিপীড়নের জটিল ইতিহাসকে সমালোচনামূলক ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষা করে। দলিত নারীবাদী অবস্থান

বর্ণ পরিচয় অতিক্রম করতে পারবে না বলে ধরে নেওয়া হয়। তার ফলে, একটা স্বতঃস্ফূর্তঃ মেরু তৈরি হয়েছে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যবাদী এবং অব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ্যবাদীদের চর্চার মধ্যে।

অভিজ্ঞতার নারীবাদী ডিসকোর্সে একটি বড় অংশ হল উচ্চবর্ণের মহিলার আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা, যেখানে দেখা যাচ্ছে ঐতিহ্যের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব এবং আধুনিক, স্বাধীন হওয়ার ইচ্ছা। এরপর এটা দেখা গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে কীভাবে 'ব্যক্তিগত' জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা এবং বর্ণবিরোধী সংগ্রাম বা বর্ণ বৈষম্য ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে পাব্লিক প্রাকটিস বা অনুশীলনগুলিকে বর্ণ ও লিঙ্গ সম্পর্কিত বিশ্লেষণে আনা যেতে পারে? এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণের লেখার অনুপস্থিতি এবং ফাঁকগুলি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, যেমন, দলিত সাহিত্য যা সাহিত্যের বিস্তৃত ক্ষেত্রে এবং সাহিত্যের আলোচনায় একটি নতুন সামাজিক বাস্তবতা নিয়ে আসার সম্ভবনা বহন করে। সত্যনারায়ণ ও থারুর যুক্তি অনুসারে দলিত সাহিত্য কেবল সাহিত্য আলোচনা থেকে বিকশিত হয় না, বরং এটি অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিনিয়োগ করা এবং স্বাধীনতার আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্বারা চালিত একটি সামাজিক আন্দোলন। এই সাহিত্যে অস্পৃশ্য বা বর্ণের শ্রেণিবিন্যাসে নিম্নতম হিসাবে যারা অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বৈষম্যের শিকার তাদের বিভিন্ন ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সৃজনশীল কাজ অন্তর্ভুক্ত।

যখন প্রান্তিক বর্ণের মহিলারা আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা ইত্যাদি লেখেন, তখন তার মধ্যে তাদের অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিত্ব এবং অনুভূতি সম্পৃক্ত থাকে। সত্যনারায়ণ এবং থারু যুক্তি দেন যে আত্মজীবনীগুলি এমন লোকদের দ্বারা লেখা হয় যারা তাদের জীবনকে গুরুত্বপূর্ণ বা উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগত উত্তরণ হিসাবে বিবেচনা করে। তাদের মতে, দলিত আত্মজীবনী এবং স্মৃতিকথাগুলি স্বতন্ত্র ও আলাদা কারণ সেখানে একটি সম্প্রদায়ের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে একক ব্যক্তিগত জীবন একটি তাৎপর্য অর্জন করে। একই সঙ্গে এগুলি দলীয় অভিজ্ঞতার প্রতিনিধিত্ব করে এবং অভিজ্ঞতার সাক্ষ্যে হিসাবেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাদের ব্যক্তিগত স্মৃতি, দুঃখ এবং ক্ষোভের অনুভূতি তখন সত্য এবং জ্ঞানের উৎস হিসাবে স্বীকৃত হয়, এক একটি সম্প্রদায়ের স্বর হয়ে ওঠে। এগুলি হয়ে ওঠে একই সঙ্গে সম্প্রদায়ের জন্য দলিল এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। এইভাবে, এগুলি সামাজিক এবং ঐতিহাসিক নথিতে পরিণত হয়। তারা একটি সামাজিক জগতকে আলোকিত করে এবং একই সঙ্গে নতুন প্রশ্ন উত্থাপন করে। যদিও সমাজের প্রান্তিক অংশের মহিলাদের দ্বারা অনেক লেখা হয়েছে (Satyanarayana, Tharu 2013; Guru, 2009; Tharu & Lalita, 1991; Rege, 2006) মহিলাদের উচ্চশিক্ষার অভিজ্ঞতা এবং হস্টেলের অভিজ্ঞতা নিয়ে বাংলায় কোনও সাহিত্য লেখা হয়নি। উচ্চবর্ণের নারীদের উচ্চশিক্ষার ইতিহাস যেমন দীর্ঘ তেমনি তাদের রচিত আত্মজীবনী, স্মৃতিকথার তালিকাও দীর্ঘ।

**বাংলা কথা-সাহিত্যে নারীদের উচ্চশিক্ষা ও আবাসজীবনের উপস্থাপন**

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় দেড়শ বছরের নারীর উচ্চশিক্ষার ধারাবাহিকতায় কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি আবাসজীবনের, মেসের উৎপত্তি। বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের সমান্তরালে ছাত্রছাত্রীদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হচ্ছেন, বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র শহরে থাকছেন। নিজের জন্য একফালি জায়গা তৈরি করেছেন বসবাসের জন্য। নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে পড়াশুনা করার উপযোগী ছোট

ছোট বৃত্ত নির্মাণ করছেন মেস, হস্টেলে। নারী শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরাও এই দলে সামিল হচ্ছেন। কেউ কেউ উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসছেন পড়তে এবং থাকছেন হস্টেলে। বাড়ির বাইরে তাদের নিজের পড়াশুনার জন্য এই বসবাস তাদের নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে সমাজকেও আন্দোলিত করছে। নানা কৌতুহল টানাপোড়েন। মেয়েরা বদলে যাচ্ছেন, বদল আসছে তাদের আচার ব্যবহারে, চালচলনে, পোশাকে, শরীরী ভঙ্গিমায়, ব্যক্তিত্বে, তাদের দেখা যাচ্ছে যত্রতত্র, তাদের দৃশ্যমানতা বাড়ছে। সমাজ নির্ধারিত লৈঙ্গিক ভূমিকার বাইরে তাদের দেখা যাচ্ছে ভিন্ন ভূমিকায়। তার ছাপ পড়ছে সংলগ্ন সমাজিক প্রেক্ষাপটে। নিরাপত্তার জন্য নিয়মের পর নিয়ম তৈরি হচ্ছে মেয়েদের হস্টেলে। নারীদের উচ্চশিক্ষা বিষয়ে প্রাথমিক চাপান উতোর চলার মাঝখানে ঘটে যাচ্ছে দেশভাগ, সত্তরের উত্তাল সময়। পূর্ব বাংলা থেকে আসছে মানুষজন। উদবাস্তু মেয়েরা লজ্জা, সংকোচ ছেড়ে খুব সহজেই সামিল হচ্ছেন শিক্ষার পরিসরে। ধীরে ধীরে সাংবিধানিক সংরক্ষণ, সামাজিক নারীমুক্তির আন্দোলনের হাত ধরে সমাজের সব স্তর থেকে মেয়েরা আসছেন  বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে, পিতৃতান্ত্রিক 'নিরাপদ' ঘর ছেড়ে থাকছেন হস্টেলে। স্বাধীনভারতে নির্মিত হচ্ছে নতুন সংবিধান। সেখানে নানা ধারায় ও পরবর্তীকালের বিভিন্ন সংস্কারে মেয়েদের জন্য ও সমাজের পিছিয়ে পড়া মেয়েদের জন্য তৈরি হচ্ছে নানা সংরক্ষণ। বিশ্ববিদ্যালয়, হস্টেলে, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মেয়েরা দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। তারা পরিসরের মধ্যে অংশীদারিত্ব নিয়ে বিরাজ করছে। তাদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বদলাচ্ছে মানুষের, কখনও বা হিংসা বাড়ছে তাদের প্রতি। প্রকাশ্য যৌন হিংসা। শহরে মফস্বলে তারা যাচ্ছে সেখানেও তারা দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। শহর তাদের বদলে দিচ্ছে, তারা শহরকে বদলে দিচ্ছে। সমাজের নীচু তলার মেয়েরা যারা উচ্চশিক্ষায় আসছেন তাদেরেই বা কিভাবে দেখছে সমাজ, শহর? এই পারস্পরিকতার সঙ্গে সামাজিক বদল চলছে সমান্তরালে। এই শিক্ষাগত জগতের রূপান্তর সামাজিক বদল আনছে তার প্রভাব পড়ছে কি বাংলার সংস্কৃতিতে? সাহিত্যে সিনেমায় কিভাবে উঠে আসছে মেস, হস্টেল, মেয়েদের হস্টেলজীবন, হস্টেলের মেয়েরা, তাদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবন তাদের ছাত্র আন্দোলনে অংশ নেওয়া, তাদের স্বাধীন বিচরণ। সাহিত্য ও সিনেমা কিভাবে তাদের উপস্থাপন করছে, সমাজ তাদের কিভাবে দেখছে তার একটা ছাপ এর মধ্যে ধরা যায়। লিঙ্গ বৈষম্য ও আন্তঃস্তরবিন্যাস কিভাবে ধরা পড়ছে এই বিষয়কেন্দ্রিক সাহিত্য ও সিনেমায়। সমকাল শুধুমাত্র নথিপত্রে আর তথ্যে বিধৃত থাকে না। সাহিত্যে সিনেমায় সময়ের একটি ধারা ক্রিয়াশীল থাকে। নারীর উচ্চশিক্ষার সামাজিক প্রবহমানতার পাশে কিভাবে বাংলা সাহিত্যেও ধারাটি ক্রমে পুষ্ট হয়ে উঠেছে তার এক রূপরেখা পরিকল্পিত হল।

দুটি উপবিভাগে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। প্রথম অংশে শান্তিনিকেতনে মেয়েদের শিক্ষা ও হস্টেল নির্মাণের পরবর্তীতে বিশিষ্ট আবাসিকাদের তিনটি স্মৃতিকথার পর্যালোচনা। দ্বিতীয় অংশে সমসাময়িক কয়েকটি আবাসজীবন কেন্দ্রিক উপন্যাস ও স্মৃতিকথা আন্তঃস্তর বিন্যাস ভিত্তিক আলোচনা পদ্ধতিতে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অংশটি দুই ভাগে বিভক্ত। ক। শিক্ষিত আবাসিক নারীর

শিক্ষাজীবনের সমান্তরালে ব্যক্তিজীবনের আখ্যান— আবাসজীবন কেন্দ্রিক স্মৃতিকথা। খ। নারীর আবাসজীবন কেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাস— সামাজিক স্তরভিত্তিক ক্ষমতা কাঠামোর প্রতিফলন।

**শান্তিনিকেতনে নারীশিক্ষার প্রক্কালে আবাসিক নারীদের স্মৃতিকথা**

শান্তিনিকেতনে মেয়েদের শিক্ষার সূত্রপাত এবং মেয়েদের হস্টেল নির্মাণ সমসময় থেকে ধারাবাহিকভাবে স্মৃতিকথা লেখা হয়েছে, হয়ে চলেছে। তপতী মুখোপাধ্যায় এবং অমৃত সেন (2016) রবীন্দ্র সমকালের শান্তিনিকেতনের বিদূষী নারীদের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। যেখানে দেখা যাচ্ছে এই নারীরা কিভাবে রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নকে, পরিকল্পনাকে রূপ দিতে সহায়তা করেছিলেন এবং তাঁর আদর্শের সঙ্গে একাত্ম বোধ করেছিলেন। প্রথম যুগে শিক্ষায় এবং শান্তিনিকেতনের কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছিলেন মূলত উচ্চবিত্ত পরিবারের উচ্চবর্ণের নারীরা। তাঁদের স্মৃতিকথা থেকে স্পষ্ট হয় তাঁদের শ্রেণিগত, জাতিগত এবং  সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থান। একটি দীর্ঘ তালিকা করা যায় এই স্মৃতিকথার। প্রথম যুগের ছাত্রীদের স্মৃতিকথা থেকে নারীশিক্ষার প্রকৃতি, মেয়েদের হস্টেলের উল্লেখ ও বর্ণনা পাওয়া যায়। কয়েকটি স্মৃতিকথা উল্লেখ করা হল। 'ভরা থাক স্মৃতি সুধায়'- রমা চক্রবর্তী (৩০ শে শ্রাবণ, ১৪০৮), 'চলে যায় দিন'– অমিতা সেন (২০০১), 'রবীন্দ্র স্মৃতি' - চিত্রনিভা চৌধুরী, 'আমার শান্তিনিকেতনের দিদিরা'– কৃষ্ণা বসু (১৯৯৮), বানী নিয়োগী - 'শ্রীসদনের ইতিকথা', 'আনন্দ সর্বকাজে'– অমিতা সেন ( ১৯৮৩ সাল) 'সেকালিনীর আত্মকথা'–বাসন্তী বাগচী (২০০১), ইন্দিরা মৈত্র– 'শান্তিনিকেতনের স্মৃতিচারণ' 'আনন্দধারা'- কণিকা বন্দোপাধ্যায়, 'গুরুদেব'– রানী চন্দ (১৩৬৯), 'অনুজ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা ও অন্যান্য'– জয়ন্তী স্যান্যাল, 'আমাদের শান্তিনিকেতনে যা দেখেছি যা পেয়েছি'– জ্যোৎস্না বন্দোপাধ্যায় (১৩৯১), 'শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ'– প্রতিভা গুপ্ত, 'আমাদের শান্তিনিকেতন'– মহাশ্বতা দেবী (২০০১), 'সব হতে আপন' – রানী চন্দ, 'শিরিষ বকুল আমের মুকুল'– অমিতা সেন (২০০০), 'শান্তিনিকেতনে আশ্রমকন্যা' – অমিতা সেন, 'পঁচিশে বৈশাখ'–মৈত্রেয়ী দেবী, 'আবির্ভাব'– ইন্দিরা দেবী (১৩৬৮)। 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ' – রানী চন্দ (১৩৪৯),  'রবীন্দ্রনাথ শান্তনিকেতন ও আমরা'– নমিতা বসু। এই স্মৃতিকথাগুলি মূলত শান্তিনিকেতনের সঙ্গে লেখিকাদের লগ্নতার ইতিবৃত্ত। আবাসিকা হিসাবে, ছাত্রী হিসাবে এবং আবাসিকাদের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে তাঁদের অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি। সকলে রবীন্দ্র সান্নিধ্য না পেলেও যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন সেই পরম প্রাপ্তির কথা।

শান্তিনিকেতনে ছাত্রীজীবন এবং আবাসজীবন বিষয়ে প্রথম যুগের ছাত্রীরা অসংখ্য স্মৃতিকথা রচনা করেছেন। যেখানে উপজীব্য হয়ে উঠেছে তাঁদের শান্তিনিকেতনের সঙ্গে একাত্মতা, সম্পৃক্ততা এবং আত্মিক নৈকট্য। প্রথম যুগের ছাত্রীদের সকলেই ছিলেন বিখ্যাত এবং উচ্চবিত্ত পরিবারের নারী। শান্তিনিকেতনে পাঠলাভ সূত্রে তাঁরা এসেছেন এবং ধীরে ধীরে মহার্ঘ্য হয়ে উঠেছে তাঁদের আশ্রমবাসের দিনগুলি। তাঁদের স্মৃতিকথায় রবীন্দ্র সান্নিধ্যের সঙ্গে আবশ্যিক ভাবে এসেছে ছাত্রীনিবাসে বসবাসের কথা। অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে এসেছে শ্রীসদনের কথা, আশ্রমিক সত্তার সঙ্গে আবাসিকা সত্তাটি স্মৃতিকথা গুলিতে অনিবার্য ভাবে এসেছে। অমিতা সেন রবীন্দ্রসমকালে 'আশ্রমকন্যা'দের অনিবার্য

গুরুত্বের কথা বলছেন (সেন, ১৯৮৩) তিনি লিখছেন, “সেকালের সকল আশ্রমকন্যার স্মৃতির ভান্ডার ভরে আছে নানা অমূল্য তথ্য-কাহিনীতে। সকলের কাহিনী যোগে যে ইতিহাস রচনা হবে, শান্তিনিকেতনের সরকারী ইতিহাসের পাশে পাশে আশ্রমকন্যাদের সেই সব কাহিনীও গাঁথা হয়ে থাকবে” (সেন, ১৯৮৩, পৃ-৬)। শান্তিনিকেতনের আশ্রমকন্যা অমিতা সেনের জন্ম ১ লা শ্রাবণ, পিতা আচার্য ক্ষিতিমোহন, বিবাহ হয় বিজ্ঞানী আশুতোষ সেনের সঙ্গে। তাঁর ‘চলে যায় দিন’ লেখিকার সহজ প্রকাশভঙ্গীতে রচিত মানবতায় পূর্ণ স্মৃতির এক আশ্চর্য ইন্দ্রজাল (সেন, ২০০১)। বইটির ‘প্রাক-কথন’ লিখেছেন নবনীতা দেব সেন। এখানে নবনীতা দেব সেন লিখছেন

> সংস্কৃতির ইতিহাসে স্মৃতিকথার গুরুত্ব নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই, মেয়েদের স্মৃতিকথা থেকে সমাজের কয়েকটি বিশেষ দিককে চিনতে পারা যায়। পুরুষদের স্মৃতিকথায় যা সাধারণত থাকে না। এই স্মৃতিমালিকায় ঘর গৃহস্থালীর কথা নেই বটে – তবু এতে আছে আশ্রমের একটি নারীরই দৃষ্টিকোণ। আশ্রমবালিকা থেকে আশ্রমমাতা হয়ে ওঠা একটি মানুষীর অভিজ্ঞতার আয়নার ধরা পড়েছে আশ্রমের মানুষ ও জীবন। যদিও বিষয়বস্তু বিশেষভাবে “মেয়েলি” বলে চিহ্নিত নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু নজরটি, দৃষ্টিকোণটি তো এক আশ্রমবালার। নারীর নজরে আশ্রমজীবনের অনেকগুলি দিকের ছায়া পড়ে যা পুরুষের নজরে পড়ে না। যেমন, রোদে রং কালো হয়ে যাবে বলে মায়েরা মেয়েদের তাড়াতাড়ি আশ্রম থেকে সরিয়ে বাড়ি নিয়ে যেতেন বিবাহের প্রস্তুতিতে। (সেন, ২০০১)

বইটির ‘আমাদের আদরের পুপেদিদি’, ‘আশ্রমকন্যা ইন্দিরা’, ‘আশ্রমকন্যার অনুভূতিতে রবীন্দ্রনাথের নারী-ভাবনা’, ‘প্রীতিডোরে বাঁধা আশ্রমকন্যা আমরা’ ইত্যাদি প্রবন্ধ এবং নিবন্ধে অমিতা সেন শান্তিনিকেতনে আশ্রমকন্যাদের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। (সেন, ২০০০) শিরিষ বকুল আমের মুকুল’ এ অমিতা সেন শান্তিনিকেতনে তাঁর আরো বিস্তৃত অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধির কথা লিখেছেন। এই গ্রন্থে ‘নারীমুক্তি’, ‘লীলা মজুমদার’, ‘রানী চন্দ’, ‘আশালতা সেন’, ‘শ্রদ্ধেয়া বীণাদি’ ইত্যাদি রচনাংশে শান্তিনিকেতনে বিশিষ্টা নারীদের কথা লিখেছেন। কৃষ্ণা বসু “আমার শান্তিনিকেতনের দিদিরা” বইতে গৌরী ভঞ্জ, বীণা দে, রানী চন্দ, নিবেদিতা বসু, অমিতা সেন প্রমুখের স্মৃতিচারণ করেছেন (বসু, ১৯৯৮)। জোৎস্না বন্দোপাধ্যায় “আমাদের শান্তিনিকেতনে যা দেখেছি যা পেয়েছি’ (অখন্ড) (বন্দোপাধ্যায়, ১৩৯১) তে তাঁর শান্তিনিকেতনে পড়তে আসা এবং হস্টেলে শ্রীসদনে বসবাসের বর্ণনা দিয়েছেন,

> ... পরের দিন সকালে আমার বাক্স বিছানা সমেত আমাকে বাবা বোর্ডিং এ রেখে গেলেন। তখনকার সময় হেমবালা সেন ছিলেন আমাদের শ্রীভবনের সুপারেন্টেন্ডেন্ট এবং হিরণদি ছিলেন মেট্রন অর্থাৎ স্টোর, কিচেন ইত্যাদির সব ভার তাঁর ওপর ন্যস্ত ছিল। বাড়ীটা বেশ বড় এবং ঘরগুলোও কিছু ছোট নয়। আমাকে একতলার একটি ঘরে নিয়ে গেলেন হেমবালা দেবী।” (বন্দোপাধ্যায়, ১৩৯১, পৃ-১১)

তিনি শ্রীসদনে মেয়েদের সারাদিনের কাজকর্ম, খাওয়া, নিজে বাসন ধোয়া, বিকেলের উপাসনা, নিয়ম করে ক্লাশে যাওয়া, দশটায় ঘুমোতে যাবার ঘন্টা ও সকাল পাঁচটায় জাগার ঘন্টা বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। শ্রীসদনে অবসরের কথা তিনি লিখেছেন, "এখন বিশ্রামের সময় এক ঘণ্টা; কেউ বই পড়ে, কেউ সেলাই করে, কেউ চিঠিপত্র লেখে, আবার কেউ দিবা নিদ্রায় মগ্ন হয়। কিন্তু কেউ জোরে কথা বলে বা চেঁচামিচি করে হট্টোগোল করতে পারবে না। চুপচাপ থাকতে হবে যতক্ষণ না পড়ার ঘন্টা পড়ে। (বন্দোপাধ্যায়, ১৩৯১, পৃ-১৩) মহাশ্বেতা দেবী 'আমাদের শান্তিনিকেতন' (দেবী, ২০০১) গ্রন্থে 'তখনকার শ্রীভবন' রচনাংশে তাঁর শান্তিনিকেতনে আবাসজীবনের কথা লিখেছেন। তিনি ১৯৩৬ সালে দশ বছর বয়সে শান্তিনিকেতনে আসেন শ্রীসদনে আবাসিকা হয়ে। পরবর্তীতে পুনরায় বি এ পড়তে তিনি এসেছিলেন ১৯৪৪ সালে। তিনি লিখছেন, "তখনকার শ্রীভবনে সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটি হলঘর। সামনের বারান্দার ওপর দেওয়ালে আর হলঘরে (হলঘর মানে মস্ত ঘর) দেয়ালে চিত্র বা ফ্রেসকো আঁকা। একটি মেয়ে ফুল কুড়োচ্ছে, সে-ছবিটাই মনে আছে। ছাত্রীদের সঙ্গে কেউ দেখা করতে এলে ওই ঘরে বসতে হত, কথা বলতে হত" (দেবী, ২০০১, পৃ -১৯)

শ্রীসদনে দৈনন্দিনের বর্ণনা দিয়েছেন তিনি "শ্রীভবনে আমাদের খাটের সঙ্গে ছত্রি আঁটা। রাতে মশারি টাঙাতেই হবে। মাথার কাছে একটা টেবিল, তাতে বই খাতা পেন্সিল রাখো... শ্রীভবনে প্রত্যেকের বিছানার বেডকভার আশ্রমেরই তাঁতে বোনা, গাঢ় চকোলেট রং এর ওপর গেরুয়া ডোরা-কাটা, গেরুয়া পাড় দুদিকে" (দেবী, ২০০১, পৃ-২২)। তিনি আরো বর্ণনা করেছেন, "শ্রীভবনের ভেতরে (ছোটবেলায় চোখে) অনেকটা পাঁচিল-ঘেরা জায়গা। তার শেষে সার সার স্নানের ঘর আর উল্টো দিকে শৌচাগার।...আশ্রমের নিয়ম ছিল, রাত এগারোটায় বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে যাবে" (দেবী, ২০০১, পৃ -২০)। 'প্রত্যহ অবাক মানি' অংশে তিনি তাঁর সমকালের শ্রীসদনে দৈনন্দিনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন। আবাসিকাদের স্মৃতিকথায় শ্রীসদন এবং আবাসজীবন উঠে এসেছে আশ্চর্য বৈচিত্র্য সহ যেখানে একদিকে যেমন রয়েছে তাঁদের ছাত্রী ও আবাসিকা সত্তার উদযাপন অন্যদিকে নারীশিক্ষার সঙ্গে আবাসজীবনের ওতপ্রোত সম্বন্ধটিও সেখানে পরিস্ফুট হয়েছে। (দেবী, ১৩৬৮; চন্দ, ১৩৪৯) নারীর স্মৃতিকথার মধ্যে যে স্বাতন্ত্র্য নিহিত থাকে, তা পরিচয় ঘটায় ভিন্ন একটি বাস্তবতার সঙ্গে যে ভিন্নতা, দৃষ্টিকোণ জন্ম দেয় স্বাতন্ত্র্যের। একজন নারীর উপলব্ধিতে, দৃষ্টিতে যে বাস্তবতা ধরা পড়ে, যে অভিজ্ঞতার চিত্র ফুটে ওঠে তার ভিত্তিতে বোঝা যায় একজন নারীর ব্যক্তিগত বাস্তবতা, শ্রেণি, জাতিগত, আর্থ-সামাজিক অবস্থান।

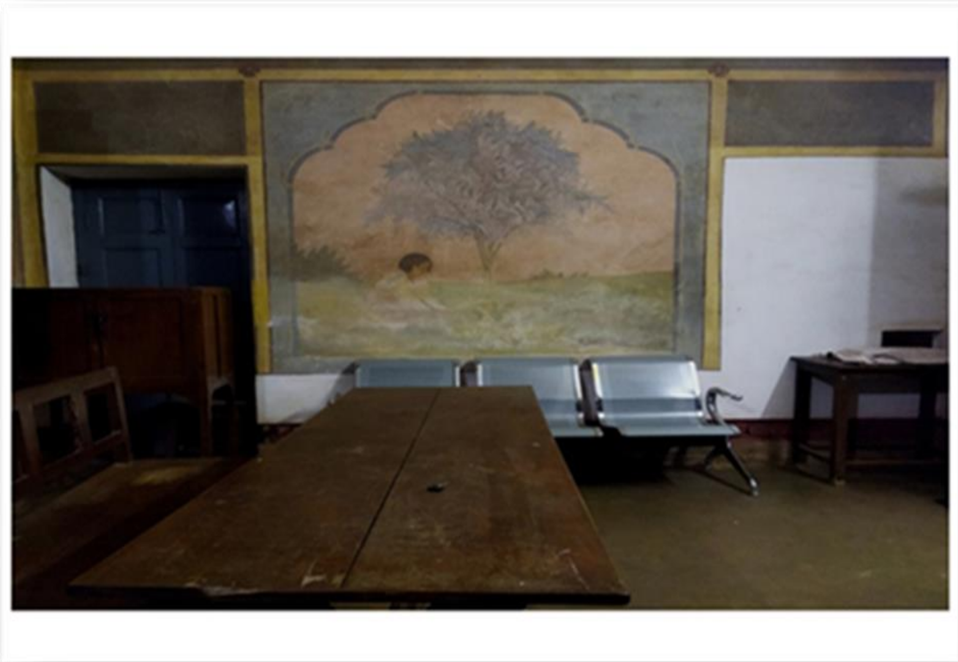

চিত্র- ৪২ স্মৃতিকথায় বর্ণিত শ্রীসদনের অতিথিশালার দেওয়াল চিত্র। ক্ষেত্রসমীক্ষাকালীন ছবি। নিজস্ব চিত্র।

এখানে দুটি স্মৃতিকথা আলোচনা করা হল –

**ক। ভরা থাক স্মৃতিসুধায়**

রমা চক্রবর্তীর 'ভরা থাক স্মৃতিসুধায়' (চক্রবর্তী, ১৪০৮) বইটি প্রকাশিত হয় ১৪০৮ সালে টেগোর রিসার্চ ইন্সটিটিউট থেকে। রমা চক্রবর্তী ১৯৩০ সালে শান্তিনিকেতনে আসেন, এই বইটিতে সেই সময়ে রবীন্দ্র সান্নিধ্যে তাঁর শান্তিনিকেতন বাসের কথা পাওয়া যায়। রমা চক্রবর্তী (মুখার্জী) ভাগলপুরের এক অভিজাত ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৯১৩ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা দেবতাচরণ মুখোপাধ্যায় অ্যাডভোকেট ছিলেন। স্বামী অনাথবন্ধু  চক্রবর্তী ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিক। তিনি রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও শিক্ষালাভ করেছেন ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বসু, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমিয় চক্রবর্তীর কাছে। তিনি লিখছেন,

> আমি সেখানে গিয়েছি কৈশোর পেরিয়ে যৌবনের উন্মেষ লগ্নে। থাকতাম আমাদের বোর্ডিং শ্রীভবনে কলেজের ছাত্রী রূপে... তখনও গুরুদেবকে কাছে পেয়েছি, তাঁর কাছে শিক্ষালাভ করেছি, তাঁর স্নেহলাভ করে ধন্য মেনেছি, সেইসঙ্গে কত জ্ঞানী, গুণী, গুরু স্থানীয়দের কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছি, আশ্রম-জননীদের স্নেহলাভ করেছি, প্রিয় বন্ধুদের প্রীতি-ভালোবাসায় মন ভরে উঠেছে। (চক্রবর্তী, ১৪০৮, নিবেদন অংশ, পৃ -৮)

তিনি লিখছেন "আজন্ম কালের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-পরিবারের প্রভূত আরাম-বহুল জীবনধারা পিছন দিকে একটুও টান দিল না, মন বিমুখ হলো না এই নতুন অভিনব জীবন পথে এগিয়ে যেতে। এ যেন metamorphosis! এ সবই সম্ভব হয়েছিল গুরুদেবের সান্নিধ্যে এসে তাঁর স্নেহলাভ করার

পরম সৌভাগ্য হয়েছিল বলে।” (চক্রবর্তী, ১৪০৮, নিবেদন অংশ, পৃ-৭) বর্ণনা থেকে উপলব্ধ হয়, তিনি ছিলেন ‘নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ’ এবং ‘আরাম-বহুল জীবন ধারা’য় অভ্যস্ত উচ্চবিত্ত পরিবারের একজন। রবীন্দ্র সমকালে একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ এবং উচ্চবিত্ত পরিবারের নারীর আবাসজীবনের অভিজ্ঞতা স্মৃতির বিশেষত্ব রয়েছে, ‘আরাম বহুলতা’ থেকে তিনি এসে পড়েছেন এমন এক জায়গায় যেখানে পরিষেবার নুন্যতম আয়োজন, যেখানে সাধারণত্বের মধ্যে অসাধারত্বের সন্ধান, যেখানে বিলাস, বৈভব, বিত্ত নিয়ে কেউ ভাবিত নয়, বরং সাধারণত্বের মধ্যেই নিহিত যাবতীয় মাধুর্য, সম্মান। এই বইতে ‘শান্তিনিকেতনের কথা’ প্রবন্ধে তিনি শ্রীসদন যার পুর্বে নাম ছিল শ্রীভবনে বসবাসের দিনগুলির স্মৃতিচারণ করছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন কিভাবে তাঁর জীবনের উন্মেষ লগ্নে, সে যুগের শান্তিনিকেতনের সামগ্রিক প্রভাব তাঁর সত্তাকে উদবুদ্ধ করে তুলেছিল। শ্রীভবন সম্বন্ধে তিনি লিখছেন, “আমাদের আবাসটির নামও ছিল কী সুন্দর– শ্রীভবন। তার দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় নিয়ম কানুন অবশ্যই ছিল, প্রথমে বেশ কঠিনও মনে হয়েছিল, কিন্তু অচিরেই বুঝতে পেরেছিলাম যে যেখানে এতগুলি মেয়ে থাকে, সেখানে সকলেরই পালনীয় কিছু নিয়ম কানুন না থাকলে চলবে কি করে।” (চক্রবর্তী, ১৪০৮, পৃ- ১-২) তিনি বর্ণনা করছেন, কিভাবে রবীন্দ্রনাথ যে আদর্শে আশ্রম গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, তারই সঙ্গে সংগতি রেখেই সে সব নিয়ম কানুন করা হয়েছিল। তিনি উল্লেখ করছেন, “তাঁর ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা ছিল শ্রীভবনের আদর্শ ও মর্যাদা রক্ষা করবে ছাত্রীরাই। নিয়ম কানুনও তারাই তৈরি করবে তাদের নিজেদের সুবিধার জন্য, সে নিয়ম বন্ধন হবে না। আরও বলেছিলেন তিনি, যে এখানে ছাত্রীদের সঙ্গে অধিকর্ত্রী ও অন্যান্য কর্মীদের সহৃদয় সম্পর্ক স্থাপন হওয়া চাই। সযত্নে, সুব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে নিজেদের মিলিয়ে নেওয়াই, শ্রীভবনে আমাদের শিক্ষার অঙ্গ ছিল।” (চক্রবর্তী, ১৪০৮, পৃ-২) শ্রীভবনের নিয়মাবলী সম্পর্কে দীর্ঘ বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, শ্রীভবনে ভোর বেলা ও সন্ধ্যের আগে উপাসনার ব্যবস্থা ছিল। ঘন্টা পড়লে সবাই সকল ছাত্রীরা এসে আসন পেতে শান্ত হয়ে বসতেন, ঘন্টা পড়লে উঠে দাঁড়িয়ে ‘ওঁ পিতা নোহসি পিতা নো বোধি’ শ্লোক উচ্চারণ। তিনি এই মন্ত্রপাঠ সম্পর্কে বলছেন, “এর তাৎপর্য অনস্বীকার্য। ছোটবেলা থেকে, অল্প সময়ের জন্য হলেও, শান্ত হয়ে বসে মনঃসংযোগ করায় অভ্যস্ত হলে, সারা জীবনই তার প্রভাব থেকে যায়।” (চক্রবর্তী, ১৪০৮, পৃ-২) তিনি আত্মিক উন্নতি এবং শান্তিনিকেতনের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছিলেন উপলব্ধ হয় বর্ণনা থেকে।

তাঁর বর্ণনা থেকে জানা যায়, শ্রীভবনে মেয়েরা স্বাবলম্বী হবার শিক্ষা পেতেন, তাদের সারাদিন পরিকল্পিত ছিল নির্দিষ্ট ছন্দে। রমা চক্রবর্তী লিখছেন,

> এখানকার নিয়ম মতো আমরাও নিজেদের সব কাজ নিজেরাই করতাম। ঘর ঝাঁট দেওয়া, বিছানা করা, কাপড়-চোপড় কাচা, নিজেদের ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখা, রান্নাঘরে গিয়েও কাজে হাত লাগানো, পরিবেশন করা – এ সবই আমাদের শিক্ষার অঙ্গ ছিল। ... সে সময় প্রত্যেকে অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিনে, রান্নাঘরের সব ভার মেয়েদের নিতে হত। রান্নাঘরের কাজের লোকেদের এমন কি পাচকদেরও ছুটি দেওয়া হত। প্রথমটা শুনে

> ঘাবড়ে গিয়েছিলাম স্বীকার করি। কিন্তু দেখলাম এ এক চমৎকার অভিজ্ঞতা। যাঁরা শ্রীভবনের ও রান্নাঘরের পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন (যেমন হেমবালাদি, সরোজিনীদি, হিরণদি প্রমুখ), তাঁদের তত্ত্বাবধানে সবই বেশ সুশৃঙ্খলায় হয়ে যেত...। বড়ো মেয়েরা রান্নার ভার নিত আর নবাগতারা তাদের সাহয্য করত।" (চক্রবর্তী, ১৪০৮, পৃ-২)

রবীন্দ্রনাথ আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন আশ্রমের মেয়েদের স্বাবলম্বিতা, পড়াশুনার সঙ্গে গৃহস্থালির কাজও তাদের শেখাতে চেয়েছিলেন। উচ্চবিত্ত পরিবার থেকে এসে দৈনন্দিন সব কাজ নিজে করতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন তিনি। অন্যের কাছ থেকে বা ভৃত্যদের কাছ থেকে পরিষেবা পাবার উপায় ছিলনা। এখানে রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় যে শ্রেণিসাম্য ছিল তা উপলব্ধ হয়। রমা চক্রবর্তী লিখছেন, "কলেজের মেয়েদের, আলাদা করে সপ্তাহে একদিন করে রান্না শিখতে হত। ক্লাসের ফাঁকে এসে আমরা কোনো একটা বিশেষ রান্না শিখতাম। হিরণদি ও সরোজিনীদি খুব যত্ন করে আমাদের রান্না শেখাতেন" (চক্রবর্তী, ১৪০৮, পৃ-৩)।

নারী স্বশক্তিকরণে, সার্বিক বিকাশে রবীন্দ্রচিন্তার যে প্রকার তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, "মেয়েরা যাতে সংসারের নানান কর্মে নিপুণ হয়ে ওঠে, প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে সমগ্ররূপে -ক্রমে যা সমৃদ্ধ করে তুলবে তাদের নারীসত্তাকে– সেই আদর্শই আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ। তিনি কত বড়ো সম্মান নারী জাতিকে দিয়ে গেছেন – বলতেন যেখানে শ্রী নেই ধরে নিতে হবে সেখানে নারী নেই।... গুরুদেব সর্বদা খোঁজ রাখতেন, নবাগতারা আশ্রম বিদ্যালয়ের আদর্শ গ্রহণ করতে পারছে কিনা" (চক্রবর্তী, ১৪০৮, পৃ-৩)। তিনি বর্ণনা দিচ্ছেন, পৌষ মেলায় ছেলেদের পাহারায় কিভাবে বাজি পোড়ানো দেখতে যেতেন। ছেলেরা নিত 'রক্ষক'এর ভূমিকা। রবীন্দ্রনাথের শ্রীভবন পরিদর্শনের ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন,

> গুরুদেব একবার বলে পাঠালেন, যে তিনি শ্রীভবনে আসবেন, বড়ো মেয়েদের ঘরে ঘরে যাবেন দেখতে যে তারা কেমন অতিথি অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা করতে পারে। আমাদের মধ্যে তো সাড়া পড়ে গেল – গুরুদেব স্বয়ং আসবেন আমাদের ঘরে। আমরা ঘর দুয়ার ঝকঝকে করে তুললাম, সাজানো গোছানো হল সুন্দর করে তবে বাড়াবাড়ি যাতে না হয় তাও দেখতে হবে।... গুরুদেব এলেন ঠিক সময়েই; সেদিন নীচের ঘরে বসবেন বললেন, পরের দিন ওপরে যাবেন। সেই ঘরের মেয়েরা তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেল, আপ্যায়নেরও ত্রুটি রাখল না, তিনিও সরস কথা বার্তায় সকলকে মুগ্ধ করে গেলেন। (চক্রবর্তী, ১৪০৮, পৃ-৭)

শান্তিনিকেতনে ছোরা খেলা, লাঠি খেলা ও জুজুতসু (জুডো) শেখানো হত। রমা চক্রবর্তী লিখছেন,

> ওখানে গিয়ে শুনেছিলাম যে জুজুৎসু শিখতে মেয়েরা সংকোচ করছে জেনে, গুরুদেব "সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান" গানটি রচনা করেছিলেন। মেয়েদের সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন...মেয়েরা স্বাবলম্বী হবে, আত্মনির্ভরশীল হবে গৃহ কর্মে নিপুণা হবে, বিদ্যাচর্চা, শিল্পচর্চা, নৃত্যগীত, অভিনয়, আবৃত্তি এ সবেও এই রকম বহুমুখী সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার

ব্যবস্থাই তিনি চেয়েছিলেন। তদুপরি তারা হবে সেবাপরায়ণা, অতিথিপরায়ণা, কাজে-কর্মে আচরণে, বেশভূষায় হয়ে উঠবে শ্রীমন্ডিতা... কে কতটা সাফল্য অর্জন করেছি সেটা বড় কথা নয়, এমন দুর্লভ সুযোগ তিনি যে মেয়েদের জন্য সে সময় করে দিয়েছিলেন, সেটাই বড় কথা।" (চক্রবর্তী, ১৪০৮, পৃ-১১)

রবীন্দ্র সমকালে শান্তিনিকেতনে জাতি বিচার সম্পর্কে তিনি দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তিনি লিখছেন কিভাবে তাঁরা জাত বিচার সম্বন্ধে এবং শ্রেণি বিভেদ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না একেবারেই। তিনি একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছেন, প্রথম দিনে রান্নাঘরে ঢুকে এক বিরাট লম্বা চওড়া চেহারার লোক দেখে অবাক হয়েছিলেন, তিনি ভাবেছিলেন, এমন পালোয়ানের মত লোক রান্নাঘরে কেন। পরে জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন, সে ছিল "দস্যু দলের বংশধর"। দস্যুরা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে মেরে লুটপাট করতে এসেছিল আর তাঁকে ছাতিমতলায় ধ্যানমগ্ন দেখে তাঁর পায়ের কাছে অস্ত্রশস্ত্র রেখে চুপ করে বসেছিল। মহর্ষিদেব যখন চোখ মেলে তাদের দিকে তাকালেন, তখন তারা তাঁর পায়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে আশ্রয় চেয়েছিল। সেই অনুগতদের লুপ্তপ্রায় বংশের একজন ছিল ঐ দশাসই লোকটি। তিনি লিখছেন,

জাতিতে সে ছিল ডোম। সে যুগে শান্তিনিকেতনের সমাজে তার সঙ্গে বা তাদের মতো সমাজের লোকেদের সঙ্গে, আচার ব্যবহারে কোনো রকম তারতম্য করা হত না। অবান্তর হলেও একটা কথা বলি যে ডোমেদের রন্ধন পটুতা যেন একটা বংশগত গুণ! সেকালে রতনকুঠিতে (বিশ্বভারতীর অতিথিশালা) যতগুলি সুপাচক ছিল, তারা সবাই জাতিতে ছিল ডোম এবং বংশপরম্পরা ক্রমে সুপাচক বলে পরিচিত ছিল তারা। তাদের আনুগত্য ও অতিথিপরায়ণতাও প্রবাদ হবার মত। (চক্রবর্তী, ১৪০৮, পৃ-১১)

তাঁর বর্ণনানুসারে শান্তিনিকেতনে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবার সঙ্গে সমান ব্যবহার করা হত, এবিষয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথকে লেখা অমিতা সেনের একটি চিঠির কথা উল্লেখ করছেন যেখানে তিনি বর্ণনা করেছেন শান্তিনিকেতনের সৌহার্দ্য পূর্ণ সমাজ বন্ধনের কথা। অমিতা সেন রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন

এখানে তো মানুষে মানুষে বাইরের কোন সমাজ জাতি ধর্ম আচার ব্যবহার বা আর কিছুর জন্যই তফাৎ রাখা হয় নি। ... যে শান্তি এখানে আকাশে বাতাসে ব্যাপ্ত হয়ে আছে, যে উদার মুক্ত ভাব এখানকার ছেলে-মেয়েদের হাসিতে খেলায়, গানে আমোদে-প্রমোদে তাদের দৈনন্দিন জীবনে ছড়িয়ে আছে, পৃথিবীর সব মানুষ কি ব্যাকুল হয়ে তাকেই প্রার্থনা করছে না? তারই জন্য কি সমস্ত মানবাত্মা আকুল হয়ে নেই?" (চক্রবর্তী, ১৪০৮, পৃ-১২)

১৯৩৯ সালে রমা চক্রবর্তী আবার শান্তিনিকেতনে অমিতা সেনের কাছে শ্রীভবনে (ততদিনে শ্রীসদন নামকরণ হয়েছে) এসেছিলেন। আজীবন শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র থেকে গেছিল।

এই স্মৃতিকথা থেকে মূলত বোঝা যায়, একজন উচ্চবর্ণীয়, উচ্চবর্গীয় নারী রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে এসে আবাসিকজীবনে হয়ে উঠেছিলেন আশ্রমকন্যা, পরিবারের সংস্কার, পরিবারের সুখ আরাম ছেড়ে কাজের মধ্যে, সবার মধ্যে আনন্দকে পাথেয় করেছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতায় ধরা পড়েছিল

শ্রীসদনের ‘সাধারণ’ অনাড়ম্বর জীবন, মেয়েদের মধ্যে সহিতত্ব, দৈনন্দিন কাজের মধ্যে আনন্দের উৎসার এবং শ্রেণি, বর্ণ, জাতি ব্যতিরেকে আশ্রমের একটি শ্রেণি এবং লিঙ্গসাম্যের চিত্র।

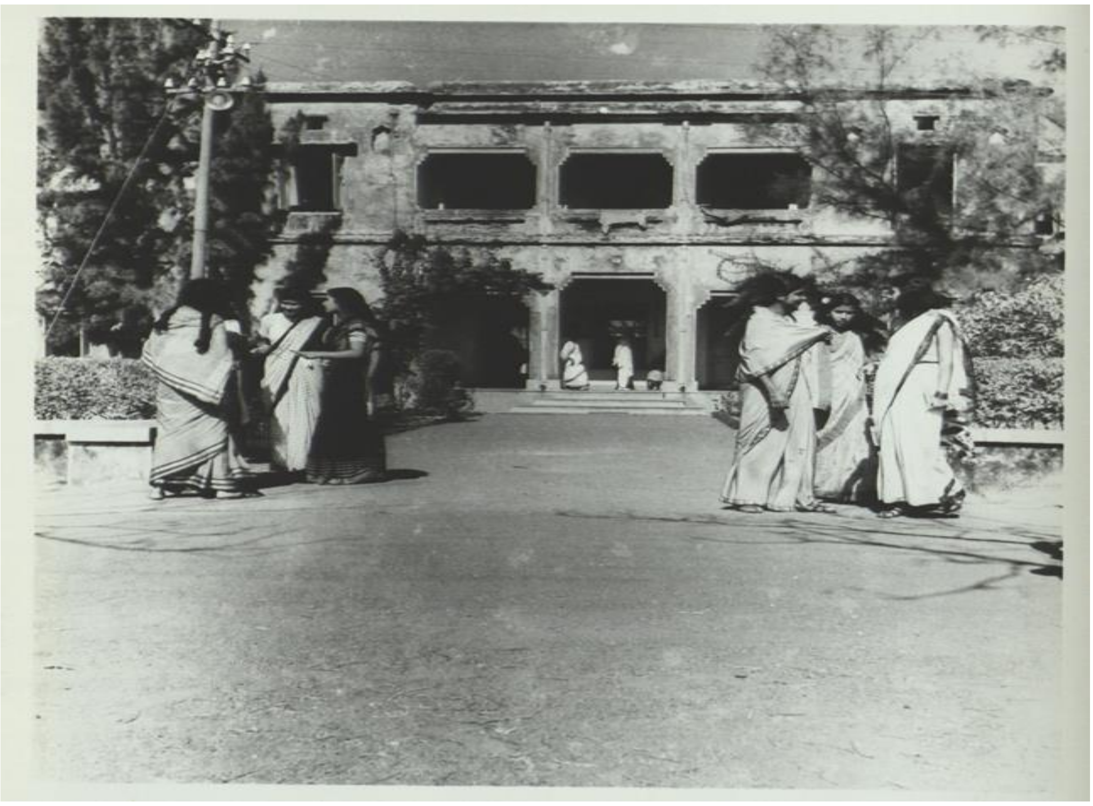

চিত্র – ৪৩ স্মৃতিকথাটির আধার, শ্রীসদন, শম্ভু সাহার তোলা ছবি, রবীন্দ্রভবন ছবি সংগ্রহশালা থেকে সংগৃহীত।

**খ। সব হতে আপন**

রানী চন্দের ‘সব হতে আপন’ (চন্দ, ১৪০১) প্রকাশিত হয় ২৫ বৈশাখ ১৩৯১। এখানে পৌষ ১৪০১ সংস্করণটি ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকাশক বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। রানী চন্দ গ্রন্থটি তাঁর স্বামী অনিলকুমার চন্দকে উৎসর্গ করেছেন। রানী চন্দের পিতার মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সহায় হয়েছিলেন। এপ্রসঙ্গে তিনি ‘সব হতে আপন’ গ্রন্থে লিখছেন, “... বললেন, নাঃ, অনেকখানি সময় তোদের নষ্ট হয়েছে, আর নয়। ... আমরা তখন কলকাতায়, গুরুদেব বললেন, ঠিক আছে, আমি ভার নিলাম। মাকে বললেন, শান্তিনিকেতনে এসো ছেলে মেয়েদের নিয়ে কোনো ভয় ভাবনা নেই।” (চন্দ, ১৪০২, পৃ -১)

রানী চন্দ (চন্দ, ১৪০১) তাঁর শান্তিনিকেতনে আসা, কলা ভবনে পাঠ লাভ, রবীন্দ্রনাথের নিকট সান্নিধ্য এবং ‘শ্রীভব’নে যাওয়ার বর্ণনা দিচ্ছেন “... গুরুদেব শ্রীভবনে খবর পাঠিয়ে দিলেন, হেমবালাদি এলেন, গুরুদেব তাঁর হাতে আমাদের সঁপে দিলেন...গুরুদেব বললেন, রোজ একবার করে এসে খবর বলে যাবি...। রাত কাটল। এই টুকু সময়ের মধ্যেই জানা হয়ে গিয়েছিল শ্রীভবনের নিয়ম কানুন।” (চন্দ, ১৪০২, পৃ -৪) তিনি শ্রীভবনে তাঁর আবাস জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন। কিভাবে অন্ধকার থাকতে উঠে লণ্ঠনের আলোয় বিছানাপত্র ঝেড়ে, ঘর ঝাঁট দিয়ে একেবারে স্নান

সেরে আসতে হত, চৌবাচ্চায় জল ভরে রাখত সাঁওতাল মাঝি – সেই জলেই আবাসিকাদের সারাদিন চলত... হিসাব করে জল খরচ করতে হত। তিনি তৎকালে শান্তিনিকেতনে জলের সংকটের কথা জানাচ্ছেন। তিনি আরো লিখছেন, "শ্রীভবনে এসে ঘর হতে কাঁসার থালা বাটি গেলাস হাতে রান্নাবাড়ি এলাম। উঁচু নিচু লম্বা দুটো বেঞ্চ। নিচু বেঞ্চিটায় বসে উঁচুটায় থালা রেখে খেতে হয়।... মেয়েরা মেয়েদের দিকে, ছেলেরা ছেলেদের দিকে পরিবেশন করল। বলল–তোমাদেরও পালা আসবে পরিবেশন করবার। দেখে রাখো ভালো করে কিভাবে কী করতে হয়" (চন্দ, ১৪০২, পৃ -৭)। তাঁর লেখা থেকে আরো জানা যাচ্ছে –

> এখন শ্রীভবনে কত মেয়ে, কয়েক শত তো হবেই। শ্রীভবন নাম বদলে হয়েছে শ্রীসদন। একা শ্রীসদন স্থান দিতে পারে না সবাইকে, বিড়লালয়, মৃণালিনী গোয়েংকালয়, আনন্দসদন – কত সদন, আলয় গড়তে হল, আরো হয়তো হবে ভবিষ্যতে। আমাদের কালে এক শ্রীভবনই মনে হত বিরাট এক প্রাসাদ। মনে হত এর সব ঘরগুলি যদি ভরে যায় কোনোদিন – না জানি কি ব্যাপার হবে তখন। একটি দুটি করে মেয়ে আসত, তাও রোজ নয়। নতুন মেয়ে এসেছে, গেটের কাছে তার মালপত্র নামানো হচ্ছে, আমরা ছুটে সবাই আসতাম, নিজেরাই ধরাধরি করে তার বাক্স বিছানাটা তুলে ভিতরে আনতাম। কোন ঘরে তার স্থান হবে জেনে নিয়ে নিজেরাই নতুন মেয়ের হোল্ডটা খুলে বিছানাটা পেতে ফেলতাম। দল বেঁধে তার সঙ্গে ঘুর ঘুর করতাম, কোথায় স্থানের ঘর, কোথায় রান্নাঘর সব বুঝিয়ে দিতে সময় লাগত না। নতুন মেয়ে আসার আনন্দই ছিল আলাদা। সেই দিনেও দেশী বিদেশী মেয়ে বলে কোনো পার্থক্য ছিল না আমাদের মনে। সবাই ছিলাম একই গোষ্ঠীর। (চন্দ, ১৪০২, পৃ -৬৮)

তিনি শান্তিনিকেতনের সেই যুগের কথা লিখছেন যখন একজন দুজন করে মেয়েরা আসত হস্টেলে। শ্রীসদনের সব ঘর গুলি পর্যন্ত আবাসিকায় ভরে ওঠে নি। রবীন্দ্রসান্নিধ্যে মেয়েদের আবাসজীবনের কথা তিনি লিখছেন নিজের স্মৃতিকথা সহ। লিখছেন আশ্রমের মেয়েদের স্বাবলম্বীতা ও কায়িক শ্রমের কথা "আশ্রমে সব কাজই আমরা নিজের হাতে করি – কয়লা ভাঙা থেকে ফুলদানিতে ফুলসজ্জা অবধি। লোক রাখবার সামর্থ্য নেই। ... বড়োজোর একটি সাঁওতালি বা বাঙালি ঠিকে মেয়ে রাখি, উঠোন ঝাঁট দেয়, বাসন মাজে, ঘর মুছে দেয়, চলে যায়" (চন্দ, ১৪০২, প -৬০)। হাসপাতাল তখনও সক্রিয় ভাবে গড়ে ওঠে নি। ছেলেদের অসুখ হলে তারা যেত হাসপাতালে। রানী চন্দ লিখছেন – "মেয়েদের অসুখবিসুখ হলে শ্রীভবনেই থাকত। ছোটো মেয়েদের ভার নিয়ে যিনি থাকতেন তিনি দেখতেন, বড়ো মেয়েরা দেখত" (চন্দ, ১৪০২, পৃ -৬৩)। হস্টেলের বড় মেয়েরা দেখবহাল করত ছোট মেয়েদের, এই ভগ্নীত্বের বোধ শ্রীসদনের আবাসজীবনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তিনি ছাত্রীনিবাসের পরিচ্ছন্নতা ও শৌখিনতার কথা লিখছেন, "সহজ সুন্দর পরিচ্ছন্নতা শ্রীভবনের ঘরে ঘরে তখন বিরাজ করত। ক্রিশ্চান বসনেক (ছাত্রীদের দেখাশোনার ভার ছিল তাঁর ওপর) আমাদের সঙ্গে এমন ভাবে মিশে গিয়েছিলেন – তাঁকে ছাড়া আমাদের পরিবার পূর্ণ হত না, এখনো হয় না" (চন্দ, ১৪০২, পৃ -৭৪)। 'সব হতে আপন' গ্রন্থের প্রথম অংশে তিনি শ্রীসদনে তাঁর আশ্রম জীবন এবং আবাসিক

জীবনের বর্ণনা দিয়েছেন। কিভাবে তিনি উদযাপন করেছেন দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, আনন্দ, কাজকর্মের মাধ্যমে স্বাবলম্বিতা, আশ্রমের বয়োজ্যেষ্ঠোদের স্নেহাশ্রয়। তিনি উল্লেখ করেছেন জাপানী হেলিসানের কথা –

> শ্রীভবনে ছিলাম যখন – কয়টিই বা মেয়ে ছিলাম আমরা, তারই মধ্যে বিদেশিনী ছিল বেশ কয়েকজনা। জাপানী মেয়ে হোলিসান ছিল তখন আমাদের সঙ্গে। আমাদের চেয়ে বয়সে একটু বড়োই ছিল সে। হাসিখুশি ধীর শান্তগতি সবই করে, সবই বলে – তবু গাম্ভীর্যের একটা স্নিগ্ধ সুষমা ছিল হোলিসানকে ঘিরে। কলাভবনের ছাত্রী। হোলিসানের কাছে আমরা প্রথম জাপানী প্রথায় ফুল সাজানো শিখি। (চন্দ, ১৪০২, পৃ-৬৭)।

শ্রীভবনের আরেক বার্মিজ আবাসিকার কথা তিনি লিখছেন, "শ্রীভবনে আমাদের ঘরটা ছিল লম্বা ধরনের। ছয়জন থাকতাম একটা ঘরে। সেই ঘরে থাকতে এলেন এক বর্মিজ মহিলা। আমাদের চেয়ে অনেক বড়ো বয়সে। তখনকার দিনে ডিগ্রি ডিপ্লোমার এত আয়োজন ছিল না। ছাত্রছাত্রীরা, বিশেষ করে মেয়েরা যে-কোনো বিভাগে পছন্দমত ক্লাশে যোগ দিতে পারত" (চন্দ, ১৪০২, পৃ -৬৮)। রানী চন্দ বর্ণনা করছেন কিভাবে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল শ্রীসদন। আগ্রা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক থেকে গুরুদেবের নামে আওয়াগড় থেকে একলক্ষ পঁচিশ হাজার টাকার চেক আসার ঘটনা সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন, বিশ্বভারতীর দুঃসময়ে আওয়াগড়ের রাজবাহাদুরের দান কাজে লেগে ছিল শ্রীসদনের পরিধি বাড়তে। তিনি উল্লেখ করেছেন "এই টাকা দিয়ে শ্রীভবনের অনেকগুলি ঘর বাড়ানো হল" (চন্দ, ১৪০২, পৃ -১৯২)।

'সব হতে আপন' গ্রন্থে রানী চন্দ তাঁর কলাভবনে পাঠগ্রহণকালীন শান্তিনিকেতনে আশ্রম জীবন তথা শ্রীভবনে আবাস জীবনের আনন্দ উচ্ছ্বাস, গভীর লগ্নতার কথা বর্ণনা করেছেন। একজন উচ্চবিত্ত ছাত্রী যিনি সদ্য পিতা হারিয়ে রবীন্দ্র সান্নিধ্যে শান্তিনিকেতনে এসে দেশি বিদেশী ছাত্রীদের সঙ্গে একত্র বাস করছেন শ্রীসদনে, নিত্য নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছেন, উদ্ভাসিত হচ্ছেন অভিনব অভিজ্ঞতায়। পাঠগ্রহণ, জীবনযাপন যেখানে একাকার হয়েছে, নিজেকে তিনি আবিষ্কার করেছেন সকলের মধ্যে একজন হিসাবে, স্বতন্ত্র অথচ সংযুক্ত সত্তায়। শান্তিনিকেতনের সজীব সত্তাকে, শ্রীসদনে মেয়েদের একত্রবাসের আবাসজীবনকে তিনি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন যার ছাপ স্মৃতিকথাটির সর্বত্র। শিক্ষিত নারী মানস তৎকালের শান্তিনিকেতন, সদ্য গড়ে ওঠা ছাত্রীনিবাসকে যেভাবে দেখেছিলেন, গ্রহণ করেছিলেন, একাত্ম হয়েছিলেন তার একটি দলিল এই বইটি।

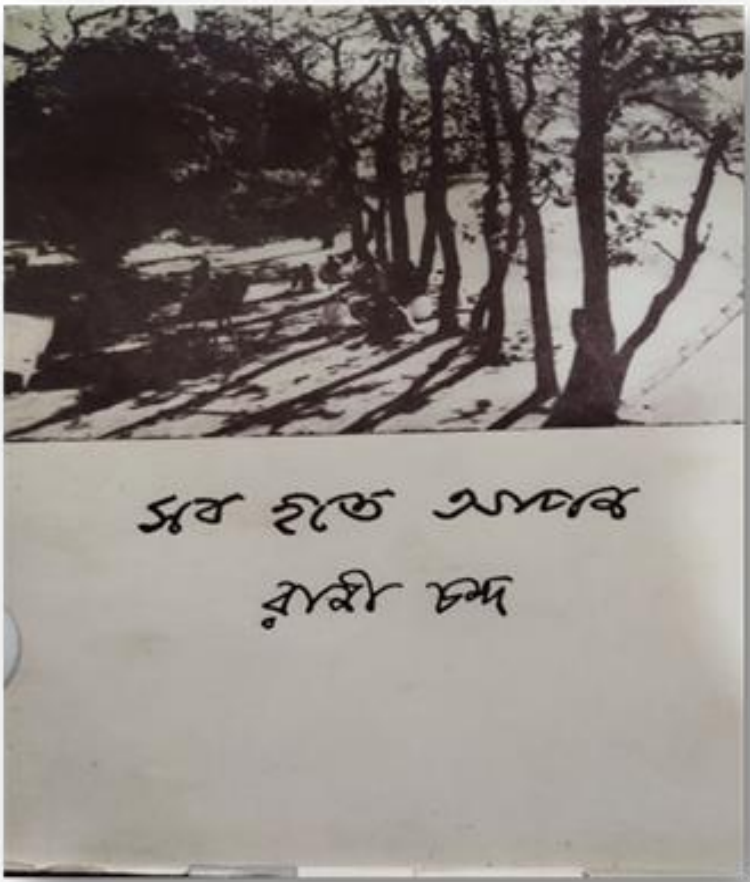


চিত্র – ৪৪ 'সব হতে আপন' বইটির প্রচ্ছেদ।

তিনি শ্রীসদনের রবীন্দ্রনাথের আগমনের কথা বর্ণনা করেছেন। তাঁর উপলব্ধি, সব কিছুর কর্মের সাফল্যে রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন নারীর হৃদয় ও তাদের কল্যাণহস্তের স্পর্শ। 'গুরুদেব' গ্রন্থে রানী চন্দ আরো লিখছেন,

> শ্রীভবন মেয়েদের নতুন হোস্টেল, সেখানে থাকি। গুটিকয়েক মেয়ে মাত্র সেখানে। যেবার বাড়তে বাড়তে চল্লিশটি মেয়ে হল – কি আনন্দ আমাদের! গুরুদেবকে গিয়ে বলি, আজ আরো দুটি মেয়ে এল গুরুদেব, শ্রীভবনে। গুরুদেবও খুশি হন শুনে। সেই শ্রীভবন এখন শ্রীসদন – বিরাট প্রাসাদ; কত শত মেয়ের বাস। শ্রীভবনে হেমবালাদি থাকেন আমাদের নিয়ে। কিন্তু আমরা জানি গুরুদেবই আছেন আমাদের নিয়ে। (চন্দ, ১৩৬৯, পৃ -১৬)

চিত্র – ৪৫ বিশ্বভারতীর প্রথম মেয়েদের হস্টেল শ্রীসদনের ছবি। শম্ভু সাহার তোলা ছবি, রবীন্দ্রভবন ছবি সংগ্রহশালা থেকে সংগৃহীত।

**‘শিক্ষিত’, ‘আবাসিক’ নারীর শিক্ষাজীবনের সমান্তরালে ব্যক্তিজীবনের আখ্যান**

**অ। আবাসজীবন কেন্দ্রিক স্মৃতিকথা**

স্মৃতিকথা একান্তই বাস্তবনিষ্ঠ সাহিত্য, এখানে একদিকে যেমন প্রকৃত বাস্তবের উপাদান থাকে অনেক বেশী অন্যদিকে লেখকের উপলব্ধি, আত্মাবিষ্কারের ও প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। দুটি স্মৃতিকথা এখানে আলোচিত হয়েছে। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও শান্তিনিকেতনে মেয়েদের আবাসজীবন নিয়ে বহু সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। একই ভাবে বেশকিছু স্মৃতিকথা লেখা হয়েছে। গল্প, উপন্যাসে উঠে এসেছে শান্তিনিকেতনের আবাসজীবনের কথা। এই স্মৃতিকথাগুলির সাহিত্য হিসাবে গুরুত্বের সঙ্গে সঙ্গে শান্তিনিকেতনে মেয়েদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ, উচ্চশিক্ষালাভ এবং আবাসজীবনের ছবি গুলিও দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে এই স্মৃতিকথা গুলির হাত ধরেই। প্রথম অধ্যায়ে শিক্ষা সূচনার প্রেক্ষাপট বিষয়ে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে কয়েকটি স্মৃতিকথার আন্তঃস্তরবিন্যাস ভিত্তিক পাঠ নেওয়া হয়েছে। দুটি স্মৃতিকথা যথা অহনা বিশ্বাসের ‘মেয়েদের হস্টেলজীবন- অন্দরের কথামালা’ (অহনা, ২০০৯), রিতা বসুর ‘শ্রীসদনের শ্রীমতীরা’ (বসু, ২০১৬) এবং দুটি উপন্যাস যথা অহনা বিশ্বাসের ‘আরশী নগরে তাবু’ (অহনা, ২০০০), তিলোত্তমা মজুমদারের ‘চাঁদের গায়ে চাঁদ’ (মজুমদার, ২০০৩) এখানে আলোচিত হল।

**ক। মেয়েদের হস্টেলজীবন; অন্দরের কথামালা - একটি আন্তঃস্তর ভিত্তিক পাঠ**

'মেয়েদের হস্টেলজীবন; অন্দরের কথামালা' (২০০৯) বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় আগষ্ট ২০০৯ সালে। গাংচিল প্রকাশনী থেকে। অহনা বিশ্বাস ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯৬ এই দশকটি পড়াশুনা সুত্রে থাকতেন  বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন হস্টেলে। এটি মূলত একটি স্মৃতিকথাধর্মী গ্রন্থ। বইটির শেষ অংশে লেখিকা জানাচ্ছেন "১৯৮৬ থেকে ১৯৯৬, এই দশ বছর কেটেছে শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন হস্টেলে। এই 'সত্যি গল্পগাথাগুলির' সেখানেই জন্ম, সেখানেই মৃত্যু। আমি কেবল স্মৃতি হাতড়ে পুনর্জন্ম দিলাম। এখানে পাত্রী এবং পাত্রদের নাম কাল্পনিক।" (বিশ্বাস, ২০০৯,পৃ -১৫৯) এই স্মৃতির 'পুনর্জন্ম'এর মধ্যে প্রকাশিত হয় লেখিকার শ্রেণি, জাতি এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থান। এই বইটি এমন একটি আত্মবিবৃতি যার কথাশিল্প হিসাবে গুরুত্ব রয়েছে আবার অন্যদিকে অন্বিত হয়ে আছে সমাজ বাস্তবতা অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে। বয়ঃসন্ধি থেকে ব্যক্তিত্বনির্মাণের ধারাবাহিক কাহিনীতে বইটি সমৃদ্ধ। লেখিকার বর্ণনায় ফুটে উঠেছে সমাজ মনস্তত্ত্ব, তিনি বর্ণনা দিচ্ছেন কিভাবে বাড়িতে বড় হওয়া ও বাড়ির নিয়ন্ত্রণের বাইরে বড় হওয়া ভিন্ন, কিভাবে আবাসিকারা সমঝোতা তৈরি করে নিজের সঙ্গে, নিজের বিকশিত যৌনবোধের সঙ্গে, পারিপার্শ্বের সঙ্গে, দুই ক্ষেত্রে মোকাবিলা ভিন্ন। হস্টেলের মেয়েদের দিনযাপনের গল্পগুলি এখানে সুললিত ভাবে বিধৃত হয়েছে। আশি-নব্বই দশকের সন্ধিক্ষণে একজন আবাসিকের চোখে দেখা শান্তিনিকেতনের হস্টেল যাপনের নিরাবরণ চিত্রমালা এই বইটি। লেখিকা বইটি উৎসর্গ করেছেন "হারিয়ে যাওয়া বন্ধুদের যারা আজ নক্ষত্রের মত দূরতম।" শুরুতেই তিনি উল্লেখ করেছেন "যে কৌশোর যৌবনের সন্ধি ক্ষণে হস্টেলে ঢুকেছিলাম, আর প্রায় দশবছর পর ঝানু হয়ে সেখান থেকে বের হয়েছিলাম" (বিশ্বাস, ২০০৯, পৃ -৭)। 'ঝানু' শব্দটির অর্থ হল অভিজ্ঞ। হস্টেলে নানা জায়গার নানা স্বভাবের সমবয়সীদের সাথে বন্ধুত্বে সংঘাতে, প্রাত্যহিক বোঝাপড়ায় মেয়েরা সমঝোতা শেখে, কোন অনুকুল বা প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে শেখে। তিনি লিখছেন "বন্ধুত্ব হতে থাকে, ভাঙতে থাকে। কখনো মনে ধাক্কা পাই, কখনো সব ঝেড়েঝুড়ে একসঙ্গে ফূর্তি করি। ওদের সুরের সঙ্গে আমার বেসুরো কন্ঠ মিলিয়ে দিই। ভালোবাসি, ভালোবাসা পাই, ভালোবাসতে শিখি। আসলে বড় হতে শিখি" (বিশ্বাস, ২০০৯,পৃ -৯)। তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন হস্টেলের ছাত্রীদের সামগ্রিক সামাজিক অবস্থানগত চরিত্র। সামাজিক স্তরের ভিন্ন অবস্থান থেকে, শ্রেণি, জাতি, বর্ণগত ভাবে ভিন্ন অবস্থানের ছাত্রীরা হস্টেলের একজায়গায় বাস করতে শুরু করে। তিনি লিখছেন,

> নানা জায়গা থেকে নানা পরিবার থেকে নানা উদ্দেশ্যে মেয়েরা হস্টেলে এসে জড়ো হয়। হস্টেলে এসেই প্রথম উপলব্ধি করি প্রতিটা মেয়েই আলাদা আলাদা পরিবার থেকে এসেছে। প্রত্যেক পরিবারের খাওয়া দাওয়া, আচার আচরণ এমনকী জীবনের আদর্শও ভিন্ন। তবু একসঙ্গে এতগুলো মেয়ের থাকা, পারস্পরিক প্রভাব এটিও কম কথা নয়। (বিশ্বাস, ২০০৯, পৃ -১০)

আন্তঃস্তর বিন্যাসের লেন্স থেকে দেখলে এই 'নানা জায়গা', 'নানা পরিবার' এবং 'নানা উদ্দেশ্যে' আসা ছাত্রীদের সামাজিক অবস্থান চিহ্নিত করা যায়। স্পষ্ট হয়ে ওঠে কেন তাদের 'খাওয়া দাওয়া', আচার আচরণ' এবং 'জীবন আদর্শ' আলাদা। হস্টেলের এই বিমিশ্র দলটি গড়ে উঠতে সময় লেগেছিল অনেক। শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের 'উচ্চবিত্ত' নারীদের থেকে ধীরে ধীরে এই 'নানা পরিবার, 'নানা জায়গা', 'নানা উদ্দেশ্যে' আসা ছাত্রীদের বৈচিত্র্য তৈরি হতে দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়েছিল।

লেখিকার হস্টেলের 'ব্যক্তিগত পরিসর' এর একটি অনুপুঙ্খ বর্ণনা পাই— "একটি বেডের ডর্মেটরি। দুটো বিছানার মাঝে এক হাত জায়গা আর পাওয়া গেল তিন তাকের জিনিসপত্র রাখার একটি টেবিল" (বিশ্বাস, ২০০৯, পৃ -৮)। শুরুতে তিনি থাকতেন শ্রীসদন হস্টেলে। তিনি জানাচ্ছেন কিভাবে এই সামান্য উপকরণটুকুও একেবারে নিজস্ব হিসাবে পেয়ে এক অদ্ভুত অনুভূতি হয়। তৈরি হয় একান্ত নিজস্ব কিছু লাভ করার মত আনন্দ। পরিবারের বাইরে এসে নিজস্ব শর্তে 'ব্যক্তিগত' পরিসর লাভের আনন্দ। লেখিকার সঙ্গে বান্ধবীটি না থাকতে পেরে বাড়ি চলে গেলেও তাঁকে থেকে যেতে হল, "কিন্তু আমার তো ফিরলে চলবে না। অনেক দুরের পথ আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। আমাকে হস্টেলেই ফিরতে হয়" (বিশ্বাস, ২০০৯, পৃ-৯)। এই 'দূরের পথের হাতছানি' তে নারী উচ্চশিক্ষার হাত ধরে বহুপথ অতিক্রম করেছে। হস্টেল সেখানে একটি প্লাটফর্ম যেখান থেকে বহু দূরের কথা ভাবা যায়, বহুদূরকে দেখা যায়। একজন নারীর কাছে এই 'দূর' একদিকে যেমন স্থানিক, গতিশীলতার ছাড়পত্র তারা পায় উচ্চশিক্ষার হাত ধরে তেমনি এই 'দূর' সমাজের তৈরি করে দেওয়া মানসিক সীমা থেকেও অনেক বিস্তৃতির দিশা নিয়ে আসে। জীবনে কিছু করার, প্রতিষ্ঠিত হবার, ইচ্ছা নিয়ে মেয়েরা হস্টেলে আসে। প্রত্যেকেই বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে কয়েক বছর যাপন করতে আসে। লেখিকাও এসেছিলেন। তিনি জানাচ্ছেন, এখানে বহু মেয়ে আছে যারা হয়তো ক্লাশ টুতে এসেছে হস্টেলে, আর বের হচ্ছে গবেষণা শেষ করে, এক একজন হয়তো দীর্ঘ কুড়িবছর হস্টেলে আছে। হস্টেলের সঙ্গে তারা এমন একাত্ম তারা হস্টেলের জীবন তাদের কাছে এমন স্বস্তিদায়ক যে বাড়িতে বেশিদিন থাকতে পারে না। হস্টেলজীবন তাঁর জীবনে ও চেতনায় ফেলেছিল উল্লেখযোগ্য প্রভাব। তিনি দেখেছেন কিভাবে ছোটখাট ঘটনা পরম্পরা সমস্তই কিশোরী মনকে প্রভাবিত করে খুব গভীর ভাবে। হস্টেলজীবন বর্ণনার সাথে সাথে শান্তিনিকেতনের নানা উৎসব অনুষ্ঠানের প্রভাব পড়ত হস্টেলে তার বর্ণনার করেছেন। বসন্ত উৎসব, আনন্দবাজার, নন্দনমেলা, পৌষমেলা ইত্যাদি। হস্টেলের ছাত্রীদের এই বৈচিত্র্যপূর্ণ দল এবং তাদের বহুত্বের মধ্যে বহুত্বের উদযাপন তিনি বর্ণনা করেছেন যেভাবে তাতে সামাজিক আন্তঃস্তরের একটি সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁর বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে, হস্টেলে সকল বন্ধু মিলে একসঙ্গে অনুষ্ঠানের জন্য সাজগোজ করছে। যে ভাল চুল বাঁধতে পারে সে সকলের চুল বেঁধে যাচ্ছে। যে ভাল করে শাড়ি পরাতে পারে তার কাছে শাড়ি পরার লাইন লেগে যাচ্ছে। তিনি উপলব্ধি করেছেন কিভাবে এইসব ছোটছোট পারস্পরিকতা গভীর ভাবে প্রভাব ফেলে। তাঁর অভিজ্ঞতার মধ্যেও ছিল, কিভাবে হস্টেল এমন একটি জায়গা হয়ে ওঠে যেখানে নারী তার নিজের ইচ্ছা বলবৎ করার অবকাশ পায়। বাড়িতে বাবা দাদা কাকা দের মধ্যে

যথেষ্ট পোশাক পরে থাকতে হয়। সব পরিবারের মেয়েদের জন্য নিজস্ব রুম থাকে না। বয়ঃসন্ধির পর ছেলেদের জন্য নিজস্ব ঘর বরাদ্দ হলেও অনেকক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য এ ব্যবস্থা থাকে না। দারিদ্র্য এর একটি কারণ হলেও আসলে মেয়েদের জন্য 'প্রাইভেট স্পেস' কোন জরুরী বিষয় বলে মনে করা হয় না; যেন মেয়েরা থাকবে বড় হবে মার সঙ্গে, পিসি অথবা ঠাকুমার সঙ্গে। স্বচ্ছল পরিবারেও এ জাতীয় কোন ব্যবস্থা সাধারণত থাকে না। কিন্তু বহু প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও ছেলেদের জন্য নিজস্ব ঘরের ব্যবস্থা থাকে। পুরুষ সদস্য থাকার ফলে বেশীর ভাগ বাড়ির মেয়েরা আপাদমস্তক পোষাক পড়তে বাধ্য হয়। এবং যথাযথ অন্তর্বাসসহ। গ্রীষ্মপ্রধান এই অঞ্চলে এটি একটি গুরুত্বপুর্ণ ও দৈনন্দিন সমস্যা। হস্টেল সেদিক থেকে অত্যন্ত সুবিধাজনক জায়গা। যেখানে 'মেলগেজ' বা পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিসংস্কারের সামনে অস্বস্তিতে পড়তে হয়না। হস্টেলে ইচ্ছামত আরামদায়ক পোষাক পড়ে থাকা যায়। লেখিকা বর্ণনা দিচ্ছেন, "হস্টেলের ভেতরে মেয়েরা খুবই খোলামেলা পোষাক পরত। মূলত রাত্রিবাস পরলেও তারজন্য খুবই কম ছিটকাপড় খরচ হত। গৃহস্থ বাড়িতে পাঁচজনের সামনে এই পোশাক পরা সে যুগে অসম্ভব ছিল" (বিশ্বাস, ২০০৯,পৃ- ২৮)। তাঁর অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা অর্থনৈতিক অবস্থান খুব বেশি প্রভাব ফেলে না হস্টেল জীবনে। হস্টেল কর্তৃপক্ষও বিষয়টি ইন্ধন দেয় না। সমস্ত জাতি, ধর্মের, বর্ণের, মেয়েরা একত্রে থাকে, একই ব্যবস্থাপনায়, একই খাবার খায়। কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হল "হস্টেল মানেই তো সকলের সঙ্গে মিলেমিশে থাকা। আর মিলেমিশে থাকার মানে নিজেকে যেন কখনই অপ্রাসঙ্গিক এবং অসাধারন না লাগে তার চেষ্টা করে যাওয়া" (বিশ্বাস, ২০০৯, পৃ -৩১)। "ধনী দরিদ্র্য সব বাড়ির মেয়েরাই একসঙ্গে বসে, এই সামান্য খাবার খায়" (বিশ্বাস, ২০০৯,পৃ -৪৯)। এছাড়াও তিনি দেখেছেন আবাসজীবনের আরো বিচিত্র মাত্রা "হস্টেলে হিন্দু মুসলমান খ্রিষ্টান বিভেদ ছিল, এটা কেউ মনেই রাখত না। ধর্মাচরণ সংখ্যাগুরু ছাত্রীরাই করত না। খুব কমজনের কাছেই তখন ব্যক্তিগত ঠাকুর দেবতার মুর্তি বা ফটো থাকত। নামাজ পড়তেও আমি সেভাবে দেখিনি" (বিশ্বাস, ২০০৯,পৃ -৪৯)। মেয়েদের 'বড় হওয়া', 'হয়ে ওঠা' কে তিনি দেখেছেন কাছ থেকে নিজের বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, "এই ভাবেই এক একজনের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। কারো আওতায় থাকতে থাকতে কেউ নত হতে, ছায়া পেতে অভ্যস্ত হয় কেউ আবার শাসন করতে। কেউ হয়তো নিজের মধ্যে গুটিয়ে যায়। সারাজীবন এর দাগ থেকে যায়। কারণ "দলছুট হলে হস্টেলে আর রেহাই নেই। যে করেই হোক, কোনও না কোনও দলে ঢুকতেই হবে" (বিশ্বাস, ২০০৯,পৃ -৭৫)। পারস্পরিক সীমানার বোধ তৈরী হয় হস্টেলে। ব্যক্তিমানুষের এক্তিয়ার সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা গড়ে ওঠে। তিনি লিখছেন,

> নিজের বিছানা নিজের বইপত্র নিজের শাড়ি জামাকাপড় নিজের জল খাবারদাবার ঘিরে যে আমি তার বাইরে আমার সর্ববিধ প্রত্যাশাকে আমি গুটিয়ে রাখতে শিখি। একটি ঘরে আটটি মেয়ে মানে আমরা আটটি পরিবার বাস করি। নিজের নিজের খাবার নিয়ে খাই। কখনো কাউকে কাউকে দেওয়া যায়। হাজার ইচ্ছা করলেও চাওয়া নিষেধ। (বিশ্বাস, ২০০৯,পৃ-১৫৯)

একত্রবাস হলেও পরস্পরের এক্তিয়ার এখানে আলাদা, সীমানা নির্দিষ্ট। হস্টেল নির্মাণের সূচনাকাল থেকেই ছেলে ও মেয়েদের হস্টেলের মধ্যে নিয়মগুলি লিঙ্গ বৈষম্য পূর্ণ ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেখানে ছেলেদের জন্য অবাধ স্বাধীনতা আর মেয়েদের জন্য নানা নিয়মের নিগড়। লেখিকার বর্ণনায় পাওয়া যায় তার বর্ণনা,

> ছেলেদের রাত্রে ঢোকার ক্ষেত্রে কোনো বিধিনিষেধ নেই। কোনো ভাল সিনেমা দেখতে গেলে, কিংবা কারও বাড়ি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেল এমনকি কোনো বিলম্বিত আলোচনা সভায় যোগ দিলে দৌড়ে দৌড়ে ফিরতে হত আমাদের মেয়ে বলে। পরক্ষণেই মনে হয় শুধু আমাদের যদি এই নিয়ম না থাকত তা হলে কি আমরা ফিরতাম না? রাতে কোথায় থাকতাম আবার রাতে যে কারণে ভয় সে কারণ তা কি দিনের বেলায় ঘটে না? (বিশ্বাস, ২০০৯, পৃ - ৩১)

"আর ছেলেদের যে এত ছাড় তাদের কি কোনো চরিত্রশুদ্ধির প্রয়োজন নেই?" (বিশ্বাস, ২০০৯, পৃ - ৪৬) রাতে ফেরার এই নিয়ম তখনো তৈরি করেছিল নানা ক্ষোভ –"রাত নটার পর আমাদের হস্টেলের চারপাশে হেঁটে বেড়ানোর কি যে অদম্য বাসনা ছিল! আর পড়াশুনা শেষ করে অন্যের বাড়িতে থেকে যেদিন কয়েক বান্ধবী মিলে তা করেছিলেন সেদিন দীর্ঘ কারাবাস থেকে মুক্তির এক অপার্থিব আনন্দ পেয়েছিলাম। মাথার ওপর সেদিনের চাঁদ সাক্ষী ছিল।" (বিশ্বাস, ২০০৯,পৃ -৪৭) হস্টেল থেকে দল বেঁধে জয়দেব গিয়ে লেখিকার অনুভব,

> এই প্রথম রাত্রিতে অভিভাবকশূন্য হয়ে একটা বাউল মেলায় যাচ্ছি বন্ধুদের সঙ্গে। দমকা হাওয়ায় যেভাবে শিমুলের শুটি ফেটে গিয়ে হেথায় হোথায় তুলো ছড়িয়ে পড়ে। তেমনি একটা খোলা অনুভব হচ্ছে। মনে হচ্ছে রাতারাতি বড় হয়ে গেছি।"(বিশ্বাস, ২০০৯,পৃ -১২৭) ছেলেরাও মেয়েদের এই ফিরতে বাধ্য হওয়া নিয়ে নানা রসিকতা করত- "দুষ্টু ছেলেরা মেয়েদের ফেরার স্রোতকে দেখলে 'যা মুরগী খাঁচায় হোক' বলে আওয়াজ দিয়ে দ্রুত সাইকেলে পালাত। (বিশ্বাস, ২০০৯,পৃ-৪৮)

সমবয়সী নারীদের একত্রবাসে প্রচুর ঘনিষ্ট সখীত্ব তৈরী হয়। তিনি দেখেছেন, নারীর সঙ্গে নারীর বন্ধুতা বা সখীত্বের একটি বিশেষ মাত্রা থাকে। সমাজের বাকিদের কাছে যা অশোভন লুকিয়ে রাখার বিষয়, সংকোচের বিষয় তা সহজে প্রকাশ করা যায়। এই বন্ধুত্বের একটি নিজস্ব সৌন্দর্য আছে। তিনি লিখছেন, "মেয়েদের হস্টেলে মেয়েতে মেয়েতে বন্ধুত্ব খুবই গাঢ়ত্বে পৌছোয়। পরিবারে এই মা বা বোনেদের সঙ্গে এমন কি ঠিক হতে পারে না। এমন খোলামেলা সব কথা বলার পরিসর হস্টেলে মেয়েদের কাছে ছাড়া কোথায় বা পাওয়া যেতে পারে" (বিশ্বাস, ২০০৯,পৃ -৭৮)। সহপাঠী এবং একই হস্টেলের আবাসিকাদের এই 'ভগ্নীত্ব' আবাসজীবনের একটি আশ্চর্য মাত্রা। শান্তিনিকেতনের সূচনাকাল থেকেই আবাসিকাদের মধ্যে, সহপাঠীদের মধ্যে এই 'ভগ্নীত্ব' এর চর্চা দেখা যায়, আবাসিকাদের স্মৃতিকথায় অবশ্যিক ভাবেই 'দিদি'দের উল্লেখ পাওয়া যায় সেখানে তারা দিদি এবং বোনের সমীকরণে, স্নেহচ্ছায়ায় নিজেদের সমৃদ্ধ করেছেন, স্নেহ আর অভিভাবকত্বের মধ্যে তারা নিজেদের

মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করেছেন অদ্ভুত মমতায়। প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা যায়  কৃষ্ণা বসুর 'আমার শান্তিনিকেতনের দিদিরা' বইটি। এই সখীত্ব, এই 'ভগ্নীত্ব' নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এর গুরুত্ব অপরিসীম। 'এথিক্স অব কেয়ার' বা স্নেহ সাহচর্যের নৈতিকতা এই 'ভগ্নীত্ব' কে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। যেখানে পরিবার যা সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত 'কেয়ার গিভার'দের উৎস হিসাবে বিবেচিত সেই তথাকথিত 'সুরক্ষিত' 'স্নেহময়' পরিসরে মেয়েরা যখন পাচ্ছেন না তাদের কাঙ্ক্ষিত, প্রত্যাশিত সাহচর্য বরং তারা সেখানে সম্মুখীন হচ্ছেন 'গার্হস্থ্য হিংসা'র, 'অবহেলা'র 'অসহযোগীতা'র। শিক্ষাসূত্রে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে, হস্টেলে অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও পাচ্ছেন স্নেহ, অভিভাবকত্ব এবং সাহচর্য যা তাদের এগিয়ে যেতে এবং ভাল ভাবে বেঁচে থাকতে সহায়তা করছে। হস্টেলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের মধ্যে এই 'ভগ্নীত্ব' শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগ থেকেই গড়ে উঠেছিল, চর্চিত হয়েছিল এবং যার ধারা আজও বহমান। লেখিকা দেখেছেন অন্যদিকে পরিবারের ভিন্ন বাস্তবতা, সম্পর্কের ভিন্ন সমীকরণ—"পরিবারের বন্ধুত্বের এমন সুযোগ নেই। খাওয়া, বসা, শোওয়া যে বান্ধবীদের সঙ্গে তাদের স্নেহ সখ্য ঝগড়াঝাটি ও যাবতীয় মনোবিকলনকে মুছে দিয়েও জেগে থাকে। মেয়েতে মেয়েতে একটা নির্ভরযোগ্য বন্ধুত্বলাভ হস্টেল জীবনের একটা বড় সম্বন্ধ।" (বিশ্বাস, ২০০৯, পৃ -১৫৬) মেয়েদের মধ্যে এই 'নির্ভরযোগ্য বন্ধুত্বলাভ' শিক্ষাজীবনের, আবাসজীবনের বড় প্রাপ্তি হিসাবে তিনি দেখেছেন স্মৃতিকথায়। এছাড়াও, মেয়েদের ব্যক্তি হয়ে ওঠার সূত্রপাত হতে তিনি দেখেছেন আবাসজীবনে। নিজেকে বিকশিত করার অবসর, সুযোগ পায় মেয়েরা এখানে, তিনি লিখছেন, "হস্টেল একটি সাময়িক জীবন। চিরকাল সেখানে কেউ থাকবে না। আর সাময়িক বলেই তার জন্য মায়া-মমতা অনেক বেশি। চলে যাবার দিন যত ঘনিয়ে আসে তত অসহায়বোধ করতে থাকে সবাই। হস্টেল ছাড়া নিজের অস্তিত্ব তেমন আর কোথায় ঘনিয়ে উঠবে?" (বিশ্বাস, ২০০৯, পৃ -১৫৫) সামাজিকভাবে ভিন্ন পরিসরের মেয়েদের একান্ত, নিজস্ব পরিসর লাভের আকাঙ্ক্ষা যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপূর্ণ থেকে যায়, হস্টেলে কিছুদিনের জন্য তারা পায় নিজস্ব পরিসরের স্বাদ যার রেশ থেকে যায় আজীবন এবং প্রতিটি স্মৃতিকথায় 'ব্যক্তিগত পরিসর' এর সঙ্গে আবাসিকাদের গভীর সম্বন্ধের কথা উঠে আসছে বারবার। তিনি লিখছেন, "অনেকের ক্ষেত্রে হস্টেলটাই স্বগৃহ হইয়ে উঠেছে। নিজের মতো করে এ একটি সংসার। মায়ের বাড়িতে নয়, স্বামীর বাড়িতে নয়। এমনটি করে থাকা কি আর কখনও কোথাও হবে।" স্মৃতিকথাগুলি পড়তে পড়তে বোঝা যায় এই একান্ত পরিসরের সঙ্গে আবাসিকাদের লগ্নতা, সংযুক্তির বোধ এবং অনিঃশেষ সম্বন্ধই তাদের শেষ অবধি আবাসজীবন কেন্দ্রিক স্মৃতিকথাগুলি লিখিয়ে নেয়। আবাসজীবন শেষে পরিবারে ফেরার ভীতি লেখিকা দেখেছেন অভিজ্ঞতায়। হস্টেলে নির্বাচন করে মেশার সুযোগ আছে। অন্যদিকে রক্তসম্পর্কিত ও পারিবারিক সম্পর্ক যুক্তদের সাথে মিশতে বাধ্য থাকে মেয়েরা। লেখিকা তাঁর অভিজ্ঞতাতেও দেখেছিলেন "হস্টেল ফুরোলে অনেককেই ভয় পেতে দেখেছি। বলেছে বাড়িতে কেমন করে থাকব?" (বিশ্বাস, ২০০৯, পৃ -১৫৫) নিজের দেহ, মন নিয়ে স্বস্তিবোধ সর্বোপরি, আত্মপরিচিতির সঙ্গে নিজের অস্তিত্ববোধের একটি সামঞ্জস্য তারা হস্টেলে করতে পারে। মেয়েদের মধ্যে নিজেদের শরীর নিয়ে কোনো অস্বস্তি হস্টেলে থাকে না।

একমাত্র এখানেই তারা শরীর নিয়ে কোন রাখঢাক করে না। অন্যের দৃষ্টি দ্বারা বিদ্ধ হবার আতঙ্ক মুক্ত থাকে। তিনি লিখছেন,

> আমরা মেয়েরা পরস্পরের শরীর দেখতাম। একই সঙ্গে বেড়ে উঠেছি আমরা। একই বয়সী সবাই। সকলের সামনেই ছিল আমাদের জামাকাপড় ছাড়ার অভ্যাস। কিন্তু আমরা হস্টেলের মেয়েরা এত সুন্দর করেই তা পরতে পারতাম, যে কেউই কিছু দেখতে পেত না। এ ব্যাপারে আমাদের নৈপুণ্যের অভাব ছিল না। (বিশ্বাস, ২০০৯, পৃ -৭৭)

সার্বিকভাবে স্বস্তিবোধ একজন ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্যকে সাবলীল রাখে যখন সমাজে, পরিবারে প্রতিনিয়ত একজন নারীর নিজস্ব সীমা, মানবিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়, এবং তার প্রভাব পড়ে তার জীবনে, আচরণে এবং মানসিক স্বাস্থ্যে। হস্টলে মেয়েদের 'আত্মবোধ' এর নিঃসংকোচ, মুক্ত উদযাপন তিনি দেখেছেন। লেখিকার অভিজ্ঞতাতে ছিল হস্টেলে সমকামী সম্পর্কের নিদর্শন সুদীপা আর তনুশ্রীর বন্ধুত্বের থেকে আরো গহীন হয়ে উঠেছিল, বেবি আর সুগন্ধার গল্পও ছড়িয়ে পড়ে হস্টেলময়। এই বয়সে মেয়েদের যৌনতা সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা থাকে না। ছোটবেলা থেকে বিশেষ একটি বিষয়ে এত রাখঢাকের সম্মুখীন হতে হতে ঠিক কোন বিষয় নিয়ে এই নিষেধাজ্ঞা এই ব্যাপারটাই পরিষ্কার হয়ে ওঠা না। হস্টেলের আবাসিকাদের কিছুটা হলেও কৌতুহলের নিবৃত্তি ঘটে। লেখিকা দেখেছেন, তারপর ও যারা চাপা স্বভাব তারা বিষয়টিতে সংকুচিত থেকেই যায়। লেখিকা জোনাকী নামে একটি মেয়ের কথা বলেছেন যে গর্ভপাত করাতে গিয়ে মারা যায়। তরুণ প্রেমিকটি অসহায় হয়ে পড়ে। নানা সামাজিক সাংস্কৃতিক নির্মাণের কথা বলেছেন 'হস্টেলের মেয়েদের বিয়ে করতে নেই'। সুনেত্রার বর বলে—"হস্টেলের মেয়েকে বিয়ে করে যা শিক্ষাটাই পেলাম।" (বিশ্বাস, ২০০৯,পৃ- ১০৮)

হস্টেল তুলনামূলকভাবে 'নিরাপদ জায়গা' মেয়েদের কাছে, পারিবারিক হিংসা থেকে অনেক দূরে রাখে, অন্ততঃ মানসিক সুস্থিরতা দেয়। লেখিকা হস্টেলের একজন আবাসিকা মণিকণার কথা বলেছেন "বাবা শংকর মাছের চাবুক দিয়ে মাকে পেটাচ্ছেন এই দৃশ্য মণিকনার মনে চিরস্থায়ী হয়ে গেঁথে আছে। মণিকনা ভুলতে পারে না যে সে তার বাবার টাকায় হস্টেলে থাকে। তাকে গিলতে হয় সে বমি করতেও পারে না।" এমনই দুরাবস্থা তার আমরা বলাবলি করতাম মণির যদি হস্টেল না থাকত, কীভাবে বাঁচত ও? অথবা কিভাবে বাঁচে ওরা? (বিশ্বাস, ২০০৯, পৃ -১৪৬) হস্টেল 'গার্হস্থ্য হিংসা' থেকে রক্ষা পাবার একটি জায়গা যেখানে মেয়েরা নিজেরা রক্ষা পায়, সামনে এগিয়ে যাবার দিশা পায় কিন্তু স্মৃতি তাদের পিছু ছাড়ে না। এই ভাবে তাঁর স্মৃতিকথায় উঠে এসেছে আবাসিকা ছাত্রীদের সামাজিক বাস্তবতার নানান দিক। লেখিকার নিজস্ব স্মৃতি যেমন প্রতিফলিত হয়েছে তেমনি তার পারিপার্শ্ব, সহআবাসিকাদের সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ। তৎকালের শ্রীসদনের একটি সামগ্রিক ছবি ফুটে উঠেছে তাঁর লেখায়। একজন ব্যক্তির সঙ্গে পরিসরের সংযুক্তির বোধ তার আত্ম পরিচিতি নির্মাণে, মানসিক আবহাওয়া নির্মাণে বিশেষ ভূমিকা নেয়। তাঁর লেখায় উঠে এসেছে অতীতচারিতার স্মৃতিকাতরতা –

> আমাদের হস্টেলের একটা কী রকম যেন গন্ধ ছিল। এমনিতে পেতাম না। কিন্তু বাড়ি থেকে এসে হস্টেলে ঢোকামাত্রই গন্ধটা নাকে এসে লাগত। গন্ধটা যেন পুরোনো প্রাসাদের গায়ের গন্ধ। সবাই পেত কিনা জানি না। আমি পেতাম। তবে সব হস্টেলের গন্ধ এক রকম নয়। এক এক হস্টেলের এক এক রকম। (বিশ্বাস, ২০০৯, পৃ -১৫১)

হস্টেলের মেয়েরা নানাধরনের পরিবার থেকে আসে। নানা সংস্কৃতি তাদের। মেয়েদের অনুপুঙ্খ নজর, দৃশ্যত বহু ছোটখাট ভাবভঙ্গি ও আচার বিচার গ্রহণ বর্জন করতে শিখি পরস্পরকে দেখে। শেষপর্যন্ত যা মহৎ কোনো সংস্কৃতির বাহক করে তোলে আমাদের। নিজেদের অজান্তে আমাদের এই 'হয়ে ওঠা' বলে আমরা সেসময় গ্রাহ্য করিনা। পরে বুঝতে পেরে অবনত হই।" এই পারস্পরিক সহিতত্ব তাদের 'হয়ে ওঠা'য় ইন্ধন জোগায়। তিনি আরো লিখছেন, "পরিবারে আমরা সাধারণত ক্ষমা পেতেই অভ্যস্ত। হস্টেলে কেউ ছেড়ে কথা বলবেনা। অতএব, বুঝে শুনে চলো ছোট থেকে। অন্যকে মান্যতা দাও। নিজের মান ও রক্ষা করো। ঘাড়ে ধরে এই শিক্ষা হস্টেলে না এলে পেতাম কোথায়?" (বিশ্বাস, ২০০৯, পৃ -১৫৬) ভিন্নমত, ভিন্নতার সঙ্গে মানিয়ে চলার, পাঠ দেয় হস্টেল জীবন।

> আমার চারপাশে কত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে যা আমার অপছন্দের কত মানুষকে তার স্বভাবের কারণের বিরক্ত লাগছে। হস্টেলে এসব সহ্য করতে শিখেছি। সবাই যে আমার মত হবে না। আমার মতে চলবে না, আমার মতে হবে না, পৃথকমত, পৃথক ভাবনা যে থাকবে, একসঙ্গে চলতে চলতে এটা বুঝে যাই। তাই একটা ঘরে দুজন থাকলেও দুজন ভিন্নলোক। দুজন দুজনের মত থাকে। আমরা কেউ কারো চিঠি পড়ি না ডায়রি সামনে পড়ে থাকলেও ওল্টাই না, কোনো ব্যক্তিগত ব্যাপার না বললে নিজে থেকে খোঁচাই না, এভাবেই লালিত হই, আমরা বড় হতে থাকি। ব্যতিক্রম চিরকালই থাকে। তবে সংখ্যা গুরুরা একই রকম। (বিশ্বাস, ২০০৯, পৃ -১৫৬)

তিনি বর্ণনা করেছেন শান্তিনিকেতনে হস্টেলের সংস্কৃতি

> বাড়িতে মেয়েরা একটা বিশেষ ঘেরাটোপে বিশেষ ধরনের আদর্শের মধ্যে বড় হয়। আমাদের হস্টেল জীবনে একটা বৃহৎ পরিবেশগত আদর্শ ও আবহাওয়া ছিল শুধু রবীন্দ্রনাথ অনেক গুণীজনের অনেকদিনের ভাবনায় তা তিলে তিলে তৈরি হয়েছিল। কালের হাওয়ায় সেই বোধিবৃক্ষের সব পাতা যে উৎপাটিত করতে পেরেছে এমন তো নয়। অনেক পেয়েছি আমরা কিন্তু আমাদের নির্বাচনেরও ক্ষেত্র ছিল। অনেকরকম পথ চারদিক দিয়ে বয়ে গেছে। এ পথ জীবিকার নয় জীবনচর্যার। কোন পথ তুমি নেবে তা তুমিই বেছে নেবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভালোমন্দ সব দায় নিয়েই তোমার পথচলা। তোমার বাকি জীবনে তুমি যতই শাখা ছড়াও না কেন তোমার বীজ তোমার হস্টেলে বড় হওয়ার মধ্যেই আছে। তাকে তুমি অস্বীকার করতে পারবে না কোনও দিন। (বিশ্বাস, ২০০৯, পৃ-১৫৮)

এইভাবে সমগ্র স্মৃতিকথা জুড়ে লেখিকার নিজের এবং সহআবাসিকাদের আবাসজীবনে বৈচিত্র্য,বহুত্ব সমেত চিত্রিত হয়েছে। যেখানে সমাজের ভিন্ন অবস্থানের ভিন্ন বাস্তবাতার ছাত্রীদের সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতা লেখিকার সংবেদনশীল পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে।

শেষ অংশে লেখিকার একটি কবিতা সংযোজিত হয়েছে।

সিঁড়ি ভেঙ্গে ভেঙে উঠে এসেছি সবুজশাড়ি পরাদের দেশে
এখানে গুলঞ্চ ঘন রাতে
খয়েরি ঠোঁটগুলো আলগা পড়ে থাকে।
এই শ্রীসদন।
যেখানে পথ লক্ষ্মীমন্তদের পায়ের তলায় গেরুয়া হয়ে ঘুমোয়
এখানে ভোর ভোর বর্ষা নামে
দ্রুত মেঘেরা ছোটে
সামনের মাঠ জুড়ে লাল নীল জার্সিয়া ভ্রমরের মত নাবে।
ওদের ধুলোবালিহীন নর্থস্টার
এইমাত্র শিরীষ স্পর্শ করে উড়ে যায় একেবারে পশ্চিমে
যেখানে গুটিসুটি মেরে একটিমাত্র ফুল ঝরিয়েই
দাঁড়িয়ে পড়ছে বকুল।
ওর লজ্জাটুকু আজ বড়ই প্রার্থিত
মাত্র চল্লিশ পাওয়ারের কি ভীষন আলোয়
জালের আড়ালে পুড়ে যাচ্ছে দেবীমূর্তীখানি। (বিশ্বাস, ২০০৯, পৃ -১৫৯)

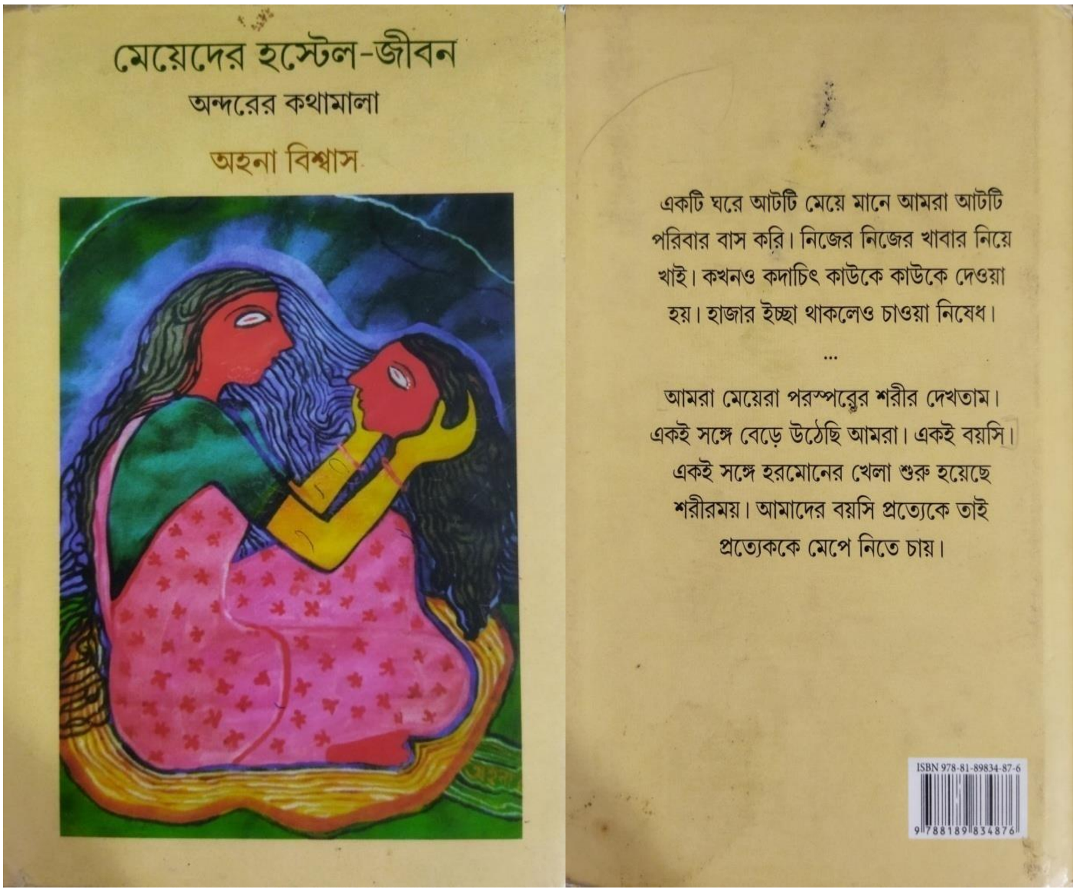


চিত্র – ৪৬ 'মেয়েদের হস্টেল-জীবন অন্দরের কথামালা' বইটির প্রচ্ছদ।

**খ। শ্রীসদনের শ্রীমতীরা হস্টেল অনাবাদী মানবজমিন**

'শ্রীসদনের শ্রীমতীরা' একটি স্মৃতিকথাধর্মী রচনা (২০১৬), এর প্রেক্ষাপট ১৯৬৪ সাল। লেখিকা ষাটের দশকে থাকতেন শান্তিনিকেতনে। তাঁর হস্টেলজীবন পাঠভবনে পড়াকালীন। অর্থাৎ স্কুলে পড়াকালীন, কলেজ জীবনের নয়। এই বইটিতে তিনি এঁকেছেন মেয়েদের হস্টেল শ্রীসদনকে কেন্দ্র করে তাঁর মেয়েবেলা যাপনের এক মনোরম স্মৃতিচিত্র। কৈশোর থেকে যৌবন এই পর্বান্তরের পৌছনোর সন্ধিক্ষণে আত্মোপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে হস্টেলজীবনের আনন্দ-বেদনা হুল্লোড়ের ছবিতে বইটি ঋদ্ধ। মেয়েদের স্কুল, হস্টেল তৈরী করে রবীন্দ্রনাথ তখনকার বঙ্গ সমাজে তুমুল আলোড়ন তৈরী করেছিলেন। শ্রীসদন গার্লস হস্টেল ছিল এই আন্দোলনের ফসল। ১৯০৮ সালে বিশ্বভারতীতে মেয়েরা পড়াশুনা শুরু করার সাথে সাথে বোর্ডিং তৈরী হয়েছিল। ১৯১০ সালে মানুষজনের বিরোধিতায় ও দায়িত্বপ্রাপ্ত পদের জন্য লোক না পাবার ফলে তা বন্ধ হয়ে যায়। নানা প্রতিকূলতা কাটিয়ে ১৯২৮ সালে তৈরী হল শ্রীভবন, যা বর্তমানে শ্রীসদন। সমসময়ে লেখিকা থাকতেন এই হস্টেলে। তিনি ভূমিকা অংশে লিখেছেন, "শ্রীসদন যে এক নীরব আন্দোলনের ফসল, অজান্তেই আমরা তার একটি অংশ হয়েছিলাম এই ভেবে গর্বে আনন্দে মন ভরে উঠেছিল। মনে হয়েছিল এই দারুণ সৌভাগ্যের কথা প্রত্যেকের নানা উচিত।" (বসু, ২০১৬, ভূমিকা অংশ)

চিত্র – ৪৭ স্মৃতিকথার পটভূমি, শ্রীসদন, চিত্রগ্রাহক –শম্ভু সাহা, রবীন্দ্রভবন ছবি সংগ্রহশালার সৌজন্যে প্রাপ্ত।

তিনি শুরুতেই উল্লেখ করছেন, "আমি যে সময়ের কথা বলছি তা আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের কথা, সে সময় মেয়ে হস্টেল আর মোগলাই অন্দরমহল প্রায় একই ব্যাপার ছিল।" (বসু, ২০১৬, পৃ -ভুমিকা অংশ) পরিসর হিসাবে মেয়েদের হস্টেল সমাজের কাছে বরাবরই খুব কৌতুহলের বিষয়। লেখিকার 'মোগলাই অন্দরমহল'এর সঙ্গে মেয়ে হস্টেলের তুলনাটা তাৎপর্যপূর্ণ। অনেক মেয়ের একত্রবাস সমাজের কাছে অদ্ভুত আগ্রহের বিষয়। নানা রসিকতা শোনা যায় তার মালিকানা নিয়ে। একসাথে অনেক মেয়েদের  বসবাস হারেম রানীর অন্দরমহল ইত্যাদির ছবি ভেসে ওঠে। অর্থাৎ তারা বিশেষ কারো 'ভোগ্য'। উল্লেখ্য রানীর অন্দরমহল বা হারেম সব কিছুর সঙ্গেই একটি পুং মালিকানার প্রসঙ্গ জড়িত। যেহেতু  পরিবারের প্রত্যক্ষ নজরদারির বাইরে তারা তাই হস্টেলের প্রতি সমাজের নানা বাঁকা নজর। সমাজ চায় সবসময় নারীর জন্য প্রত্যক্ষ অভিভাবক থাকুক। যারা তার বাইরে থাকবে তার দিকে থাকবে সমাজের অদ্ভুত নজর। প্রতিনিয়ত তাদের দিকে তোলা হবে চারিত্রিক অশুদ্ধতার প্রশ্ন। নিজেকে উপলব্ধি করার জন্য আত্মাবিষ্কারের জন্য সময় পরিসর তারা এখানে পায়। এই নিজস্ব পরিসরটিই পুরুষতন্ত্রের কাছে আতঙ্কের। আর পুরুষতন্ত্রের কাছে নারীর আত্মাবিষ্কারের অর্থ হল স্বেচ্ছাচার ও ব্যাভিচার আর পদস্খালন। কোথা থেকে স্খালন বা বিচ্যুতি? পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর তৈরি করে দেওয়া কিছু 'শুদ্ধতা', 'অপবিত্রতা'র আজগুবি ধারণা থেকে। এই কারণেই বাড়ির মেয়েদের সম্বন্ধে শুদ্ধতার একটি ধারণা জড়িত। সঙ্গে হস্টেলের মেয়েদের সম্বন্ধে নিন্দাসুচক নজর। এই বইতে হস্টেল জীবনের পাশাপাশি শান্তিনিকেতন ও তার পারিপার্শ্ব সম্বন্ধে ও আলোচিত

হয়েছে। তিনি বর্ণনা করছেন কিভাবে হস্টেলে এসে সবারই প্রথম এক অনাস্বাদিত স্বাধীনতার অনুভূতি হয়। লেখিকা ২৩ জানুয়ারী ১৯৬৪ সালে শ্রীসদন হস্টেলে আসেন। তিনি লিখছেন,

> আমার সঙ্গে ভর্তি হওয়া লিপি যখন শ্রীসদনের দরজায় দাঁড়িয়ে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছিল আমি তখন শ্রীসদনের সিংহ দরজার প্রবেশ পথে আবিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে... এই প্রথম এজমালীর বদলে প্রতিটা জিনিসই নিজস্ব। খাট বিছানা সাবান পেস্ট বালতি তোয়ালে। এমনকী আস্ত দুটো নতুন শাড়ী। (বসু, ২০১৬, পৃ- ৯)

গ্রামগঞ্জে মফস্বলে বাড়ির মেয়েটির জন্য নিজস্ব পরিসরের অভাব থাকে উল্লেখযোগ্য ভাবে। স্বচ্ছল পরিবার হলেও নিজস্ব ব্যক্তিগত জিনিসপত্রের আয়োজন করার কোন প্রয়োজনীয়তা পরিবারের লোকজন অনুভব করেন না। সে দিক থেকে হস্টেলে এসে এই সামান্য জিনিসপত্রটুকুও সম্পুর্ণভাবে নিজের হিসাবে পাওয়ার ও নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করার মধ্যেও একটি আনন্দ কাজ করে। লেখিকা যদিও খোদ কলকাতার মানুষ। তাঁর হস্টেলে প্রথম আসার আনন্দ সম্বন্ধে ও তৎকালীন কলকাতা সম্বন্ধে জানাচ্ছেন,

> তখন উত্তর মধ্য কোলকাতার মেয়েদের বাড়ির বাইরে দেখলে মনে হত, বিপদসংকুল পৃথিবীতে কোনওরকমে নিজের কাজটুকু সেরে নিরাপদে অক্ষত অবস্থায় বাড়িতে ফিরে যাওয়া ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু চাওয়ার নেই। পথেঘাটে হাসি মশকরা বেলেল্লাপনারই নামান্তর। মেয়েদের এমন অফুরন্ত হাসি প্রাণখোলা হট্টগোল মেয়ে হস্টেলেই সম্ভব সেটা সেদিন বুঝলাম। (বসু, ২০১৬,পৃ -১০)

লৈঙ্গিক প্রান্তিকতা, সামাজিক পরিসরে মেয়েদের নিয়ন্ত্রিত বিচরণ এখানে বর্ণিত হয়েছে।

তাঁর লেখায় বারবার উঠে এসেছে পারস্পরিকতার কথা "সিনিয়াররা জুনিয়ারদের মশারী টাঙিয়ে দিচ্ছে। ভুতে ভয় পেলে ভরসা দিচ্ছে, সুবিধা অসুবিধার খোঁজ নিচ্ছে।" এই যৌথতার মধ্যে নিঃসঙ্গতার অবসর কম। "হস্টেল জীবনে আর যারই অভাব থাকুক না কেন সঙ্গীর অভাব হয় না।" (বসু, ২০১৬, পৃ -১৩) তিনি নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছিলেন 'হস্টেল ছিল কালেক্টিভ অ্যাক্টিভিটির কারখানা', সেখানে ঝাঁকের কই হয়ে মিশে থাকতেই সবার আরাম হত। তিনি আরো একটি বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন এসময় পরস্পর পরস্পরের নকল করতে শুরু করে। তিনি আরো জানাচ্ছেন ডে স্কলার আর রেসিডেন্টদের মধ্যে আকাশপাতাল পার্থক্য থাকে বিশ্বভারতীর গঠন আবাসিক হিসাবে পরিকল্পিত হলেও এ সম্পুর্ণ আবাসিক নয়। এ নিয়ে বিতর্ক আজও অবসান হয় নি। তাঁর লেখাতেও পাই একই অভিজ্ঞতার কথা,

> আমাদের মধ্যে পরিষ্কার দুটো ভাগ ছিল। বাড়ি আর হস্টেল। বাড়ি থেকে যারা পড়তে আসত তারা কিন্তু একদম এরকম ছিল না দিব্যি 'ছাত্র ছাত্র' ভাব ছিল তাদের মধ্যে। এরা বেশিরভাগই অধ্যাপকদের ছেলে মেয়ে। বাড়িতে বসে বইয়ের পাতা টাতা ওল্টাত বলেই মনে হয়। আমরা যারা হস্টেলে থাকতাম তাদের অসীম ক্ষমতা ছিল যে কোনও সিরিয়াস বিষয়কে গলিয়ে তরল করে ফেলার। পড়াশুনার ব্যাপারে তো বটেই অন্যান্য ব্যাপারেও তা সমান

প্রযোজ্য ছিল। শ্রীসদনের স্থানমাহাত্ম্য তার সঙ্গে কাল আর পাত্রীরা মিলে সোনায় সোহাগা। (বসু, ২০১৬, পৃ-৩৬)

তবে হস্টেলে পড়াশুনার উল্লেখযোগ্য গাফিলতির কথাও তিনি বলেছেন। এই বিশৃঙ্খলার ছাপ বাড়ির মেয়েদের ওপর পড়ত না। তিনি লিখছেন, "হস্টেল অনাবাদী মানবজমিন, কোনও কোনও মহামানবী এর মধ্যেই আবাদ করে নিশ্চয় সোনা ফলিয়েছে। মুসকিলে পড়েছে মধ্যমরা।" (বসু, ২০১৬, পৃ- ৪৯)

তিনি জানাচ্ছেন সে সময় হস্টেলের মেয়েরা স্কুল পাশের পর মূলত সংগীতভবন কলাভবন যেত। বাংলা ইন্ডোলজি, সংস্কৃত ইত্যাদি পড়ত। বাড়িতে গাইড করার লোক থাকলে তবেই সায়েন্স নিত কিন্তু তারা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। হস্টেলে থাকা মেয়েদের মধ্যে অঙ্ক বা ইংরাজিতে অনার্স নেওয়া বিরল ঘটনা। বিষয় গ্রহণের ক্ষেত্রে লিঙ্গ পক্ষপাত এবং লিঙ্গ বৈষম্য ক্রিয়াশীল ছিল। লেখিকা আরো এক জায়গায় বলেছেন, তৎকালীন ধারণা ছিল, "অংকে কাঁচা হওয়াটা নায়িকা সুলভ। অত নীরস খটমট কখনও সরস সুন্দরীরা হজম করতে পারে?" বিষয় নির্বাচন ও তা নিয়ে সামাজিক ধ্যান ধারণাটি লিঙ্গ বৈষম্যপূর্ণ একটি সামজিক নির্মাণ। এই শ্রীসদনের খোলামেলা অবয়ব পরবর্তীকালে ঢেকে দেওয়া হয়। উদ্ধৃত করা যায়, "যুগোপযোগী কারণেই মেয়েদের বিচরণ ভূমি শ্রীসদনের সেই বিখ্যাত বা কুখ্যাত বারান্দার সমস্তটা তারের জাল দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।" তিনি আরও একটি কথা জানাচ্ছেন "তখনো মেয়ে হস্টেল নিয়ে ভয়ের বাতাবরণ তৈরি হয়নি বলে চারদিকে ছিল বন্ধু পাঁচিল।" (বসু, ২০১৬, পৃ-৮৪) হস্টেলে নির্দিষ্ট সময়ে ফেরার নিয়ম ছিলই। সঙ্গে আবার ক্যাম্পাসের মধ্যে হস্টেলের কাছাকাছি চৌহদ্দীটুকুই নির্ধারিত ছিল মেয়েদের ঘোরা ফেরার জন্য। "শ্রীসদনের বৈধ চারণভূমির চারটি সীমায় পূর্বে মৃণালিনী ও আনন্দ পাঠশালা। উত্তরে ছাতিমতলার গেট, দক্ষিণে নতুন কিচেন খেলার মাঠের বেড়া আর পশ্চিমে সংগীত, কলাভবন। শান্তবাধ্য ভীতু মেয়েরা শ্রীমতীরা সেই নিষেধ অক্ষরে অক্ষরে পালন করত।"(বসু, ২০১৬, পৃ-৫৭) তাদের এক দায়িত্বপ্রাপ্ত রমাদি দুজন ছাত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন "বলতো অন্তঃপুর জায়গাটা কেন তৈরী হয়েছিল? মেয়ে দুটির বিশেষ কোন বিশৃংখল কাজের জন্য এই তিরষ্কার অর্থাৎ তিনি জানাতে চাইলেন, মেয়েদের প্রকৃত জায়গা অন্তঃপুরে। আর হস্টেলটিকে তিনি তার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তারপর রমাদি যে কথাগুলি বলেছেন তাতে বোঝা যায় হস্টেল সমাজ বিচ্ছিন্ন কোন জায়গা নয়, সমাজের বদ্ধমূল ধারণাগুলো এখানেও ভয়াবহভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালায়,

> কিছু কিছু জিনিস যেমন দাঁতমাজা খাওয়া ইত্যাদি আড়ালে করত কারণ ও গুলো দৃষ্টিনন্দন নয়। এইজন্য সভ্য মানুষের বাড়িতে ভিতর আর বাহির বলে দুটি অংশ থাকে। আজ যখন তোমরা একটি পরপুরুষের সামনে দাঁড়িয়ে হাঁ করে আলজিভ দেখিয়ে ঘুপচুপ খাচ্ছিলে তোমাদের পেট পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। কী যে কুৎসিত লাগছিল সেটা তোমরা ধারণা করতে পারবে না। (বসু, ২০১৬, পৃ-৬৩)

মেয়ে দুটির অপরাধ ছিল তারা বাইরে এক দোকানে দাঁড়িয়ে ফুচকা খেয়েছিল। মেয়েদের অন্তঃপুর অর্থাৎ সামাজিকভাবে ব্যক্তিগত পরিসরের পিতৃতান্ত্রিক ধারণাটি এখানে স্পষ্ট হয়েছে। মেয়েদের

নিজেদের শর্তে যা ব্যক্তিগত পরিসর নয়, সামাজিক শর্তে তা ব্যক্তিগত এবং যেখানে মেয়েরা 'নিজস্ব পরিসর'-এর অভাব বোধ করে। তিনি আরো বলতেন,

> দেহ হচ্ছে পবিত্র ফুলের মতো। একে রক্ষা করা তোমাদের কর্তব্য। পুরুষ মানুষ যত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ই হোন না কেন, তোমাদের উচিত তাঁদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলা। দোলের দিন অজানা অচেনা ছেলেদের স্পর্শে তোমাদের দেহের শুচিতা নষ্ট হয়। সেইজন্য এবার অনুষ্ঠান শেষে শ্রীসদনে চলে আসবে। এখানেই নিজেরা দোল খেলবে। (বসু, ২০১৬, পৃ-৬৩)

এগুলো কর্তৃপক্ষ আরোপিত নিয়ম নয়। নানা সময় হস্টেল সুপাররা এধরনের নিয়ম বানিয়ে থাকেন সুবিধামত বা ইচ্ছামত। সমাজে নির্মিত নিয়মের, লিঙ্গ বৈষম্যপূর্ণ বিধির প্রয়োগ করে থাকে 'পিতৃতন্ত্রের কর্তব্যপরায়ণ কন্যারা'। লেখিকা দেখেছেন, ব্যক্তিগত বিষয়ে সুপারদের নাক গলানো ছিল বিভীষীকার মত। ছাত্রীদের ব্যক্তিগত বন্ধু নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন সময় কটূ মন্তব্য করতে শোনা যায় হস্টেল সুপারদের। লেখিকার অভিজ্ঞতাতেও ছিল মেয়েদের ব্যক্তিগত চিঠি তারা পড়ে দেখতেন।

লেখিকা দেখাচ্ছেন কিভাবে তৎকালেও হস্টেলে 'ভাল মেয়ে', 'খারাপ মেয়ে' সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট বিভাজন ছিল। "এই সাংঘাতিক উর্বর জমিতে কিন্তু খারাপ মেয়ে বলতে ঘন ঘন প্রেমিক বদলানো আর সিগারেট খাওয়া পর্যন্তই আমাদের কল্পনার দৌড় ছিল। গাঁজা তখন পর্যন্ত এত গ্ল্যামারাস হয় নি। অন্য মাদকের নাম শুনিনি। মদ পুং লিঙ্গের একচেটিয়া এই পর্যন্তই জানতাম।"(বসু, ২০১৬, পৃ- ৬৩) হস্টেলটাও তো ছিল একটা সমাজ। সেখানে 'ভালো মেয়ে'র কিছু ধারণা তৈরি করা হত। যারা প্রধানত নিয়মানুবর্তী তারা ভাল মেয়ে হিসাবে বিবেচিত হত। তিনি লিখছেন, "মেয়েদের ভাল মেয়ে, মিষ্টি মেয়ে বলে নাম কেনার লোভ চিরকালের সেটা ওখান থেকেই শুরু হয়ে যেত। ছেলেদের হস্টেলের সঙ্গে মেয়ে হস্টলের মূল তফাত ওটাই, পরিচ্ছন্ন টিপটপ মেয়েদের বেশ সম্মানের সঙ্গে দেখা হত"। 'ভাল মেয়ে' সম্পর্কিত এটি আরো একটি সামাজিক নির্মাণ। হস্টেলে অনভিজ্ঞ বালিকাদের মধ্যে আর কিছু ধারণা প্রচলিত ছিল।

> আমরা বিশ্বাস, করতাম যারা খুব ভাল সেই মেয়েদের পিরিয়ড হয় না। প্রত্যেকেরই জানাশোনা এইরকম দু একটা ভাল পূণ্যবতী মেয়ে ছিল। তাদের গল্প শুনতাম যারা মেয়েজীবনের এই দুঃখকষ্টের ঊর্ধ্বে। তখন মনের অগোচরে পাপচিন্তার জন্য 'খারাপ মেয়ে' হয়ে গিয়েছি বলে গ্লানিবোধ হত। (বসু, ২০১৬, পৃ- ৭৮)

এই নানা ধরণের সমস্যা থাকা সত্বেও, হস্টেল প্রতিষ্ঠানটির নানা নিয়ন্ত্রণের মধ্যেও অনেক আশাপ্রদ বিষয় থাকে হস্টেলে "একটা কথা একটা প্রাঞ্জল হওয়া দরকার। তখনকার শ্রীসদনের হাওয়ায় সাম্যবাদ ছিল প্রবল, রাজকন্যার সঙ্গে কেরানীকন্যার ফারাক বোঝা যেত না... বিত্ত বৈভব দেখানোর কোন সুযোগ ছিল না শ্রীসদনে।" (বসু, ২০১৬, পৃ- ১২২) হস্টেল ছাড়ার সময় এই একত্রবাসের স্মৃতি তাড়া করে ছাত্রীদের, সারাজীবন তার রেশ থাকে, "লোহার ঘোরানো সিঁড়িটা, টানা বারান্দা বসার জায়গা বেদী, বোগেনভেলিয়ার ঝাড়, কত প্রিয় মুখ সকাল থেকে রাত, হাত বাড়ালেই বন্ধু। এত অনায়াস এত সহজে পাওয়া বলেই বিশ্বাস হয় না তার না থাকা।" (বসু, ২০১৬, পৃ- ১৪৯) যৌথতার

মধ্যে এই একত্রবাস, বহু একাত্মতা, দৈনন্দিন স্বাধীনতার আস্বাদ ছেড়ে চলে যাওয়া এবং পরিবার জীবনে প্রবেশ আবাসিকাদের দাঁড় করায় কিছু প্রশ্নের সামনে। “গত কয়েক বছর যাদের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল তাদের সঙ্গে আর দেখা হবে না। কে কোথায় ছিটকে যাবে। শ্রীসদনের বাতাসে নিম্নচাপ সেই চলে যাবার দলের জন্য... সে কাউকে ধরেও রাখে না, আবার বিদায়ও দেয় না।” (বসু, ২০১৬, পৃ-১৫০) এইভাবে লেখিকা আবাসিকাদের দৈনন্দিনের ছবি এঁকেছেন স্মৃতিকথায়। শ্রীসদনের আবাসজীবন কিভাবে সবাইকে একত্রিত করেছে শ্রেণি, জাতি নির্বিশেষে যেখানে ‘রাজকন্যা’ আর ‘কেরানীকন্যা’ একত্রে বাস করেছে, একই ভাবে আদৃত হয়েছে। কর্তৃপক্ষ মেয়েদের ‘সামাজিক দৃষ্টি’তে দেখেছে এবং সামাজিক নিয়ম পালনের আদেশ দিয়েছে।

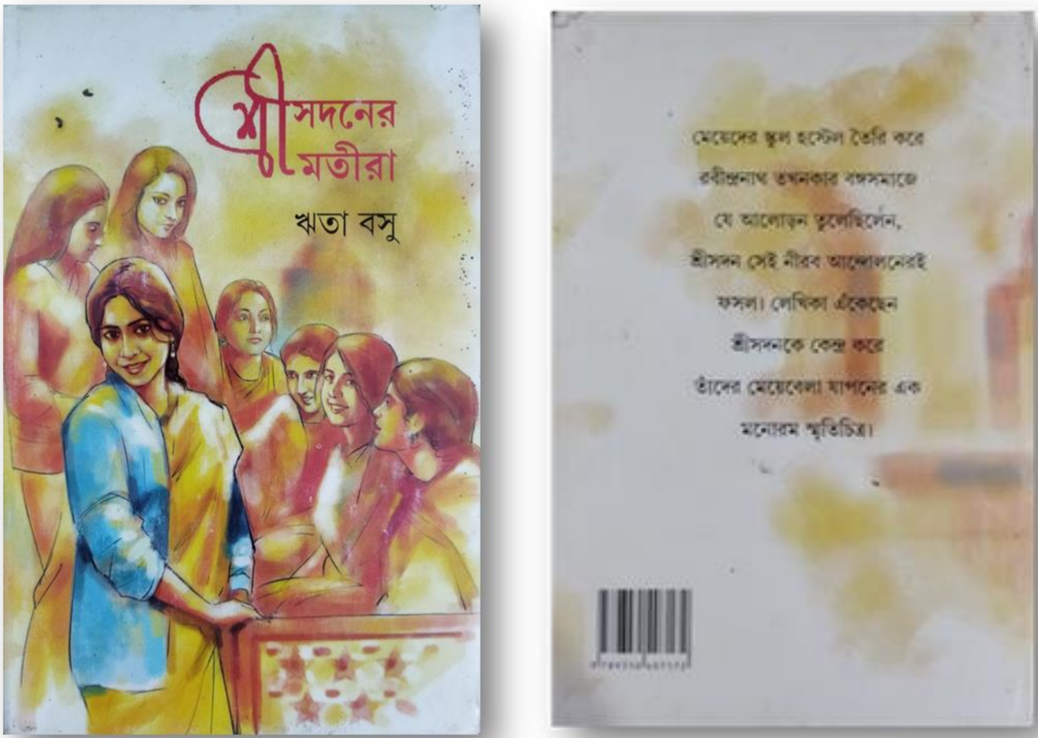


চিত্র -৪৮ শ্রীসদনের শ্রীমতীরা বইটির প্রচ্ছদ।

**নারীর আবাসজীবন কেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাস – সামাজিক স্তরভিত্তিক ক্ষমতা কাঠামোর প্রতিফলন**

বাংলা উপন্যাসে মেয়েদের আবাসজীবনের চিত্রায়ণ দুটি উপন্যাস অবলম্বনে আন্তঃস্তর বিন্যাসের দৃষ্টিকোণ থেকে নারীবাদী সাহিত্য সমালোচনা পদ্ধতি অনুযায়ী পাঠ নেওয়া হল।

**ক। আরশিনগরে তাঁবু**

বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের লেখিকা অহনা বিশ্বাসের লেখায় সমকাল, বাস্তবতা, সময়ের মনস্তত্ত্ব উঠে আসে বিশ্বস্তভাবে। একদিকে চিত্রশিল্পী অন্যদিকে লেখিকা অহনা বিশ্বাস তাঁর সমসময়কে চিনেছেন নিজস্ব ধরণে। আলোচ্য উপন্যাস ‘আরশিনগরের তাঁবু’ প্রকাশিত হয় ২০০০ সালে। এটি তাঁর প্রথম উপন্যাস। তাঁর শিক্ষাজীবনের একটি দীর্ঘ সময় কেটেছে শান্তিনিকেতনের হস্টেলে। তাঁর লেখা প্রথম

উপন্যাসটির পটভূমি হস্টেল। কলকাতা থেকে স্বল্প দূরত্বে বর্ধমান, দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল সংলগ্ন আধা মফস্বল জনপদ, জামতলা সরকারী বিএড ট্রেনিং কলেজ। তার দুই পাশে দুটি অস্থায়ী হস্টেলবাসী ট্রেনিদের নিয়ে আখ্যানটি গড়ে উঠেছে। উপন্যাসের শুরুতেই দেখা যাচ্ছে একটি চরিত্র নুরুল একটি দীর্ঘ মন্তব্য করে তাতে বোঝা যায় 'হস্টেলে থাকা মেয়েদের' সম্পর্কে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ধারণা।

> ওই সব নির্লজ্জ হস্টেলের মেয়েরা, তাদের হ্যাহ্যা হাসি, ইংরাজি জানার ফুটানি, ওই নৈঋতা, লীলা, সুকন্যা, সুকুমারী যাচ্ছেতাই সব মেয়েরা। কীরকম চোখে তাকায়। বুক উঁচিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ছেলেমেয়ে গুলো যেন ওদের চাকরবাকর। পিছু পিছু ঘুরে বেড়াবে কুকুর বেড়ালের মত। ... কি আছে ওই মেয়ে গুলোর মধ্যে...এইসব মেয়েদের কথা ভাবলেই মুখখিস্তি দিতে ইচ্ছা করে। (বিশ্বাস, ২০০০, পৃ-৫)

নুরুলের প্রণয়িনী জাহানারা রক্ষনশীল মুসলিম পরিবারের মেয়ে। সে প্রায় আসূর্যস্পর্শা। নুরুল তার সম্পর্কে কখনোই এ জাতীয় কথা মনে করে না। তাহলে কি স্বতঃসিদ্ধ ভাবে ধরেই নেওয়া হয় হস্টেলে থাকা মেয়েদের তথাকথিত চরিত্র খারাপ যাদের দেখা মাত্র 'মুখখিস্তি' করা যায়। এই মেয়েরা 'যাচ্ছেতাই' এবং 'নির্লজ্জ' তাদের শরীরী ভাষার মধ্যে কোন জড়তা বা সংকোচ না থাকাটিও সমাজের কাছে নিন্দনীয়। নুরুলের কাছে দৃষ্টিকটু মনে হয় তাদের সাবলীল ভঙ্গি। সে বিরক্তির সঙ্গে ভাবে হস্টেলের মেয়েরা 'কীরকম চোখে তাকায়' আবার 'বুক উঁচিয়ে ঘুরে বেড়ায়'। অভিভাবকের আওতায় না থাকা নারীদের সম্বন্ধে সামাজিক ধ্যান ধারণার একটি সম্যক পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। রক্ষকের নাগালের মধ্যে না থাকলে তাদের 'শুদ্ধতা' ও 'পবিত্রতা' নিয়ে সহজেই প্রশ্ন ওঠে। তাদের দিকে ওঠে 'নৈতিক' অধঃপতন জনিত দোষারোপ। এলাকার ছেলেদের কাছে গার্লস হস্টেল 'বিশেষ কিছু'। হস্টেলের সামনে তাদের মধ্যে অদ্ভুত সচেতনতা দেখা যায়। নুরুলের "চশমা পড়ে গাড়ি চালাতে তার অসুবিধাই হয়। কেবল মনে হয় নাক থেকে এই বুঝি খুলে পড়ে যাচ্ছে... বউদির দোকানের সামনে আসার আগেই পরে ফেলে" তার কারণ সে দোকানে হস্টেলের মেয়েরা খেতে আসে। আর দোকানের পর থেকেই মেয়েদের হস্টেল শুরু।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র নৈঋতা, যার চোখ দিয়ে লেখিকা হস্টেলজীবনকে দেখেছেন, বর্ণনা দিয়েছেন হস্টেলজীবনের যাবতীয় অনুপুঙ্খ। বাড়িতে সে ছিল প্রায় নিঃসঙ্গ। ভাল মন্দ নানা ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্যেই সে হস্টেলে খুঁজে পাচ্ছে নিজস্ব পরিসর। তার আত্মউপলব্ধি—

> হস্টলে থাকা তার অভ্যাসেই নেই, তবু এখানে সে কেমন করে জড়িয়ে যাচ্ছে। কী রকম একটা সমাজ, সে এখানে দেখতে পাচ্ছে। রুচিকর হোক বা না হোক তার সঙ্গে প্রচন্ড গতিতে নৈঋতা এগিয়ে চলেছে। সম্পর্ক রাখতে না চাইলেও সম্পর্ক হয়ে যাচ্ছে। তবে এও ভালো। বাড়িতে একা থাকার দুঃখ তার এতদিনে অনুভব হচ্ছে। সে কি আগে জানতো! লোকের সঙ্গে মিশতে সে এত ভালোবাসে। নিজের অবস্থা নিয়ে সে কুণ্ঠিত ছিল চিরকাল। (বিশ্বাস, ২০০০, পৃ -১১)

অর্থাৎ সে নিজের অবস্থান নিয়ে বাড়িতে সাবলীল ছিল না। পরিবার, অভিভাবক, পাড়া পারিপার্শ্ব। সব মিলিয়ে যে জটিল বাস্তবতা তার মধ্যে বাড়ির মেয়েটি নিজেকে বিকশিত করার সুযোগ পায় খুব কম। তার কারণ সে বুঝতে পারে তার প্রতিটি কাজ, কথা, হাঁটাচলা প্রতিনিয়ত পরিমাপ করা হচ্ছে। নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে নিজের ইচ্ছা মত প্রকাশ করার ক্ষেত্রে এটি একটি দূর্লঙ্ঘ বাধা। অনেক সময় সরাসরি বিকাশে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করা হয় বা অলক্ষ্যে কারো নজরদারী ক্রিয়াশীল এই বিষয়টি সম্বন্ধে সচেতনতার বোধটিই মানুষকে সংকুচিত রাখে। হস্টেলে আসার পর নানা নিয়মের সম্মুখীন হতে হলেও দৈনন্দিন এই নজরদারি থেকে মুক্তি পায় ছাত্রীরা। কেউ পরিমাপ করছে না, নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে এই সহজতার বোধ, কারোর কাছে প্রতিটি সাধারণ কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে না এই স্বস্তিটুকু খুব জরুরী নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে। সমাজের নিয়ম আর অভ্যাসের নিগড় হস্টেলে শিথিল। বদ্ধমূল ধারণার জগতের নিত্তনৈমিত্তিকতা থেকে তারা এখানে কিছুটা হলেও স্বস্তি পায়। বাড়ির অনেক আত্মীয় হিতৈষীর মাঝখানে থেকেও নৈঋতা নিঃসঙ্গ ছিল। এই নিঃসঙ্গতা শুধু নৈঋতার নয়, হাজার হাজার মেয়ের বহুদিনের প্রস্তরীভুত নিঃসঙ্গতার বোধ। পার্সোনাল স্পেস না পাবার অভাববোধ। প্রতিনিয়ত নিজেকে প্রমান করার প্রকান্ড ক্লান্তিবোধ। অস্তিত্বকে অন্যের মন মত করে তোলার জন্য প্রতিদিন নিজেকে হত্যা করার রক্তাক্ত ইতিহাস। হস্টেলেও নানা নজরদারী থাকে কিন্তু তা খুব বেশি প্রভাব ফেলে না তার অন্যতম কারণ হস্টেলের মানুষজনের সঙ্গে আবেগ গত একটা দূরত্ব থাকে। যা একটা স্বস্তিজনক নৈর্ব্যক্তিকতা তৈরী করে। মানুষের ব্যক্তিত্ব এখানে প্রতিমুহূর্তে প্রশ্নের সম্মুখীন হয় না। এখানে সবার মাঝে থেকেও একান্ত নিজস্ব পরিসর পাবার অবকাশ মেলে। নৈঋতার উপলব্ধি- “কারুর সাথে কথা না বলেও সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকা যায়।” (বিশ্বাস, ২০০০, পৃ -১০) এই প্রশান্তি পরিবার দিতে পারে না। পরিবারে থাকাকালে যা কিছু মনে হত চিরকালীন, স্থায়ী বিষয়, হস্টেলে এসে সাপেক্ষতা বিযুক্ত ভাবে আত্ম আবিষ্কারের পর সমাজের সব বদ্ধমূল ধারনার দিকে তাকালে তাদের ভাসমান রূপ ভেসে আসে, সন্দিগ্ধ একটি যুক্তিশীলতা হাজির হয়। পরিচিতদের বিয়ে তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়তে দেখে নৈঋতার মনে হয়—“চিনেমাটির কাপডিশের মতো একদিন একটু পুরোনো হতে না হতেই কোনো কিছুর ঠোক্করে ভেঙে পড়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়” (বিশ্বাস, ২০০০, পৃ -১৩)।

সমাজ যে ঔচিত্য অনৌচিত্য বোধ শেখায় বা যেভাবে কোন ঘটনা, পরিস্থিতি বিচার বিশ্লেষণ করতে শেখায় তা বহুদিন হস্টেলে থাকার পর অর্থহীন মনে হয়। তার কারণ এখানে সমবয়সী বা প্রায় সমবয়সী মানুষের জীবনকে এত কাছ থেকে দেখার সুযোগ থাকে যে শুধু বদ্ধমূল ধারণার মানদন্ড দিয়ে না দেখে ব্যক্তিমানুষ ও তার সমস্যাকে সহমর্মিতা দিয়ে দেখার অবকাশ তৈরি হয়। সুকন্যা দারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝে পড়াশুনা চালিয়ে যায়,এবং সবকিছু সামলাতে গিয়ে তাকে দেহ বিক্রী করতে হয়। নৈঋতা তার পরিস্থিতিটা গভীর ভাবে বুঝতে পারে, বাইরে থেকে নিছক বিচারক সুলভ মন্তব্য করে না, বা নীতিপুলিশের ভুমিকা নিতে পারে না। তার মনে হয়, “এভাবে লড়তে পারছে যে মেয়ে, দেহ বিক্রী করে হোক যেভাবেই হোক- মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলেছে যে মেয়ে তার কাছে

জীবনের পাঠ নিতে হবে বৈকি। তাকেও ভাল বাসতে হবে" (বিশ্বাস, ২০০০, পৃ-১৫)। শ্রেণিগত প্রান্তিকতা, একজন ছাত্রীর অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা এখানে ফুটে উঠেছে। নৈঋতা তার বেঁচে থাকার সংগ্রামকে, খর বাস্তবতার মধ্যে টিকে থাকার লড়াইকে যুক্তি দিয়ে বোঝে, সম্মান করে। সমাজের শিখিয়ে দেওয়া 'বেশ্যা' শব্দটির কদর্থের মধ্যে নিজের চিন্তাকে সে সীমাবদ্ধ রাখতে পারে না। সে বিশ্বাসী গুঢ়ার্থে, সে বিশ্বাস করে 'মানুষ রত্ন যত্ন করো তার' এই মতাদর্শে। সমাজ নির্মিত পারস্পরিক পরিমাপ যোগ্যতার বাইরে তারা একে অপরকে শ্রদ্ধা করতে শেখে। প্রতিদিনের লড়াইকে কাছ থেকে দেখার পর বাহ্যিক কতকগুলো ভাসমান মন্তব্য করতে তাদের বাধে। এই হস্টেলে যারা থাকে তারা মূলত বিভিন্ন গ্রাম ও মফস্বলের। ভৌগলিক ভাবে 'প্রান্তিক' ছাত্রীরা শহরে পড়তে আসে এবং থাকে হস্টেলে। সেখানে ছেলেমেয়েরদের অবাধ বন্ধুত্বপুর্ণ মেলামেশা অথবা ভিন্ন ধর্মের মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের অনুমতি সমাজ দেয় না বা ভালো চোখে দেখে না। কিন্তু এই উপন্যাসে দেখি হস্টেলে এসে নৈঋতা, সুকুমারী, সুকন্যারা আলতাফ, আনোয়ার, নুরুলদের সাথে সহজে অবলীলায় মিশতে পারে। তারা প্রত্যেকেই বুঝতে পারে বাড়িতে থাকলে এই বন্ধুত্ব কোন দিন সম্ভব হত না। হস্টেলে বিশৃঙ্খল হবার যেমন প্রচুর সুযোগ থাকে তেমনি জাত, ধর্ম, বর্ণ এর শৃঙ্খল গুলোও ধীরে ধীরে মন থেকে খসে যেতে থাকে।

> ধলা কালার এক বীজে ভাই, সর্বজাতি যাতে হয় উদয়, কর্মগুণে এই সমাজে ভিন্ন গোত্র আখ্যা পাই" হিন্দু মুসলিমের এই বন্ধুত্ব নিয়ে তাদের আলোচনায় প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে সাধক দুদ্দুর গান— "দীনদুদ্দু বিনয় করে কয়, আমার কোন জাতি গোত্র নাই, দিয়ে মানুষের দোহাই মানুষের বন্দনা গাই। (বিশ্বাস, ২০০০, পৃ -২৩)

এই ছেলে মেয়েরা পরস্পরের সঙ্গে অবলীলায় মেশে, মেশার সুযোগ পায়। আবার কখনো প্রণয়াবদ্ধ হয় কোন সামাজিক প্রত্যাশা ছাড়া নিতান্ত ভালোবেসে। গ্রাম ও মফস্বলের পাড়ার সংস্কৃতি ছেলেমেয়েদের সাবলীল ভাবে মেশার সুযোগ দেয় না। "আমাদের দেশে গাঁয়ে গঞ্জে যেখানে মধ্যযুগই কাটে নি। সেখানে কজন ছেলেমেয়ে স্বাধীনভাবে মেলামেশার সুযোগ পায়।"(বিশ্বাস, ২০০০, পৃ -২৩) হস্টেলের যৌথতার মধ্যে নৈঋতা, সুকুমারী সুকন্যারা স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবেশ পায়। সমাজে, পরিবারে সংসারে নানান মানসিক অপ্রাপ্তি হস্টেলে এসে কিছুটা মেটে তাই তারা হস্টেলের সাথে মানসিক ভাবে জড়িয়ে পরে, আঁকড়ে ধরে গভীর ভাবে, "তারা যখন থাকে পরস্পরের মধ্যে এমনি করেই কি জড়িয়ে পড়ে? নৈঋতা যেভাবে জড়িয়ে পড়েছে। এটা হস্টেল যেন মনেই থাকে না। এখান থেকে কখনো ফিরে যেতে হবে ভাবতেই পারে না। যেন অনন্তকাল এখানেই রয়েছে। সুখে দুঃখে।"(বিশ্বাস, ২০০০, পৃ -৩৭) চলে যাবার দিন ঘনিয়ে এলে হস্টেলের সঙ্গে একাত্মতা আরো বেশি অনুভব করে নৈঋতা। "এই হস্টেলটার সবাইকেই তার ভালো লাগছে। আর কদিন থাকবে। কত ভালো লাগছে মানুষকে। এই হস্টেলটাকে নৈঋতার পৃথিবী বলে মনে হচ্ছে।" (বিশ্বাস, ২০০০, পৃ-১১২) হস্টেলে তারা নিজেদের পুনরাবিষ্কারের সুযোগ পায়, অতঃপর ফিরে যায়। এই দিন যাপন স্মৃতিতে নিবিড় হয়ে আসে। "পেছনে ফেলে আসা হস্টেলবাড়ি হাত পা মেলে হাসছে, ইট কাঠ পাথরের কিছুই এসে যায়

না, আবার সেখানে নতুন ছেলেমেয়েরা আসবে।" (বিশ্বাস, ২০০০, পৃ -১১২) সমাজ নির্ধারিত সম্পর্কের স্থবির চেহারা ভুলে তারা নিজেদের ইচ্ছা অনিচ্ছা প্রেম যৌনতার ইচ্ছে মতো স্ফূরণের সুযোগ এখানে পায়। সামাজিক পরিসর হিসাবে হস্টেলের এই বিস্তৃতি সম্বন্ধে লেখিকা লিখছেন- "রিক্ত দীর্ণ অভ্যাসের বস্তাপচা সংসার ভুলে নারী পুরুষকে কাছে টানবে, পুরুষ নারীকে কাছে টানবে। সমাজের সব জাঁদরেল নিয়মকে শিকেয় তুলে শুধু নিজের ইচ্ছামতো সম্পর্কগুলোর খোলনলচে বদলে পরখ করবে, রং বদলাবে।" (বিশ্বাস, ২০০০, পৃ -১১২) মুক্তভাবে বেঁচে থাকার কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ মেয়েরা পেয়েছিল হস্টেলে। তারা খুবই ভাল ভাবে জানে এই মুক্তি পরিবারে পাওয়া সম্ভব নয়। নৈঋতার কথাগুলো হয়ে ওঠে সর্বকালের পড়াশুনা শেষে হস্টেল ছেড়ে আসা মেয়েদের হৃদয়ের কথা— "আর জীবনে তুমি কখনো কোথাও এই ছুটি পাবে না। আর কখনো তোমার মন তোমায় ভালোবাসার জন্য এত লম্বা দৌড় দেবে না। এই বুড়ো পৃথিবীতে তোমরা আরো বৃদ্ধ, আরো একা হয়ে যাবার জন্য যে যার ঘরে রওনা দেবে।" (বিশ্বাস, ২০০০, পৃ -১১২)

উপন্যাসটির নামকরণটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। 'আরশিনগর' বাউলসাধন তত্ত্বে এমন একটি কল্পিত স্থান যেখানে পৌছতে গেলে বহু সাধনার প্রয়োজন। আর সকল সাধনার অন্তিম গন্তব্য, পুর্ণতার ঠিকানা, যেখানে কোন অপূর্ণতা থাকে না, মনের মানুষের দেখা মেলে, মনের মানুষ বলতে এখানে নিজের অখণ্ড আত্মের সন্ধান পাওয়া বোঝায়। 'আরশি' শব্দটির অর্থ হল আয়না বা দর্পণ। যাতে আত্ম প্রতিবিম্ব দেখা যায়। আর তাঁবু বলতে বোঝায় অস্থায়ী বাসস্থান। নামকরণের মাধ্যমে লেখিকা বোঝাতে চাইলেন হস্টেল আরশিনগরের মত এমন একটি কাঙ্ক্ষিত স্থান যেখানে পরিসর যেখানে পূর্ণতা আছে, যেখানে আরশিতে নিজের দেখা মেলে, আত্ম আবিষ্কারের অবকাশ আছে। যে অবকাশ সমাজ, পরিবার দেয় না। সমবয়সী মেয়েদের পারস্পরিক আরশিতে তারা নিজেদের অবস্থান যাচাই করে, বুঝতে পারে। আর তাঁবু বলতে বোঝায় অস্থায়ী বাসস্থান। হস্টেলে ছেলেমেয়েরা আসে কিছু বছরের জন্য। সারাজীবনের জন্য নয়। পড়াশুনা শেষে এই অস্থায়ী বাসস্থান ছেড়ে যায়। পর্যায়ক্রমে ছেলেমেয়েরা আসে, এখানে বাঁধে অস্থায়ী তাঁবু, আবার শেষে ফিরে যায়। সঙ্গে নিয়ে যায় জীবনাভিজ্ঞতা যার রেশ থেকে যায় সারাজীবন।

বাড়ির থেকে হস্টেলে তুলনামুলক স্বাধীনতা পায় মেয়েরা। আবার ছেলেদের হস্টেলের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় ছেলেদের হস্টেলে মেয়েদের হস্টেলের তুলনায় অনেক বেশি মুক্ত পরিবেশ। যেমন তারা উপলব্ধি করতে পারে, কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের উপস্থিতি, ছেলে ও মেয়েদের হস্টেলের মধ্যে লিঙ্গ বৈষম্য পূর্ণ নিয়মাবলী। "রাত এগারোটাকে কি গভীর রাত বলা যেতে পারে? জামতলা গার্লস হস্টেল হলে বলা যেতে পারে। বয়েজ হস্টেলে গভীর রাত না হলেও তা সন্ধ্যে নিশ্চয়।" (বিশ্বাস, ২০০০, পৃ -২৮) রাতের ধারণাটিও ছেলে ও মেয়েদের জন্য ভিন্ন অর্থ বহন করে। গভীর রাত যেন মেয়েদের জন্য নিষিদ্ধ। আর ছেলেদের তাতে অবাধ অধিকার। আবার উপন্যাসটির আখ্যানভাগেও দেখা যায় লেখিকা একটি বিষয়ে সামাজিক লিঙ্গ বৈষম্য পূর্ণ ধ্যান ধারণার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। ছেলেদের হস্টেলে কথা বা আলোচনা হয় ভোট নিয়ে, রাজনীতি নিয়ে। আর মেয়েদের হস্টেলের যে

বর্ণনা দিয়েছেন তাতে মেয়েরা কেবল প্রেম নিয়ে, সম্পর্ক নিয়ে কথা বলে। ছেলেরা এসব নিয়ে তেমন আলোচনা করে না। আর মেয়েরা কেবল সম্পর্কের আবর্তে পড়ে থাকে, তা নিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে। আর একটি পঙক্তি সমগ্র উপন্যাসে দুষ্ট বাতাসের মত ঘুরে বেড়ায়— "বলব কথা লোক নেই, বাসব ভাল লোক নেই।" (বিশ্বাস, ২০০০, পৃ-৩৩) অর্থাৎ মেয়েরা বিশেষ কিছু বিষয়ে দুঃখ পায় হীনমন্যতায় ভোগে, পড়াশুনা করে তারপরও তাদের আলোচনা আবর্তিত হয় সমাজে 'মেয়েলি' হিসাবে পরিচিত কিছু বিষয়ের মধ্যে, তার বাইরে তারা বেরোতে পারে না। মেয়েরা নিজেদের মধ্যে অনেক বেশি হীনমন্যতার চর্চা করে। ছেলেদের ও মেয়েদের  আলোচনার বিষয় বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটা পক্ষপাত এখানে লক্ষিত হয়। পরিবারের মধ্যে মেয়েদের লৈঙ্গিক প্রান্তিকতা এবং শ্রেণিগত প্রান্তিকতা এখানে চিত্রিত হয়েছে।

**খ। চাঁদের গায়ে চাঁদ**

বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের কথাসাহিত্যিক তিলোত্তমা মজুমদারের 'চাঁদের গায়ে চাঁদ" (মজুমদার, ২০০৩) উপন্যাসটির মূখ্য পটভূমি মেয়েদের হস্টেল। শ্রুতি, সমগ্র উপন্যাসটির ঘটনা প্রবাহ যার চোখ দিয়ে দেখাচ্ছেন লেখিকা, সে ফিলজফি নিয়ে পড়াশুনা করে, মা মারা গেছেন, বাবা অবসাদগ্রস্থ, এবং ভাই অলক মানসিকভাবে অপরিণত, জড়বুদ্ধি সম্পন্ন। শ্রুতি বেথুনে ফিলজফির ছাত্রী, সে থাকেই ইউ জি গার্লস হস্টেল অব ইউনিভার্সিটি অব কলকাতা, তিনতলায় ২০ নাম্বার রুমে, রাধানাথ বোস লেন কলকাতা-৭০০০০০৬, এখানে মোট আবাসিক সংখ্যা আশি। হস্টেলটি সম্বন্ধে লেখিকা বলছেন "এখানে সাধারণত প্রত্যেকেই ছোট শহর, শহরতলি বা গ্রাম থেকে আগতা, পোশাকে, আচরণে তেমন আধুনিকতা নেই বা চাকচিক্য যেমন কোলকাতায়" (মজুমদার, ২০০৩, পৃ-৯)। খোদ কলকাতায় অবস্থিত হলেও এখানে মূলত মফস্বলের ও মেয়েদের বসবাস। ভৌগলিক ভাবে প্রান্তিক ছাত্রীরা রাজধানী শহরে এসেছেন উচ্চশিক্ষা সূত্রে। শ্রুতির দুই রুমমেট শ্রেয়সী ও দেবপ্রিয়া। মূলত এই তিনটি কেন্দ্রীয় চরিত্রের হস্টেল জীবনে নানা ঘটনা প্রবাহ, সংকট, সর্বোপরি একটি উপলব্ধিতে পৌছনো এইভাবেই উপন্যাসটি এগিয়ে যায়। আর ঘটনা ক্রমের সমান্তরালে চলতে থাকে একটি দার্শনিক জিজ্ঞাসার স্রোত। উপন্যাসের দীর্ঘ অংশ জুড়ে লেখিকা মেয়েদের হস্টেলের উৎপত্তির কথা বলেছেন। নারীশিক্ষার সূত্রপাত, পড়াশুনার হাত ধরে নারীদের পরিবারের বাইরে আসা, হস্টেল গড়ে ওঠা, নারীর সামাজিক সাংস্কৃতিক ভুমিকার আমূল বদলে যাওয়া বর্ণনা করছেন। তিনি লিখছেন 'আবাসিক' পরিসরের গড়ে ওঠার কথা।

> কেন আবাসিক বা আবাসিক কি? আবাসিক কারণ প্রবাসে এ এক ভূমিহীনের গৃহহীনের অবস্থা। আবাসিক কারণ এখানে যারা এল তারা এই উদ্দেশ্যে এল যে কিছু জ্ঞান তারা লাভ করবে; কিছু শিক্ষা উপার্জন করবে। সেই জ্ঞান এবং শিক্ষা তারা লাভ করবে, প্রয়োগ করবে জীবনে বা আদৌ প্রয়োগ করবে না। এই আবাসিক একটি ছবি মাত্র।  (মজুমদার, ২০০৩, পৃ-২৩)

নারীশিক্ষা ও বাহ্যিক সামাজিক পরিসরে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আবাসজীবনের ভুমিকা অনস্বীকার্য। বাংলায় মেয়েদের আবাসজীবন খুব বেশিদিনের পুরোনো নয়, নারী শিক্ষার সমান্তরালে দুশো বছরের। তার পূর্ববর্তী পরিস্থিতির বর্ণনা পাই উপন্যাসের মধ্যে,

> মনে করো সেই সবসময় যখন এই আবাসিক প্রয়োজন ছিলনা, যখন মেয়ে জন্মাত আমকুশি খেতে শিখবার আগেই কাঁসার থালায় বসে পড়ত, ঘুরত সাতপাক এবং দিন এগোল থালায় বিয়ে রইলনা তবে আটে নয়ে বিদায়, এগারোয় মানসিক পরিণতি এলো কি এলো না, তেরোয় মাতৃত্ব। তখন শুধু উৎপন্ন আর উৎপাদন। (মজুমদার, ২০০৩, পৃ-২৩)

নারীদের জন্ম, বিবাহের নিয়তির এই স্থবিরত্ব পেরিয়ে নারীশিক্ষার সুত্রপাত হল। নানা বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও তৈরী হল মেয়েদের হস্টেল। তিনি নারীর সামাজিক, পারিবারিক ভূমিকার ঘূর্ণাবর্তের কথা বর্ণনা করছেন,

> নারী মনুষ্য নয়, নারী এক গাভীর ন্যায় জাতি, যার সাথে সম্পর্কিত কেবল উৎপাদন, বৎস ও দুগ্ধ। আহা! কি মহিমা ছিল সেইসব নারী জন্মে! ক্রমে মহিমা শুকিয়ে এখন আবাসিক কেন না ওইসব উৎপাদনকারীরা লিপি ছুঁলো গোপনে আর আবাসিকের ভিত্তি রচিত হল...আর বর্ণ পরিচয় ও অপরিচয়ের এই সংঘর্ষ আবাসিকের ইট রচনা করেছে। (মজুমদার, ২০০৩, পৃ-২৫)

এই ভিত্তি স্থাপন খুব সহজ ছিলনা সেকালে। নানা প্রতিবন্ধকতার পাহাড় পেরিয়ে যাঁরা শিক্ষালাভের জন্য পরিবারের নিগড় কেটে বাইরে আসতে পেরেছিলেন সেই নারীরাই সমাজকে এগিয়ে দিলেন কয়েক ধাপ। আবদ্ধ গার্হস্থ্জীবন থেকে বহির্বিশ্বের সঙ্গে পরিচিত হওয়া খুব সহজ সাবলীল ছিল না। পরিবারে, বিবাহে, সমাজে নারীর আত্ম পরিচিতি, নিজের সঙ্গে নিজের যে সম্বন্ধ বদলের সূচনা হল। লেখিকা লিখছেন সেইসব উন্মেষের সময়ের কথা।

> সেই নারী এমন সব নারী তোমরা জেনো, এই ছাত্রী আবাসের প্রস্তরসমূহ। এদের সমস্ত সহ্য বজ্র, অস্থিগুলি দিয়ে গড়ে উঠেছে এমন আবাস। সেই গোপন ও নির্যাতিত পঠন থেকে ধীরে ধীরে কোনও একদিন সমস্ত পিতা গ্রাম থেকে নগরের অভিমুখে পাড়ি দিল সন্তানের হাত ধরে। উচ্চশিক্ষা স্বপ্নবুকে করে। সে সন্তান শুধুই পুত্র রইল না। কন্যা এল। কন্যাদের হাতধরে  পিতারা এল আবাসের দরজায়। নিয়ম কানুন ঠাসা ছাত্রী আবাস। অনুশাসনের কড়াপাকে বাঁধা তবু সেইসব নারীদের থেকে বড় সহজ এই প্রক্রিয়া। (মজুমদার, ২০০৩, পৃ-২৭)

নির্ধারিত ভূমিকার বাইরে পরিবারের বাইরে, বিবাহের বাইরে, সমাজের রক্তচক্ষুর বাইরে নারীরা শিক্ষার হাত ধরে ‘নিজের’ জীবন বেছে নিল আবাসজীবনে এসে, আত্ম-আবিষ্কারের এক আশ্চর্য আলো এসে পড়ল তাদের চেতনার ওপর।

লেখিকা উৎস খুঁজেছেন “কে ছিল প্রথম আবাসিক? কোনও গবেষণাগ্রন্থ তার সন্ধান দিতে পারে। কিন্তু মনে জেনো আর কেউ নয় প্রথম আবাসিক ওইসব অভিযুক্ত হাড়, ওইসব নিঃস্ব নারী

গুলি, ওইসব প্রাচীন অর্থহীন সংস্কার ও ভীতি টপকানোর অসীম ক্ষমতাশালী নারী, রেড়ির তেলের বাতির তলায় যাদের জ্ঞানার্জন।" (মজুমদার, ২০০৩, পৃ-২৭ ) 'প্রাচীন অর্থহীন সংস্কার ও ভীতি' ছেড়ে বেরিয়ে আসা 'অসীম ক্ষমতাশালী' নারীদের স্পর্ধার কথা, সাহসের কথা সমাজকে যুঝে নেবার তিনি লিখছেন এমন একটি তীব্র ভাষায়, তীক্ষ্ণ ভঙ্গিতে যা পড়তে পড়তে 'সহৃদয়হৃদয়সংবাদী' পাঠককে শিউরে উঠতে হয়। নারীকে নিয়ন্ত্রণ করার, আটকে রাখার, দমন করার যাবতীয় আয়োজনের বিরুদ্ধে নারীরা সামাজিক বিভিন্ন অবস্থান থেকে পিতৃতন্ত্রের চৌকাঠ পেরিয়ে পড়তে এলেন।

> পড়া কি আশ্চর্য আত্ম আবিষ্কার। সমস্ত ঘৃণা ও অভিযোগ প্রতিবিধিত করে এই আবাসিক, দেখো দেখো তোমরা। আজ সেইসব কন্যাদের সুমনা, কল্যানী, বীথিকা, মণিদীপা, শ্রেয়সী, নন্দিনীদের সহজ আগমনের আগে কত কত ক্ষতচিহ্ন, রক্তচিহ্ন। কত কত ইচ্ছের অপূর্ব অভিরূপ, দেখো, দেখো নাও আর তত্ত্ব খোঁজো, তত্ত্ব, তত্ত্বের রূপ বদলে যায়। (মজুমদার, ২০০৩, পৃ-২৮)

নীরবে নারীর 'আত্মহনন' এর 'ক্ষতচিহ্ন', 'রক্তচিহ্ন' পেরিয়ে পেরিয়ে লেখাপড়ার হাত ধরে ছাত্রীদের, গবেষকদের উদ্বোধন ঘটল। নারীর সামাজিক ভূমিকায় ঘটল বদল, শুধুমাত্র গার্হস্থ্য জীবনে কন্যা, স্ত্রী মাতা এই ভূমিকার জায়গায় দেখা দিল নতুন পরিচয়, তারা ছাত্রী, তারা আবাসিক। সাংসারিক কাজকর্ম ছাড়াও তাদের এখন নতুন কাজ পড়াশুনা, যে মগজে কেবলই গৃহকর্ম আর পরিবারের সদস্যদের পরিষেবা দেবার চিন্তা পাক খেত সেখানে ঘটল তুমুল পরিবর্তন, বাইরের পৃথিবী, অনেক মানুষের সঙ্গে, আলাপ তাদের সাহচর্য জন্ম দিল নতুন মননশীলতার, চর্চিত হতে থাকল নতুন জগত, আর ভিন্ন ভবিষ্যতের কথা। পারিবারিক কয়েকটি সম্বন্ধ ছাড়াও মেয়েরা পরিচিত হল আরো নানা মাত্রার সম্পর্কের সঙ্গে। সবকিছু বদলের এই সন্ধিক্ষণ খুব সাবলীলভাবে আসে নি। তিনি লিখছেন "যাদের বজ্রহারে গঠিত এই নারীশিক্ষা তারা অবিশ্বাস জানত না। বিশ্বাসই ছিল তাদের একমাত্র প্রাণশক্তি। ... ওই আবাসিকের মেয়েরা, ছাত্রীরা ভবিষ্যতের নারী দেশের দশের সমাজের ধ্বজাধারী কান্ডারী।" (মজুমদার, ২০০৩, পৃ-৩৭) এই 'বিশ্বাস' আত্ম হতে জাত, সেই স্বশক্তি নিয়ে মেয়েদের শিক্ষার যাত্রাপথ। পরিবার থেকে হস্টেলে আসার পর মেয়েরা নানা ভাবে পরিবর্তিত হয়। পরিবার থেকে বাইরে এসে বৃহৎ এক জীবনের সন্ধান পায়, সন্ধান পায় 'নিজের'। বদলে যায় তার মন, মনন, আত্মবোধ, আত্মপরিচিতির বোধ, তৈরি হয় 'নবনির্মিত আত্ম'। পূর্ববর্তী দমিত হয়ে থাকা, চাপা পড়ে থাকা আত্ম থেকে ধুলো সরে গিয়ে এক নতুন 'আমি'র জন্ম হয়। যে যাবতীয় প্রান্তিক অবস্থান থেকে নিজেকে আর দেখতে চায় না, সে নিজেকে মানুষ হিসাবে চিনে নেয়, বদলে যায় তার নিজের সঙ্গে সম্বন্ধ। বদলে যায় তার পারিপার্শ্বের সঙ্গে সম্বন্ধ। লেখিকা লিখছেন -

> সবে দরজার চৌকাঠ পেরুল। তাদের শরীর বদলায় গো। মন বদলায়। কেন না তারা গাঁ থেকে শহরে আসে। শহর থেকে নগরে আসে। নগর থেকে মহানগরে, জনবিরল থেকে জনবহুলে আসে। থিক থিক জনতার নীতি ও নষ্টামি ভাঙন ও সংস্কার দেখতে দেখতে তাদের আপন নীতিতে পরিবর্তনের রঙ লাগে। বিধি দূর হল, নিষেধ নাই। এই বয়স এমন

> বয়স যে ভেসে যায়। ওকে দেখে না তো কেউ তাই যা খুশি তাই করে। যেখানে খুশি যায়। পরিবার ছেড়ে এই আবাসিকে নিজের জীবন যেন মুঠোর মধ্যে এসে ধরা দেয়। আপন মুঠোয় আপন জীবন অন্য স্পন্দনে ধরা দেয়, অন্য ছন্দে টানে। নিজের জীবনটিকে, জীবনের রহস্যচাল, ঘেঁটে, চিড়ে ফালা ফালা করে দেখতে চাওয়ার অশান্ত ইচ্ছে যদি হয় তুমি দোষ দিতে পারবে না। (মজুমদার, ২০০৩, পৃ-৩৭)

প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রণ আর নজরদারীর বাইরে তারা নিজেদের দেখে, চারপাশকে দেখে। মেয়েদের সঙ্গে মেয়েদের সম্বন্ধের মাত্রা বদল ঘটল, বিশেষ কয়েকটি নির্ধারিত সম্পর্কের জায়গায় এল সম্পর্ক নির্মাণের নতুন বয়ান। মা, ঠাকুমা, দিদিমা, দিদি, মাসি পিসি ইত্যাদির বাইরে কিছু বন্ধু হয়তো মেয়েদের আগেও তৈরি হত, সখি পাতানো হত, 'গঙ্গাজল', 'বকুল ফুল' ইত্যাদি। কিন্তু একজন আবসিকের সঙ্গে আরেক জন আবাসিকের সম্বন্ধটা আসলে ঠিক কি? তারা পরস্পরের কে? তারা একসাথে বহুবছর থাকে, একই রুমে দীর্ঘ সময় থাকে সুতরাং তারা শুধু বন্ধু, নাকি আত্মীয় নাকি এখানেও গড়ে উঠতে পারে পারিবারিক বোধের মত এক স্বতন্ত্র্য একাত্মতা। এইসব সম্পর্কের এক্তিয়ার কি, পরস্পরের প্রতি প্রত্যাশা কতদুর, স্থায়িত্বই বা কতদিন। পারস্পরিক আলোচনার বিষয়বস্তুতেও এল বদল। তারা পরিবারের বাইরে নানা জায়গা থেকে আসা মেয়েদের সাপেক্ষতায় দেখল নিজেদেরকে, চিনল নিজেদের, পরখ করল নিজেদের পূর্ণতা এবং শূন্যতাগুলো। বর্ণনা করা হচ্ছে,

> এইসব মানুষের মেয়ে মানুষ তাঁরা সব আবাসিকে থাকতে এসেছেন, এক মেয়ে অন্য মেয়ে দেখলেন। এক কন্যা অন্য কন্যার পাশে জায়গা পেলেন। এর ওকে পছন্দ হল তো তার হল না। এর ওকে দেখে ঈর্ষা জাগল তো ওর মায়া উথান... এরই মধ্যে ভাব হল যেমন ঝগড়ার ইন্ধনও হল। বন্ধুত্ব হল। বন্ধুত্ব হলও না শত্রুমিত্র গড়ে উঠল। দল উপদল তৈরী হল। পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে কূটকাচাল তর্ক। (মজুমদার, ২০০৩, পৃ-৪০)

এই অংশটিতে লেখিকা নারীর আবাসিক 'হয়ে ওঠা'র প্রক্রিয়াটি অদ্ভুত বলিষ্ঠ ভাষায় এবং ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন। লিঙ্গগত প্রান্তিকতা, ভৌগলিক প্রান্তিকতা এই অংশে প্রতিভাত হয়েছে।

কেন্দ্রীয় চরিত্র শ্রুতি হস্টেলে এসে এক মুক্তির স্বাদ পায়, আত্মীয়তার জটিল ভার থেকে সে দূরবর্তী হয়ে স্বস্তি অনুভব করে। শ্রুতির জবানিতে বর্ণিত হয়েছে,

> কোনও কোনো সময় অনাত্মীয়তা আত্মীয়তার চেয়ে অনেক বেশী সহনশীল, আত্মীয়তা বেশী ভাগ ক্ষেত্রেই বোঝার মত। অনাত্মীয়তা যেখানে কর্তব্য সেখানে ভদ্রতার জমিনে আত্মসম্মানের বুনোট। অনাত্মীয়ের দায়িত্ব কর্তব্য সবটাই স্বয়ং কাঁধে তুলে নেওয়া। তাই তা সম্পূর্ণ পালনে সম্মান। দুই অনাত্মীয়ের যে স্বাভাবিক দূরত্ব সূর্য ও পৃথিবীর দূরত্বের মতোই কল্যাণী। মানুষে মানুষে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব থাকলে উত্তাপ সহনীয় হয়। (মজুমদার, ২০০৩, পৃ-৫৭)

লেখিকার ভাষা ব্যবহার চমৎকৃত করে বারবার। আত্মীয়তার ধারনাটি সম্পূর্ণভাবে সামাজিক সাংস্কৃতিক নির্মাণের অন্তর্গত। কারা মানুষের তথাকথিত আত্মীয় কারো ব্যক্তিজীবনে আত্মীয়ের

এক্তিয়ার কতটুকু—সমস্তটাই বানানো। আত্মীয়তা একদিকে যেমন পরিবার জীবনে দায়বদ্ধ হতে সাহায্য করে তেমনি আত্মীয়তার বোঝা মানুষের সামান্যতম সামাজিক বিচ্যুতিতে ভয়ংকর আক্রমণ ও মানসিক চাপ তৈরী করে। কারা মানুষের আত্মীয় এই বিষয়টি আবর্তিত হয় পরিবার ব্যবস্থাকে কেন্দ্রে রেখে। শ্রুতির মত বহু আবাসিক নারী আত্মীয়তার বেড়াজাল থেকে বেড়িয়ে হাঁপ ছাড়ে। অনাত্মীয় পরিবেশে স্বস্তি খুঁজে পায়। গড়ে ওঠে আরো নানা সম্বন্ধ। বন্ধুত্ব। শ্রুতি রুমমেট শ্রেয়সীর প্রতি একটা টান অনুভব করে।

> পারিবারিক সম্পর্কের বাইরে এইতার প্রথম কোনো টান, এই সম্বন্ধ যৌনতার নয়। বন্ধুত্বের বুক। সেই নিবিড়তায় কোনও রতিবোধ ছিল না, কামবোধ ছিল না। সমকাম বিপ্রীত কাম ছিল না। কাম মনে ছিল না শ্রুতির। বরং সে ভেবেছিল শ্রেয়সীর কোথায় যেন তারও আছে। (মজুমদার, ২০০৩, পৃ-৯০)

বহু সম্বন্ধ যেগুলি তৈরী হয় কিন্তু পারিবারিক ও বৈবাহিক সম্পর্কের স্বীকৃতি পায় না বলে তা বেশীদিন সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে না মানুষ। মানুষের সম্পর্ক নির্মাণ ও তার এক্তিয়ার পুরোটা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় সামাজিক সাংস্কৃতিক বদ্ধমূল ধারণার দ্বারা। শ্রুতি  উপলব্ধি করতে পারে— "এমন বন্ধুত্ব যারা জীবনে আপনি ভাঙ্গে আপনি গড়ে। বা ভাঙে না, দূরত্বের জন্য অদর্শনের, যোগাযোগ বিহীনতার জন্য ফিকে হতে হতে মিলিয়ে যায়। কোনো দিন বহু দূর নক্ষত্রের মতো জেগে ওঠে সেইসব অতি প্রিয় বন্ধুদের মুখ, নিরাবেগ দুঃখসুখ স্মৃতি।" (মজুমদার, ২০০৩, পৃ-১১৫) অন্যদিকে হস্টেলজীবনে অনেকের মধ্যে একাকিত্বের বোধও তৈরী করে। কারো কারো নিঃসঙ্গতা বাড়ে আবাসজীবনে। শ্রুতির মনে হয় "যেন বা একরাত্রে উপলব্ধি হয়েছে এই হস্টেল এক জেলখানা যেমন কিংবা নির্বাসিত দ্বীপ ভাই নেই বন্ধু নেই যারা ছিল আত্মার কাছাকাছি। (মজুমদার, ২০০৩, পৃ-১১৫) আবার, হস্টেলে নিয়মের লাগাম অনেক সময়  লিঙ্গ বৈষম্য পূর্ণ। এই হস্টেলে  বিকেল পাঁচটার মধ্যে নানা নিষেধাজ্ঞা শুরু হয়। শ্রেয়সীর কথায় উঠে আসে হস্টেলের নিয়মকানুন সংক্রান্ত নানা ক্ষোভ। "রাতে বাড়িতে থাকা না থাকা দিয়ে আমাদের পবিত্রতা মাপা হয়। কি অদ্ভূত! খারাপ হতে গেলে শুধুমাত্র রাত্রি লাগে নাকি?" (মজুমদার, ২০০৩, পৃ-৯৮) "একটা মেয়ে যতই বড় হোক না কেন, যত ই স্বাধীন ও আত্মনির্ভরশীল হোক না কেন, পৃথিবী তার কাছে একজন গার্জিয়ানের পরিচয় প্রত্যাশা করে। তুই শ্রুতি বসু তুই যদি নিজেই নিজের দায়িত্ব নিয়ে চলিস তবু তোর একজন গার্জিয়ান থাকলে তোর চেয়ে অনেক বেশি স্বস্তি বোধ করবে চারপাশের মানুষ! সারা পৃথিবী তোর আত্মবিশ্বাসকে তোর নিজস্ব ন্যায় নীতি বোধকে খন্ড খন্ড করে দেবার জন্য অজস্র ধারাল ছুরি হাতে বসে আছে। আমরা এসব বুঝতে চাই না। উল্টে এগুলোকেই নিরাপত্তা ভেবে মানতে শুরু করি"। (মজুমদার, ২০০৩, পৃ-৯৮) 'সুরক্ষিত' 'নিরাপদ' পরিসরের যাঁতাকল, নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে 'সুসজ্জিত কারাগার', অবদমনের সহস্র আয়োজন। সেইসব থেকে বেরিয়ে আবাসজীবনে নারীরা পায় এক মুক্ত অবকাশ। লেখিকা বর্ণনা করছেন কিভাবে হস্টেলে পারস্পরিক নারী শরীর গুলো সংকোচ মুক্ত। তাদের মধ্যে কোন দ্বিধা লজ্জা ভয় থাকে না। শরীরকে লুকোনোর বা গোপন করার কোন প্রচেষ্টা থাকে না।

পরস্পরের কাছে উপস্থিতিগুলি স্বাচ্ছন্দ্যের। মেয়েদের শরীরের উপস্থাপন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবে খুবই  বিতর্কিত বিষয় আবার মেয়েদের দৈনন্দিন পোশাক কেমন হবে তা নিয়েও আপত্তি, আলাপ আলোচনা কম নয়। পরিবারে পুরুষ সদস্য থাকায় মেয়েরা নিজের ইচ্ছামত পোশাক বাড়ির মধ্যেও পড়তে পারে না। একমাত্র মেয়েদের হস্টেলেই তারা নিজের পোশাক নিজের শরীর নিয়ে অস্বস্তির মধ্যে থাকে না। বাকী সর্বত্র তাদের সন্ত্রস্ত থাকতে হয়। দেবরূপা শ্রেয়সীকে বলে— "আমার কাছে কিসের লজ্জা? আমি কি ছেলে? একটা মেয়ের কাছে আরেকটা মেয়ের কোন লজ্জা নেই। কাল থেকে রাত আটটার পর যেন গায়ে আর ব্রা না দেখি।" (মজুমদার, ২০০৩, পৃ-৭৮) বন্ধুত্বের পাশাপাশি হস্টেলে সমকামী সম্বন্ধও তৈরি হয়। শ্রুতির দুই রুমমেট দেবরূপা আর শ্রেয়সী পরস্পর প্রণয়াসক্ত। হস্টেলে নারীদের একত্রবাসে অনেকের মধ্যে তৈরী হয় মানসিক ও শারীরিক ঘনিষ্ঠতা যা সামাজিক অনুশাসনের কাছে নিষিদ্ধ। লেখিকা বলছেন,

> যখন গড়ে উঠেছিল এই আবাসিক এবং ছাত্রীরা থাকছিল এবং পঠনপাঠনের মাধ্যমে স্ত্রীজাতিকে তথা সমগ্র সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছিল তখন সেই কবেকার কথা, সেইসব হস্টেল জীবনের ইতিহাস নেই যে তোমাদের বলি... যদি হত ইট কাঠ পাথর কথা বলে, যদি হত ভূমি বায়ু জল তা হলেও হস্টেলের কিছু কিছু ইতিহাস পাওয়া যেত যার মধ্যে থাকবার সম্ভবনা প্রতীয়মান, নারীতে নারীতে টান, প্রেম, ভালোবাসা যৌনবোধ। (মজুমদার, ২০০৩, পৃ-১২৩)

নারীর যৌন প্রান্তিকতা, সমকামীতা এবং একজন আবাসিক সমকামী নারীর প্রান্তিকতার বোধ এখানে বিধৃত হয়েছে। "যদি হয় হোক প্রেম নারীতে নারীতে পুরুষে পুরুষে হোক। প্রেম হোক, দেহবোধ শুধুমাত্র। জন্ম দেবার তরে নয়, উৎপাদনের তরে নয়, যদি সৃষ্টি বলো তবু সৃষ্টি হয়। আনন্দ শিল্প চিত্রকলা... ভালোবাসো ভালোবাসো। ভালোবাসি। এস পরস্পর।" (মজুমদার, ২০০৩, পৃ-১২৪)

তবে কর্তৃপক্ষ এ জাতীয় সম্বন্ধ প্রশ্রয় দেয় না। হস্টেলে মেয়েরা পরিবারের তুলনায় নিজস্ব পরিসর পায় তবে প্রতিষ্ঠান হিসাবে হস্টেল সামাজিক নিয়মকানুন, মূল্যবোধগুলির পৃষ্ঠপোষকতা পুনরুৎপাদন করে। সমাজ যেহেতু সমকামীতাকে মান্য সম্বন্ধ হিসাবে স্বীকার করে না এবং নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে তাই হস্টেল কর্তৃপক্ষ দেবরূপা ও শ্রেয়সীর সম্পর্ককে অপরাধ গণ্য করে, বিচারসভা ডাকে। ইউনিভার্সিটি আবাসিক দপ্তর থেকে আসে সায়ন্তনী বক্সী, মিসেস রায়, মিস ঘোষাল ও মিসেস মুখার্জী। দেবরূপা শ্রেয়সীর সাথে 'ভয়ার' হিসাবে হস্টেল থেকে বের করে দেবার দাবী ওঠে। সমকামীতার দায়ে হস্টেল থেকে তাদের বের করে দেওয়ার পর তিনজনের জীবন তিনটি ভিন্ন খাতে বইতে থাকে। শ্রুতি তার হস্টেলজীবনকে ফিরে দেখে এই ভাবে "আমার বিকল বিফল হস্টেল জীবন। আমার মস্তিষ্কে পোকা ধরে যাবার কাল। হস্টেল জীবন আমি ভুলতে চেষ্টা করি কিন্তু পারি না। আমার সমস্ত না হওয়া, আমার সমস্ত যন্ত্রণার মুহুর্তে হস্টেল আমার সামনে এসে দাঁড়ায়।" (মজুমদার, ২০০৩, পৃ-১৭৭) হস্টেলজীবনে থেকেও তার জীবনে প্রভাব ফেলেছিল একটি সমকামী সম্বন্ধকে হস্টেলে সবার মেনে নিতে না পারা আর তার মেনে নিতে পারা বা সমর্থনের দ্বন্দ্ব।

যৌনবোধের প্রান্তিকতা এখানে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। বিষয়টি তার নিজের জীবনে নানা প্রতিকূলতা সৃষ্টি করলেও শেষপর্যন্ত সে সমাজের কাছে আস্বাভাবিক কিন্তু প্রকৃতির কাছে স্বাভাবিক এই সমকামী সম্বন্ধকে সে ঘৃণা করতে পারে না, স্বতঃস্ফূর্ত বলেই মনে করে। গাইতে থাকে—“চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে / আমরা ভেবে করব কি”।[২] (মজুমদার, ২০০৩, পৃ-২২৬)

এই গানটি বিখ্যাত একটি দেহতত্ত্বের গান। লেখক লালন সাঁই। গানটির পংক্তি বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। এবং উপন্যাসটির নামকরণও এই গানটির পংক্তির অংশ। বাউল সাধনার দর্শনে

চিত্র – ৪৯ ‘চাঁদের গায়ে চাঁদ’ বইটির প্রচ্ছদ।

প্রকৃতি ও পুরুষের মিলন বোঝাতে ‘চাঁদের গায়ে চাঁদ’ এই শব্দবন্ধটি ব্যবহৃত হয়। দেহতত্ত্বের সাধনা নারী এবং পুরুষ এই যুগল অর্থাৎ বিষমকামীতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেখানে সমকামীতার কোন জায়গা নেই। অথচ এই শব্দবন্ধটি লেখিকা ব্যবহার করলেন সমকামী সম্পর্কের ক্ষেত্রে। ধারণার এই পুনর্নির্মাণটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং মুগ্ধকর।

---

[২] লালন ফকিরের গান।

**পরিশেষ**

টেক্সটগুলি পর্যালোচনা করার পর দেখা যাচ্ছে, লেখকের অভিজ্ঞতার জগৎ, অনুভবের জগৎ এবং সংযুক্তির পরিধির ভিন্নতা আবাসজীবন কেন্দ্রিক স্মৃতিকথার, উপন্যাসের ভাষা বদলে দেয় আমূল। একই স্থান, পরিসর, বিশ্ববিদ্যালয় এবং হস্টেলে ছাত্রীদের বসবাসের অভিজ্ঞতা বদলে যায়, বদলে যায় ব্যক্তির চেতনা প্রবাহ, বদলে যায় অভিজ্ঞতার, স্মৃতি প্রকাশের ভাষা। সাহিত্যে প্রতিফলিত 'আত্ম' এর উপস্থাপন বদলে যায়। 'আবাসিক', 'ছাত্রী', 'গবেষক' এবং 'লেখক' এই আত্মপরিচিতি এবং আত্মবোধের বহিঃপ্রকাশ আলাদা হয়ে যায় সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে। কারণ তাদের ঔচিত্য-অনৌচিত্য, ভালো লাগা মন্দ লাগার বোধ আলাদা, আনন্দ দুঃখের হেতু আলাদা। পারিপার্শ্বের সঙ্গে সম্বন্ধ আলাদা, বিদ্যমান ক্ষমতা সম্পর্কের মধ্যে অংশগ্রহণ এবং দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। এই ভিন্নতাগুলি ছাত্রীদের নিকট বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কের চেহারা বদলে দেয়, বদলে যায় সৃষ্ট সাহিত্যের ভাষা,বক্তব্য এবং দৃষ্টিকোণ। এছাড়াও অমিতা সেন, কৃষ্ণা বসু, রানী চন্দের শান্তিনিকেনের স্মৃতিকথায় শান্তিনিকেতনের মেয়েদের আবাসজীবনের কথা উঠে এসেছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিষয়টি বিশদে আলোচিত হয়েছে। আত্মজীবনীতে রয়েছে আবাসজীবনের বিশদ বর্ণনা। আখতার ইমাম 'ইডেন থেকে বেথুন', 'আত্মজীবনী' ইত্যাদিতে নিজের ছাত্রাবস্থায় আবাসজীবন এবং কর্মসূত্রে আবাসের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। নারী নিম্নবর্গের আবাসজীবন তার যাবতীয় বিশেষত্ব সমেত সাহিত্যে উঠে আসাটিও একটি সামাজিক রূপান্তরের প্রক্রিয়া। ভারতীয় দলিত সাহিত্যে এই বিষয়টি অন্বেষণের অবকাশ রয়েছে। বাংলা সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে মেয়েদের আবাসজীবনের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা প্রতিফলিত হয়ে চলেছে। বাংলা সিনেমায় আবাসজীবন উল্লেখযোগ্যভাবে চিত্রিত হয়েছে। সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'পথের পাঁচালী'-র পরবর্তী সংযোজন 'অপরাজিত'-তে অপু কলকাতায় এসে মেসে থাকত। 'সাড়ে চুয়াত্তর'-এও মেসবাড়ির দেখা মেলে। 'বসন্তবিলাপ' সিনেমায় ছেলেদের ও মেয়েদের মেস পাশাপাশি দেখানো হয়েছে। খুব সম্প্রতি 'গার্লস হস্টেল' নামে একটি ওয়েব সিরিজ এ মেয়েদের হস্টেলের ছবি উঠে এসেছে বাস্তবসম্মত ভাবে। পরবর্তীতে এই বিষয়ে আলোচনার পরিসর মুক্ত রইল।

একদিকে উচ্চশিক্ষা জগতে প্রান্তিক ছাত্রীদের আগমন যেমন সংরক্ষণ সত্ত্বেও সীমিত, অন্যদিকে সাহিত্যেও দেখা যাচ্ছে এই স্বরের অভাব। তারা উচ্চশিক্ষা থেকে লব্ধ নবনির্মিত আত্মবোধ নিয়ে এগিয়ে যাবার সুযোগ পাচ্ছে কম যার ফলে যেমন চাকরিতে যুক্ত হয়ে অর্থনীতিতে অংশ নিতে পারছে না অন্য দিকে তাদের স্মৃতিকথাও সাহিত্যে আসছে না। তারা উপস্থাপিত হচ্ছেন অন্যের লেখনিতে। ছাত্রী, গবেষক, এবং একজন স্বতন্ত্র  নারী হিসাবে নিজেদের সত্তা বা পরিচিতির অংশ যেমন রক্ষা করে এগিয়ে যাবার পথে একটা সময় থেমে যেতে বাধ্য হচ্ছেন, তেমনি লেখক সত্তাটিকেও তারা ধারণ করার অবকাশ পাচ্ছেন না। অথবা সাংস্কৃতিক মুলধনের অভাবে, গ্রহণযোগ্যতার অভাবে তাদের শিক্ষাজীবনের, আবাসজীবনের অভিজ্ঞতা আড়ালে থেকে যাচ্ছে। উচ্চশিক্ষার মতই সাহিত্যে, স্মৃতিকথায় তাদের স্বরের শূন্যতা লক্ষ করার মত।

# উপসংহার

# উপসংহার

বিশ্ববিদ্যালয় ও আবাসজীবনের প্রভাব প্রান্তিক ছাত্রীদের একটি সামাজিক রূপান্তরের প্রবহমানতায় সামিল করেছে। একদিকে শিক্ষা, তথ্য ও সম্পদের লভ্যতা তাদের নিজের লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করছে, অন্যদিকে বিদ্যমান ক্ষমতা সম্পর্ক তাদের সীমা বেঁধে দিতে চায়। প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক ছাত্রীরা তাদের শিক্ষাজীবনে লিঙ্গ, শ্রেণি এবং জাতি ভিত্তিক বৈষম্যের এই ত্রিমাত্রিক বাস্তবতায় সম্মুখীন হন। পরিবার থেকে বাইরে হস্টেলে, বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে তারা নিজেদের সম্ভবনা একদিকে যেমন চিনে নেন, তেমনি 'প্রাপ্ত বাস্তবতা' থেকে বেরিয়ে 'অর্জিত বাস্তবতা' কে গ্রহণ করার সুযোগ পান। যে ভাবে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ তাদের দেখতে চায়, যে লৈঙ্গিক ভূমিকা পালনের প্রত্যাশা করে তার বাইরে তারা নিজেদের জীবন গড়ে নেয় নিজেদের ইচ্ছার আদলে। বৈষম্যের যাবতীয় মানদণ্ডের একবারে শেষ প্রান্তে যে নারীর অবস্থান উচ্চ শিক্ষা তাকে আদৌ কোথাও পৌঁছে দিতে পারে কিনা এই অনুসন্ধিৎসা থেকে যে গবেষণার সূত্রপাত, সেই গবেষণা অন্তে দেখা যাচ্ছে যে বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানকে তারা নিজেদের 'ভাগ্য বদল'-এর কেন্দ্র হিসাবে দেখেছিল এবং যে গণতান্ত্রিক পরিসরে তাদের একাত্ম হয়ে ওঠার কথা ছিল সেখানেও তারা প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতা সম্পর্কের সম্মুখীন।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিকাঠামো এবং পরিসরের সঙ্গে প্রান্তিক প্রথম প্রজন্মের ছাত্রীদের এই দূরত্ব শেষ পর্যন্ত সাংস্কৃতিক, যা অংশগ্রহণকারীদের সাক্ষাৎকার থেকে প্রতিফলিত। ভিন্ন পরিমণ্ডল, ভিন্ন অভিজ্ঞতা জগত থেকে এসে তারা যে বিষয়গুলিতে সমস্যায় পড়ছে এবং মানিয়ে নিতে পারছে না সেগুলি একদিকে পরিকাঠামোগত অপ্রতুলতা এবং সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব প্রসূত। তারা নিজেদের অভিজ্ঞতার জগত থেকে কিছু উপাদান সিলেবাসে, পরিসরে, পরিকাঠামোয় পর্যাপ্ত পরিমাণে দেখতে পায় না, শুধুমাত্র কমতি নিয়ে, সমস্যা নিয়ে তারা আসে না, বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর তাদেরকে বোঝার এবং লালনের দায়িত্ব বর্তায়, তাদের সমস্যা, তাদের অপারগতা এই আলোচনার প্রবণতার মধ্যে একটি অসংবেদনশীলতা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা যে 'উচুঁ', 'অনতিক্রম্য' কিছু মানদণ্ডে খাপ খাওয়াতে আসে নি, এই পরিসরটি বাকীদের মত তাদেরও, এই বোধ গড়ে তোলার অবকাশ তৈরি হওয়া অবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের 'কমতি'গুলি শুধুমাত্র চিহ্নিত না করে যদি তাদের কমতিগুলি নিরাময়ের চেষ্টা করা হয় তাহলে তারা এই পরিসর নিজেদের বলে চিনতে পারবে এবং বেখাপ হয়ে ওঠা, বিচ্ছিন্নতার বোধ লাঘব হবার রাস্তা নির্মিত হবে। স্বদেশি শিক্ষার পুনর্গঠনের মধ্যে প্রান্তিক স্বর উঠে আসার যে সূচনা ছিল তা সংরক্ষণ, সংস্কারের মাধ্যমে বর্তমানে রূপান্তরের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। বিদেশি শাসকের শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং প্রকৃতির বাইরে স্বদেশি শিক্ষার পুনর্গঠন ফলপ্রসূ হয়েছিল উচ্চবর্ণের পুরুষের জন্য, পরবর্তীকালে এই পরিসরে, পরিকাঠামোয় উচ্চবর্ণের নারী সংগ্রাম করেছে, সাংবিধানিক সংরক্ষণ, সংস্কার, সামাজিক এবং

জাতি বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের হাত ধরে প্রান্তিক পুরুষ এবং পরিশেষে প্রান্তিক নারী এই পরিসরকে গণতান্ত্রিক করে তোলার এবং ভিন্ন স্বরের স্বীকৃতির লড়াই করেছে। প্রান্তিক নারীর উচ্চশিক্ষায় অবস্থান এখনও রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে – যা এই গবেষণা থেকে উপলব্ধ হয়। গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতা থেকে আরো দেখা যাচ্ছে যে সার্বিক রূপান্তর না হলে উচ্চশিক্ষাসূত্রে লব্ধ নবনির্মিত আত্মবোধ প্রান্তিক নারীর জন্য সমস্যা সংকুল হয়ে উঠছে যা তাদের বেখাপ করে তুলছে সামাজিক পরিসর এবং প্রতিষ্ঠানে। আশাপ্রদ এই যে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে প্রান্তিক ছাত্রীরা যে সমস্যায় পড়ছেন এবং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যে সংঘাত তৈরি হচ্ছে তা মূলত উচ্চশিক্ষা পরিসরের 'রূপান্তর' এর পথ প্রশস্ত করছে।

উচ্চশিক্ষা সূত্রে বিশ্ববিদ্যালয় পরিসর থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা এবং হস্টেলে নিজস্ব পরিসরে আত্ম আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রান্তিক ছাত্রীদের মধ্যে নবনির্মিত আত্ম গড়ে ওঠে, সেই আত্ম একদিকে যেমন তাদের সামাজিক, পারিবারিক পরিসরে এবং নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে বেখাপ করে তুলছে তেমন এই নবনির্মিত আত্মের জন্য তারা নিজেরা নিজেদের জীবনের সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়ে উঠছে, কোনো বিষয়ে আলোচনা, তর্ক, এবং প্রতিরোধ করার জন্য নিজেকে সক্ষম করে তুলতে পারছে। পরিবারের বাইরে, সমাজের নির্দিষ্ট গন্ডির বাইরে উচ্চশিক্ষা সূত্রে প্রান্তিক মেয়েদের নবনির্মিত আত্মবোধ গঠন এবং ক্ষমতায়নের ভিত্তি প্রস্তুত করা উচ্চশিক্ষায় প্রান্তিকতার স্বর বলিষ্ঠ করতে সহায়তা করছে। সামাজিক নিয়ম, বিয়ে, বয়স, পরিবার, বাহ্যিক পরিসর ইত্যাদিকে চ্যালেঞ্জ করে তারা নিজেদের জীবনে স্ব-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়ে উঠছেন অনেক ক্ষেত্রে। তাদের জন্য এই রাস্তা সহজ নয়, পরিবার, সমাজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হস্টেল সর্বত্র বিদ্যমান ক্ষমতা সম্পর্ককে প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জ করা এবং নিজের জায়গায় অধিষ্ঠিত থাকা সহজ নয়,তারা ক্ষমতায়নের এই প্রক্রিয়া ক্রমাগত চালিয়ে গেছে। স্কুল বা কলেজ থেকে যে কারন গুলির জন্য প্রান্তিক ছাত্রীরা পড়াশোনা ছেড়ে দেন, অন্যকাজে বা বিয়ে ইত্যাদিতে নিয়োজিত হন, উচ্চশিক্ষায় এসে এই ছাত্রীরা সেই সমস্ত কারণ গুলো অস্বীকার এবং অতিক্রম করে টিকে আছে। প্রথম পর্যায় গুলির সাক্ষাৎকার গুলিতে তাদের ক্ষোভ, হতাশা ঝড়ে পড়লেও ক্রমে দেখা যায় তারা পরবর্তী সাক্ষাৎকার গুলিতে ধীরে ধীরে নিজেদের মেলে ধরছেন, কিভাবে তারা প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে টিকে আছে, কিভাবে তারা দিশাহীন হয়ে গিয়েও স্বশক্তিতে নিজেদের উদ্বোধিত করেছেন, তার কথা বলেন। ওরাল ন্যারেটিভের এই অসীম সম্ভবনা যেখানে ব্যক্তির সময়ের ভিত্তিতে বদল চিহ্নিত করা যায়। এখন প্রশ্ন, পরিকাঠামোর সঙ্গে প্রান্তিক ছাত্রীদের অবস্থানগত দূরত্ব কি এই ছাত্রীদেরই দায়িত্ব অতিক্রম করার?

**অংশগ্রহণকারীদের পলিশি নির্মাণের পরামর্শ**

ছাত্রীরা নিজেদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণকালে যে ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন তার ভিত্তিতে তারা পরিকাঠামোগত ভাবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে কিছু নতুন পলিশি এবং পরিবর্তন চান যাতে তাদের পরবর্তী

কালের 'প্রান্তিক' ছাত্রীদের পাঠ অভিজ্ঞতা ভিন্ন হয়। গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রী এবং গবেষকরা যে সমস্যাগুলিতে পড়ছেন এবং সেই সূত্রে তারা যে ধরনের পরামর্শ দিয়েছেন এখানে উল্লিখিত হল।

১। শুধুমাত্র 'একাডেমিক' সাহায্য নয়, 'নন-একাডেমিক' হিসাবে যা কিছু ধর্তব্যের বাইরে ধরা হয়, তাদের সাহায্য মূলত সেই জায়গাগুলিতে দরকার। অর্থাৎ তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান যেহেতু তাদের বাস্তবতা তৈরি করে সেদিক থেকে তাদের কিছু নন-একাডেমিক সাহায্য দরকার। যেমন, নিরাপত্তা, খাদ্য, স্বাস্থ্য, আর্থিক স্বচ্ছলতা ইত্যাদি।

২। উচ্চশিক্ষা গ্রহণকালে মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যা প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক ছাত্রীদের প্রধান সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিদ, থেরাপিস্ট এবং কাউন্সেলিং-এর ব্যবস্থা প্রয়োজন।

৩। ভাষা বিষয়ে তারা যে সমস্যায় পড়েন এ বিষয়ে ভাষাশিক্ষার জন্য তাদের যদি বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ ব্যবস্থা রাখে।

৪। তারা যে সাহায্যগুলি পায় সেগুলি ভলেন্টারিলি সিনিয়রদের বা শিক্ষকদের কাছ থেকে পায়, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় যদি তাদের প্রত্যেকের জন্য পরিকাঠামোগত ভাবে এই ব্যবস্থাগুলি রাখে তারা উপকৃত হবে।

৫। প্রতিটি শিক্ষার পর্যায়ের সঙ্গে তাদেরকে নিয়মিত তথ্য সরবরাহ করার ব্যবস্থা, একটি ডিগ্রি লাভ করার পর কি ধরনের কাজ তারা করতে পারবে কি কি সুযোগ রয়েছে সে সম্পর্কে অবগত করা।

৬। বিশ্ববিদ্যালয় শুধু 'শিক্ষার' দায়িত্ব নিলে তাদের পক্ষে 'উচ্চশিক্ষিত' হয়ে ওঠা অসুবিধাজনক। সেক্ষেত্রে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের কিছু দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় নিলে তারা উপকৃত হবে। এই কথা বারবার ছাত্রীদের সাক্ষাৎকারে উঠে আসছে।

৭। এই ছাত্রীদের মূল সমস্যা অবিভাবকত্বের। শিক্ষাকদের একটি মেন্টর গ্রুপ যদি তাদের সাপ্তাহিক বা মাসিক ভাবে মিটিং এর মাধ্যমে অভিভাবকত্ব প্রদান করেন, পাশে আছেন একথা ও জানান এবং তাদের পড়াশোনা ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত কথা বলেন, তাদের আত্ম বিশ্বাস গড়ে উঠতে সহায়তা হবে।

৮। নিজের গোষ্ঠী ছেড়ে ভিন্ন পরিসরে এসে তারা যে বিচ্ছিন্ন এবং একক হয়ে পড়ে নি এর জন্য তাদের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে যুক্ত করা দরকার।

৯। ছাত্রাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় কিছু ইন্টার্নশিপের কাজ যদি তারা পায় তাদের সুবিধা হবে।

১০। তথ্য না জানা এবং পরিস্থিতি অনুধাবন করতে না পারার জন্য তাদের যে অ্যাংজাইটি, অস্থিরতা এবং দুশ্চিন্তা তার জন্য তাদের সহযোগিতা এবং সহমর্মী শিক্ষক দের সান্নিধ্য দরকার। ক্রমে সিনিয়ররা যাতে এই ভূমিকাটি নিতে পারে তার একটি সংস্কৃতি গড়ে তোলা প্রয়োজন।

১১। হস্টেলে বিনামূল্যে তাদের থাকার ব্যবস্থা ইতিমধ্যে রয়েছে, হস্টেলে সুষম খাদ্য প্রয়োজন।

১২। কোনো কোর্স শুরু করার আগে কি কি বিষয়ে তাদের সমস্যা রয়েছে সেগুলি চিহ্নিত করে পরামর্শ দিয়ে ব্যবধানগুলি দূর করলে এই ছাত্রীরা উপকৃত হবেন।

১৩। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে সবার নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি উপস্থাপনের সুযোগ এবং ভিন্ন সংস্কৃতিতে সংযুক্তির অবকাশ প্রয়োজন।

১৪। শিক্ষাগ্রহণের পর তাদের রোজগারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

**সীমাবদ্ধতা**

করোনাকালে এই গবেষণা পরিচালনা করতে গিয়ে কিছু সীমাবদ্ধতা তৈরি হয়েছিল। লকডাউন চলাকালীন ক্ষেত্রসমীক্ষা করা যারপরনাই সমস্যাজনক হয়ে উঠেছিল। কিছু সাক্ষাৎকার ফোনে করতে হয়েছে। সম্মুখে সাক্ষাৎকার এবং ফোনের মাধ্যমে করার আবশ্যিক পার্থক্য রয়েছে। এছাড়াও লকডাউনের সময় আর্কাইভ, লাইব্রেরীর ব্যবহারে সীমাবদ্ধতার ফলে কাজকর্মে দীর্ঘসূত্রতা তৈরি হয়েছিল। এখানে সময় এবং পরিসরের স্বল্পতার জন্য দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত কয়েকজন ছাত্রীর মধ্যে গবেষণাটি সীমায়িত করা হয়েছে, বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে বিষয়টি আলোচনার অবকাশ রয়েছে।

**পরবর্তী সম্ভবনা**

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বেশ কিছু সম্ভবনা পরিলক্ষিত হয়েছে। গবেষণার স্বল্প পরিসরে সবদিকগুলিতে আলোকপাত করা সম্ভব হয় নি। প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার বিষয়টি এখানে আলোচিত হয়েছে, তাদের প্রাথমিক শিক্ষা, মধ্যশিক্ষা বিষয়ে বিশদে আলোচনার অবকাশ রয়েছে, যার ধারবাহিকতায় তারা উচ্চশিক্ষায় এসে পৌঁছায়। তাদের শিক্ষাবিষয়ে পেডাগজি বা শিক্ষণ পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনার অবকাশ রয়েছে। যারা ড্রপ আউট, স্কুলছুট সেই সব প্রান্তিক ছাত্রীদের স্কুল ত্যাগের কারণ এবং কি ভাবে তারা বাকি জীবন যাপন করছেন তার একটি সমীক্ষা করা যেতে পারে। প্রান্তিক ছাত্র এবং ছাত্রীদের অভিজ্ঞতা এবং বাস্তবতার একটি তুলনামূলক সমীক্ষা করা যেতে পারে। এই ছাত্রীরা যখন শিক্ষক এবং অধ্যাপক পদে যাচ্ছেন সেখানে তাদের অভিজ্ঞতার সমীক্ষা করা যেতে পারে। এই বিষয়ে নির্মিত সাহিত্যের, সিনেমায় উপস্থাপনের সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা করা পারে। যে কোনো সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে এই প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষাগত দিক থেকে কিভাবে এবং কেন বাকী ছাত্রদের তুলনায় বেশি প্রভাবিত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হন তার একটি সমীক্ষা এবং কার্যকারণ বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। করোনাকালে এই ছাত্রীরা কীভাবে পর্যুদস্ত হয়েছেন তা অংশগ্রহণকারীদের শেষ দুটি পর্যায়ের সাক্ষাৎকার থেকে জানা গেছে।

লাইফ হিস্ট্রী রিসার্চের বিপুল সম্ভবনা পরিলক্ষিত হয়েছে গবেষণা চলাকালে। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর নির্দিষ্ট কিছু সময় অন্তর ছ'বার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। প্রতিবার তারা নতুন তথ্য যেমন দিয়েছেন তেমনি পূর্বে যা কিছু সংকোচবশত অথবা ব্যক্তিগত কারণে এড়িয়ে গেছেন, বাদ দিয়ে গেছেন, সেইসব তথ্য তারা অবলীলায় বলেছেন পরবর্তী পর্যায়গুলিতে। একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিচিত্র দিকগুলি এই মেথডে আবলোকন করার অবকাশ দেখা গেছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র সাহিত্যে ব্যক্তির উপস্থাপনের

ক্ষেত্রে বলেছিলেন, 'গোটা মানুষের মানে' উঠে আসা প্রয়োজন, কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকগণ ব্যক্তির শুধুমাত্র 'ভালোদিক', নান্দনিক দিক দেখছেন না। তাঁরা একজন ব্যক্তিকে তার সমস্ত দোষ ত্রুটি, অক্ষমতা, অসূয়া সহ দেখছেন। তাদের পর্যবেক্ষণ সার্বিক ভাবে 'মানবিক' হয়ে উঠছিল। লাইফ হিস্ট্রি রিসার্চের বিস্তৃত পরিসর সেই 'গোটা মানুষ' টিকে খুঁজে নেবার অবকাশ দেয়। একজন অংশগ্রহণকারীর কথার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে আসে তার কথন ভঙ্গি, যা কিছু সে লুকোতে চায় অথবা বিশদে প্রকাশ করে অথবা এড়িয়ে যায়, স্বতোঃপ্রণোদিত হয়ে বলে, তার ব্যক্তিসত্তা, সামাজিক সত্তার সাথে তার মনস্তাত্ত্বিক গহীন অন্ধকার উঠে আসে বিভিন্ন পর্যায়ের সাক্ষাৎকারে। উচ্চশিক্ষার গবেষণায় লাইফ হিস্ট্রী রিসার্চের সমুহ সম্ভবনা কাজে লাগানোর অবকাশ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দর্শন বর্তমানে কিভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারে সামাজিক সাম্য এবং জাতি-লিঙ্গ সাম্যের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণার অবকাশ রয়েছে। সময়ের সীমাবদ্ধতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমকালে যেভাবে সামাজিক অসাম্য দূর করে একটি স্থায়ী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন, বর্তমানেও তাঁর  শিক্ষা দর্শন রূপান্তরের পাথেয় হতে পারে। ঔপনিবেশিক পরবর্তীকালে শিক্ষার পুনর্গঠনের ধারাবাহিকতা কিভাবে সাসটেনেবল এবং সময়োপযোগী রূপান্তর ঘটাতে পারে এবিষয়ে পরবর্তী গবেষণার অবকাশ রয়েছে। এছাড়াও দলিত, প্রান্তিক ছাত্রীদের শিক্ষাজীবন, আবাসজীবনের অভিজ্ঞতার উপস্থাপন বিষয়ে কিভাবে সাহিত্যের পাশাপাশি সিনেমায় একটি শূন্যতা রয়েছে এবিষয়ে সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে কাজের অবকাশ রয়েছে। বাংলা সাহিত্যে নির্মীয়মান যে ধারা গড়ে উঠেছে মেয়েদের শিক্ষার অভিজ্ঞতার হাত ধরে, আবাসজীবনকে কেন্দ্র করে সেখানে ক্রমে দেখা যাচ্ছে বহুস্বরের উপস্থিতি। আন্তঃস্তর বিন্যাস ধীরে ধীরে পরিলক্ষিত হচ্ছে এই সাহিত্যের উপস্থাপনে। সাক্ষাৎকারে যেমন তাদের শিক্ষার অভিজ্ঞতার বিশেষত্ব প্রকাশিত হয়েছে এই অভিজ্ঞতার স্বাতন্ত্র্য সাহিত্যেও প্রতিফলিত। ব্যক্তির অবস্থান, ব্যক্তির সংযুক্তির বোধ অনুযায়ী নির্মিত হয় একজন ব্যক্তির অভিজ্ঞতা, যা ভিন্ন অবস্থানের, ভিন্ন সংযুক্তি বোধে অন্বিত কারো পক্ষে পুরোপুরি অনুধাবন করা সম্ভব হয়না। একমাত্র অংশগ্রহণকারীদের বয়ান এবং স্মৃতিকথার আলেখ্য তাদের অনুভূত বাস্তবতার প্রতীতি তৈরি করে। এই গবেষণায় দুটি উপাদান, সাক্ষাৎকারের বক্তব্য এবং স্মৃতিকথার ভিত্তিতে নির্মিত হয়েছে। লাইফ হিস্ট্রী রিসার্চে এই দুটি উপাদান বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়। এই গবেষণা করতে গিয়ে লাইফ হিস্ট্রী রিসার্চের বিপুল সম্ভবনা উপলব্ধ হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, মূলস্রোত নিজের যাপিত জীবন আর তার জ্ঞাননির্মাণ বিষয়ে যখন শতভাগ নিশ্চিত নয়, বরং পুরোপুরি দ্বিধান্বিত এবং সংশয়িত। তখন তথাকথিত পিছিয়ে থাকা বা রাখা মানুষজনকে 'শিক্ষা' দিয়ে মূলস্রোতভুক্ত করার মধ্যে একটি নিরর্থকতা আছে। তার যাবতীয় বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্রকে লালন না করে কয়েকটি পরিমাপ দিয়ে তাকে মেপে নেওয়ার মধ্যে রয়েছে ক্রূরতা। তার ভাষা, পোশাক, শিক্ষণ প্রণালী, খাদ্য, চিন্তা করার পদ্ধতিকে অস্বীকার করে, দূর্বলতা মনে করে তাকে 'মূলস্রোত' এর চর্চিত

বিষয়ে চলতে বাধ্য করা একটি কাঠামোগত সমস্যা। ক্ষমতাশালী পক্ষের 'সংস্কৃতি' আরোপ করে তাকে কয়েকটি মানদণ্ডে দণ্ডিত করার মত নিষ্ঠুরতা হয়ে আসছে যদিও বহু শতাব্দী জুড়ে। জাতি এবং উপজাতিগুলি গৃহীত হোক তাদের সমস্ত বৈচিত্র্য সমেত। শিক্ষা যেন তাদের অন্তর্ভুক্তির একটি কৌশলমাত্র হয়ে না দাঁড়ায়, শিকড় বিচ্যুত করে 'নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি' হয়ে ওঠাই যেন শেষকথা না হয়ে দাঁড়ায়। প্রামাণ্য নিয়ম এবং সূচকের ভিত্তিতে শিক্ষার সাফল্যে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, দীর্ঘ শতক জুড়ে গড়ে ওঠা নিজস্ব জ্ঞানতন্ত্র যেন নস্যাৎ না হয়ে যায়। উচ্চশিক্ষার পরিসর প্রান্তিক ছাত্রছাত্রীদের 'স্ট্রাগল' করার জায়গা না হয়ে প্রস্ফুটিত হবার পরিসর হয়ে উঠুক। বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা পরিসরে 'পিছিয়ে রাখা' ছাত্রীদের আগমন যেন 'অনুপ্রবেশ' না হয়ে সহজ হয়ে ওঠে এবং তারা এই পরিসর নিজেদের পরিসর হিসাবে নিজেদের অংশিদারিত্ব চিনতে পারে। গবেষণায়, আলোচনায় তারা যেন 'বিষয়' থেকে ক্রমে 'বিষয়ী' হয়ে ওঠে। উচ্চশিক্ষা পরিসর যেন শুধুমাত্র দৃশ্যমানতায় এবং সংরক্ষিত আসনে কয়েকটি সংখ্যায় তাদের অস্তিত্বের প্রমাণ না হয়ে, তাদের স্বতন্ত্র স্বর প্রতিষ্ঠার সাবলীল ক্ষেত্র হয়ে ওঠে।

# পরিশিষ্ট

# পূর্ণ নাম

জে আর এফ – জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ।

আর জে এন এফ – রাজীব গান্ধী ন্যাশনাল ফেলোশিপ।

এন এফ ও – ন্যাশনাল ফেলোশিপ ফর আদার ব্যাকোয়ার্ড ক্লাশ।

এ আই এস এইচ ই – অল ইন্ডিয়া সার্ভে অন এডূকেশন।

ও বি সি - আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাশ। (অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়)

এস টি – সিডিউল ট্রাইব। (তপশিলী উপজাতি)

এস সি – সিডিউল কাস্ট। (তপশিলী জাতি)

যা বি – যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

বি বি – বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

ইউ সি সি – ইউনিফর্ম সিভিল কোড।

# গ্রন্থপঞ্জি

# গ্রন্থপঞ্জি

## বাংলা গ্রন্থপঞ্জি


অধিকারী, শচীন্দ্রনাথ, (১৯৭৪), *শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ,* জিজ্ঞাসা, কলকাতা।

আখতার, ইমাম, (১৯৯০), *ইডেন থেকে বেথুন,* সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

আখতার, ইমাম, (১৯৯৩), *আমার জীবনকথা* (১৯১৭-১৯৫০), প্রকাশক- আখতার ইমাম, ঢাকা।

আখতার, ইমাম, (২০০২), *আমার জীবনকথা* : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫২-১৯৮২), সেগুন বাগিচা. ঢাকা।

উলফ, ভার্জিনিয়া, (অনুবাদ- অনসূয়া গুহ), (২০০২), *নিজস্ব এক ঘর,* প্যাপিরাস, কলকাতা।

কর, সাধনা, (১৩৪৮,শ্রাবণ), *আমাদের গুরুদেব,* প্রবাসী, প্রবাসী প্রেস, কলকাতা।

কর, সুধীন্দ্রনাথ, (১৩৬০), *শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা,* ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা।

কর, সুধীরচন্দ্র, (১৯৬৩), *কল্যাণব্রতী রবীন্দ্রনাথ,* এস সি সরকার, কলকাতা।

কর্মকার, মধুপর্ণা, (২০১৮), *গার্লস হস্টেল: আবাসিক নারীর মানসভূমি,* একলব্য, কলকাতা।

ঘোষ, অমিত, ভট্টাচার্য, বৈশাখী, (২০০৭), *জাতের নামে বজ্জাতি,* কাল রবিবার, কলকাতা।

ঘোষ, ঈশানচন্দ্র, (১৯৮৩), *জাতকে পুরাতত্ত্ব,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা।

চক্রবর্তী, অজিতকুমার, (১৩৯৭), ব্রহ্মবিদ্যালয়, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা।

চক্রবর্তী, রমা, (১৪০৮), *ভরা থাক স্মৃতিসুধায়,* টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতা।

চক্রবর্তী, শিবরাম, (১৪২৫), *শিবরাম রচনা সমগ্র, অখন্ড সংস্করণ,* অন্নপূর্ণা প্রকাশনী, কলকাতা।

চক্রবর্তী, স্মরণজিৎ, (২০০৯), *আমাদের সেই শহরে,* আনন্দ, কলকাতা. প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী, ষষ্ঠ মুদ্রণ মার্চ ২০১৯।

চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল, (২০০৯), *সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ,* রত্নাবলী, কলকাতা।

চন্দ, রানী, (১৩৪৯), *আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা।

চন্দ, রানী, (১৩৬৯), *গুরুদেব,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা।

চন্দ, রানী, (১৪০১), *সব হতে আপন,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, শান্তিনিকেতন।

চৌধুরী, চিত্রনিভা, (২০১৭), *রবীন্দ্রস্মৃতি.* বেঙ্গল পাবলিকেশন, কলকাতা।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (১৩২২), *স্ত্রীশিক্ষা,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, শান্তিনিকেতন।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (১৩৮১, পুনর্মুদ্রণ -১৪১৭), *চিঠিপত্র ১১ খন্ড,* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (১৩৮১, পুনর্মুদ্রণ -১৪১৭), *চিঠিপত্র ১১ খন্ড,* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (১৩৮১, পুনর্মুদ্রণ -১৪১৭), *চিঠিপত্র ১১ খন্ড,* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (১৩৮১, পুনর্মুদ্রণ -১৪১৭), *চিঠিপত্র ১১ খন্ড,* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (১৩৯৬), (সুলভ সংস্করণ, পুর্নমুদ্রণ-১৪১৭), *রবীন্দ্র – রচনাবলী - দশম খন্ড (ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত, রাশিয়ার চিঠি),* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (১৩৯৬), *সুলভ সংস্করণ, পুর্নমুদ্রণ -১৪১৭, রবীন্দ্র – রচনাবলী - চতুর্দশ খন্ড, (আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম),* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (১৩৯৬), *সুলভ সংস্করণ, পুর্নমুদ্রণ -১৪১৭, রবীন্দ্র – রচনাবলী - চতুর্থ খন্ড, (ঘরে বাইরে, ব্রাহ্মণ),* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (১৩৯৬*), সুলভ সংস্করণ, পুর্নমুদ্রণ -১৪১৭, রবীন্দ্র -রচনাবলী* - পঞ্চদশ খন্ড।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (১৩৯৬), *সুলভ সংস্করণ, পুর্নমুদ্রণ -১৪১৭, রবীন্দ্র – রচনাবলী - তৃতীয় খন্ড. (গোরা),* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (১৩৯৬, পুনর্মুদ্রণ ১৪১৭) *রবীন্দ্ররচনাবলী - চতুর্দশ খন্ড, (আশ্রমের রূপ ও বিকাশ),* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (১৩৯৬, পুনর্মুদ্রণ ১৪১৭), *রবীন্দ্ররচনাবলী - পঞ্চদশ খন্ড,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (১৩৯৬, পুনর্মুদ্রণ ১৪১৭), *রবীন্দ্ররচনাবলী - সপ্তম খন্ড,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (১৪১৭), *নবযুগ, রবীন্দ্র – রচনাবলী - দ্বাদশ খন্ড,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (১৪১৭), *পল্লীপ্রকৃতি প্রবন্ধ গ্রন্থ (পল্লীসেবা, ১৯৪০), রবীন্দ্ররচনাবলী - ১৪ খন্ড,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (১৪১৭), *শিক্ষা, রবীন্দ্র – রচনাবলী - ষষ্ঠ খন্ড, সপ্তদশ খন্ড,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *(১৯০৮), শিক্ষা,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, শান্তিনিকেতন।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (১৯৯২), *চিঠিপত্র ১৩ খন্ড,* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (১৯৯২), *চিঠিপত্র ১৩ খন্ড,* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (১৯৯২), *চিঠিপত্র ১৩ খন্ড,* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।

দাশ, নির্মল, (১৪০৪), *চর্যাগীতি পরিক্রমা, দে'জ* পাবলিশিং, কলকাতা।

দাস, ড. ক্ষুদিরাম, (১৯৫৮), *সমাজ প্রগতির রবীন্দ্রনাথ,* ইউ এন ধর অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিমিটেড, কলকাতা।

দেবী, ইন্দিরা, (১৩৬৮), *আবির্ভাব,* শরৎ পুস্তকালয়, কলকাতা।

দেবী, মহাশ্বেতা, (২০০১), *আমাদের শান্তিনিকেতন,* সৃষ্টি প্রকাশন, কলকাতা।

দেবী, হেমবালা, (কার্তিক চৈত্র, ১৩৪৮/১৯৪১), *রবীন্দ্র স্মৃতি পূজা,* প্রবাসী, প্রবাসী প্রেস, কলকাতা।

নাথ, আভা, (১৪০৭), *সমাজচিন্তায় রবীন্দ্রনাথ,* টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতা।

নিয়োগী, অখিল, (২০১২), *বাবুইবাসা বোর্ডিং,* আদিত্য পুস্তকালয়, কলকাতা।

নিয়োগী, বানী, (২০০১), *শ্রীসদনের ইতিকথা,* রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতন।

পাল, প্রশান্তকুমার, (১৯০৮ -১৯১৪), *রবিজীবনী - ষষ্ঠ খন্ড,* আনন্দ, কলকাতা।

পাল, প্রশান্তকুমার, (১৯৮২, ১৯৮৪ -৯৩), *রবিজীবনী- ১ ম খন্ড,* ভূর্জপত্র, কলকাতা।

পাল, প্রশান্তকুমার, (১৯৯৩), *রবিজীবনী ৬ ষ্ঠ খন্ড,* আনন্দ পাবলিসার্শ, কলকাতা।

*প্রবাসী,* অগ্রহায়ণ সংখ্যা, (১৩৩০), প্রবাসী প্রেস, কলকাতা।

বন্দোপাধ্যায়, অ, (১৩৭১/১৮৮৬), *মহিলাদের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ,* বিশ্বভারতী, কলিকাতা।

বন্দোপাধ্যায়, অরুনেন্দু, (১৯৯৭, ২৬ শে জুলাই), *রবীন্দ্রনাথের ডিজাইন ভাবনা,* দেশ, কলকাতা।

বন্দোপাধ্যায়, জ্যোৎস্না, (১৩৯১)*, আমাদের শান্তিনিকেতনে যা দেখেছি যা পেয়েছি,* নিউ বেঙ্গল প্রেস, কলকাতা।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণেন্দু, (১৯৯৭, ২৬ জুলাই), *রবীন্দ্রনাথের ডিজাইন ভাবনা,* দেশ, কলকাতা।

বসু, ঋতা, (২০১৬), *শ্রীসদনের শ্রীমতীরা,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

বসু, কৃষ্ণা, (১৯৯৮), *আমার শান্তিনিকেতনের দিদিরা,* পুনশ্চ, কলকাতা।

বাগচী, বাসন্তী, (২০০১), *সেকালিনীর আত্মকথা,* ভাষাবিন্যাস, কলকাতা।

*বিশ্বভারতী অ্যানুয়েল রিপোর্ট,* (১৯২৯), শান্তিনিকেতন।

*বিশ্বভারতী নিউজ,* (১৯৩২), ডিসেম্বর সংখ্যা, শান্তিনিকেতন।

*বিশ্বভারতী নিউজ,* (১৯৩৪), জুলাই সংখ্যা, শান্তিনিকেতন।

*বিশ্বভারতী পত্রিকা,* (১৩৩২), আশ্বিন সংখ্যা, শান্তিনিকেতন।

*বিশ্বভারতী বুলেটিন,* (১৯২৮), এপ্রিল সংখ্যা, শান্তিনিকেতন।

বিশ্বাস, অহনা, (২০০০) *অহনা বিচিত্রা, আরশি নগরে তাঁবু,* প্রথম সংস্করণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা (পৃষ্ঠা ৩-১১২)

বিশ্বাস, অহনা, (২০০৯), *মেয়েদের হস্টেল-জীবন অন্দরের কথামালা,* গাঙচিল, কলকাতা।

বোভোয়ার, সিমোন দ্য, (২০১২), *দ্বিতীয় লিঙ্গ,* আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

ভট্টাচার্য, অমিত, (২০২৩), *যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাসে ও ব্যক্তিদর্পণে (১৯০৬-২০১৭),* সেতু পাবলিকেশন, কলকাতা।

ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, (২০২০), *শান্তিনিকেতনে সেকাল,* দেশ, কলকাতা।

ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, (২০২০), *স্মৃতির লিপিমালা,* দেশ, কলকাতা।

ভট্টাচার্য, বিদ্যাভূষণ, দিগিন্দ্রনারায়ণ, (১৯২৮), *জাতিভেদ,* গ্রন্থকার, কলকাতা।

মজুমদার, তিলোত্তমা, (২০০৩), *চাঁদের গায়ে চাঁদ,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, (১৩৫৯), *রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খন্ড,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা।

মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, (১৩৫৯), *রবীন্দ্রজীবনী, ৩য় খন্ড,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা।

মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, (১৯৩৬), *রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক, ৪ র্থ খন্ড,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা।

রায়, আলপনা, (২০০১), *ঐ আসন তলে,* সপ্তক, শান্তিনিকেতন।

রায়, আলোক, (২০১০), *সাহিত্যকোষ কথা সাহিত্য,* সাহিত্যলোক, কলকাতা।

রায়, নীহাররঞ্জন, (১৯৪৭), *বাঙ্গালী হিন্দুর বর্ণভেদ,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা।

*শান্তিনিকেতন পত্রিকা,* (১৩২৮ – ১৯২১), মাঘ সংখ্যা, শান্তিনিকেতন।

*শান্তিনিকেতন পত্রিকা,* (১৩২৮), মাঘ সংখ্যা, শান্তিনিকেতন।

*শান্তিনিকেতন পত্রিকা,* (১৩২৯), মাঘ সংখ্যা, শান্তিনিকেতন।

*শান্তিনিকেতন পত্রিকা,* (১৩৩০), আশ্বিন সংখ্যা, শান্তিনিকেতন।

*শ্রেয়সী বিশেষ সংকলন সংখ্যা,* (১৪২২/২০১৬), আলাপিনী মহিলা সমিতি, নতুনবাড়ি, শান্তিনিকেতন।

*শ্রেয়সী,* নব পর্যায়, (৭ই পৌষ, ১৩৯৮), শ্রদ্ধেয় হেমবালা স্মরণে, আলাপিনী মহিলা সমিতি, শান্তিনিকেতন।

*শ্রেয়সী,* নব পর্যায়, (৭ই পৌষ, ১৩৯৮), শ্রীসদনের অধ্যক্ষা হেমবালা সেন, আলাপিনী মহিলা সমিতি, শান্তিনিকেতন।

শ্রেয়সী, রবীন্দ্র প্রদক্ষিণ সংখ্যা, (১৯৮৯), গুরুদেবের আশ্রমে ছাত্রীজীবন, আলাপিনী মহিলা সমিতি, শান্তিনিকেতন।

সরকার, তারকচন্দ্র, (১৯৭১), *শ্রী শ্রী হরিলীলামৃত, সপ্তম সংস্করণ,* ইন্টারনেট আর্কাইভ।

সরকার, স্বরোচিষ, (২০০৫), *অস্পৃশ্যতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ,* প্রতীক প্রকাশনা, ঢাকা।

সিংহ, দীক্ষিত, (২০১০), *রবীন্দ্রনাথের পল্লী পুনর্গঠন প্রয়াস,* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি, কলকাতা।

সুর, অতুল, (১৯৭৭), *বাঙ্গালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়,* জিজ্ঞাসা, কলকাতা।

সেন, অমিতা, (১৩৮৯), *আনন্দ সর্বকাজে,* টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতা।

সেন, অমিতা, (১৯৭৭), *শান্তিনিকেতনে আশ্রমকন্যা,* টেগোর রিসার্চ ইন্সটিটিউট, কলকাতা।

সেন, অমিতা, (২০০০), *শিরিষ বকুল আমের মুকুল,* নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা।

সেন, অমিতা, (২০০১), *চলে যায় দিন,* পুনশ্চ, কলকাতা।

সেন, সুকুমার, (১৯৬২), *পরিজন-পরিবেশে রবীন্দ্র-বিকাশ,* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা।

হোসেন, সাখাওয়াত রোকেয়া, (২০১৮), *অবরোধবাসিনী,* কেয়া কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

**ইংরেজি গ্রন্থপঞ্জি**

AISHE (2010). *All India Survey on Higher Education 2010-11.* Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Government of India, New Delhi. http://aishe.nic.in/aishe/reports.

AISHE (2018). *All India Survey on Higher Education 2018-19*. Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Government of India, New Delhi. http://aishe.nic.in/aishe/reports.

AISHE (2020). *All India Survey on Higher Education 2020-21* Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Government of India, New Delhi. http://aishe.nic.in/aishe/reports.

Akerkar, S. (1995). Theory and Practice of Women's Movement in India: A Discourse Analysis. *Economic and Political Weekly*, *30*(17), WS2-WS23.

Anandhi, S. & Swaminathan, P. (2006). Making it Relevant: Mapping the Meaning of Women's Studies in Tamil Nadu. *Economic and Political Weekly*, *41*(42), 4444-4451+4454, http://www.jstor.org/stable/4418835.

Banerjee, N., Sen, S. & Dhawan, N. (2011). *Mapping the Field: Gender Relations in Contemporary India*. Stree.

Basu, S. (2015). *The Trouble with Marriage: Feminist Confront Law and Violence in India.* Orient Blackswan.

Batliwala, S. (1993). *Empowerment of Women in South Asia: Concepts and Practices.* Asian-South Pacific Bureau of Adult Education.

Batliwala, S. (2019). *All about Power: Understanding Social Power and Power Structure*. Crea.

Belluigi, D. Z. (2020). Lecture: *The Challenges Facing Social Justice in and of Higher Education*. Jadavpur University.

Belluigi, D. Z. & Thondhlana, G. (2020). Your Skin has to be Elastic: The Politics of Belonging as a Selected Black Academic at a 'Transforming' South African University. *International Journal of Qualitative Studies in Education*, *35*(2),141-162, doi:10.1080/09518398.2020.1783469.

Boserup, E. (1970). *Women's Role in Economic Development*. St. Martin Press.

Chakravarti, U. (2002). *Gendering Caste through a Feminist Lens*. Popular Prakashan.

Chellman, C. & D. J. Levitan, J. (2016). *Adult learning and pragmatic identity theory.* New Prairie Press.

Choudhury, S. (2011). What is to be done? Economies of knowledge. *Sage*, *105*(1), 7-22. https://doi.org/10.1177/0725513611400392.Corbridge.

Cornwall, A. (2016). Women's Empowerment: What Works? *Journal of International Development, 28*(3), 342-359.

Crenshaw, K. (1991). Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color. *Stanford law Review, 43*(6), 1241-1299, https://doi.org/10.2307/1229039.

Dasgupta, U. (2009). *Selected Writings on Education and Nationalism*. Oxford University Press.

Datta, K. (2007). *Women's Studies and Women's Movements in India since the 1970s: An Overview*. Asiatic Society.

Davis, N. Y. (2006). *Belonging and the Politics of Belonging*: Patterns of Prejudice. Routledge, *40*(3),197-214.

Davis, N. Y. (2011). *The Politics of Belonging: Intersectional contestations*. Sage.

Denzin, N. K. (1997). *Interpretive Ethnography: Ethnographic Practices for the 21st Century*. Sage.

Deshpande, S. (2013). Caste and Castelessness: Towards a Biography of the 'General category'*. Economic and Political Weekly, 48*(15), 32–39.

Deshpande, S. (2016). The Public University after Rohith-Kanhaiya*. Economic and Political Weekly, 51*(11), 32-34.

Dhareshwar, V. (1993). Caste and the Secular Self. *Journal of Arts and Ideas. 25 - 26, 115–126.* http://cscs.res.in/ dataarchive/textfiles/textfile.2007-08-16.9861664259/file

Dhawan, N B., Belluigi, D. Z. & Idahosa, G. EO. (2023). "There is a hell and heaven difference among faculties who are from quota and those who are non-quota": Under the Veneer of the 'New Middle Class' Production of Indian Public Universities. *Higher Education, 86,* 271-296. https://doi.org/10.1007/s10734-022-00932-7

Dutta, N. K. (1968). *Origin and Growth of Caste in India.* Firma KLM Private Limited.

Fernandes, L. & Heller, P. (2006). Hegemonic Aspirations: New Middle-Class Politics and India's Democracy in Comparative Perspective. *Critical Asian Studies, 38*(4), 495–522.

Foucault, M. (translated by Alan Sheridan). (1975). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, Penguin Books.

Ghosh, A. (2017). Thought, Policies and Politics: How May we Imagine the Public University in India? *Kronos, 43*(1). doi.org/10.17159/2309-9585/2017/v43a11

Goffman, E. (1961). *Asylums: Essays on the Situations of Mental Patients and Other Inmates.*

GOI, Government of India. (1974). *Towards Equality: Report of the Committee on the Status of Women in India.* Ministry of Education and Social Welfare.

Govinda, R., Mackay, F., Menon, K. & Sen, R. (Eds.). (2020). *Doing Feminisms in the Academy: Identity, Institutional Pedagogy and Critical Classrooms in India and the UK.* Zubaan.

Guru, G. (Oct,1995). Dalit Women Talk Differently. *Economic & Political Weekly, 30*(41/42),2548 -2550.

Hall, J. M., Fields, B. (2015). "It's killing us!" Narratives of Black Adults about Microaggression Experiences and Related Health Stress*. Global Qualitative Nursing Research*, *2*(1), 14. doi:10.1177/2333393615591569

Harrison, B. (2009). *Life History Research*. Sage.

Hossein, R. S. (2005). *Sultana's Dream*. Penguin.

Huber, L. P. & Solorzano, D. G. (2015). *Racial Microaggressions as a Tool for Critical Race* Research. *Race Ethnicity and Education, 18*(3), 297–320. doi:10.1080/13613324.2014.994173

John, M. (2015). Intersectionality: Rejection or Critical Dialogue? *Economic & Political Weekly, 50*(33),72-76

John, M. E. (2012). Gender and higher education in the time of reforms*. Contemporary Education Dialogue, 9*(2), 197–221.

Kabeer, N. (1999). *Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment*. Blackwell.

Kabeer, N. (2001). *Conflicts over credit: Re-evaluating the Empowerment Potential of Loans to Women in Rural Bangladesh. World Development, 29*(1), 63-84.

Kanagasabai, N. (2018). Possibilities of Transformation: Women's Studies in Tier II Cities in Tamil Nadu, India. *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 39*(5), *709-722. doi*: 10.1080/01596306.2018.1448702

Kapoor, D. (2007). Gendered-Caste Violations and the Cultural Politics of Voice in Rural Orissa, India. *Gender, Place and Culture, 14*(5), 609-616. doi: 10.1080/09663690701562453

Krishnan, S. (2014). The political Economy of India's Tertiary Education: Persistence and Change*. Economic and Political Weekly, XLIX*(15), 63–70. https://www.epw.in/journal/2014/11/special-articles/political-economy-indias-tertiary-education.html

Krishnan, S. (2017). The Engineering of India's Middle-Class Politics. *Contemporary South Asia*, *25*(4), 364–379.

Kumar, R. (1995). *From Chipko to Sati: The Contemporary Indian Women's Movement In A.Basu (Ed.), The Challenge of Local Feminisms. Women's Movement in Global Perspective*, pp.29, Westview Press.

Levi, L. & Rothstein, B. (2018). To Cope with Present and Future Catastrophic Risks, Higher Education must Train Future Decision Makers to Think Critically, Ethically and in Systems. *Erudito, 2*(4), 23-26.

Majid, A. (2012). Future of Untouchables in India: A Case Study of Dalit. *South Asian Studies, 27*(1), 263-285.

Menon, N. (2012). *Seeing Like a Feminist*. Penguin. India.

Mukhopadhyay, T. & Sen, A. (2016). *Sharing the Dream–The Remarkable Women of Santiniketan*. Rabindra Bhavana, Santiniketan.

Nair, J. (2017). The Provocations of the Public University. *Economic and Political Weekly*, *52*(37), 34-41.

Nash, C, J. (2008) Re-thinking Intersectionality. *Feminist Review, 89*(1),1-15. https://doi.org/10.1057/fr.2008.

NEP (2020), National Education Policy, Ministry of Human Resource Development, Government of India.

O' Connell, M. K. (2002). *Rabindranath Tagore: the Poet as Educator*. Visva Bharati. Kolkata.

Paik, S. (2014). Dalit women's education in modern India: Double discrimination. *Routledge.*

Phadke, S., Khan, S. & Ranade, S. (2011). *Why Loiter? Women and Risk on Mumbai Streets*. Penguin.

Ramberg, S. B. (2015). *Conjugality Unbound*. Women Unlimited.

Rege, S. (1998). Dalit Women Talk Differently; A Critique of 'Difference' and Towards a Dalit Feminist Standpoint Position. *Economic & Political Weekly, 33*(44), WS39-WS46.

Rege, S. (2006). *Writing Caste/Writing Gender: Reading Dalit Women's Testimonios.* Zubaan.

Rowlands, J. (1997). *Questioning Empowerment: Working with Women in Honduras.* Oxford.

Saha, L. J. (Ed.). (1997). *International Encyclopedia of the Sociology of Education.* Pergamon.

Sastri, S. (1974). *History of Brahmo Samaj.* Sadharan Brahmo Samaj.

Satyanarayana, K, & Tharu, S. (Eds.). (2013). *The Exercise of Freedom: An Introduction to Dalit Writing.* Navayana Publishing.

Scott, S. (2011). *Total Institutions and Re-Inventive Identities.* Palgrave Macmillan.

Sen, S. (2000). Towards a Feminist Politics? The Indian Women's Movement in Historical Perspective. In K. Kapadia (Ed.), *The Violence of Development. The Politics of Identity, Gender and Social Inequalities in India.* Zubaan.

Sen, S., Biswas, R. & Dhawan, N. (Eds.). (2011). *Intimate Others: Marriage and Sexualities in India.* Stree.

Shaguri, O. R. (2013). *Higher education in India: Access, Equity, Quality. EAN World Congress Scholar. Global Access to Postsecondary Education.* https://docplayer.net/6311022-Higher-education-in-india-access-equity-quality-obadya-ray-shaguri.Html

Shastri, A. (1945). *Manusamhita.* Modern Book Agency.

Sheth, D.L. (1999). Secularisation of caste and Making of New Middle Class, *Economic and Political Weekly,* 34(34/35), 2502-10

Shreeya, A. (2018). *The Self as an Active Agent: Understanding Goffman's Theory of Resistance in Total Institutions through Life histories.* Sage.

Smith, A. V. (1961). *The Oxford History of India: From the Earliest Times to the End of 1911.* Oxford University Clarendon Press.

Smith, G. (2006). *Erving Goffman.* Routledge.

Sunder Rajan, R. (2000). Women between Community and State: Some Indications of the Uniform Civil Code Debates in India. *Social Text*, *18*(4), 55-82.

Susan, S. L. (1991). Feminist Literary Criticism: How Feminist? How Literary? How Critical. *NWSA Journal*, *3*(1), 3-19

Thapar. R. (1966). *A History of India, Vol II.* Penguin Books.

Tharu, S. & K. Lalita. (Eds). (1991) *Women Writing in India: 600 B.C. to the Present*, The Feminist Press.

Tharu, S. & Niranjana, T. (1994). Problems for a Contemporary Theory of Gender. *Social Scientist, 22*(3/4), 93-117.

Upadhya, C. (2016). Engineering Equality? Education and Im/mobility in Coastal Andhra Pradesh, India. *Contemporary South Asia, 24*(3), 242–256.

Walker, C. (1990). Feminist Literary Criticism and Author. *Critical Enquiry, 16*(3), 551-571

Yadav, N. (2006). *Gender, Caste and Class in India.* Pragun Publications.